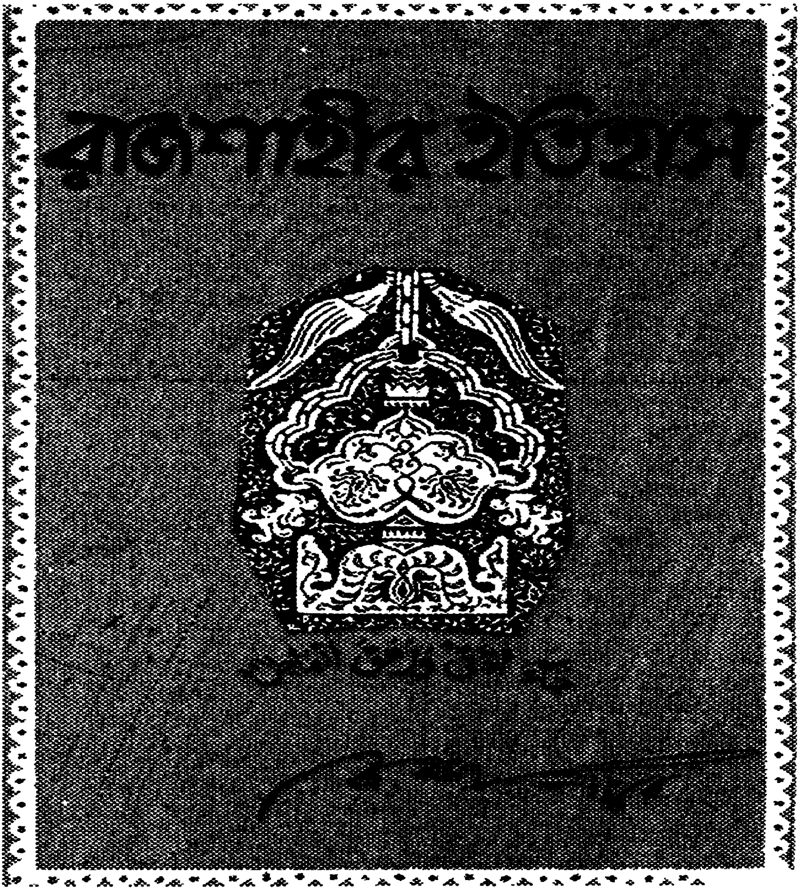
# রাজশাহীর ইতিহাস



প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র। ১৯৬৫

# রাজশাহীর ইতিহাস

[ ১ম ও ২য় খণ্ড ]

কাজী মোহাম্মদ মিছের

গতিধারা
৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৬৫

**প্রকাশক**
সিকদার আবুল বাশার
গতিধারা
৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
e-mail : gatidara@bdonline.com

**পরিবেশক**
বইপত্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১৭৫১৫, ৭১১৮২৭৩

**প্রচ্ছদ**
১৯৬৫ সালের প্রচ্ছদ অবলম্বনে
সিকদার আবুল বাশার

**কম্পিউটার কম্পোজ**
গতিধারা
৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

**মুদ্রণ**
জি. জি. অফসেট প্রেস
৩১/এ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন
নয়াবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭৩৯২০৭৭, ০১৭১১৬০২৪৪২

# উৎসর্গ

বাঙলা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে

# ভূমিকা

[মুহম্মদ এনামুল হক, এম.এ, পি.এইচডি, এস.আই]

দুই খণ্ডে প্রায় সাতশত পৃষ্ঠার 'রাজশাহীর ইতিহাস' প্রণেতা জনাব কাজী মোহাম্মদ মিছের সাহেব আমাদের দেশের এবং ভারতভুক্ত পশ্চিম-বঙ্গের প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তাদের অনেকের নিকট সুপরিচিতি। ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে ইহা তাঁহার প্রথম গ্রন্থ নহে। ইতঃপূর্বে তিনি 'বগুড়ার ইতিকাহিনী' নামক আরও একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ১৯৫৭ সালের শেষের দিকে তিনি একা এই 'বগুড়ার ইতিকাহিনী' মুদ্রণের ব্যয়ভার বহনের অসমর্থ হইলে, অর্থ সাহায্যের জন্য তাঁহাকে বাংলা একাডেমীর শরণাগত হইতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরূপে তখন আমার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। ইতোমধ্যে জনৈক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান-সংগ্রাহকরূপে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।

সখের খাতিরে প্রায়ই দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনা করিলেও, আমি এই শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত গোঁড়া ঐতিহাসিক নহি। সুতরাং, জনাব মিছের সাহেবের ইতিহাস সম্বন্ধে আমার কোন মতামত প্রকাশ করার অধিকার নাই বলিলেই চলে। 'অনধিকার-চর্চা' বলিয়া একটা কথা যখন আমাদের অভিধানে পাওয়া যায়, বিশেষ করিয়া জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমরা যখন অনধিকার-চর্চা করিতে অভ্যস্ত, এমন কি, কোন-না-কোন বিষয়ে অনধিকার-চর্চা না করিলে যখন আমাদের পেটে ভাত হজম হয় না, তখন আপন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমিও ঐতিহাসিকদের কাছ হইতে অনধিকার-চর্চার অনুমতি পাইতে পারি বলিয়া মনে হয়।

মিছের সাহেব "বগুড়ার ইতিকাহিনী" লিখিয়াছিলেন,– সে প্রায় আট বৎসর পূর্বের কথা। সেই ইতিহাস ও বর্তমান ইতিহাস গ্রন্থকারের পূর্ব-পাকিস্তানের বৃহত্তর ইতিহাস রচনার পূর্বপ্রস্তুতিরূপে লিখিত জেলাওয়ারী ইতিহাস। সুতরাং উভয় রচনার একটা তুলনামূলক আলোচনা অতি সহজেই চলিতে পারে। এই দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, উভয় ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য এক হইলেও, গ্রন্থ-পরিকল্পনা, বিষয়-বৈচিত্র্য, উপাদান-সংগ্রহ, এমন কি, তাহাদের বাছাই, যাচাই ও ব্যবহারের দিক হইতে 'রাজশাহীর ইতিহাস' 'বগুড়ার ইতিকাহিনী' হইতে উন্নত প্রকৃতির গ্রন্থ। মুদ্রণ-পারিপাট্যে ইহার শ্রেষ্ঠত্বের কথা নাই বা বলিলাম। ভাষার দিক হইতেও মিছের সাহেবের এই গ্রন্থ পূর্বগ্রন্থ হইতে প্রাঞ্জল ও সাবলীল। তাহা হইবারও কথা। উভয় গ্রন্থ রচনার মধ্যে সময়ের যে দীর্ঘ ব্যবধান রহিয়াছে, গ্রন্থকার তাহা অবহেলায় কাটাইয়া দেন নাই। ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির পর্যালোচনায়, লেখাপড়ার অনুশীলনে, কাহিনী ও কিংবদন্তী-সংগ্রহে, প্রাচীন কীর্ত্তি ও স্মৃতিবিজড়িত স্থানাদি ভ্রমণের দ্বারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জনে

তিনি এই সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার প্রমাণ তাঁহার 'রাজশাহীর ইতিহাসের' প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় বর্তমান।

'রাজশাহীর ইতিহাস'- কে ঠিক 'ইতিহাস' বলা যায় কি না, বলিতে পারি না;-তবে ইহা যে রাজশাহী জেলার একটি ঐতিহাসিক বিবরণী, তাহাতের কোন সন্দেহ নাই। এই বিবরণীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে গোঁড়া ঐতিহাসিকেরা নানা কথা বলিতে পারেন। তবে, গোঁড়া ঐতিহাসিকের ইতিহাস-রচনার মৌলিক উপাদান, এই ইতিহাস হইতে যে সংগৃহীত হইবে, সে-বিষয়ে আমি একেবারেই নিঃসন্দেহ। কেননা, ইহাতে পাথুর-প্রমাণের একান্ত অভাব না থাকিলেও, হাতুড়ে-প্রমাণের, অর্থাৎ কিনা কাহিনী ও কিংবদন্তীর যে অসদ্ভাব নাই, গ্রন্থটিই তাহার জাজ্জল্যামান প্রমাণ। এবং এই হাতুড়ে প্রমাণকে অস্বীকার করিয়া কেবল পাথুরে-প্রমাণের সাহায্যেই কোন ইতিহাস যে রচিত হয় না। বা হইতে পারে না, তাহা একটা সর্বস্বীকৃত সত্য। অতএব, 'রাজশাহীর ইতিহাস' ইতিহাস নহে,- এই কথা বলিয়া তুড়ি মারিয়া গ্রন্থটিকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

'রাজশাহীর ইতিহাসে এই জেলার প্রাচীন কীর্তি হইতে আরম্ভ করিয়া অতি আধুনিক কীর্তির বিবরণ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই জেলার এমন কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় নাই, যাহাকে মিছের সাহেব বাদ দিয়াছেন, বা যাহার সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান নাই। তিনি কাহিনী ও কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়াছেন, এইগুলির যথাসাধ্য বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন, অতঃপর তিনি তাহার তাঁহার পুস্তকে স্থান দিয়াছেন। এই সমস্ত উপাদান সম্বন্ধে এক এক ক্ষেত্রে মতামত প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অধুনা সুদুর্লভ। এতদ্ব্যতীত, তিনি উপাদান-সংগ্রহে যে ব্যক্তিগত ঐতিহাসিক অভিরুচি, অনুসন্ধিৎসা, অনুসন্ধান ও বিচার-বিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা গবেষণা-দায়গ্রস্ত আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

মিছের সাহেবের 'রাজশাহীর ইতিহাস' মুখ্যতঃ জেলার বিবরণীমূলক গ্রন্থ হইলেও ইহাতে প্রত্যেকটি বিবরণে সুদীর্ঘ কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রধানতঃ এই কারণেই, আমি মনে করি, 'রাজশাহীর ইতিহাস' এই জেলার একটি 'হিষ্টরিক্যাল গ্যাজেটিয়ার' বা ঐতিহাসিক-বিবরণী। এই শ্রেণীর গ্রন্থের আবশ্যকতা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সমগ্র দেশের, বিশেষ করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার জন্য এই জাতীয় গ্রন্থ সম্পূর্ণ অপরিহার্য। বস্তুতঃ, এই শ্রেণীর গ্রন্থ এখনও, রচিত না হইলে, আর কিছু দিন পর জাতির প্রকৃত ইতিহাসই অবলুপ্ত হইবে। বলাবাহুল্য, যে-জাতি আত্মবিস্মৃত এবং আপন ইতিহাস ও ঐতিহ্য-সচেতন নহে, সে-জাতির উন্নতি সুদূরপরাহত। মিছের সাহেব 'রাজশাহীর ইতিহাস'-রচনা করিয়া একটি বিশেষ জাতীয় কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল এই যে, 'রাজশাহীর ইতিহাসে' মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে, অথচ অন্য সংস্কৃতিও উপেক্ষিত হয় নাই। এই ইতিহাসের ইহাও একটি বৈশিষ্ট্য বটে। ফলে,

এতকাল রাজশাহীর যে সমস্ত প্রাচীন কীর্তি ও ঐতিহাসিক বিবরণ সম্বন্ধে কেহই অবগত ছিল না, শুধু রাজশাহীর অধিবাসী নহে, সাধারণভাবে দেশের অগণিত জনসাধারণও এই গ্রন্থ হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিবে।

এই গ্রন্থ জনাব কাজী মোহাম্মদ মিছের সাহেবের সুদীর্ঘ অনুসন্ধান ও গবেষণার ফল। তাঁহার ন্যায় এমন আত্মভোলা সংস্কৃতিসেবী এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসাপ্রবণ তরুণ আমি এ-যাবৎ দেখি নাই। 'রাজশাহীর ইতিহাস' রচনার জন্য তিনি দীর্ঘ দিন ধরিয়া যে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে আমি সম্যক্ অবহিত। এতদিন পর, তাঁহার এই ইতিহাস-সাধনা সফল হইল, -ইহা আমাকে বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছে। আমি 'রাজশাহীর ইতিহাস' রচনার জন্য জনাব মিছের সাহেবকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাইতেছি। প্রার্থনা করি,-তাঁহার ভবিষ্যৎ গবেষণার পথ সুগম হইক। আমিন।

ঢাকা
৮৪ সংখ্যক শান্তিনগর
১লা অক্টোবর ১৯৬৪

মুহম্মদ এনামুল হক
পরিচালক
কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড
ঢাকা

# লেখকের নিবেদন

পরম করুণাময় আল্লার অশেষ কৃপার 'রাজশাহীর ইতিহাস' প্রকাশিত হ'ল। এই ইতিহাস প্রকাশিত হওয়ায় কেবল রাজশাহী জেলার কতকগুলো ঘটনা প্রবাহের সন তারিখই প্রকাশিত হ'ল না বরং আজাদী পূর্ব্ব সমগ্র বাঙলা এবং ক্ষেত্র বিশেষে পাক-ভারতের অনেক বিশিষ্ট স্থানের কথাও এতদসঙ্গে রয়ে গেল। বাঙলার প্রত্যেক জেলার তথ্যাদির সঙ্গে কোন না কোন বিষয়ে এ জেলার তথ্যাদির সংযোগ রয়েছে, বাংলার সঙ্গে পাক-ভারতেরও ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসের তথ্যাদির উপর গবেষণার কাজে নিয়োজিত থাকা কালীন প্রয়োজনের তাগিদে আমি এই সব ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত স্থান পরিভ্রমণ করেছি। প্রতিপাদ্য বিষয় বস্তু সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করে যাচাই করাই ছিল আমার গবেষণার মূল লক্ষ্য। এতদবিষয়ে গবেষণা কালে পশ্চিম বঙ্গের পথঘাট নদী নালা হাট-বাজার, পুরাতন-নূতন পল্লী প্রভৃতি পর্য্যটন করি। এবং ১৯৫১ সালে সমগ্র হিন্দুস্থানের ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করার সুযোগ লাভ করি। তখন বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত মণিষী ব্যক্তির সাহায্য পেয়ে আমি উপকৃত হয়েছি। প্রাচীন ইতিহাসের তথ্যাদির ব্যাপারে হিন্দুস্থানের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডঃ নীহার রঞ্জন রায় প্রমুখ পণ্ডিতদের চিঠি পত্রে অনেক মূল্যবান উপদেশ পেয়ে বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছি।

ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন মুসলিম বাঙলার ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানের নেশায় আমাকে পথে ঘাটে দুঃখ কষ্ট বরণ করতে হয়েছে। ব্যক্তিগত লোভ, লালসা, ভোগ বিলাসের কথা না ভেবে আমি জাতির ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করে তথাকথিত রাজনীতির কোন্দলে যোগদান করিনি; যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে জানেন তারা স্বীকার করবেন, মোটা মাইনের কথা ভাবিনি, ফিরিঙ্গি সভ্যতায় ডুবে যাইনি; মানবিক নিষ্ঠার কথা ভেবেই সব রকম দুঃখ কষ্ট নীরবে সহ্য করে চলেছি-মনে আশা পোষণ করেছি যদি আমার দ্বারা এ কাজে জাতির কিঞ্চিৎ উপকার হয়।

আমার গবেষণার বয়স আজ ১৬ বছরে পড়েছে। ১৯৫৭ সালে 'বগুড়ার ইতিকাহনী' প্রকাশের পর আমি অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করি। তখন স্বদেশ বা মাতৃভূমির প্রতি একটা বীৎশ্রদ্ধার ভাব আসে কিন্তু, আমার পরম শ্রদ্ধের গুরুজন মা বাবা ও বড় ভাই এবং শ্রদ্ধেয় ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, ডঃ আহম্মদ হোসেন দানী, বরেন্দ্র মিউজিয়ামের রামপদ বাবু, মরহুম মীরজাহান, বগুড়ার ডাঃ কছির উদ্দীন তালুকদার (এম-বি), আমার বাল্য বন্ধু উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সংসদের সহসেক্রেটারী জনাব এ, বি, এম, ফজলুর রহমান প্রমুখ শুভানুধ্যায়ী বন্ধু বান্ধব আমাকে নানাভাবে শান্ত্বনা দিতে থাকেন। পুনরায় আমি গবেষণার কাজে প্রবৃত্ত হই। পরে আমি এ কাজে তথ্যাদি সংগ্রহ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী যে তিন জন বন্ধুর সময়োচিত সাহায্য লাভ করি, তাঁরা ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, রাজশাহী বিভাগের প্রাক্তন কমিশনার সৈয়দ মুরতেজা আলী ও পূর্ব্ব পাকিস্তান পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডক্টর নাজিমুদ্দীন আহমদ। আজ আমার

(দ্বিতীয়গ্রন্থ) 'রাজশাহীর ইতিহাস' প্রকাশিত হওয়ায় এই আনন্দের দিনে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই।

'রাজশাহীর ইতিহাস' রচনার ব্যাপারে যাঁরা আমাকে তথ্যাদির বিষয়ে খোঁজ খবর দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন পোরশার শাহ্ আবদুল গফুর চৌধুরী জনাব মৌলবী মাদার বখশ (উকিল), জনাব আব্দুল মজিদ (এম, এন, এ), শ্রী ভূবনেশ্বর সেন গুপ্ত (রাজশাহী সেরিকালচার), জনাব একরামুল হক্ (অধ্যাপক), শ্রী অতুল চন্দ্র মৈত্রেয় ও গজেন্দ্র নাথ কর্মকার (নাটোর,) খন্দকার মোঃ আশরাফ আলী রানী নগরী), মরহুম মোবারক আলী (দেশের বানী নওগাঁ), জনাব মৌঃ ইদরিস আলী আহ্মদ (দাদনচক), মৌঃ সাইদ-উদ-দীন মিঞা (রামচন্দ্রপুর হাট), রায় বাহাদুর ধরণী মোহন মৈত্রেয়, জনাব মৌঃ আতাউর রহ্মান (মোক্তার), জনাব মির্জা আব্দুল কাইয়ুম (উকিল, নওয়াবগঞ্জ), জনাব মৌঃ জিয়াউল আলম মোঃ ইউসুফ খাঁন (ভাইস চেয়ারম্যান-রাজশাহী মিউনিসিপ্যাল কমিটি), জনাব মওলানা গোলাম মোস্তফা, রাজশাহী কালেক্টরীর জনাব মৌঃ আব্দুল কাদের, পোরশার ডাঃ হাবিবুর রহমান, জেলার পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মৌঃ মজিবুর রহমান, পি-এন-বিশি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

রাজশাহীর ভূতপূর্ব ডেপুটি কমিশনের জনাব পি এ, নাজিরের আমল 'রাজশাহীর গৌরবময় যুগ। চারিদিকে কর্মকোলাহল। সমগ্র জেলায় কর্ম ও কর্মীদের প্রাণচাঞ্চল্য। তদুপরি তিনি ব্যাক্তিগত আত্ম নিষ্ঠায় এই জাতীয় পুর্ণগঠন মূলক কাজে এগিয়ে আসেন এবং রাজশাহীর ইতিহাসের তথ্যাদি সংগ্রহ ব্যাপারে প্রত্যেক থানা, ইউনিয়ন ও মহকুমা হাকিমদের কাছে ব্যাক্তিগত সাহায্য চেয়ে আবেদন জানান। অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব কে, জি, এম, লতিফুল বারী, জনাব টি, হোসেন, জনাব জমিরুদ্দীন আহম্মদ, জনাব এস, এম, মওলা বখশ প্রমুখ ভদ্র মহোদয়গণ বিভিন্ন সংস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাকে প্রেরণা দিতে থাকেন। অতঃপর জনাব নাজিরের বন্ধুজনসূলভ সহানুভূতি ও দৃঢ়তায় অনেক দুঃসাধ্য কাজ সুসম্পন্ন হয়। সত্যি কথা বলতে কি জনাব নাজির রাজশাহীতে না এলে এত শীঘ্রই 'রাজশাহীর ইতিহাস' দুনিয়ার আলো দর্শন করতো কিনা সন্দেহ ছিল। সত্যই তাঁর ব্যক্তিগত কর্মনিষ্ঠার ফলে রাজশাহীতে যতগুলো গঠন মূলক ঐতিহাসিক কাজের ভীত্তি সুদৃঢ় হয়েছে তন্মধ্যে-'রাজশাহীর ইতিহাস' অন্যতম। তাঁর কাছে আমি জীবন ভর ঋণী।

এই ইতিহাসে আর যাঁরা সব সময় আমার পাশে থেকে ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে নাড়াচাড়া করে আমাকে নানা ভাবে পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন তাঁদের মধ্যে রাজশাহী কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জনাব মোঃ রমজান আলী, রাজশাহী সিটি কলেজের অধ্যক্ষ জনাব এস, এম আব্দুল লতিফ ও সহ অধ্যক্ষ জনাব শামসুল হক কোরেশী, জনাব নুরুজ্জামান (রহমান ব্রাদার্সের ম্যানেজার) অন্যতম। অতিরিক্ত খাটুনিতে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লে আমি অনেক সময় ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলতাম, তখন আমার বাল্য বন্ধু জনাব কোরেশী সাহেব আমাকে নানা ভাবে উৎসাহিত করে সত্যিকারের বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এমন বন্ধু পাওয়া খুবই দুর্লভ। এঁদের কাছেও আমি ঋণগ্রস্থ।

পাকিস্তান পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক ও বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ সমস-উদ-দীন আহম্মদ সাহেব, আমার নবাবিস্কৃত (স্থানীয় বরেন্দ্র মিউজিয়াম রক্ষিত) আরবী, ফারসী লিপি, ২০ খানা বাদশাহী ফরমান, বহু দলিল দস্তাবেজ, দুস্প্রাপ্য মুদ্রা প্রভৃতির পাঠোদ্ধার করে দিয়ে আমার সবিশেষ উপকার করেছেন। আমি তাঁহার কাছেও কৃতজ্ঞ। কিন্তু, দুঃখের বিষয় হাত বদল হয়ে স্থানীয় 'বরেন্দ্র মিউজিয়াম' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যাওয়ায় আমার বার বার চেষ্টা স্বত্বেও রাজশাহীর ইতিহাসের এই সব মূল্যবান দুস্প্রাপ্য সম্পদগুলো রাজশাহী বাসির দৃষ্টিগোচর হল না। পুনর্বার যদি অত্র ইতিহাসের পুর্ণমুদ্রণ হয় তখন আর একবার চেষ্টা করব। রাজশাহীতে আবিস্কৃত আমার বহু মূল্যবান ১ম কুমার গুপ্তের 'তাম্র পত্র' ও অন্যান্য উপাদানের বিষয়েও তখন আলোকপাত করবার প্রয়াস পাব।

আমার অবাল্য বন্ধু লোকনাথ হাইস্কুলের হেড মাষ্টার জনাব আব্দুল মুইজের পিতা মরহুম খান বাহাদুর মহাম্মদ সাহেব (হুগলীতে) আমার বাল্য শিক্ষক ছিলেন। এই দিক দিয়ে জনাব মুইজের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা বহুদিনের বিগত ৭ বছর ধরে এই লোকনাথ স্কুলে থেকে রাজশাহীর ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেছি। জনাব মুইজ মধ্যে মধ্যে আমার পাণ্ডুলিপি পাঠ করে আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং আমার বন্ধুত্বের দাবী ছাড়াও আমি তাঁর কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। এতদসঙ্গে লোকনাথ স্কুলের পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষকদের বার বার সহানুভূতির জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১৯৫৮ সালের ১২ই জানুয়ারীতে রাজশাহীর ইতিহাসের কাজ আরম্ভ করি। আর ইহার পরিসমাপ্তি গটে ১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসে। এই গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশে প্রধাণত: বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, জিন্না ইসলামিক ইন্সটিটিউট, রাজশাহী মিউনিসিপ্যাল কমিটি, রাজশাহী জেলা পরিষদ প্রভৃতি সংঘ সমিতি সরকারীও বে-সরকারী এক কালীন দান ও ক্ষুদ্র বৃত্তির মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য করেন। জেলা পরিষদের অংক অপেক্ষাকৃত বেশী। এই সব প্রতিষ্ঠানের বদান্যতা, সহানুভূতি ও অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে তাঁদের কাছে আমি বিশেষ ভাবে ঋণী। আমার নিজের ২৬৬ খানা 'বগুড়ার ইতিকাহিনীর বিক্রয়লব্ধ টাকার কথা বাদ দিলে রাজশাহীর বিখ্যাত রাজনৈতিক ও জনদরদী কর্মী জনাব মোঃ আতাউর রহমানের (মোক্তার) কথা মোটেই ভুলা যায় না। তিনি রাজশাহীর ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। তাঁর কাছেও আমি ঋণী। পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার জনাব মোমতাজ হাসান এই ইতিহাসে কিছু অর্থ সাহায্য করে কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

দেশের ইতিহাসের মৌলিক তথ্যের উপর আলোচনা গবেষণা সম্পর্কে আমাদের অনেকের ধারণা সুস্পষ্ট নয়। আবিস্কৃত উপাদানের স্থানকাল পাত্র ভেদাভেদ বিচার বিবেচনা করতে গিয়ে সময়ের অল্পতা ও অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার দরুণ সব সময় নিজের খাওয়া পরার দিকেও নজর দিতে পারিনি। ২/১ বার হাতীর পীঠে-, আর বেশীর ভাগ সময়ে নৌকা, গো-যানে ভ্রমণ করেছি। আর এই বেশে গাঁয়ের পথে পল্লী প্রান্তরে

কতজনের যে কতভাবে সময় নষ্ট করেছি, কত একতারা বাদকের বাড়ীতে গান শুনতে উঠে তার গৃহিনীর বকুনী শুনেছি, রোজগারের পথ ঘাট করেছি; কত পথিককে রাস্তাপথে দাঁড় করে অযথা হয়রানি করেছি তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু শেষের বারে সুবরাজপুরের চৌধুরী সাহেবের হাতীর পীঠে সীমান্ত অঞ্চলে রাজার হালে আনন্দে যে কয়টি দিন কাটিয়েছি চির দিন তা আমার মনে ভেসে বেড়াবে। এই সময় আমার সহযোগী পাচক ছেলেটি সঙ্গে না থাকায় উদীয়মান কর্মী চৌধুরী মোশারফ হোসেনের সঙ্গ ও সহযোগীতার কথা একই ভাবে মনে থাকবে।

আধুনিক যুগের বাবুআনা কালচারে পুষ্ট ফিটফাট বাবুদের পক্ষে পুরাতত্ত্বের নেশায় এ ভাবে ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে কিনা জানি না। তবে কথাগুলো একদিন কাজে লাগতে পারে তাই একরূপ গায়ে পড়ে লিখে যাচ্ছি। গায়ে কাদা, মাথায় দুপুরের রোদ, গামছা পরে নদী সাঁতার, বাঁশ বনের ছায়ায় বসে হেটো পেতে লেখা, কত হিংস্র জন্তু জানায়োরের গ্রাস থেকে প্রাণে বেঁচে, টিক টিকিদের খপ্পড় এড়িয়ে, গুপ্তচর সন্দেহে পুলিশি হাজত বাস করে, নানা জনের ঠাটটা বিদ্রূপ গাল মন্দ নীরবে সহ্য করে, দেশের মাটি থেকে খাঁটি সোনা উদ্ধার করা যায়। যাঁদের কাছে আমি এ শিক্ষা লাভ করেছি তাঁরা হলেন অনেকেই আশ্রম বাসী সাধু সন্ন্যাসী; খদ্দর বাসা গাছের ছাল পাতা পরিহিত কেহ বা ধুতি ফোতা জড়ানো পণ্ডিত। এখানে সবাইকে মনে রাখা সম্ভব নয়। তবে গঙ্গা সাগর মেলার পথে শিবগঞ্জের অদূরে বেতগুর নীচে ফলতায় দারকেশ্বর-হুগলী নদীর মোহনায় সাগরগামী সন্ন্যাসীদের নৌকায় আরোহণাবস্থায় নৌকাডুবির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা, আর পল্লী পর্য্যটনের অগ্রদূত কলিকাতা নিবাসী ঐতিহাসিক ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের কথা আজও আমার মনে আছে।

অত্র গ্রন্থের আলোচনা উপকরণের বেশীর ভাগ তথ্যই নবাবিস্কৃত। আমাদের গ্রাম পল্লীর সব কিছু তথ্যই ইতিহাসের উপজীব্য। কিন্তু সামনে আমার সময়ের স্বল্পতার কথা চিন্তা করে কেবলমাত্র মাটীর একটি ক্ষুদ্র দীপ জ্বালিয়ে গেলাম। এমন একদিন আসবে সেদিন বাঙ্গালী সাহেবদের বর্তমান বাবুআনা কালচারের পরিবর্তে দেশী তমুদ্দুনের প্রতি মমতা ও দেশাত্ব বোধ জাগবে। তখন নবীন প্রবীনরা দেশের মাটিতেই খাঁটি সোনা খুঁজে বেড়াবে। তখন রাজনীতির ঘনঘটা, সমাজ সেবার নামে জাতির মুণ্ডুপাত করা, সমাজ বিরোধী কাজ করা, বাঙ্গালী সাহেবদের ফিরিঙ্গি কায়দায় চলাফেরা, গাড়ী বাড়ীর বহর থাকবে না।

রাজশাহীর ইতিহাসে আমি কেবল সংগ্রহ ও সরক্ষণের কথা বলে গেলাম। ইহার গুণাগুণ বিচার করবেন সুধী পাঠক সমাজ। এটি আমার দ্বিতীয় গ্রন্থ। পাঠক সমাজে সুবিধার জন্য আমি ইহাকে দু'ভাগে ভাগ করেছি। প্রথম খণ্ডে প্রধাণতঃ "রামপুর-বুয়ালিয়া" দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র জেলাকে কেন্দ্র করে অতীত ও বর্তমানের তথ্যাদির উপর আলোকপাত করেছি; মোটামুটি ভাবে অধিকাংশ তথ্য ও তত্ত্বের বিষয় সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছি। অনিবার্য্য কারণে শেষের দিকে রাজনীতি ও জমিদারী অধ্যায় সংক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছি।

ঐতিহাসিক কারণে এদেশের হিন্দুরা মুসলমানদের প্রতি চিরদিনই বৈরী ভাবাপন্ন। ইতিহাস ও সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করেননি। বিংশ শতকে যে ২/১ জন ঐতিহাসিক নিজের নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনে চেষ্টা করেছেন পরিণামে তাঁরা হিন্দু সমাজের গলগ্রহ রূপে অতীব ক্লেশে জীবন অতিবাহিত করেছেন। যেহেতু পাক-ভারতের ইতিহাসের স্রষ্টা মুসলমান সেই হেতু আজ মুসলমানদের উচিৎ সেই সত্য নিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি রেখে ইতিহাস রচনা ও সৃষ্টি করা। এই হিসাবে আমি কতটা বিচার বিবেচনা করেছি বিজ্ঞ পাঠক সমাজ তা কষ্টি পাথরে বিচার করে দেখবেন। আমি এখানে কেবল হিন্দু মুসলমানের পুরানো কালের স্মৃতি রেখার জের টানিনি। পাকিস্তানী অর্থে সর্ব স্তরের নাগরিকের যা সত্য, আমরা তারই প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রয়াস পেয়েছি। ইতিহাসের সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অনেক অপ্রিয় সত্যের কথা খুঁজে বের করতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থকারকে কেউ যেনো জাতি বিদ্বেষী মনে না করেন।

প্রাচীন বাঙ্গলার হিন্দু শাসন থেকে মুসলমান আমল এবং পাকিস্তান সৃষ্টি ও ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে গ্রহণ যোগ্য তথ্যাবলীর উপর আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। দেশ বিভাগের পর কতকগুলো ঐতিহাসিক কীর্তি-সহ মলদহ ও দিনাজপুর জেলার কতকাংশ রাজশাহী জেলার অন্ত হওয়ায় 'রাজশাহীর ইতিহাসের' কলেবর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাজশাহী জেলা পর্য্যটন কালে ক'বার আপদ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে ছোট সোনা মসজিদ থেকে ফেরার পথে কামালপুর মৌজার সীমান্ত রক্ষী কর্তৃক গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়ে ৫/৬ ঘন্টা হাজত বাস করতে হয়। ক'বার জঙ্গল অঞ্চলে হিংস্র জন্তর কবল থেকে প্রাণ রক্ষা পায়। আর এক স্থানে রাতের অন্ধকারে দুর্বৃত্ত কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে কতকগুলো মূল্যবান জিনিস পত্র লুণ্ঠিত হয়।

আলোচ্য প্রবন্ধ ও সংগৃহীত তথ্যাদির প্রমাণ পঞ্জীর জন্য আমি বহু খ্যাত অখ্যাত সরকারী বেসরকারী লাইব্রেরীর সাহায্য নিয়েছি। এই সব লাইব্রেরীব কর্তৃপক্ষের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার কথা স্বীকার করে নিম্নলিখিত লাইব্রেরী কয়টির নাম উল্লেখ করছি: রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির লাইব্রেরী ও মিউজিয়ম, রাজশাহী কলেজের লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী, কালেক্টরী লাইব্রেরী, বিভাগীয় কমিশনারের অফিস লাইব্রেরী, জিন্না ইসলামিক ইন্সটিটিউট, লোকনাথ হাইস্কুল লাইব্রেরী; নাটোর, নওগাঁ ও নওয়াবগঞ্জ মহকুমাধীন পুরাতন লাইব্রেরী এবং দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা ও বগুড়া শহরের পুরাতন লাইব্রেরী; ঢাকা মিউজিয়াম লাইব্রেরী প্রভৃতি।

কোন কোন তথ্যের ব্যাপারে আমাকে পশ্চিম বঙ্গের চুঁচড়া, কলিকাতা, বর্ধমান, বোলপুর, বিষ্ণুপুর, কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, পাটনা (বিহার) ফ্লোরারী শরীফ প্রভৃতি স্থানের বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে প্রত্যেকের কাছে বন্ধুজন সুলভ সাহায্যের কথা স্বীকার করছি।

আলোকচিত্র প্রভৃতি ব্যাপারে পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডঃ নাজিমুদ্দিন আমাকে

তাঁদের নিজের কতকগুলো ছবি ছাপাতে দিয়ে বাধিত করেছেন। রাজশাহীর ষ্টার ষ্টুডিওয়ের মালিক জনাব মোতাহার হোসেনের প্রদত্ত কতকগুলো ছবি ছাড়াও অনেক বিষয়ে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। প্রচ্ছদপট প্রভৃতি অঙ্কনে সাহায্য করে সেরিকালচারের শিল্পী সৈয়দ ফজলার রহমান আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

বঙ্গে সূফী প্রভাবের ডক্টর এবং কেন্দ্রীয়-বাঙলা-উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক ও বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রদ্ধের ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক রাজশাহীর ইতিহাসের ভূমিকা লিখে দিয়ে ইহার মর্যাদা অনেক খানি বৃদ্ধি করেছেন।

রাজশাহীর ইন্টারন্যাশান্যাল প্রিন্টিং ফারমে 'প্রথম খণ্ড' মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রণ ব্যাপারে ঢাকার আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কসের মালিক মীর হাসান আলী সাহেব বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। এইভাবে জানিত অজানিত বহু বন্ধুবান্ধব 'রাজশাহীর সবার কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণের কথা পরম শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করছি। এই ইতিহাসে যদি কোন কৃতিত্ব থেকে থাকে তা আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধু বান্ধবদের–আর যা দোষ ত্রুটি আছে তা আমার নিজের।

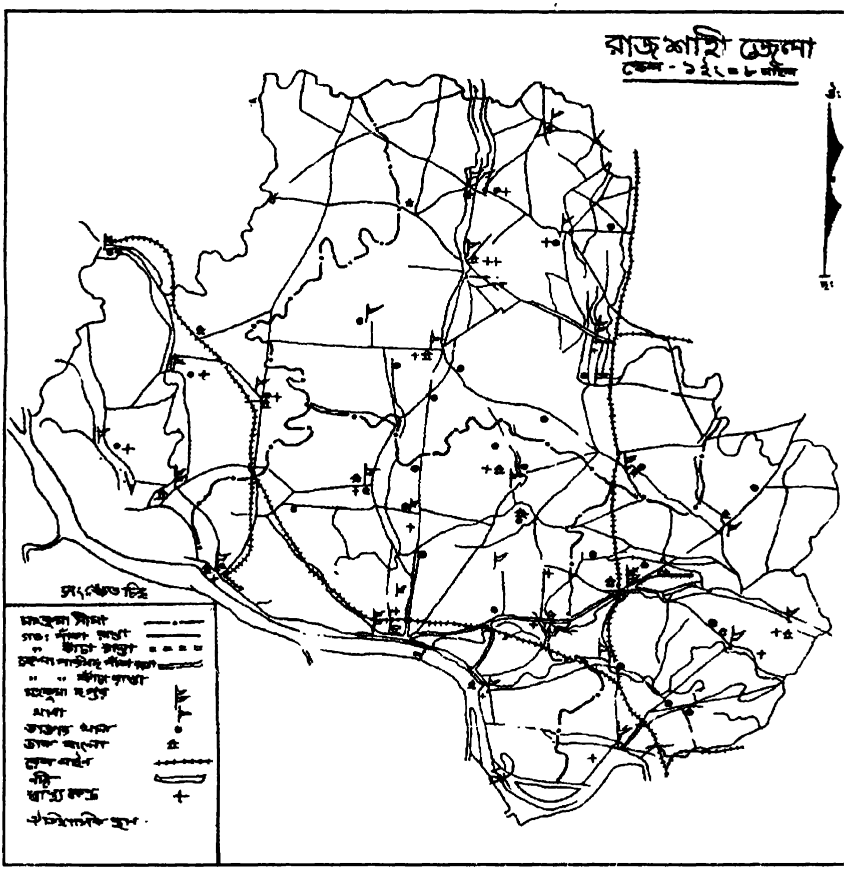
গবেষণামূলক স্থায়ী গ্রন্থদি রচনা করতে গিয়ে বাধা ধরা নিয়ম কানুন মেনে চলতে গেলে অথবা সরকারী তদারকে অনেক সময় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হয় না। সত্যের অনুরোধে বলতে হয় রাজশাহীর ইতিহাস রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে কতবার কতজনকে কত রকম যে কৈফিয়ত দিতে হয়েছে তা বর্ণানাতীত। সেজন্য খুব তাড়াহুড়া করতে গিয়ে অনেক সময় প্রেসের মালিকের সাথে অনেক অপ্রীতিকর বচসা হয়েছে। এই সব কারণে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রুফ সংশোধনের কাজে কিছুটা ভূল ত্রুটি রয়ে গেলো। বিজ্ঞ পাঠক সমাজ বিজ্ঞান সম্মত উপদেশ ও এতদসম্পর্কে তথ্য প্রেরণ করলে সাদরে গৃহীত ও পুনর্মুদ্রণে ইহার সংশোধনের ওয়াদা নিয়ে ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা চাইছি।

সর্বশেষে আমার জীবন সঙ্গিনীর কথা। শেষের দিকে রাজশাহীর ইতিহাসের পাণ্ডুলিপির প্রেস কপি প্রস্তুত ও ইতিহাসের সৌন্দর্য্য বর্ধনে সৎ পরামর্শ দান প্রভৃতি ব্যাপারে যার ঋণ আমি কোন দিনই শোধ করতে পারব না। আমি আমার সেই সহধর্মিনী সৈয়েদা হোসনে আর বেগম ওরফে হাসিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এখানেই আমার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি টানছি।


কাজী মোহাম্মদ মিছের
নারায়ণ শহর
ডাকঘর : শিবগঞ্জ
জেলা : বগুড়া
পূর্ব্ব পাকিস্তান


'পৌণ্ড্রবর্ধন স্মৃতিকাজীকুঠী'
আশ্বিন/কার্ত্তিক ১৩৭২
অক্টোবর ১৯৬৫

# রাজশাহী জেলার প্রাচীন ম্যাপ



# রাজশাহীর ইতিহাস : ১ম খণ্ড

## বিষয়সূচি

মসজিদ, হেমায়েতে ইসলাম, কলিকাতায় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন, ইসলাম মিশন মোহামেডান এসোসিয়েশন, মফিদুল ইসলাম, মুসলিম ক্লাব ও জিন্না ইসলামিক ইনষ্টিটউট, ইয়াং মেনস এশোসিয়েশন খাদেমুল ইসলাম, মুসলিম গোরস্থান, শ্মশান ঘাট, ইদগাহ।

**পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ১৬৯–১৭৬ পৃঃ**

পাকিস্তান আমল :

রাজশাহী শহরকে বিভাগীয় শহরের মর্যাদা দান, বিদেশী মিশন, উচ্চ শিক্ষার পূর্বভাষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ, টি, টি, কলেজ, মুসলিম হাই স্কুল, কোর্ট একাডেমী, কায়েদে আজম বিদ্যালয়, সিটি কলেজ, মহিলা কলেজ, লক্ষ্মীপুর উচ্চ-বিদ্যালয়, সরকারী এতিম খানা, আদিবাসী ছাত্রাবাস, মুকুল ফৌজ, কচিকাঁচা, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেকনিক্যাল স্কুল, অন্ধ বিদ্যালয়, দারুস সালাম মাদ্রাসা, যানবাহন সমিতি, উকিল-মোক্তার বার, রেশম-লাক্ষা গবেষণাগার, শিল্পকলা, পথঘাট ও নূতন পরিকল্পনা, রেডিও সেন্টার, স্টেডিয়াম, টেলীফোন, মার্কেট, মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ... প্রেসক্লাব।

## চিত্রসূচি

## ॥ প্রথম পরিচ্ছদ ॥

# রাজশাহীর ইতিহাস : প্রথম খণ্ড

**সাধারণ বিবরণ :**

পূর্ব্ব পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত রাজশাহী একটি বিখ্যাত শহর। বর্তমান এই শহরই উত্তরাঞ্চলের কর্মকীর্তির উৎস। রাজধানী ঢাকার পরেই রাজশাহী শহরের ভূমিকা আজ নানা কারণে বিশিষ্ট। এখানে অবস্থিত বিভাগীয় ও জেলার সদর দপ্তর, সর্ববিধ উচ্চতম শিক্ষার ধারক 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়', রাজশাহী কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ল'কলেজ, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, সরকারী রেশম ও লাক্ষা গবেষণাগার, বেতার কেন্দ্র এবং সেন্ট্রাল জেল প্রভৃতি উহার গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। এতদব্যতীত কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, মৎস্য প্রভৃতি বহু বিষয়ের বিভাগীয় হেড কোয়ার্টার্স এখানে স্থিত। এই জন্য আজ রাজশাহী শহর, রাজশাহী বিভাগের তথা উত্তর বঙ্গের জন-জীবনের প্রাণ কেন্দ্র স্বরূপ। অধুনা রাজশাহী শহরকে কেহ কেহ উত্তরাঞ্চলের রাজধানী অভিহিত করেন। এই শহরের নীচ দিয়া প্রবাহিত ইতিহাস বিখ্যাত পদ্মার প্রাণ লীলা। তীরে শহরের দৃশ্য ও আবাসিক আভিজাত কুঠিগুলি সারিবদ্ধ ভাবে থাকিয়া হুগলী-কলিকাতার স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দেয় কালে কালে ধীরে ধীরে এই শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। শহরের বিশিষ্ট কীতিগুলি তাহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

এই শহরের সর্ব পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত, জেলার সদর দপ্তর; কোর্ট-কাচারী, জেলা কাউন্সিল প্রভৃতি, পূর্ব প্রান্তে বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরে শ্রম-শিল্প সংক্রান্ত কলকারখানা, দক্ষিণে প্রমত্তা পদ্মা।

শহরের নাভী স্থলে অবস্থিত, নগরজীবন বা পৌর সভার কার্য্যালয় (Municipality)। ইহার চারিপার্শ্বে রহিয়াছে স্কুল, কলেজ, সরকারী আফিস, সঙ্ঘ, সমিতি, হাট-বাজার, দীঘি, পুষ্করিণী, মাঠ-ময়দান, রাস্তা-পথ, বসতি-বিস্তার, দালান-কোঠা যত কিছু এই সুন্দর শহরের অলঙ্কার; পাকিস্তান যুগের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে রাজশাহী শহরের গুরুত্ব বহুধা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। জেলার সদর ইহার পুর্ণাঙ্গ জীবন রচনায় আজ বদ্ধ পরিকর। শহরের চারি পার্শ্বে কর্ম কোলাহল শ্রমিক নাগরিকদের আনন্দ বিগলিত জীবন, কর্মরত আফিস আদালত, জ্ঞানী, গুণি, মনীষীবৃন্দের কখন কখন সমাবেশ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে সভা সম্মেলন এই শহরের অগ্রগতির দ্যোতক।

এই শহরের দক্ষিণ ধার দিয়া বিশালাকায় পদ্মা প্রবাহিত। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর আম্রকানন দ্বারা পরিবেষ্টিত। শহরের রাস্তা-পথে নানা প্রকার আম, জাম, মেহগনী, কৃষ্ণচূড়া, বট-অশ্বথ ইত্যাদি বৃক্ষ এই টাউনকে পরিশোভিত করিয়াছে। কোথায়ও নারিকেল কোথাও ছোট-খাট আম্রকানন, প্রাচীন কুঠি ও নূতন পুরাতন সমৃদ্ধ সৌধমালার প্রাঙ্গণে ফুলের বাগান, কোথাও দুই ধারে পাম সারি ও ফাঁকে ফাঁকে দীঘি পুষ্করিণী প্রভৃতি রাজশাহীর সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যের পরিচায়ক।

প্রাকৃতিক গঠন ও শহর রচনা

বিখ্যাত নাটোর পথ পূর্ব দিক হইতে আসিয়া শহরের বক্ষকে ভেদ করিয়া সোজা পশ্চিম দিকে গমন করিয়াছে। এই পথের দুই ধারেই শহরের উল্লেখযোগ্য সৌধ ও কর্মকেন্দ্রগুলি অবস্থিত।

রাণীবাজার রেশমপট্টি, বুয়ালিয়া ও ঘোড়ামারা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও ঘন বসতি পূর্ণ। ক্রয় বিক্রয় সব কিছুই এই অঞ্চলে হইয়া থাকিত। এই অঞ্চলই হইল এই শহরের আদিতম বসতি-বিস্তার। ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজগণ এই অঞ্চলেই পরশ মানিক লাভ করে। এই খানেই তাহারা সওদা ক্রয় করিয়া স্বদেশে চালনা করিত। বিদেশী সওদা আনিয়া এই বুয়ালিয়াতেই ঢালিয়া দিত। সুতরাং আজিকার সাহেববাজার, বুয়ালিয়া, রেশপট্টি, ঘোড়ামারা এই শহরের প্রাচীন কেন্দ্র ও প্রাথমিক রচনা।

এই শহরের আবহাওয়া সমভাবাপন্ন। উচ্চতম তাপমাত্রা প্রায় নাই বলিলেই চলে। সকল ঋতুতেই সমুদ্রবৎ পদ্মার জলীয় বায়ু টাউনের আবহাওয়াকে স্নিগ্ধ করিয়া রাখে। এই জলীয় বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী। সেই জন্য পদ্মার তীরে প্রাতে ও সন্ধ্যায় শত শত লোক ভীড় জমাইয়া থাকে।

এক সময় রাজশাহী স্বাস্থ্য নিবাস হিসাবে বঙ্গে সুপরিচিত ছিল। বৃদ্ধ ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের লোকজন তাহাদের স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য কিছু দিনের মত ও স্বাস্থ্য নিবাস এখানে আসিয়া বাস করিত। দেশ বিদেশের বিত্তশালী ও স্বাস্থ্য নিবাস রাজা জমিদারগণ পদ্মার তীরে স্বাস্থ্য নিবাস কুঠি বা 'বাংলা' নির্মাণ করিয়াছিলেন। পাঁচ-আনীর কুঠি[১] (এখন এই কুঠিতে সরকারী এতিমখানা স্থাপিত হইয়াছে), দিঘাপতিয়া রাজার কুঠি[২], কলিকাতা হাই কোর্টের বিখ্যাত উকিল বাবু মোহিনী মোহন রায়ের[৩] কুঠি, ওয়াটশন কোম্পানীর[৪] কুঠি প্রভৃতি কুঠির নাম করা যাইতে পারে। আরও ছোট বড় বহু কুঠি পদ্মা গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। সেই সব কুঠির হিসাব আমরা উদ্ধার করিতে পারি নাই। এখনও স্বাস্থ্যকর

**আবহাওয়া ও স্বাস্থ্য নিবাস**

স্থান হিসাবে বাহিরে রাজশাহীর নাম আছে। কিন্তু বর্তমানে শহরের জনসংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ এখানকার আবহাওয়া কখন কখন দুষিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এখন 'গোদাগাড়ী', 'প্রেমতলী', 'চারঘাট', 'মীরগঞ্জ', 'বাঘা' প্রভৃতি স্থান স্বাস্থ্য নিবাসের অনুকুলে গড়িয়া উঠিতেছে। অধিকন্তু সেই সব স্থান এক সময় নানা কারণে বিখ্যাত ছিল। সে কথা আমরা জেলা অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। এই শহরের ভূমি আর্দ্র ও দো-আঁশলা। পুরাভূমি লক্ষিত হয় না। মধ্যযুগের পূর্ব্বে এই ভূমি-খণ্ড কি অবস্থায় ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে রাজশাহীর পদ্মা এবং মহানন্দা, বাড়াণই, নারদ, হোজা, বড়োল গদাই, মুশাখান

---

১. পুঁঠিয়ার পাঁচ-আনীর আবাসিক কুঠি। ইহাতে জমিদারী সংক্রান্ত কার্যও চলিত।

২ ইহাও একটি বিখ্যাত আবাসকি কুঠি ছিল। শ্রীরামপুরে স্থিত সরকারি আফিসাদি পদ্মায় নিমজ্জিত হইলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বর্তমান কুঠি নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি এখানে অবস্থান করিতেন। পরে রাজা প্রমোদা নাথ এই কুঠির দারুময় সরঞ্জামাদি বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের ইমারত নির্মাণের ন্য দান করিয়া যান।

৩. রাজশাহীর পানসিপাড়ার (লালপুর থানা) বিখ্যাত জমিদার বাবু মোহিনী মোহন রায় খ্যাত নামা উকিল ছিলেন। তিনি কলিকাতা গমন কালে তাঁহার জামাতাকে (নাটোরের ছোট তরফের রাজা) উক্ত কুঠি দান করিয়া যান। এখন সেই কুঠিই বর্তমান জেলা জজের কুঠি। বুয়ালিয়া ক্লাবটিও তাঁহার সম্পত্তি ছিল।

৪. এখনই এই কুঠি বর্তমান রাজশাহী বিভাগের কমিশনার সাহেবের আবাসিক কুঠি

প্রভৃতি নদীর প্রাচীনত্ব আলোচনা করিলে জানা যায় যে, এই সব নদীর মোহনাস্থিত বালি চরে গঠিত ভূমি ভাগের উপরই রাজশাহী শহর প্রতিষ্ঠিত[৫]। পুর্ব্বে মুশাখান, উত্তরে হোজা, পশ্চিমে জামদোহা, দক্ষিণে অশান্ত পদ্মা। এই নদী চুতষ্টয়ের বেষ্টনের মধ্যে রাজশাহী শহর অবস্থিত। উল্লিখিত নদীগুলির চক্রাকারে খাত পরিবর্তনের ফলে বালিমাটি বাহিত রাজশাহী শহরের ভূমি গঠিত। এইজন্য এইভূমি নবভূমি, পুরাভূমি নহে। পঞ্চদশ শতক হইতে খুব সম্ভব এখানে মানুষের আনাগোনা, বসতি-বিস্তার, বাজার বন্দরের সূচনা।

ভূমি-উদ্ভব

**নামকরণ :**

'রাজশহী' নামের উপর লিখিত কোন ইতিহাস নাই। ইহার প্রামাণিক তথ্য নির্ণয়ের জন্য ইতিপূর্বের তেমন কোন চেষ্টাও করা হয় নাই।

যতটুকু হইয়াছে তাহা জনশ্রুতি মূলক। এই ব্যাপারে আমরা যতটা তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল।

তখন বাঙলায় নওয়াবী আমল। নওয়াব মুর্শিদকুলী খান[৯] বাঙলায় নওয়াবী (১৭০৪-১৭২৫ খ্রী:) লাভের পর রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে সুবায়ে বাঙলাকে ১৩টি চাকলার বিভক্ত করেন[১০]। এই ১৩টি চাকলার মধ্যে 'চাকলা-রাজশাহী' নামক একটি বৃহৎ চাকলা ইতিহাস পাওয়া যায়। এই চাকলা পদ্মার উভয় তীরে বিস্তৃত ছিল। তখন এই চাকলা রাজশাহীর রাজস্ব আদায় করিতেন একজন ব্রাহ্মণ জমিদার। তিনি ইতিহাসে উদয় নারায়ণ নামে পরিচিত[১১]। সম্ভবত: জমিদারী লাভের পর মুশিদকুলী খান কর্তৃক তিনি রাজা উপাধীতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

---

৫. Statistical Account of Rajshahi district pp 22-24 and Rajshahi district gazetteer pp 9-13, (যে সময় মহানন্দা বাহিত বালুচবে এই ভূমি গঠিত হয়, তখন পদ্মার অস্তিত্ব এখানে ছিল না। মুশিদাাদেব ভগবানগোলার নিকট দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হইত। তখন পদ্মা এতখানি বিশাল নদী ছিল না। দশম একাদশ শতকে পদমা ভীষণা ভয়ঙ্করীর পরিবর্তে পদ্মা ক্ষীণ তোয়া। মধ্য যুগের নদীর ইতিহাসে সরদার নিচে পদ্মাব সহিত মহান্দার সঙ্গমেব কথা আছে। কিন্তু আত্রাইয়ের সহিত মিলনের কোন সংবাদ শোনা যায় না। রাজশাহী শহরস্থ বড় কুঠির পূর্ব্ব ধাব দিয়া 'বাড়াহী'[৭] নদী বাহিব হইয়া তাহিবপুরেব নীচে দিয়া 'তেমুখ গ্রামে' আত্রাই নদীব সহিত মিলিত ছিল[৮]। তাহার কিছু পুর্ব্বদিকে মহানন্দা পরে পদ্মার সহিত মিলিত। সাবদের সহিত এখন তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। পুঁঠিয়ায় পূর্ব্ব দিকে পাইকপাড়ায় একটি নালা বড়োল ও হোজাকে সংযুক্ত করিয়াছিল। এই নালার দক্ষিণ পূর্ব্বভাগকে মুশাখাল বলিয়া থাকে। -১২৪৫ (১৮৩৮ খ্রীঃ) সালে বিরাট বন্যায় মুশাখান বিস্তৃত হয় এবং বাজশাহী শহরের দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে পদ্মার প্রবল জল তরঙ্গে একটি ভীষণ জল-বিপ্লব ঘটে। সেই হইতে মুশাখান ও হোজা একত্র হইয়া গদাই নামে অভিহিত হইয়াছে। দক্ষিণে নাবদ এখন স্তব্ধ, মজিয়া গিয়াছে।

৬. পুঁঠিয়া রাজবংশ পৃঃ ৩; মহারাণী শরৎ সুন্দরী জীবন চরিত্র। পৃঃ ১৬-১৭

৭+৮. Rennell's account of the Ganges and Burmhaputra River. (Philosophical transactions 1781), and also see-Rennell's Map.

See- Imperial gazetteer, provincial series P. 209

৯. বাদশাহ্ আলমগীর আওরঙ্গজেব কর্তৃক তিনি "মতিন-উল-আল-মলক্ জাফর খান নাছিবী নাছির জঙ্গ" পদবীতে ভূষিত হন।

(Stewart's History of Bengal P 418)

১০. The fifth Report, Vol. I. P. 389.

১১. Stewart's History of Bengal, P. 428

পরবর্তী কালে দেখিতে পাই-পদ্মার উত্তর ভাগস্থিত জমিদারী হাত বদল হইয়া রামজীবনের নিকট (বাংলা ১১২১ সালে?) ইং ১৭১৪ সালে বন্দোবস্ত হয়, আর এক অংশ পদ্মার দক্ষিণ ভাগে থাকিয়া যায়; তাহা 'নিজ চাকলা রাজশাহী' নামে পরিচিত[১২]। পরবর্তী কালের ইতিহাসে উহার উল্লেখ সুস্পষ্ট[১৩]। এই সময় রামজীবনের জমিদারীও রাজশাহী নামে পরিচিত হয়। কেন না, মিঃ গ্র্যান্ট বলিয়াছেন যে, "রাণী ভবানীর জমিদারীকে সাধারণত: "রাজশাহী" বলা হয়[১৪]। ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র মতে ইং ১৭৩০ সালে রাজা রামজীবনের মৃত্যু হয়। তাহার উত্তরাধিকারী রামকান্তের মৃত্যু হয় ইং ১৭৫১ সালে। রামজীবনের পর মাত্র ২০/২১ বৎসর অন্তর এই 'রাজশাহী' জমিদারী রাণী ভবাণীর কর্তৃতাধীনে চলিয়া যায়। সুতরাং পদ্মার উত্তর ভাগের জমিদারী 'রাজশাহী নামে রামজীবনের কাছে বন্দোবস্ত হইয়াছিল একথা বলা যায়।

উপরে বর্ণিত বিষয় সমূহ পরিষ্কার করিতে হইলে "চাকলা রাজশাহীর" জমিদারী সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের সময় "চাকলা রাজশাহীর" অন্তর্গত স্থান সমূহের পরিবর্তন হয়। ইং ১৭৬৫ সাল হইতে ১৭৯৩ সাল পর্য্যন্ত "চাকলা রাজশাহী" বাঙলার প্রায় এক এক তৃতীয়াংশ জুড়িয়া ছিল। ইহার পশ্চিম সীমা ভাগলপুর; পূর্ব সীমা ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইংরেজ আমলে রাজশাহী বিভাগ ছাড়াও "চাকলা রাজশাহীর" জমিদারীর কতক অংশ যশোহর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিল। রাজা উদয় নারায়নের পর পদ্মার উত্তর তীরের জমিদারী একটি পৃথক জমিদারী হইয়া রামজীবনের নিকট বন্দোবস্ত হয়। এই সময় পদ্মার দক্ষিণাংশের অবশিষ্ট জমিদারী 'নিজ চাকলা"[১৫] নামে আর একটি পৃথক জমিদারী হয়। যেহেতু এই জমিদারী মধ্যে মুর্শিদাবাদে তখন বাঙলার রাজধানী সেইহেতু রাজধানী অন্তর্গত অংশ পরবর্তীকালে "নিজ চাকলা রাজশাহী" উল্লিখিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

মোঘল আমলের শেষভাগে সরকারের পরিবর্তে সুবায়ে বাঙলাকে কতকগুলি চাকলার বিভক্ত করা হয়[১৬]। শাসন শঙ্খলা ও রাজস্ব আদায়ের তগিদে পর্য্যায়ক্রমে কোম্পানী আমলে মুর্শিদকুলী খান প্রবর্তিত চাকলাগুলি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় পরিণত হয়। এই সময় রাজশাহী চাকলাও জেলায় পরিণত হয় কিন্তু 'বাজশাহী' নাম ঠিকই থাকে। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকেব গোড়ার দিকে রাজশাহী হইতে কতক অঞ্চল পৃথক হইয়া আরও কয়েকটি জেলার সৃষ্টি হয়।

যাহাহউক, নওয়াব মুর্শিদকুলী খানের পূর্ব্বে রাজশাহী নাম আর কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বরং পববর্তীকালে এই নামের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। এখন আমরা

১২. Statistical account of Bengal by W W Hunter Vol VIII District of Rajshahi and Bogura P 20

১৩. বাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃঃ ২/৩; Rajshahi gazetteer PP. 44–45 . Rajas cf Rajahahi, Calcutt Review

১৪. The fifth Report Vol I. PP, 250, 259–260.

১৫. রাজশাহীব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পৃ: ৩; Hunter's statistical account of Rajshahi and Bogura district P,20

১৬. 'গৌড়ের ইতিহাস' : ১৯৯, দ্বিতীয় ভাগ, মুসলমান রাজত্ব, শ্রীরজনী কান্ত চক্রবর্তী; রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পৃ: ১৪৯।

চাকলা রাজশাহীর সপক্ষে প্রমাণ যাচাই করিব। জনৈক কিশোরী চাঁদ মিত্র রাজশাহীর রাজা জমিদারের জীবন বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন[১৭]। "রাজশাহীতে বহু রাজার বাস। এই রাজাদের নামানুসারে রাজশাহী নামকরণ হইয়াছে ইত্যাদি। কিশোরী বাবুর এই অনুমান মানিয়া লওয়া যায় না। কারণ রাজশাহীতে বহু রাজার সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বেই ইতিহাসে রাজশাহীর নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং মিত্র মহাশয়ের অনুমান কল্পনা প্রসূত বলা যাইতে পারে। জনৈক কালীপ্রসন্ন বাবু বলিয়াছেন যে, রাজশাহীর নাম রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত। কিন্তু বাঙলার কোন ইতিহাসে তাঁহার কোন সমর্থন বা উল্লেখ নাই। অতএব কালী বাবুর মতটির পশ্চাতে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না[১৮]। অধ্যাপক ব্লকম্যান অনুমান করিয়াছেন যে, ভাদুরিয়ার হিন্দু রাজা কংস বা গণেশ গৌড়ের মুসলমান সুলতানকে উৎখাত করিয়া সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন 'হিন্দী' 'রাজ' ফারসী 'শাহী' যেমন মাহমুদ শাহী বারবাক শাহী, তেমনই হিন্দুর 'রাজ' মুসলমানের শাহী-রাজশাহী, অর্থাৎ হিন্দু রাজা হইয়া মুসলমানের সিংহাসনে শাহ হইয়াছিলেন[১৯]। সুতরাং রাজশাহী নামটি এই ভাবেই গঠিত হইয়াছে। মিঃ ও'মেলী পরোক্ষভাবে অধ্যাপক ব্লকম্যানের এই মত সমর্থন করিয়াছেন[২০]। কিন্তু যে অনুমানের পশ্চাতে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকে না তাহা সমর্থন যোগ্য নহে। কেননা রাজা গণেশ পঞ্চদশ শতকে গৌড়ের মুসলমান সিংহাসন লাভ করেন। ষোড়শ শতকে শেরশাহী আমলের ভূমি বিভাগের পরগণা সরকার প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এই সময়ে যদি কোন পরগণা বা সরকার অথবা মহলের নাম গণেশের নামানুসারে রাজা শাহ্ হইয়া বাজশাহী হইয়া থাকিত–তাহা হইলে পরবর্তীকালে আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে তাহার উল্লেখ থাকিত। কারণ শেরশাহী ভূমি বিভাগের ভিত্তির উপরই আকবরী আমলে ভূমির পুনঃ সংস্কার ও বন্দোবস্ত হয়। আইন-ই-আকবরীতে উহা সুস্পষ্ট[২১]। সুতরাং ব্লকম্যানের অনুমানকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। রাজশাহীর কালিনাথ চৌধুরী বলিয়াছেন "পদ্মা নদীর দক্ষিণে 'নিজ চাকলা রাজশাহী নামে একটি ভূ-ভাগ রাজশাহী প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরেজদের অধিকার সময়ে বোধ হয় ঐ চাকলার নামে রাজশাহী জেলার[২২] নাম করণ হয়।" কালিনাথের উক্ত ধারণা ব্লকম্যান প্রমুখের অনুমান অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিপূর্ণ ও প্রবল। কালিনাথ বাবু হান্টার প্রমুখের ইতিহাসে হয়ত 'নিজ চাকলা রাজশাহী' নাম দেখিয়া থাকিবেন। তাই হয়ত তিনি চাকলা রাজশাহীর নামানুসারে রাজশাহী নাম করণ হওয়া সঙ্গত মনে করিয়া উক্ত মতকে সমর্থন করিয়াছেন। মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক চাকলা বন্দোবস্ত ও রাজশাহীর নামের উৎপত্তি, একথা তিনি জানিতেন বলিয়া মনে হয় না। জানিলে হয়ত তিনি তাহার বিষয় উল্লেখ করিতেন। যাহা হউক, আমাদের মতে নওয়াব মুর্শিদকুলী খান কর্তৃকই রাজশাহীর নাম

---

১৭. Rajas of Rajshahi, Calcutta Review, 1873.
১৮. উৎসাহ পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৯০৫ সাল।
১৯. J. A. S. B 1876-P-287.
২০. Rajshahi gazetteer, Ist page
২১. Ain-I-Akbari-by Abul Fazal Allami, Translated by Jarrett, PP 129-141.
২২. রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পৃঃ ২, ১০৮।

করণ হইয়াছে। কারণ, মুর্শিদকুলী খান আলমগীর বাদশাহের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। নওয়াবী লাভের পর তিনি বাদশাহ কর্তৃক উচ্চ পদবীতে ভূষিত ও হইয়াছিলেন। হয়ত বাদশাহকে খুশী করিবার জন্য বাঙলার সর্ব্ববৃহৎ জমিদারীটির নাম রাজশাহী করিয়াছিলেন। হিন্দু রাজা মুসলমানের বাদশাহী' আমাদের মত 'রাজশাহী'; এই দুই জাতীয় অদ্ভুত নামের সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। কারণ রাজা উদয় নারায়ণকে তিনি ভালবাসিতেন বলিয়াই 'রাজা' উপাধি দিয়াছিলেন। আগামীতে কোন অধিকতর গ্রহণযোগ্য তথ্যের আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত এই ধারণাকে যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেহেতু মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক বঙ্গ সুবার নূতন ভাবে বন্দোবস্ত হয় সেই হেতু নূতন নামের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। বিশ্বকোষেও ইহার ইঙ্গিত আছে (বিশ্বকোষ ষোড়শ ভাগ-পৃঃ ৩৮২ "রাজশাহী" শব্দ দ্রষ্টব্য)। অতএব রাজশাহী নাম তাঁহারই কীর্তি প্রায় নিঃসন্দেহে একথা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আমাদের মত

**শহরের অবস্থান ও বাঁধের সূচনা :**

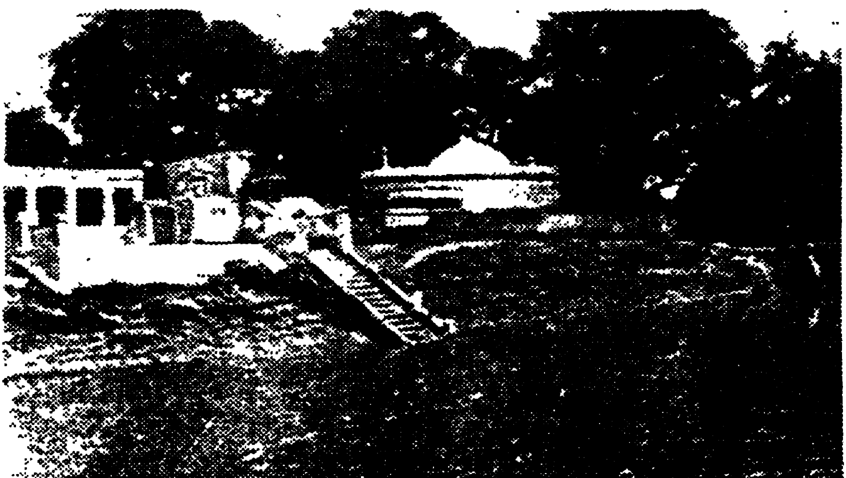
পদ্মা ভীষণা, ভয়ঙ্করী, রাক্ষসী। পদ্মার ভাঙ্গাগড়ার সহিত রাজশাহী শহরের ভাগ্য জড়িত। ইহার উত্তর তীরে শহরের অবস্থান। পূর্ব্ব পাকিস্তানের নদীর ইতিহাস আলোচনা করিলে অনুমিত হয় যে, প্রায় পঞ্চদশ শতকে এই শহরের দক্ষিণে দুই অথবা আড়াই মাইল দূরে, মহানন্দা পশ্চিম হইতে দক্ষিণগামী (কিছুটা ক্রম বক্র গতিতে) হইয়া প্রবাহিত হইত। এই সময় মহানন্দার ৩/৪ মাইল দক্ষিণে পদ্মা প্রবল ছিল। তখন সরদার দক্ষিণে কিছু দূরে মহানন্দা তাহার বিপুল জলধারা পদ্মার প্রবাহে ঢালিয়া দিত। তারপর দেখা যায়, ক্রমশ; বামকোলে মাতম করিতে করিতে পদ্মা মহানন্দাকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে মহানন্দাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না; মহানন্দা এইখানে তাহার নামটিও হারাইয়া ফেলে। মহানন্দার সহিত পদ্মার সঙ্গম হওয়ায় পদ্মা তখন সমুদ্রবৎ করালমূর্তি লইয়া প্রলয় ঘটাইতে ঘটাইতে আগাইয়া আসিতে থাকে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আসিয়া পদ্মা শ্রীরামপুরস্থিত শহরের সহিত সংগ্রাম শুরু করিয়া দেয়; পদ্মার প্রলয় নৃত্য চলিতে থাকে। মহানন্দা এখন বহুদূরে শহর হইতে ১৫/১৬ মাইল পশ্চিমে প্রেমতলী ও গোদাগাড়ীর মাঝামাঝি পদ্মার ও মহানন্দার মিলন ক্ষেত্র রচিত হইয়াছে। আজ বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ভাগে দেখিতেছি– পদ্মা-মহানন্দার সংগমস্থল একেবারে গোদাবাড়ী থানার নীচে চলিয়া গিয়াছে।

পদ্মা মহানন্দার সঙ্গমস্থল

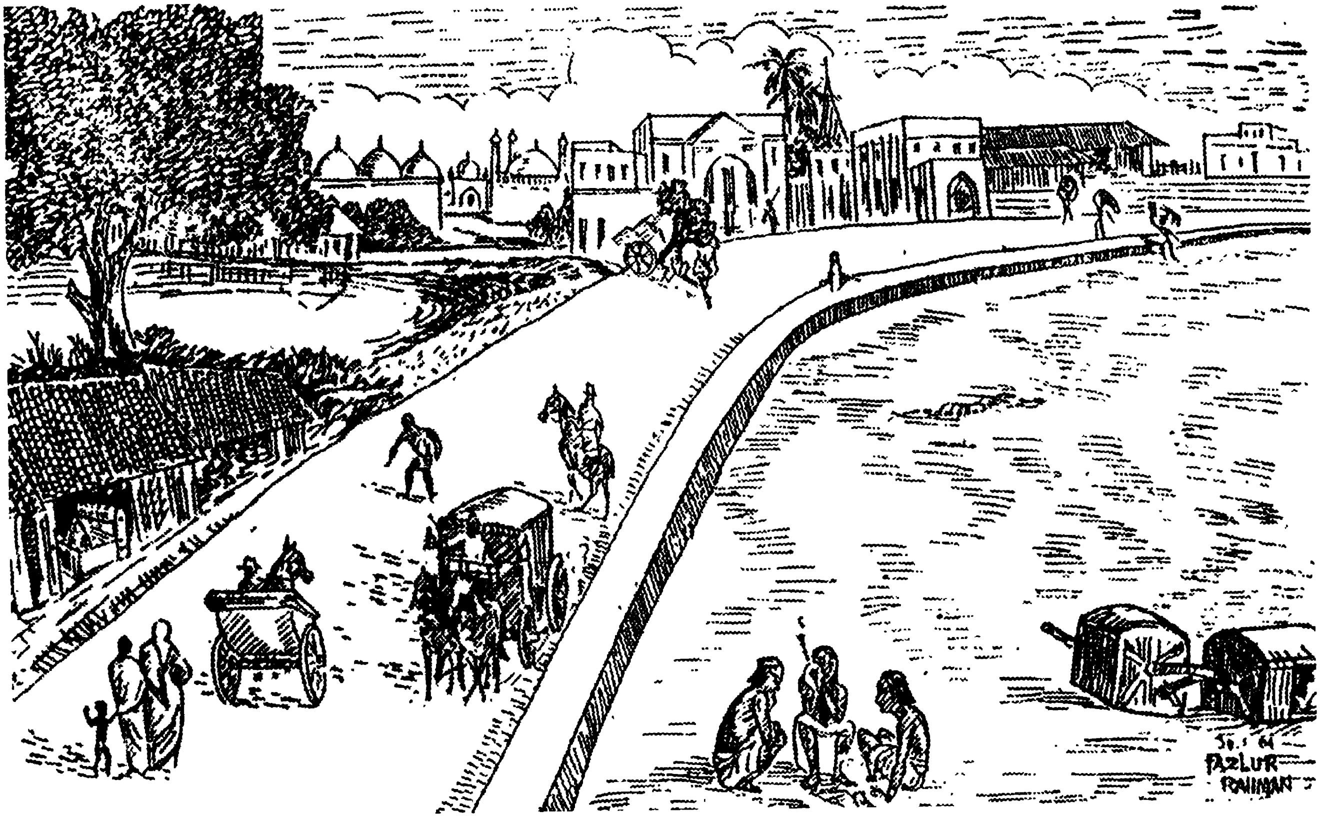
প্রকৃতির তাড়নায় বান-বন্যায় ভরা যৌবনোদ্দাম এই রাক্ষসী পদ্মা বহুবার খাত পরিবর্তন করিয়াছে বহু পুরাতন বাজার-বন্দর, বৃক্ষ শোভিত গ্রাম, শস্য-শ্যামল মাঠ প্রান্তর, বহু মসজিদ-মন্দির, দালান-কোঠা প্রভৃতি মানুষের কত কীর্তি' 'যে ধ্বংস করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কত জনপদের সুখ সমৃদ্ধি যে পরিবর্তন করিয়াছে যুগে যুগে তাহার হিসাব ইতিহাস রাখিতে পারে নাই। প্রকৃতির এই দুরন্ত ভাঙ্গাগড়ার সহিত মানুষ সব সময় আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই; অনেক সময় নতি স্বীকার করিয়াছে। রাজশাহীর পুরাতন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম 'চর সাঁইপাড়া'. 'কাদিরপুর', 'শ্রীরামপুর', 'সাহেবগঞ্জ', নবীনগর',



রাজশাহী-বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে বাঁধের দৃশ্য



শাহ মখদুমের সমাধি




কোম্পানী আমলের রামপুর-বুয়ালিয়া

'হাবাসপুর', 'নওয়াবগঞ্জ-বাজার', 'বশরী', (কসাই, বৈরাগী, নাপিত, ধোপা, তেলী, কুমার, ময়রা চেরাগীপাড়া[২৩]?) প্রভৃতি গ্রাম পদ্মা গর্ভে সমাধিস্থ[২৪] হইয়াছে।

এই সব গ্রাম-স্মৃতি মানুষের মুখে মুখে আজ নানা কথা কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছে। কতক বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইতে চলিয়াছে। পদ্মার স্বাভাবিক গতি প্রবাহের সহিত মানুষ দিনের পর দিন বিরামহীন সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। বহুশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতেছে; তবুও মানুষ আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে[২৫] রাজশাহীর শ্রীরামপুরে অবস্থিত জেলার সরকারী দপ্তরখানা, ইউরোপিয়নদের আবাসিক কুঠি, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইলে টাউনস্থ সরকারী বেসরকারী লোকজন বহু ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জন সাধারণেরা ভীত হইয়া উঠে। অতপর বাঁধ দিয়া (Embankment) শহরকে বক্ষা করা সাব্যস্ত হয়। জেলার সদর-কোর্ট-কাচারী প্রভৃতি বুলনপুরে স্থানান্তরিত (বর্তমান স্থানে) হইলে কাচারীর দক্ষিণে, বুলনপুরের দক্ষিণ ধার দিয়া ইং ১৮৫৫ সালে সর্ব্বপ্রথম ১,৭২৯ ফিট বাঁধ (Embankment) নির্ম্মিত[২৬] হয়। ইহাই রাজশাহীর প্রথম সরকারী বাঁধ। তারপর বান-বন্যার সময় কখন কখন কাচারী প্রাঙ্গণে বন্যার জল প্রবেশ করিতে থাকিলে কাচারীর সংলগ্ন পশ্চিম ও দক্ষিণ ধারে ঢালু করিয়া আর একটি বাঁধ নির্ম্মিত হয়। উহাই বর্তমান 'কাচারী বাঁধ' নামে পরিচিত। সরকারী কাগজ পত্রে এই বাঁধটিই ইং ১৮৫৫ সালের বাঁধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আদিতম বাঁধটির বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের ইং ১৯৫২ সালে পূর্ব্ববঙ্গ বাঁধ এবং ড্রেন য়্যাক্ট (The East Bengal Embankment and drainage Act, 1952) সংক্রান্ত বিষয়ে যে বইখানা প্রণীত হইয়াছে তাহাতে রাজশাহীর বাঁধ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যের উল্লেখ নাই। কেবল মাত্র বর্তমান্ বাঁধগুলির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।[২৭]

প্রথম বাঁধ

কাচারী বাঁধ

ইং ১৮৬৯ সালে[২৮] বর্ষার সময় প্রবল বন্যায় পদ্মা পুনরায় তাহার প্রলয় গতিবেগ লইয়া রামপুব-বুয়ালিয়াস্থিত শহর এবং নিকটস্থ আরও কয়েকটি স্থান আক্রমণ করে। অতঃপর উহার প্রতিরোধ কল্পে প্রাথমিক ব্যবস্থাদি করা হয়। অতঃপর উহার প্রতিরোধ সরকারের বাঁধ সংক্রান্ত আইন পাশ হইলে বুয়ালিয়া তালাইমারী ও গোদাগাড়ী রোডে বাঁধ দেওয়ার বিষয় স্থির হয়। তদনুযায়ী ইং ১৮৯৫ সালে বুয়ালিয়ার দক্ষিণ ধার দিয়া

২৩. এই সব পল্লী নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইলে লোকজন উপরের দিকে আসিয়া বাড়ি ঘর নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছে। স্ব স্ব গ্রামের স্মৃতির রক্ষার্থে– তাহারা পূর্ব নাম ঠিকই রাখিয়াছে। আজিকাব কসাইপাড়া তাহারই একটি স্মৃতি বহন করিতেছে।

২৪ Rajshahi gazetteer P 12; রাজশাহী কালেকটারীতে ১৮৬৭ সাঃ খাকবট ভূমির নকশা দ্রষ্টব্য।

২৫. Statistical account of Rajshahi district P 23

২৬ , .... The left bank of the river ganges, 1, 729 feet in length more or less . south side of the Nator road at the village of Bulanpur .. Pargan girrerhat .. Bangal Embankment Act, 1873 (Bengal Act VI of 1873) by notification datad the 23 Feb, 1885, published in Calcutta Gazetter 1885 Part, I, P 139, as amended by notification No. 707, Dated the 12th Feb, 1895, published in Calcutta Gazetteer; 185, Part; 1, P 127.
পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

২৭. See-East Bengal Act I of 1953; East Bengal Embankment and drainage Act, 1952

২৮. Statistical Account of Rajshahi District, P, 23

বড় কুঠির ১৭০ ফিট পশ্চিমে কসাইপাড়া হইতে বুলনপুর পর্যন্ত ১৪,১৮০ ফিট বাঁধ (Boalia Embankment) সাহেবগঞ্জ হইতে রাজশাহী পাবনা রোডের সংযোগ স্থল পর্যন্ত ৮,২২৪ ফিট (lalaimary Embankment); রামপুর বুয়ালিয়া বাঁধের উত্তর পশ্চিমে জজ্ কোর্টের নিকট হইতে গোদাগাড়ী রাস্তার উপরে মাটি ঢালিয়া ১২,৩৫০ ফিট (Godagari road Embankment) এই তিনটি বাঁধ নির্ম্মিত হয়[২৯]। উহা গোদাগাড়ী রোড বাঁধ, বুয়ালিয়া বাঁধ ও তালাইমারী বাঁধ নামে সরকারী কাগজ পত্রে উল্লিখিত। গোদাগাড়ী বাঁধটি সোনাইকান্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশ বিভাগের পূর্ব্বে বাঙলা সরকারের উক্ত ইং ১৮৭৩ সালের আইনে,

গোদাগাড়ী রোড বাঁধ, বুয়ালিয়া বাঁধ ও তালাইমারী বাঁধ

ইং ১৯৪৪ সালে রাজশাহী শহরে আরও দুইটি বাঁধ নির্ম্মিত হয়। তাহা পাঠানপাড়ার[৩০] বাঁধ ও রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবের কুঠির দক্ষিণে এই বাঁধ অবস্থিত। পাঠানপাড়া বাঁধ ২,৪৫০ ফিট ও অধ্যক্ষ সাহেবের কুঠির দক্ষিণ ধারের বাঁধটি ৭৬৬ ফিট[৩১]। সাধারণ্যে উহা দরগাপাড়া বাঁধ নামে পরিচিত।

পাঠানপাড়া ও দবগাপাড়া বাঁধ

অতঃপর পাকিস্তান যুগে আসিয়া ইং ১৯৪৮ -৪৯ ও ১৯৫৪ সালে আর ও দুইটি বাঁধ নিম্মিত হইয়াছে। এই দুইটির একটি সোনাইকান্দী ও কাজলা বাঁধ বাঁধ ১০,৬০০ ফিট[৩২]; আর কাজলা বাঁধ ৩,৭৬০ ফিট[৩৩]। ইহাই হইল রাজশাহী শহর রক্ষা কল্পে আজাদী-পূর্ব্বাপর বাঁধ নির্ম্মাণের মোটামুটি কথা। এখানে আর একটি মজার ব্যাপার এই যে, স্থানীয় প্রাচীন লোকের[৩৪] মুখে বর্তমান বাঁধের নীচে আরও কয়েকটি বাঁধের কথা শোনা যায়। কিন্তু সরকারী কাগজ পত্রে তাহার কোনো উল্লেখ নাই। বর্তমান শ্মশান-পঞ্চবটির নিকট নূতন বাঁধের দক্ষিণ ধারে পুরাতন বাঁধের যে অবশিষ্টাংশ আছে এবং তালাইমারীতে পাবনা রোডের মুখে একটি পুরাতন বাঁধের যে নিদর্শন দেখা যাইতেছে. উহাই হইল স্থানীয় প্রবীণ লোকের উদ্দিষ্ট বাঁধের প্রামাণিক প্রাচীন নিদর্শন। দুঃখের বিষয় সরকারী আফিসে ইহার কোন তথ্য পাওয়া যায় না। রাজশাহী শহরের বিস্তৃত তথ্য ও নদীর ইতিহাস নির্ণয় করিতে হইলে বিষয়টি ঐতিহাসিকগণের কাছে বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। সেই জন্য বলিতে হয়, জমিদারী আমলে বুয়ালিয়ার বহু অঞ্চল এবং নদীর চরগুলি রাজশাহীর রাজা জমিদারদের খাস

সোনাইকান্দী ও কাজলা বাঁধ

প্রাচীন বাঁধের নিদর্শন

২৯. See the book of East Bengal Act I of 1953 The East Bengal Embankment and dramage Act 1952, (A) left bank of the river ganges 14, 180 feet in .... length (Bengal Embankment Act VI of 1873 (B) .. left bank of the river Ganges 8,224 feet in length more or less. ... (c) .. this is a continuous line of Embankment (which is also a district road) on- the left bank of the river Ganges 12,250 feet in lenght. ... .. to the village of Sonaikandi.

৩০. The Embankment having a length of 2,450.. Bengal Embankment Act, (1873 Bengal Act VI of 1873) by notification No, 9-1, dated the 26th May 1944

৩১. The Embankment in front of the quarter of the principal, Rajshahi College having length of 766 feet....Do

৩২. See-New records file in the EPWAPDA, office, North-West-zone, Rajshahi

৩৩. Do Do

৩৪. – শ্রীঅবিনাশ চৌধুরী ৮১. শিরইল; মুনিরুদ্দীন আহমদ; ৮৭, সেখপাড়া নুরউদ্দীন মিয়া - ৭৪ রশরী, প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

মহলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সব চরে নীল ও রেশমের প্রচুর চাষ[৩৫] হইত। পদ্মার বান বন্যার সময় এই চরগুলির শস্যাদি রক্ষাকল্পে জমিদারগণ তখন নিজ নিজ এলাকায় প্রতি বৎসর বাঁধ বাঁধিয়া দিতেন এবং এজন্য প্রজাদিগকে পৃথক কর দিতে হইত; জমিদারী কাগজ পত্রে উহার উল্লেখ আছে। সুতরাং সরকারী বাঁধের পূর্বে পদ্মার চরে যে জমিদারী বাঁধও ছিল একথা সত্য। তবে বর্তমান সরকারী বাঁধের নীচে আরও কয়েকটি বাঁধ নদী গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে, এ গুলির প্রত্যক্ষদর্শী প্রবীণ লোক এখনও এই শহরে জীবিত আছেন। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে রামপুর, বুয়ালিয়া, তালাইমারী প্রভৃতি গ্রামের ভূমি নকশাতেও উহার উল্লেখ আছে। পুরাতন বাঁধ নদী গর্ভে নিমজ্জিত হইলে নূতন বাঁধের সৃষ্টি হইয়াছে। ইং ১৯২৩ সালে(?) তালাইমারী এবং ইং ১৯১৬ (?) সালে 'বুয়ালিয়া বাঁধ' পুণনির্ম্মিত হয়। তালাইমারীর বর্তমান বাঁধের দক্ষিণ ধারে পুরাতন, নাটোর রোড ও একটি বাঁধের অংশ এবং ইটের গাঁথুনির একটি সাঁকো এখনও আছে[৩৬]। কোন বাঁধ কত সালে নদী গর্ভে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বা যাইতেছে সেই সব তথ্য স্থানীয় অফিসাদিতে রক্ষিত হইলে ভবিষ্যতে তাহার মূল্য সুধী সমাজ উপলব্ধি করিবে। আমরা যে সব তথ্য পাইয়াছি তাহা নিতান্ত অল্প। রাজশাহীস্থ "উত্তর পশ্চিম জোনের" ওয়াপদার বর্তমান প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর আফিসে সংযোগ স্থাপন করিয়া রেকর্ড মূলে জানা গিয়াছে যে, প্রায় ১১ মাইল বাঁধের মধ্যে এখন ৯ মাইলের মত বাঁধ টিকিয়া রহিয়াছে। বুয়ালিয়াস্থ বাঁধকে রক্ষার জন্য সম্প্রতি উহার অধিকাংশ স্থানে তারের জাল দ্বারা আবৃত করা হইয়াছে। এখানে অতীতেও এইরূপ ব্যবস্থা ছিল এবং কতকস্থানে প্রস্তর ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সেই সব বাঁধ ও প্রস্তরাদি এখন আর দেখা যায় না। পদ্মার তীরে বড় কুঠির কোলে প্রচুর পরিমাণ প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপের ফলে ওলন্দাজগণের একটি কীর্তি এখনও টিকিয়া আছে। রাজমহলের পাহাড় হইতে এই সমস্ত প্রস্তররাশি সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। পদ্মার বাঁধ সম্পর্কে আমরা আর অধিক অধিক অগ্রসর হইব না। এই ব্যাপারে অতীতের আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। প্রাচীনকালে বাঙলা দেশের অনেক নদীতে বাঁধ প্রভৃতি বাঁধিয়া জনপদ, বাজার-বন্দরকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইত। এইরূপ নজীর আমাদের সম্মুকে এখনও আছে। বগুড়ার মহাস্থান গড়ের পূর্ব্ব প্রাচীরে এবং পাঁচ-বিবিতে তুলশী পাথর ঘাটার বাঁধ ও শিলাদ্বীপ গঙ্গা নদীর তীরে পাথর ঘাটার বাঁধটি অতীতের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। সেখানে আজ নগর বন্দরের কোন চিহ্ন নাই। কেবল ধ্বংসস্তুপ আর জনশ্রুতি; -করতোয়া ও তুলশীগঙ্গা আজ স্তব্ধ ক্ষীণতরা। কালের বিবর্তনে সেই জন্য আজ মহাস্থানের শিলাদ্বীপ শিলাদেবীর কথায় পৌঁছিয়াছে[৩৭]। বহুযুগ পরে সত্য তথ্য আবিষ্কার হওয়ায় ঐতিহাসিকগণের আনন্দের কারণ হইয়াছে।

পাথর ঘাটার বাঁধ ও শিলাদ্বীপ

শহরে বসতি বিস্তার ও শিল্প বাণিজ্য

নদী হইতে উত্থিত নব ভূমির উপর রাজশাহী শহরের সূচনা, তাহা আগে ভূমি বর্ণনায় উল্লেখ করা হইয়াছে। এই নব ভূমি মানুষের বসবাসের উপযোগী হইবার পূর্ব্বে এই অঞ্চল দুর্ভেদ্য অরণ্যে আবৃত ছিল।

---

৩৫. Rajshahı Gazetteer p, III.

৩৬. আহমদপুর (রামচন্দ্রপুর) শাহ সাহেবের বাড়ীর দক্ষিণে শ্মশান-পঞ্চবটীর পথের বামধারে নাটোর রাস্তা ও প্রাচীন একটি সাঁকো দৃষ্ট হয়।

৩৭. বগুড়ার ইতি-কাহিনী পৃঃ ১৬৯, ৪৩৬ মহাস্থান অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তখন এই চর অঞ্চল নানা প্রকার হিংস্র জন্তু জানোয়ারের বিচরণ ক্ষেত্র থাকায় মানুষের বসবাসের অনুকূলে ছিল না। কালচক্রে এই স্থানে মানুষের বসতি-বিস্তার ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র, জেলা ও বিভাগীয় সদর প্রভৃতি স্থাপিত হইয়া আজ শহরে পরিণত হইয়াছে।

এই নব ভূমিতে সর্ব প্রথম কি ভাবে জনবসতি গড়িয়া ওঠে তাহার কোন ইতিহাস নাই। তবে, পারিপার্শ্বিকতার প্রাচীনত্বের বিষয় আলোচনা করিয়া যতদূর অবগত হওয়া যায়, শ্রীরামপুর, বুয়ালিয়া, চরসাঁইপুর, কাদিরপুর প্রভৃতি এখানকার প্রাচীন পল্লী (ক)।

শ্রীরামপুর ও বুয়ালিয়া

এই ব্যাপারে এতদক্ষেপা অতিরিক্ত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। পর-দরগাকে কেন্দ্র করিয়া 'দরগাপাড়ার' অভ্যুদয় হইয়াছে; একথা নামেই প্রকাশ। এখন আমরা অনুমান করিতে পারি দরবেশ মখদুমের আগমনের পূর্বে, কম হউক বেশী হউক এতদঞ্চলে জনবসতি ছিল। পরে দরবেশ মখদুমের আগমনের পর হইতে এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া এতদঞ্চলে হিন্দু মুসলমান বসতি গড়িয়া উঠে এবং বিস্তার লাভ করিতে থাকে। বাঙলার বিভিন্ন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ স্থান হিসাবে বাঘা, (খ) মখদুমনগর, আলাইপুর, সুলতানপুর প্রভৃতি প্রাচীন বর্ধিষ্ণু মুসলমান পল্লীর উল্লেখ আছে। গৌড়ের সুলতান ও সেপাইগণ এবং দিল্লীর বাদশাহ (গ) ও ফৌজদারগণ নদী পথে এই সব স্থানে যাতায়াত করিতেন; কোন কোন ইতিহাসে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীরামপুর বা বুয়ালিয়ার কোন উল্লেখ তখন পাওয়া যায় না। সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে অর্থাৎ ইংরেজী ১৬০৯ সালে জনৈক আবদুল লতিফ নামক পর্যটক দিল্লী হইতে বাঙলার পথে গৌড়ে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি রাজশাহীর বাঘা আলাইপুর এবং যশোহরের ফতেপুর ও নাজিরপুর প্রভৃতি স্থান পর্যটন করেন এবং কয়েকজন আউলিয়ার সমাধিও তিনি জিয়ারত করেন। আলাইপুরে তিনি মাসাধিক কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় আলাইপুরে গৌড়ের সুলতানদের মিলিটারী সেন্টার (Military Centre) ছিল। উত্তর বঙ্গের নানা স্থান পর্যটন করিয়া এই সময়ের একটি সুন্দর বিবরণী। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন[৩৮]। তখন শ্রীরামপুর বা বুয়ালিয়ার কোন প্রসিদ্ধি বা তেমন কোন নাম ছিল না। যদি কোন প্রসিদ্ধি থাকিত তাহা হইলে তিনি তাঁহার বিবরণীতে তাহা উল্লেখ করিতেন। আলাইপুর হইতে বুয়ালিয়ার দূরত্ব খুব বেশী নহে। সুতরাং ইহাতে অনুমিত হয় যে, তখনও বুয়ালিয়া অথবা শ্রীরাম-পুর সাধারণ গ্রামই ছিল। কোন খ্যাতি ছিল না। হয়ত এই সময়ে দরবেশ, মখদুম বুয়ালিয়াতে পদার্পণ করেন নাই অথবা পদার্পণ করিয়া থাকিলে তখন তাঁহার কোন খ্যাতি ছিল না।

আলীকুলী বেগ ও সমাধি

এখানে মখদুম সাহেবের আগমন ও মৃত্যুর কোন সঠিক তারিখ জানা যায় নাই। তবে তিনি যেখানেই পরলোক গমন করিয়া থাকেন না কেন, বর্তমান দরগাপাড়া মহল্লাতে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। তারপর

(ক) রাজশাহী কালেক্টরীতে থাকবট ভূমি নক্শা দ্রষ্টব্য।

(খ) Baharistan-I-Ghaibi-vol II, pp. 707-714.

(গ) J. A S B , part 1, P 108, 1904

৩৮. Bengal Past and present p 143, 1928.

রাজশাহীর কুমারপুরে অবস্থানকারী জনৈক আলীকুলী বেগ ইং ১৬৩৪ সালে তাঁহার কবরের উপর একটি সমাধি সৌধ পুনঃনির্মাণ করিয়া দেন[৩৯] হয়ত তখন হইতেই ইহা দরগারূপে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং দরগাপাড়া নামের সৃষ্টি হয়। ইহার পর ইং ১৬৬০ সালে[৪০] ডাচ গবর্ণর ফান্‌ডেন ব্রুক কর্তৃক রচিত বঙ্গদেশের নক্‌শায় বুয়ালিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নক্‌শায় বুয়ালিয়া হইতে একটি পথ লস্করপুর[৪১] (পুঁঠিয়া), হাণ্ডিয়াল[৪২]; তারপর বগুড়ার শেরপুর[৪৩] প্রভৃতি স্থান হইয়া আসামের দিকে গিয়াছে। এই রাস্তার অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থানের সহিত বুয়ালিয়ার উল্লেখ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, মখদুম সাহেবের সৌধ পুনঃনির্মাণ করিবার পর স্থানটি বিদেশী সওদাগর ও পর্যটকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হয়ত তখন বুয়ালিয়া বাজার-বন্দর হিসাবে এতদঞ্চলে বেশ পরিচিত-হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্যই বোধ হয় বাণিজ্য বন্দর হিসাবে বুয়ালিয়া ব্রুকের নক্‌শায় উল্লিখিত হইয়া থাকিবে। আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা এই যে, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে (অর্থাৎ-ইং ১৭৪১-২ সাল[৪৪]) মারাঠা কর্তৃক বাঙলা আক্রান্ত হয়। তখন মুর্শিদাবাদে বঙ্গের রাজধানী স্থাপিত ছিল। রাজধানীর চারিপার্শ্বে বহু সমৃদ্ধ ও বিত্তশালী লোকের বসবাস থাকাতে খুব সম্ভব মারাঠাগণ অল্প সময়ে অধিক লাভের আশায় বিহারের দিক হইতে আসিয়া রাজধানীর চারপার্শ্বের পদ্মার দক্ষিণাঞ্চলে আক্রমণ চালায়। জনগণ দিনের পর দিন মারাঠা কর্তৃক নানাভাবে প্রপীড়িত হইতেছিল। নর-পিশাচ বর্গীদের হাতে কাহারও নিস্তার ছিল না। নওয়াব তাঁহার সেনাবাহিনী লইয়া গতিরোধের চেষ্টা করিতেছিলেন বটে কিন্তু তাহাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে তিনি রাজধানীর বিষয় সম্পত্তি ও স্বীয় পরিজনবর্গকে লইয়া মুর্শিদাবাদে থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না। বর্ষা আগত প্রায় অধিক পরিশ্রমে বর্গীরা কিছুটা নিরস্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই সুযোগে নওয়াব আলীবর্দী খানের ডেপুটী গবর্ণর নওয়াজেস্ খানের নেতৃত্বে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-সম্পত্তি দারুময় সরঞ্জামাদি ও পরিজনবর্গকে রাজশাহীর গোদাগাড়ীর 'আলী-বাড়োইপাড়া' নামক স্থানে স্থানান্তরিত করেন। এই সময় মুর্শিদাবাদের বহু লোকজন পদ্মা ও মহানন্দার উত্তর তীরে বরেন্দ্র ভূমির বিভিন্ন স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন বুয়ালিয়াতেও একটি উপনিবেশ স্থাপিত হয়[৪৫]। এই তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যতীত বাঙলার আর কোন ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে বুয়ালিয়ার উল্লেখ দেখা যায় না। এই সব ঘটনা হইতে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, শাহ মখদুমের আগমনের পর বিদেশী পর্যটক ফান্‌ডেন ব্রুকের রচিত বাঙলার নকশায় একটি বড় জায়গা হিসাবে বুয়ালিয়ার স্থান লাভ এবং মারাঠা হাঙ্গামার সময় বুয়ালিয়াতে মুর্শিদাবাদের মোহাজেরদের উপনিবেশ স্থাপন

ব্রুকের নক্‌শা

মুর্শিদাবাদে বর্গী

ডেপুটী গবর্ণর নওয়াজেশ খান ও রাজধানী

৩৯. Inscription of Bengal vol, iv, p. 272। প্রাচীন বঙ্গানুবাদ কাগজপত্র দ্রষ্টব্য।
৪০. See-venden Brouk's Map, (ইহা বিশেষ করিয়া জল ও স্থল পথের বাণিজ্যিক নক্‌শা। 1660.
৪১. পুঁঠিয়ার পূর্ব নাম লস্করপুর ছিল।
৪২. ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাচীন বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। পাবনা জেলার তাড়াশ থানায় করতোয়া তীরে এই হাণ্ডিয়াল অবস্থিত।
৪৩. বগুড়ার ইতিকাহিনী পৃঃ ১০৫-১২১।
৪৪. History of Bengal by charls stewart, P. 516, and also see Wellesley's Mahratta war.
৪৫. The Seir-ul-Mutakharin, PP. 395-6 Vol, I. and also Rajshahi Gazetteer PP. 179, 162-63.

এই দুইটি ঘটনা স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, শাহ মখদুমের শুভাগমন বুয়ালিয়ার ইতিহাসে নবযুগের উদ্বোধন এবং পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদের মোহাজেরদের উপনিবেশ স্থাপন রাজশাহীর নগর গৌরবের সূচনা করে। এই সত্যকে স্বীকার করিতে কোন রকম সন্দেহ জাগে না। পাঠানপাড়া, শেখপাড়া, হোসেনীগঞ্জ, সেপাইপাড়া, হাতেম খাঁ, কাজিরগঞ্জ (?) প্রভৃতি পাড়া তাহাদের প্রাচীন স্মৃতি বহন করিতেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক তাহাদের মধ্যে ছিল। পাঠান, সেপাই, শেখ প্রভৃতি পদ-পদবীতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। হোসেনীগঞ্জে শিয়াদের বাস ছিল, তাহাও নামেই প্রকাশ পাইয়াছে এবং শহরের মেহেদীপুর*[৪৬] প্রাচীন মসজিদে এক প্রস্তর খণ্ডে শিয়া সম্প্রদায়ের কলেমা উৎকীর্ণ থাকায় উল্লিখিত প্রমাণকে আরও সুদৃঢ় করিয়াছে। রাজশাহী গেজেটিয়ার প্রণেতা মিঃ ও'মেলী শাহ্ মখদুম সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন; তিনি মখদুম সাহেবের আগমন সম্পর্কে ততখানি গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। তবে তিনি ইতিহাসকে অস্বীকারও করেন নাই। তিনি প্রায় স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে, মুর্শিদাবাদ হইতে মোহাজেরগণের আগমন ও বসতি স্থাপনের পর ওলন্দাজগণের ব্যবসায় বাণিজ্যে যোগদান বুয়ালিয়াকে পরিচিত করিয়া তোলে[৪৭]। রাজশাহীর গেজেটিয়ার প্রণেতা মিঃ ও'মেলীর কথায় আরও কিছু যোগ দিয়া বলিতে পারা যায় যে, বুয়ালিয়া বন্দরে বিদেশী বণিকদল ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজগণের আগমনে দেশীয় 'ব্যবসিকগণের' সমন্বয়ে বাণিজ্য তীর্থ হিসাবে অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ হইতে বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্য্যন্ত 'বুয়ালিয়া' (পরে রামপুর-বুয়ালিয়া) দুই শতাধিক বৎসরের কিছু বেশী অর্থাৎ সোয়া দুই শত বৎসর ধরিয়া সমগ্র এশিয়া ইউরোপের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখিয়া ছিল। এই সময়ে বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে বুয়ালিয়া এতখানি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, বুয়ালিয়ার বড় কুঠি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া পদ্মার উভয় কূলে, অত্র জেলা তথা সমগ্র উত্তর বঙ্গের বড় বড় নদীর তীরে দেশী ও বিদেশী কোম্পানীর রেশম ও নীল কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল। এতদব্যতীত বাঙ্লার অন্যান্য স্থানে তো কুঠি ছিলই। নীল ও রেশমের এইসব কুঠিই বাঙ্লার চেহারা বদলাইয়া দিয়াছে। বাঙ্লার নগর বন্দর গড়িয়া তুলিয়াছে। সরদা, মীরগঞ্জ, কাজলা, মতিহার, সুলতানপুর, গোদাগাড়ী, খরচাগা, বেলোড়া প্রভৃতি পুরাতন কুঠি আজ রাজশাহী শহরের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমৃদ্ধির স্মৃতি বহন করিতেছে। এসব স্মৃতি তো সেদিনের কথা। ওলন্দাজ, ফরাসী ও বিশেষ করিয়া ইংরেজ কোম্পানীর কুঠিয়াল সাহেবেরা বাণিজ্য উপলক্ষে এখানে যে বিরাট উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছিল[৪৮]; তাহার আরও কিছু প্রমাণ আমাদের চোখের সম্মুখে রহিয়াছে। শহরের বড় কুঠি (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের বর্তমান আবাসিক কুঠি ও আফিস); ওয়াটশন কোম্পানীর কুঠি (এখন যেটী বিভাগীয় কমিশনারের কুঠি), কাজলা কুঠি (এখন যেটি বেতার কেন্দ্র), এবং তাহাদের অন্তিম স্মৃতির দুইটি গোরস্থান। রাজশাহী সেণ্ট্রাল জেলের পশ্চিমে সি, এণ্ড, বি আফিস সংলগ্ন একটি, আর অপরটি বড় কুঠির প্রাঙ্গণে পশ্চিম ধারে অবস্থিত; এই দুইটি। সি-এণ্ড-বি আফিস সংলগ্ন গোরস্থানটির (প্রায় দুই বিঘা জমির উপর

মোহাজেরদের উপনিবেশ

নবযুগেই উদ্বোধন ও নগর গৌরবের সূচনা

মিঃ ও মেলী

৪৬. বর্তমানে ইহা লক্ষ্মীপুরের অন্তর্গত।

৪৭. Rajshahi gazetteer P. 179.

৪৮. Statistical Account of Rajshahi pp-5-3, 82-86 and also Rajshahi gazetteer, pp. 103-112.

বিস্তৃত) চারিধারে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। স্থানীয় মিশনারীদের অধীনে ইহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ভার অর্পিত আছে। ইহাতে শতাধিক সমাধি আছে। নদীগর্ভে নিমজ্জিত সমাধিগুলির উৎকীর্ণ শ্বেত প্রস্তরলিপি এই গোরস্থানের পূর্ব প্রাচীর গাত্রে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কে কি কার্য্য করিতেন, কে কোন দুর্ঘটনা বা আপদ বিপদে পড়িয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছেন এবং কে কোন শ্রেণীর লোক ছিলেন জন্ম মৃত্যুর তারিখ সহ অধিকাংশ সমাধি বক্ষে শ্বেত প্রস্তরে তাহা উৎকীর্ণ আছে। রাজশাহীর গেজেটিয়ারের মতে বড় কুঠির প্রাঙ্গণস্থ গোরস্থানটি প্রাচীনতর। এই গোরস্থানে সমাহিত 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' কয়েকজন উচ্চ কর্মচারী; নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সেনা বিভাগের দুইজন ফরাসী সৈনিক। ইহাদের একজন ভারতে নীলকর সাহেব হিসাবে এখানে আগমন করিয়াছিলেন; আর একজন জনৈক সেনাপতির স্ত্রী। হাণ্ডিয়াল আবাসিক কোম্পানী কুঠির এক সাহেবের মৃত্যু হইলে তিনি এখানে সমাহিত হন। জনৈক কুঠিয়াল চার্লস ওয়াল-টার-ইউলিয়ম কেরীর শিশু কন্যা (মৃত্যু–ইং ১৮২৬ সালে) এখানে সমাহিত। মুর্শিদাবাদ মরিচাই কুঠির একজন কুঠিয়াল সাহেব এখানে সমাহিত ইত্যাদি বহু নাম ও তারিখ পাওয়া যায়। অধিকাংশই উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৮০৬, ১৮০৮, ১৮২৬ প্রভৃতি তারিখের উৎকীর্ণ লিপি উল্লেখযোগ্য। গেজেটিয়ার সংকলনের পূর্বে এই গোরস্থানের অধিকাংশ অংশ পদ্মাগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। সেই জন্য দক্ষিণাংশের সমাধিগুলির উৎকীর্ণ প্রস্তরলিপি সম্ভবতঃ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। ইং ১৮৯৭ সালের সর্ব্বনাশা ভূমিকম্পে অবশিষ্ট সমাধিগুলি বিনষ্ট হইলে উহার উৎকীর্ণ প্রস্তরশিলাগুলি উদ্ধার করিয়া বড় কুঠির নীচের তলায় জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে অকস্মাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হইলে ঐ প্রস্তর শিলাগুলি কে বা কাহার দ্বারা অপহৃত হয়। মিঃ ও'মেলী অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ ঐ শিলা প্রস্তর দ্বারা 'শীল' প্রস্তুত করা হইয়াছে[৪৯] ইহাই হইল কুঠিয়াল সাহেবদের বসতি বিস্তার ও কর্মকীর্তির মোটামুটি কথা।

বিভিন্ন স্থানে কুঠি

খ্রিষ্টানদের গোরস্থান

পাবনা জেলার হাণ্ডিয়াল

ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু

এখন আমরা বুয়ালিয়ার শিল্প-বাণিজ্য অধ্যায়ে প্রবেশ করিব। এই অবসরে পশ্চাৎ ফিরিয়া কুঠিয়াল সাহেবদের আগমনের কথা কিছু বলিব। যদিও সেই সবের বিস্তৃত তথ্য আমাদের হাতের কাছে নাই, তথাপি যাহা আছে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের এই অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্য বিস্তৃতির বিগত দুই শতাব্দীর গতি নির্দ্দেশ করিবার পক্ষে তাহা নিতান্ত অপ্রচুর নহে।

ইউরোপীয় বণিকদল

ইউরোপের সহিত পাক-ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রাচীন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমুদ্র পথে নূতন বাণিজ্য পথে ইউরোপের সহিত পাক-ভারতের সংযোগ স্থাপিত হয়। বিখ্যাত পর্ত্যুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার (ইং ১৪৯৮ সাল) পাক-ভারত আগমনের সময় হইতে পর্ত্যুগীজগণ শতবর্ষ ব্যাপী নানাস্থানে কুঠি স্থাপন করিয়া একচেটিয়া বাণিজ্য করিতেন। দক্ষিণ ভারতে তাঁহাদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র গড়িয়া

ব্যাণ্ডেল চার্চ্চ

৪৯. Rajshahi Gazetteer, P.182

৫০. হুগলী শহরের দেড় মাইল উত্তরে হুগলী নদীর তীরে এই চার্চ্চ বা গির্জ্জা অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল রেলওয়ে জংশন হইতে অর্দ্ধ মাইল (পূর্ব্বে মতান্তরে ১৫৯৫ খ্রীঃ)। ইহা ব্যাণ্ডেল চার্চ্চ নামে প্রসিদ্ধ ইং ১৫৯৯ (Calcutta Review, vol, IV, 1845.) স্থাপিত।

উঠিয়াছিল। বাঙলা দেশের হুগলীতে তাঁহাদের উপনিবেশিক বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল[৫০]; ব্যাণ্ডেল চার্চ্চ তাঁহাদের প্রাচীন কীর্তি। এই সময় ইউরোপের যে সব জাতি পর্ত্তুগীজদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; হল্যাণ্ডের অধিবাসী (ডাচ) ওলন্দাজগণ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের এক চেটিয়া বাণিজ্য ধ্বংস করিয়া দেয়। ইং ১৬০২ সালে (ডাচ) ওলন্দাজগণ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করেন। অতঃপর তাঁহারা পর্ত্তুগীজদের গুরুত্ব নষ্ট করিয়া পাক-ভারতে অপ্রতিহত প্রতিপত্তি স্থাপন করেন। ইং ১৬০৯ সালে মাদ্রাজের উত্তরস্থ কালিকটে ও ইং ১৬৬০ সালে নাগাপট্রমে তাঁহারা কুঠি স্থাপন করেন। বাঙলা দেশে চুঁচুড়াতে ইং ১৬৪৫ সাল হইতে ১৬৫০ সালের মধ্যে তাঁহাদের একটি বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এশিয়ার মধ্যে ইহা একটি বৃহত্তম ফ্যাক্টরী হিসাবে গড়িয়া[৫১] উঠিয়াছিল। কিন্তু পাক-ভারতে তাঁহারা কোন দিনই স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া উঠিতে পারে নাই। ডেনমার্কের অধিবাসী দিনেমারগনও এদেশের বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন কিন্তু ইতিহাসে তাঁহাদের কোন উল্লেখযোগ্য স্থান নাই। ইং ১৫৯৯ সালে ৩০শে ডিসেম্বরে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামক এক শত জন ব্যবসায়ীর একটি দলকে পাক-ভারত ও মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত বাণিজ্য কবিরার জন্য অধিকার প্রদান করিয়া ইংলণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ এক সনদ দান করেন। অতঃপর তাঁহারা বঙ্গদেশে বাণিজ্য কবিরার আগ্রহ প্রকাশ করিলে ইং ১৬০৮ সালে হেক্টর নামক জাহাজের কাপ্তেন হকিন্স রাজা প্রথম জেমসের নিকট হইতে একটি চিঠি লইয়া জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁহাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। পুনঃরায় ইং ১৬১৫ সালে স্যার টমাস রো নামক জনৈক ইংরেজ রাজদূত রাজা জেমসের চিঠি লইয়া বাদশাহ সমীপে উপস্থিত হন। তিনি বাদশাহের নিকট হইতে বঙ্গে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করেন। তারপর হুগলীতে তাঁহাদের যে কুটি স্থাপিত হয় উহাই ইংরেজদের বঙ্গদেশে প্রথম কুঠি ইং ১৬৩৯ সালে মাদ্রাজে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া একটি কুঠি স্থাপন করেন। এই কুঠি রক্ষার জন্য সেন্টজর্জ নামক একটি দূর্গ নির্মিত হয়। ইং ১৬৬০ সালে রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগালের রাজ কন্যাকে বিবাহ করিয়া বোম্বাই নামক বাণিজ্য কেন্দ্র যৌতুক স্বরূপ লাভ করেন। এখানেও একটি দুর্গ নির্মিত হয়। অতঃপর যব্ চার্ণক ইং ১৬৯৩ সালে কলিকাতায় একটি কুঠি স্থাপন করেন। এই কুঠি রক্ষার জন্য ফোর্ট ইউলিয়াম নামক একটি দুর্গ নির্মিত হয়। এইরূপে ইংরেজগণ মাদ্রাজ, কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পাটনা, কাশিমবাজার ও বুয়ালিয়া প্রভৃতি স্থানেও তাঁহাদের কুঠি ছিল।

কালীকট, নাগাপট্রম ও চুঁচড়াতে বাণিজ্য কুঠি

ক্যাপ্টেন হকিন্স ও বাদশাহ জাহাঙ্গীব

বাংলাদেশে ইংবেজদের প্রথম কুঠি

কলিকাতায় কুঠি

ফরাসীদের আগমন ও কুঠি স্থাপন

ফরাসীগণ ইউরোপীয় অন্যান্য জাতির পরে পাক-ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। ইং ১৬৬৪ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক একটি কোম্পানী গঠন করিয়া তাঁহারা বাণিজ্য করিতে শুরু করেন এবং ইং ১৬৭৪ সালে পণ্ডিচেরীতে তাঁহাদের একটি কুঠি স্থাপিত হয়। ইং ১৬৮৮ সালে বঙ্গদেশে হুগলী নদীর তীরে চন্দননগরে এবং ইং ১৭২৫ সালে মালাবার উপকুলস্থ 'মাহী' নামক

৫১. History of Bengal (Bihar and orissa under British rule) P. 21.
(বলা বাহুল্য, হুগলী চুচুঁড়ার অধিকাংশ প্রাচীন গগনচুম্বী প্রাসাদগুলি মুসলমান ও ইউরোপীয়ানদেব কীর্তি। মধ্যযুগে পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান সওদাগরদের একমাত্র বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল হুগলী। মোগল আমলে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ইউরোপীয়ানদের আবির্ভাব হইলে মুসলমানদের অবনতি ঘটে)।

স্থানে আরও দুইটি কুঠি স্থাপিত হয়। এইভাবে একের পর এক করিয়া একদল বণিক এদেশে আগমন করেন। অন্যদল আসিয়া তাঁহাদের প্রতিপত্তি নষ্ট করিয়া নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করেন। এইরূপে ইউরোপের বহু জাতির বাণিজ্য ধ্বংস হইয়া যায়। শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকে ইংরেজ ও ফরাসী। অবশেষে পাক-ভারতে ইংরেজদের আধিপত্য স্থাপিত হয় এবং ফরাসীদের প্রভাব সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। এই হইল পাক-ভারতের সহিত ইউরোপবাসীর নূতন পরিচয় ও কুঠি স্থাপনের গোড়ার কথা।

এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, বিদেশী বণিকগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম কোন সময় কাহার দ্বারা বুয়ালিয়া বন্দরে কুঠি স্থাপিত হয় এবং রাজশাহীর শহরের বড় কুঠি কাহার কীর্তি। গেজেটিয়ার ব্যতীত রাজশাহীর উপর আর কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ পঞ্জি নাই। রাজশাহীর গেজেটিয়ারে ওলন্দাজগণকে বুয়ালিয়াতে প্রথম বিদেশী বণিক দল হিসাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উক্ত গেজেটিয়ার লেখক মিঃ ও'মেলী বলিয়াছেন "অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে মুর্শিদাবাদ হইতে বহু মোহাজের (Refugee) রামপুর-বুয়ালিয়াতে আসিয়া বাড়ী ঘর নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। তখন হইতে ওলন্দাজ কর্তৃক রেশম প্রভৃতি ব্যবসায়-বাণিজ্য এই শহরকে পরিচিত করিয়া তোলে[৫২] সেই সময়ে তাঁহাদের যে বাণিজ্য কেন্দ্র বা বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল উহাই বড় কুঠি' নামে খ্যাত।"

চুচঁড়াতে ওলন্দাজগণের সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বাণিজ্য- কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। সে কথা একটু আগেই বলিয়াছি। অধিকন্তু, ওলন্দাজ গবর্ণর ফান্- ডেন্ ব্রুক বঙ্গদেশে বাণিজ্য উপলক্ষে জল ও স্থল পথের নির্ণয় কল্পে ইং ১৬৬০ সালে একটি নকশা (Map) প্রস্তুত করেন। এই নকশাতে বুয়ালিয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রুকের উক্ত নকশাতে বুয়ালিয়ার উল্লেখ দেখিয়া অনুমিত হয় যে, এই নকশা প্রস্তুতের পর হইতে ওলন্দাজ বণিকদল চুচঁড়া হইতে এখানে যাতায়াত করিতেন এবং আমাদের মতে অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগেই বুয়ালিয়াতে ওলন্দাজগণ আসিয়া আবাসিক কুঠি স্থাপন করিয়াছেন। হাণ্টারের ইতিহাসেও ইহার ইঙ্গিত আছে[৫৩]। তারপর মুর্শিদাবাদের উপনিবেশিক মোহাজেরগণ জীবিকা নির্বাহের তাগিদে ডাচগণের ব্যবসায় শ্রমিক ও কর্মচারীরূপে যোগদান করিলে ওলন্দাজগণ মাথা চাড়া দিয়া উঠেন এবং এই সময়ে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফরাসী ও ইংরেজগণ আবির্ভূত হন।

**রেশম ও নীল :***

রেশম ও নীল চাষের কথা অধুনা আমাদের দেশে অনেকে ভুলিয়া গিয়াছে। নবীনদের কাছে ইহা একটি অপূর্ব সম্পদ বলিয়া মনে হইতেছে। অথচ এই রেশম ও নীল এক সময় বাঙালীর একচেটিয়া অর্থকরী সম্পদ ছিল। বঙ্গ আসাম তথা আজিকার পূর্ব-পাকিস্তানের প্রায় সকল জেলাতেই কীট পালন, তুঁত ও ভেরেণ্ডার চাষ হইত। বিগত শতকের শেষ অধ্যায়েও ইহার চাষ পুরাদমে চলিয়াছিল। তখনকার রেশম ও নীল কেনা বেচার কেন্দ্রগুলি আজ বড় বড় বাজার-বন্দর ও শহরে পরিণত হইয়াছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে আজ যেমন আখ মাড়াই কল-কারখানা দেখিতে পাওয়া যায় তখন

৫২. Rajshahi Gazetteer, P. 179.

৫৩. ....it was first Selected by the Dutch in the early part of the last century as the Seat of a factory (Statistical account of Bengal Rajshahi P. 53),

* সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

এইরূপ রেশম ও নীল প্রস্তুতের কল-কারখানা এদেশের পথে প্রান্তরে দেখা যাইত। এখন সেই সব কল-কারখানা আর নাই; কেবল ধ্বংসস্তূপ সেই সময়ের সমৃদ্ধির স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

বিচিত্র রঙের পাখা বিশিষ্ট সুদর্শন 'প্রজাপতি' নামক এক প্রকার পতঙ্গ আমাদের বাড়ীর আশে-পাশে, ঝোপে-ঝাড়ে, আনাচে-কানাচে উড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়। এই প্রজাপতি বনে-জঙ্গলের পতঙ্গ বিশেষ হইলেও সভ্য জগতের সুসভ্য মানব হইতে পর্ব্বত-গহ্বর-বাসী অসভ্য মানুষ পর্য্যন্ত তাহার বিচিত্র রূপে মুগ্ধ। সে শুধু চিত্ত মুগ্ধকর অসামান্য রূপ সম্পন্নই নহে, নানাভাবে সে মানুষের কল্যাণ করিয়াও থাকে।

প্রজাপতি

একাধারে সে শিল্পী, দানশীল ইত্যাদি নানাগুণের অধিকারী। তাই সে বনের পতঙ্গ বিশেষ হইয়াও প্রজাসাধারণের কাছে অতি প্রিয়। সেই জন্যই কবি-সাহিত্যিকরা আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছে প্রজা- শ্রেষ্ঠ বা 'প্রজাপতি'।

বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চঞ্চল' কবিতায় এই প্রজাপতির স্বভাব জীবন সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রজাপতি, আপন ভুলি'
ফিরিস ওরে
ফুলের দলে দুলি' দুলি'
কিসের ঘোরে।
হাওয়ার বুকে যে চঞ্চলের
গোপন বাসা
আকাশে তুই ব'য়ে বেড়াস
তারি ভাষা–
অপ্সরী তার ইন্দ্র সভার
স্বপ্নগুলি
পাঠালো তোর পাখায় ভ'রে।
... ... ... .. ... ... ... ... ...
চিকন রঙের লিখন মুছে
হেলায় ফেলে,
... ... ... ... ... ... ... ... ...
তার হারা সুর নাচের তালে
কোন সকালে
ডানাতে তোর পড়ল ঝ'রে।

উপরে বর্ণিত বর্ণাঢ্য প্রজাপতি সদৃশ্য বিচিত্র এক প্রকার কীট রেশমের জনক; বাঙলা ভাষায় উহাও প্রজাপতি নামে পরিচিত। এই প্রজাপতি যখন শুয়া পোকা অবস্থায় থাকে, তখন তাহার মুখ হইতে সূতার মত একপ্রকার আঠাল পদার্থ দ্বারা একটি গোলাকার গুটি প্রস্তুত করে। এই গুটিকে ইংরেজীতে 'ককুন' (Cocoon) বা বাঙলা ভাষায় 'কোয়া' বলে। হস্ত ও বাষ্প চালিত যন্ত্র দ্বারা এই কোয়া হইতে যে সূতা প্রস্তুত হয়, তাহাকে রেশম বা রেশমী সূতা বলে। আমাদের দেশে এই রেশম সম্বন্ধে কৃষকদের মধ্যে এইরূপ একটি গাথা এখনও প্রচলিত

রেশম বা রেশমী সূতা

আছে :–

"বনের পাতা খেয়ে পোকা,
ঢেলে দেয় সোনার টাকা"

বাস্তবিক এই রেশমের টাকাই প্রকারন্তে অধুনা পাক-ভারতের বহু সম্পদের সূচনা করে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় উৎপন্ন দ্রব্য এবং উহার অর্থকরী সুযোগ সুবিধা বিদেশী বণিকগণই একচেটিয়া ভাবে উপভোগ করে।

আমরা এখানে উক্ত রেশম পোকার নিম্নরূপ পরিচয় প্রদান করিতেছি।

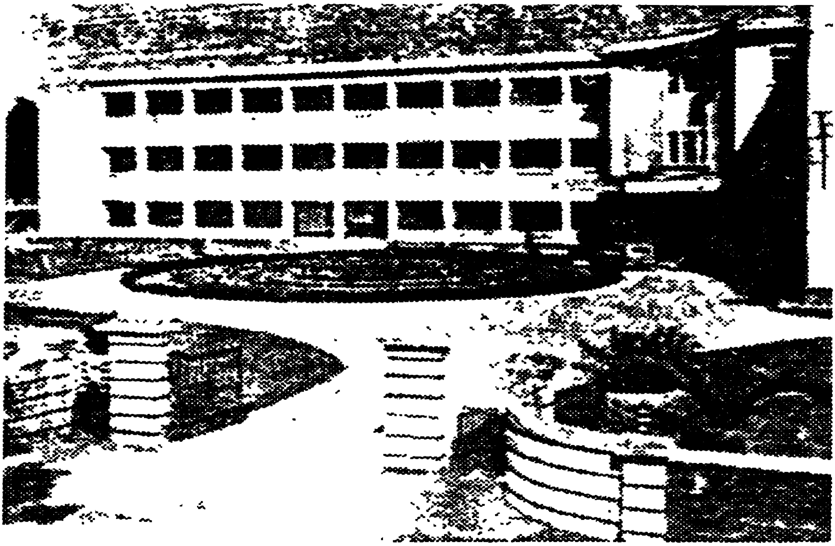
| | |
|---|---|
| প্রজাপতি- | ১ |
| ডিম- | ২ |
| পোকা- | ৩ |
| পত্তুলী বা কোয়া- | ৪ |
| প্রজাপতি- | ৫ |

কোয়া কাটিয়া পাখা বিশিষ্ট যে পতঙ্গ বাহির হয়, তাহাকেও 'প্রজাপতি' (moth) বলে।

এই রেশম পোকার প্রধান খাদ্য তুঁত গাছের পাতা। এতদ্ব্যতীত ভেরাণ্ডার পাতাও খাদ্য হিসাবে অন্য জাতীয় রেশম-পোকা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। তাহা ছাড়া কোন কোন গ্রন্থে রেশম- পোকার খাদ্যস্বরূপ শিমূল, শাল, বাদাম, ডুমুর প্রভৃতি ১০/১২টি বৃক্ষের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে[৫৪]। ল্যাটিন শব্দে ৪১টি বৃক্ষের নাম জানিতে পারা যায়। সেই সব বৃক্ষের পাতাও রেশম পোকার খাদ্য। নিম্নে বৃক্ষগুলির তালিকা প্রদত্ত হইল :–

1. Rhizophora claceolaris linn.
2. Terminalia alata glabra Assum tree.
3. Terminalia tomentosa Saj tree.
4. Terminalia catappa country aimond tree.
5. Tectona grandis teak tree.
6. Zizyqhus jujuba bertree.
7. Shorea robusta Sat tree.
8. Bombax heptaphyllum Semu.
9. Careya Sphoerica.
10. Pentaptera tomentosa.
11. Pentaptera glabra .
12. Ricinus communis castor-oil plant.
13. Cassia lanceolata.
14. Lagerstroemia indic vern Daiyeti.
15. Carissa carandas-Karinda.
16. Terminalia arjuna-Sadara.

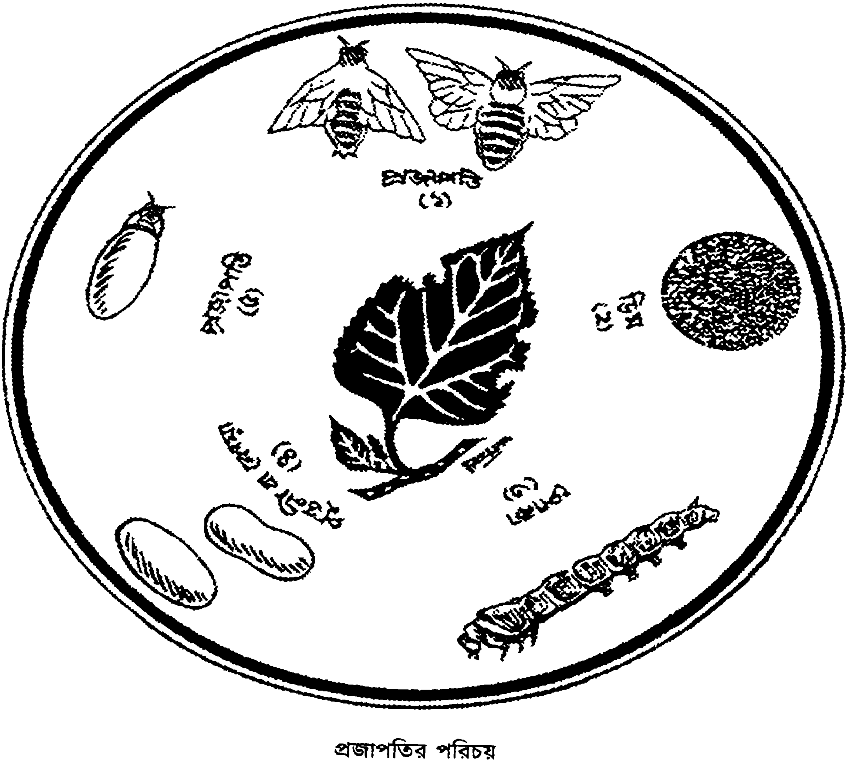
৫৪. F. Moore's catalogue of Lhpidopterous insects, PP, 296-387.



রাজশাহী । কলেজের প্রথম ও প্রধান ইমাবত



তুঁতের চারাগাছ




প্রজাপতির পরিচয়

17. Ficus Benjaminia-Nandruk.
18. Koosool.
19. Hindograss.
20. Murkurdal.
21. Okonnee.
22. Litta pakuree.
23. Birzanally.
24. Xanthosylon hostile.
25. Coriaria Nipalensis.
26. Ailanthus Glandulosa.
27. Ailanthus excelsa.
28. Boswellia Thurifera.
29. Myna kata.
30. Balos.
31. Kurkuree.
32. Osbeckia.
33. Bon chelita.
34. Dillenia Speciosa.
35. Pedrelaceae.
36. Tood.
37. Tetranthera Lauciaefolia Lauraceoe.
38. Castanea.
39. Ficus Indica.
40. Nauclea.
41. Gomaree.

মেজর ফ্রেডারিক মুর, মিঃ হট্‌ন ও টমাস প্রমুখের লিখিত প্রবন্ধে রেশম কীটের বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, "ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ প্রভৃতি দেশে যে সব বিভিন্ন জাতীয় রেশম-কীট রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিলে আনুমানিক চারিশত[৫৫] হইবে। মিঃ সিগনর মুলি, ডঃ হেলকর ও ডঃ রসবার্গ প্রমুখ রেশম তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বহু শ্রম স্বীকার পূর্বক বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর রেশম-কীটের যে সমস্ত নাম সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার সংখ্যাও প্রায় পাঁচশত হইবে। তবে ইহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক কীট রেশম উৎপাদন করিতে সক্ষম বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ব্যবসায়োপযোগী যত প্রকার কীট আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে বম্বেস্ক মুরি নামক রেশম পোকাই উৎকৃষ্ট। বম্বেস্ক মুরি প্রায় ৬০০ শত মিটার উৎকৃষ্ট সূতা প্রস্তুত করিতে পারে।

রেশম কীটের প্রকারভেদ

৫৫. Silk Industries in Bengal P. 240 and also see "রেশম তত্ত্ব" by রমানাথ সেন।

এই কীট বৎসরে একবার গুটি প্রস্তুত করে। এই জাতীয় কীটের উত্তম গুটি হইলে চার হইতে ছয় কাহন গুটিতে এক সের ওজনের রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ রেশমের বর্ণ সাধারণত: পীত ও শ্বেত হইয়া থাকে। তুঁত পাতা ইহাদিগের প্রধান খাদ্য।

আর এক জাতীয় রেশম কীট কাশ্মীর, চীন, জাপান, মিশর, ইটালী ও ফ্রান্স দেশে গৃহে পালিত হইত। কিন্তু এই সব দেশের জলবায়ু ও ঋতু সর্বত্র একই প্রকার নহে বলিয়া সময়ের তারতম্য অনুযায়ী সকল স্থানে সম পরিমাণ ফল পাওয়া যায় না। সেই জন্য উক্ত দেশ সমূহে বিভিন্ন জাতীয় কীটের চাষ হয়। এই জাতীয় রেশম কীটগুলি বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট হওয়ায় ফ্রান্স দেশীয় মিঃ সিময়েল ইটালী হইতে উক্ত কীটের বীজ আনাইয়া জঙ্গীপুর (পশ্চিমবঙ্গ) মহকুমায় কতক স্বহস্তে এবং কতক স্থানীয় চাষীদের দ্বারা চাষ করাইয়াছিলেন। কিন্তু তেমন সুফল পাওয়া যায় নাই। জলবায়ু ও ভিন্ন প্রকৃতির ভূমির জন্য বহু অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম সত্বেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। কারণ সূর্য্যের তাপ সকল দেশেই সম পরিমাণ নহে। বাঙলা দেশের ভূমির উত্তাপ, পাশ্চাত্য দেশ সমূহের ভূমি-উত্তাপ ও জলবায়ুর তারতম্য থাকায় বিদেশী বীজ এ দেশের জলবায়ু সহ্য করিতে না পারায় নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়া যায়।

ফ্রান্স, ইটালী, উত্তর চীন, জাপান ও কোরিয়া, নিরক্ষ বৃত্ত হইতে প্রায় সমদূরবর্তী এবং সূর্য্য কক্ষের এক সম্পাত হইতে তির্য্যক ভাবে দৃষ্টিপাত করিলে ফ্রান্স ও ইটালী যতদূর অন্তরে অবস্থিত হইবে, অপর সম্পাত হইতে তির্য্যকভাবে দৃষ্টিপাত করিলেও উত্তব চীন ও জাপান তদনুরূপ দূরবর্তী লক্ষিত হইবে। অতএব এই সব দেশের জলবায়ু সূর্য্যের তাপ প্রায় একই রূপ। সেই জন্যই এই সব দেশে রেশম-কীট সম পরিমাণ উৎকৃষ্ট ধরনের রেশম সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়।

বাঙলাদেশের চাষোপযোগী বেশম কীটের প্রকারভেদ

বাঙলাদেশের জলবায়ুর অবস্থা অনুসারে যে সমস্ত রেশম-কীট চাষ হইয়া থাকে, শ্রেণীভেদ তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নামের তালিকা নিম্নরূপ :-

১। সোনামুখী ২। আলতাপাটী ৩। আসল দেশী ৪। সাহেব দেশী ৫। দাগী ৬। নারী ৭। খুর্দিনিস্তিনি ৮। বাণেশ্বরী ৯। বড় পলু।

ইহাদের মধ্যে এক হইতে চার পর্য্যন্ত নামধারী কীটগুলির সাধারণ নাম দেশী পলু। ল্যাটিনে এইগুলিকে বম্বেস্ক ফরচুনেট্স্ বলা হয়। ইহারা কার্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ছয় মাস সুস্থ থাকে। এই সময় ইহারা অধিক পরিমাণে গুটি প্রস্তুত করে। বৈশাখ হইতে আশ্বীন পর্য্যন্ত দুর্বল অবস্থায় থাকে। তখন ইহারা অপেক্ষাকৃত অনেক কম রেশম প্রস্তুত করে। ৫০ হইতে ৮০ ডিগ্রী (ফাঃ) উত্তাপে ইহারা সুস্থ থাকিতে পারে। উহার কম বেশী হইলে দুর্বল হইয়া পড়ে। তুঁত পাতা ইহাদের খাদ্য। বৎসরে পাঁচ ছয় বার গুটি প্রস্তুত করে। এই সব গুটির সূতা ৫০ হইতে ২০০ শত মিটার পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। এবং উৎকৃষ্ট গুটি হইলে ১৩ হইতে ১৪ কাহন* গুটিতে ১ সের রেশম উৎপন্ন হয়। এই জাতীয় গুটি হরিদ্রা বর্ণ হয়। কীট ৬০ হইতে ৬২ দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

৫ হইতে ৭ নম্বর পর্য্যন্ত নামধারী কীটগুলির সাধারণ নাম 'নিস্তারী' বা মাদ্রাজী পলু। ইহারা বৈশাখ হইতে আশ্বীন মাস পর্য্যন্ত সবল থাকে এবং এই সময় উৎকৃষ্ট রেশম

* ১২৮০ গুটিতে এক কাহন।

উৎপাদন করিতে পারে। কার্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত উহারা দুর্বল অবস্থায় থাকে। তখন অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক গুটি প্রস্তুত করে। ইহারা ৮৫ ডিগ্রী হইতে ৯৫ ডিগ্রী (ফা:) উত্তাপে সুস্থ থাকে। উহার কম বেশী হইলে ইহারা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ৫২/৫৬ দিন জীবিত থাকে। তুঁত পাতাই ইহাদের একমাত্র খাদ্য। ইহারাও বৎসরে পাঁচ ছয় বার রেশম-গুটি প্রস্তুত করিতে পারে। এই গুটির সূতা ১৭৫ হইতে ২২৪ মিটার দীর্ঘ হয়। উত্তম গুটি হইলে ১৩/১৪ কাহনে ১ সের রেশম উৎপাদন হয়। এই রেশম হরিদ্রা বর্ণ হইয়া থাকে। ৮নং 'বানেশ্বরী' বা 'সেয়ানা' কীট। ইহার ল্যাটিন নাম বম্বেস্কসিনেনসিশ। উপরে উল্লিখিত কীটের ন্যায় বম্বেস্কসিনেনসিশ কীটও তুঁত পাতা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। তবে ইহার রেশম কিঞ্চিৎ মলিন এবং শুভ্র বর্ণ ও হয়। এই জাতীয় কীট বর্তমানে এইখানে পাওয়া যায় না। –পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের কয়েকটি ফার্মে এই জাতীয় কীট দেখা যায়। ৯ নম্বর কীট 'বড় পলু'। ইংরেজীতে ইহাকে বম্বেস্কটেক্স্টর বলে। ইহা বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র চৈত্র মাসের প্রথমে অথবা ফাল্গুন মাসের শেষে গুটি প্রস্তুত করে। তুঁত পাতা ইহাদের প্রধান খাদ্য। এই কীটের রেশম-সূতা ২৫০ হইতে ৩০০ শত মিটার দীর্ঘ হইত। উত্তম কীট হইলে ১০/১২ কাহন গুটিতে ১ সের রেশম উৎপন্ন হইত। ইহার মধ্যে কতক শুভ্র ও কতক পাটল রঙ অর্থাৎ পাকা ইঁটের ন্যায় বর্ণের হইত। বঙ্গ দেশের অন্যান্য রেশম অপেক্ষা ইহা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ছিল। প্রায় ১ বৎসর কাল ইহা বাঁচিয়া থাকিত[৫৬]।

পাক-ভারতের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বিভাগ পূর্ব বাঙলা রেশম উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান। এখানে প্রায় সকল জেলাতেই অল্প বিস্তর রেশম জন্মে। বাঙলা দেশের ভূমিতে যেমন উৎকৃষ্ট ধরণের রেশম উৎপাদন হয়, ফলনও তেমনই প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে।

রেশম জন্মাইবার ভূমি

ইংরেজ রেশম-তত্ত্ববিৎরা বলিয়াছেন, "বাঙলা দেশই ভারত বর্ষের 'রেশম-ভাণ্ডার'।" বাস্তবিকই তাঁহাদের হিসাব ও ধারণা অমূলক নহে। তবে এখানে সকল জেলাতে সমপরিমাণ রেশম উৎপাদন হয় না। ভূমি সাপেক্ষ কম বেশী ফলন হইয়া থাকে।

মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বগুড়া ও রাজশাহীর বড় বড় নদী-তীরবর্তী দো-আঁশ ভূমিতে রেশমের চাষ অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল এবং ফলনও হইত প্রচুর। আবার এই জেলা কয়েকটির মধ্যে উৎকৃষ্ট ধরণের রেশম-চাষের ক্ষেত্র হিসাবে বগুড়া, মালদহ ও রাজশাহীর রেশম বিখ্যাত ছিল। উত্তর বঙ্গে 'বুয়ালিয়া' ও বগুড়ার 'সুলতানপুর' সেই জন্য রেশম কেনা-বেচার বাজার বন্দর হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। যাহাহউক, রাজশাহী, বগুড়া এবং মালদহ জেলার অধিকাংশ রেশম ও লাক্ষা* অঞ্চল বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানেব ভূমি ভাগের অন্তর্ভূক্ত। ইং ১৮৮১-৮২ সালে একটি বিবরণী হইতে জানা যায় যে, (Report of the Silk) এই সালে বাঙলা দেশ হইতে ৩৭৮৯৪০ টাকা মূল্যের ১৩১৪৬ মণ রেশম বিদেশে রফতানী হইয়াছে[৫৭]; তখন কেবল রাজশাহী জেলা হইতে প্রতি

---

৫৬. রাজশাহীর প্রবীনতম প্রসিদ্ধ রেশম-ব্যবসায়ী জনৈক শ্রীঅনাথ বন্ধু মণ্ডল এবং রাজশাহীব সেরিকালচার কারখানার শ্রীভুবনেশ্বর বাবু রেশম-কীটের প্রকারভেদ, গুটি উৎপাদন ও পতন সম্পর্কে স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য জানান।

*–লাক্ষার কথা পরে বলিব।

৫৭ B. Administrative Report of 1881-82

বৎসর গড়ে ৫০০০ মণ রেশম উৎপন্ন হইত।

রেশম আবিষ্কার ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে নানা দেশে নানা মত দেখা যায়। ইংরেজ ইতিহাসকারের মতকে সমর্থন করিয়া কোন কোন রেশম-তত্ত্ববিৎ বলিয়াছেন, "চীন দেশই রেশমের আবিষ্কার ভূমি।" ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে জাপানী একখানি গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া মিঃ লীভ বলিয়াছেন,* "চীন দেশই রেশমের আবিষ্কার-ভূমি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রথম স্থল।" কেহ কেহ বাইবেলের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "বাইবেলে বর্ণিত জলপ্লাবনের এক শত বৎসর পূর্বে চীনে রেশমের ব্যবসায় প্রথম শুরু হয়+।" আর একটি জনশ্রুতি এই রূপ ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়,

রেশম আবিষ্কারের ইতিবৃত্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত

"খৃষ্টপূর্ব দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে বিখ্যাত চীন-সম্রাট 'হোয়াংটি' মতান্তরে 'ফোহি' নামক সম্রাটের চৌদ্দ বৎসর বয়স্কা পত্নী 'সীলিচী' (বা সীলিংচী[৫৮]) স্বয়ং রেশম-কীট পালন করিতেন। উহার জনশ্রুতি মূলক গল্প এইরূপ ভাবে বর্ণনা করা যায়, 'খৃষ্টপূর্ব ২৬০০ মতান্তরে ২৭০০ বৎসর পূর্বে চীনের বিখ্যাত রাজা হোয়াংটির পত্নী 'সীলিচী' তাঁহার রাজ-প্রাসাদের নিকট একটি বাগানে পতঙ্গ বিশেষ একটি কীটের গুটি প্রস্তুত প্রণালী প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হন এবং উৎসুক হইয়া তিনি সেই বাগান হইতে উক্ত কীট ধরিয়া আনিয়া স্বীয় প্রাসাদে লালন পালন করিতে থাকেন এবং তাহার খাদ্য স্বরূপ সেই বাগান হইতেই পাতা সংগ্রহ করিয়া খাওয়াইতেন। কিছু দিন পর সেই কীট রাজ-প্রাসাদেও গুটি প্রস্তুত করিতে থাকে। এই গুটি হইতে সম্রাজ্ঞী সূতা বাহির করিয়া পরিধেয় বস্ত্র বয়ন করেন এবং সম্ভবত: তখন উক্ত কীটের নাম হয় শী। তাহার পর হইতে ধীরে ধীরে এই সূতা ও বস্ত্রবয়নের কথা চারিদিকে প্রচারিত হইতে থাকে এবং অল্প দিনের মধ্যেই উহা সমগ্র চীনে ছড়াইয়া পড়ে। তৎপর দেশের আপামর জন সাধারণ উহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া চাষ শুরু করিয়া দেয়। অতঃপর খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষের দিকে এই রেশম কোরিয়া ও জাপানে গিয়া পৌঁছে[৫৯]। জাপানে ইহার দ্রুত উন্নতি হয় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্যে দিয়া ক্রমশ: পৃথিবীর নানাস্থানে বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীকালে রেশম সংক্রান্ত ইংরেজী ও বাঙলা ভাষায় লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থে ও বিবরণে উহার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সমর্থন রহিয়াছে[৬০]। তদানীন্তন ভারত গবর্ণমেন্টের আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ জে, গেইগান কর্তৃক সংগৃহীত ভারতবর্ষীয় রেশম সংক্রান্ত বিবরণে (ইং ১৮৭২) উক্ত মতের সমর্থন দেখা যায়[৬১]।

দ্বিতীয়ত: পাক-ভারতে রেশম-চাষ সম্বন্ধে দুইটি প্রাচীন প্রবাদ এইরূপ : —কাশ্মীর দেশীয় নাগবংশীয় এক রাজপুত্রের সহিত চীন দেশের এক রাজ কন্যার বিবাহ-কাহিনী অবলম্বনে বলা হইয়াছে যে, "রাজকন্যার বিবাহান্তে পিত্রালয় হইতে পতিগৃহে যাত্রাকালে

* প্রবাসী ১৯২৭, আশ্বিন সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

+. রেশম তত্ত্ব, তাহিরপুর হইতে প্রকাশিত পৃঃ–১২৬।

৫৮. Notes on Silk of the central ..Silk As ociation of Japan

৫৯. Mulberry cultivation, P. 115.

৬০. রাজশাহীর তাহিরপুর এবং শহরের কাজলা কুঠি হইতে প্রকাশিত "রেশম তত্ত্ব" নামক পুস্তক দ্বয় দ্রষ্টব্য . Encyclopedia Britanea old and new edition, Vol XXII. Silk. PP, 56-66 ; Vol. 20, PP. 661-671.

৬১ Hunter's statistical account of Bengal, Rajshahi and Bogura, PP, 83-88

কয়েকটি রেশম-কীটের অন্ড স্বীয় কবরী মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া কাশ্মীরে লইয়া যান।" আর একটি মত এইরূপ; কোরিয়া জাপানে রেশমের চাষবাস ও ব্যবসায়-বাণিজ্য আরম্ভ হইবার পর উহা পাক-ভারতের পূর্বাঞ্চলে পৌঁছে। তাহার পর ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার দুই তীরে (মধ্যযুগের পদ্মার তীরে?) চাষ আরম্ভ হয়। অতঃপর সেখান হইতে পশ্চিম দিকে খার্তুম, পারস্য মধ্য-এশিয়া, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হয়। এই ভাবে পৃথিবীর নানাস্থানে রেশম-চাষ ছড়াইয়া পড়ে। পাক-ভারতে রেশম-চাষের জনশ্রুতি মূলক ইহাই হইল গোড়ার কথা।

সমালোচনা

এখন আমাদের কথা এই যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপযুক্ত জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া অতীতে ইতিহাসের সূত্র সন্ধান করা হইত। উহাতে অধিকাংশ কর্মী সাফল্যমন্ডিত হইয়াছেন। এখনও এই রীতি বর্তমান রহিয়াছে। ইতিহাস গবেষণার সাধক কর্মীগণ এইভাবে নানা জনশ্রুতি ও প্রবাদকে কেন্দ্র করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে রত রহিয়াছেন। আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে, কোথাও কোথাও মানুষের জাতিগত রীতি-নীতি চালচলনকে চাবিকাঠি করিয়া কর্মীগণ অতীতের কৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিক গবেষণা করিতেছেন। এ ক্ষেত্রেও বেশীর ভাগ কমী সফলকাম হইয়াছেন এবং হইতেছেন। সেই জন্য পাক-ভারতের আবিস্কৃত প্রাচীন প্রত্ন-সম্পদ ও তথ্যাদির নিদর্শন আজ ইতিহাসের অতি অমূল্য সম্পদ। লক্ষ লক্ষ অর্থ ব্যয়ে এই সবের যত্ন ও রক্ষণ কার্য চলিতেছে। এখন আমরা দেখিব উক্ত জনশ্রুতির মূলে উপযুক্ত প্রমাণ্যদি পাওয়া যায় কি না এবং বাস্তবিকই রেশম চীন হইতে আসিয়াছে -না পাক-ভারতের সম্পদ, তাহাই যাচাই করিব।

যাহা হউক, অগ্রগামী দলের বেশীর ভাগ রেশম-তত্ত্ববিৎ বলিয়াছেন, "চীন দেশই রেশমের আদিভূমি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রথমস্থল।" কিন্তু একথা আমরা মানিয়া লইতে পারিতেছি না। আমাদের দেশে গ্রাম্য কথায় প্রচলিত আছে, "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই পৃথিবীতে -যাহা আছে ভারতে তাহা আছে পৃথিবীতে।" এই প্রাচীন গ্রাম্য গাথার সহিত প্রকৃতি গত সৃষ্টির যোগ আছে বই কি। পৃথিবীর এই ভূখণ্ডে আমরা সব কিছুই পাইয়াছি-সব কিছুই দেখিতেছি অথচ কেবল রেশম ব্যতীত আর সব কিছু দিয়া বিশ্ব প্রতিপালক এই উপমহাদেশ গড়িয়া তুলিয়াছেন, একথার কোন যুক্তি আমরা খুজিয়া পাইনা।

পশ্চিম পাকিস্তানে নবাবিস্কৃত খৃষ্টপুর্ব তিন সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে মহেঞ্জদারোতে আমরা মানুষের বসতি বিস্তার, উন্নত ধরণের জীবন-যাত্রা প্রণালী, সভ্যতা-সংস্কৃতি, অশন-ব্যসন, রঙ-বেরঙের পোষাক-পরিচ্ছদের বাহার, আত্মরক্ষা নিমিত্তে হাল-হাতিয়ার সব কিছুই দেখিতেছি অথচ তখন কেবল এদেশে রেশম-বস্ত্রের ব্যবহার ছিল না - একথা বিশ্বাস করিয়া লইতে যেন দ্বিধা সঙ্কোচ হইতেছে। মহেঞ্জদারোতে সেকালের সুসভ্য জাতির অস্তিত্ব আবিস্কৃত হওয়ায় আমরা এখন একরূপ জোর করিয়াই বলিতে চাই- রেশম পাক-ভারতের সভ্য-জাতির বিলাসিতার সামগ্রী ছিল- তাহার মান যত উন্নত অথবা নিম্নস্তরের হউক - বহু প্রাচীনকাল হইতেই এই উপমহাদেশে রেশমের চাষ ও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই সম্পদ পাক-ভারতের নিজস্ব সম্পদ। বিদেশাগত হইলে হিন্দুর স্মৃতি ও শ্রুতি অথবা কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রে উহার উল্লেখ থাকিত।

পাক-ভারতের প্রাচীন বাসিন্দা মনুষ্য জাতি পৌরাণিক মতবাদ বিশ্বাসী বেদ-

পুরাণের অনুসারী হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠানে, যাগ-যজ্ঞাদিতে দেশী উৎপন্ন দ্রব্যাদি ভিন্ন বিদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহারের রীতি নাই। দেশজ দ্রব্যাদি জিনিষ পত্র ব্যবহার করিতে তাহারা গৌরব বোধ করে। যেমন পাথরের বাসন তাহাদের কাছে অতি পবিত্র। তাহারা পুজা-আচারে -পদ্ম, নাগেশ্বর, পলা, মালতী, অপরাজিতা, গন্ধরাজ, জবা, করবী প্রভৃতি দেশজ ফুল ফল-মূল প্রভৃতি ব্যতীত বিদেশী গোলাপ, গাঁদা ইত্যাদি ফুল পূজা- পার্ব্বনে ব্যবহার করে না। বলা বাহুল্য-হিন্দুর ধর্মীয় ক্রিয়াদিতে এই রেশমী ও পট্ট বস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ইত্যাদি দেখিয়া সভাবত:ই মনে হয়-এ দেশের প্রাচীন হিন্দুরা বিদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহার করিত না। কেহ কেহ বৈদিক গ্রন্থে -'ক্ষৌম বসনে বসনা' ইত্যাদি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিবাহে ব্যবহৃত উক্ত ক্ষৌম বস্ত্রকেই রেশম বলিয়াছেন। কিন্তু, প্রাচীন স্মৃতি-সংস্কৃত সাহিত্যে ক্ষৌম শব্দের উল্লেখ নাই। পরবর্তী স্মৃতি-সাহিত্যে যেখানে ক্ষৌম বস্ত্রের উল্লেখ আছে, সেখানে প্রাচীন টীকাকারেরা ক্ষৌম শব্দের অর্থ শণ নির্মিত বস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অথর্ব্ব বেদীয় কৌশিক সূত্রে "ক্ষৌমকীং বৈশ্যায়[৬২]" অর্থাৎ বৈশ্যাকে ক্ষৌম নির্মিত মেখলা দিবে। এই ক্ষৌম শব্দ দেখিয়া কেহ কেহ রেশম কল্পনা করেন। কিন্তু মনুসংহিতাকার স্বয়ং ঐ ক্ষৌম শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বীজ্যা বৈশ্যাস্য শণতান্তবী [৬৩]।" অর্থাৎ বৈশ্যের শণতন্ত্র মেখলা[৬৪] হইবে। ক্ষৌম শব্দে পট্ট বস্ত্র বুঝায়, তবে এই পট্টবস্ত্রের অর্থ শণের পাট; রেশম নহে। মনুসংহিতায় রেশম ও তসর বস্ত্রের উল্লেখ আছে। যথা–"কৌষেয়াবি কয়োরূষৈঃ কতোপানাম-রিষ্টকৈঃ। শ্রীফলৈবংশু পট্টানাঙ ক্ষৌমানাং গৌরসর্ষপৈঃ[৬৫]।" অর্থাৎ কৌষেয় ও পশম[৬৬] লোনা মাটি দিয়া পরিশুদ্ধ করিতে হইবে। অংশু পট্ট বা রেশম শ্রীফল দ্বারা এবং গৌর সর্ষপ দ্বারা ক্ষৌম বস্ত্র শোধন করিতে হইবে। উল্লিখিত শ্লোক হইতে দুই প্রকার রেশম পাওয়া যায়। একটি তসর, অপরটি রেশম। মনুসংহিতা রচনাকালে পাক-ভারতে কৈষেয় ও অংশু পট্ট নামে যে দুই প্রকার বস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা চীনের রেশম বা চীনের রেশমী বস্ত্র "চীনাংশুক" হইতে স্বতন্ত্র। মহা-ভাবতের এক গল্পে উল্লেখ আছে যে, চীনাবাসী রাজা যুধিষ্ঠিকে "চীনাংশুক" উপহার দিয়াছিল[৬৭]। পরবর্ত্তীকালে কালিদাসের[৬৮] বর্ণনাতে উহার সমর্থন দেখিয়া মনে হয়–"চীনাংশুক" ভারতীয় রাজন্যবর্গের বিলাস সামগ্রীরূপে ব্যবহৃত হইত। সম্ভবতঃ রাজা যুধিষ্ঠির "চীনাংশুক" পরিধানের পর হইতে চীনের রেশমী বস্ত্র ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। কিন্তু তাহার পরে বা পূর্বে ভারতবর্ষে চীনা পলুর চাষ, প্রভৃতি এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা হতে প্রতীয়মান হয় হয়ত চীনা পলুর চাষ পরে ভারতবর্ষেও হইয়া থাকিবে। মনুসংহিতার উপর ও রেশম এখনও পাক-ভারতে

৬২. অর্থবেদ–৫৭৩ শ্লোক–টীকা দ্রষ্টব্য।
৬৩. মনুসংহিতা ২/৪২, শ্লোক . বঙ্গাক্ষরে টীকা দ্রষ্টব্য।
৬৪ কিন্তু আধুনিক অভিধানে 'মেখলা' অর্থে কেহ কটি-ভূষণ, কেহ চন্দ্রহাব, গোট প্রভৃতি অলঙ্কাবেব কথা বলিযাছেন।
৬৫ মনুসংহিতা ৫/১২০, শ্লোক . দ্রষ্টব্য। বঙ্গাক্ষবে টীকা।
৬৬. তসব অর্থে তৎকালে পশম বলা হইত।
৬৭. মহাভাবত, সভাপর্ব ৫২/২৬ শ্লোক–
"প্রমাণ বাগস্পর্শাদ্রান বাহলী-চীন সমদ্ভবম।
উনঞ্চরাঙ্ক বঞ্চৈব পট্টজং কীটজন্তুথা।।"
৬৮. শকুন্তলা, ১ম অঙ্ক। "চীনাংশুক শুকমিবকেতঃ প্রতিবাতং নীয়মাস্য।।"

বহুল প্রচলিত আছে। রেশম-বিশেষজ্ঞ দ্বারা যাচাই করিলে হয়ত আমাদের বিস্মৃত কালিদাস সমর্থিত তসর ও রেশম চীনের তসর ও রেশম হইতে পৃথক করা সম্ভবপর হইতে পারে। বর্তমানে আমাদের দেশে যে তসর ও রেশম উৎপন্ন হইতেছে, তাহা জাপানী ও চীনা তসর ও রেশম হইতে ভিন্ন প্রকৃতির। সম্প্রতি কতিপয় বাঙ্গালী রেশম-তত্ত্ববিৎ জাপানী রেশম উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া আসিয়া দেশী রেশমের সহিত তুলনা করিয়া উল্লিখিত মতের সমর্থন করেন এবং তাঁহারা এমনও ইঙ্গিত করেন যে, 'বাঙলার মাটিতে রেশমের চাষ পুরাদমে চালাইলে বৃটিশ আমলে যে পরিমাণ উৎকৃষ্ট ধরনের রেশম উৎপন্ন হইত, তদপেক্ষা বহুগুণে বেশী উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে, যদি বাঙালীরা এই দেশী শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া চাষবাস শুরু করিয়া দেয়।" যাহা হউক, এদেশেও রেশম ও তসর ছিল তাহা বহুকাল পূর্ব হইতেই হিন্দুর পূজা পার্ব্বনে পবিত্র জ্ঞানে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং এখনও এই রীতি রহিয়াছে।

**প্রাচীন চীন-ভারত বাণিজ্য সম্বন্ধ**

পাক -ভারতের সহিত চীনের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ বহু প্রাচীন। সে সব বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র এখানে নহে। তবে এতটুকু বলিয়া রাখিতে চাই যে, কামরূপ হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত একটি দুর্গম গিরিপথ ছিল। এই পথই ত্রয়োদশ শতকের ঐতিহাসিক তবকাৎ-ই নাসিরী কার মওলানা মিনহাজদ্দীন বর্ণিত বখতিয়ার খিলিজির তিব্বত অভিযানের পথ; এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সম্ভবত: এই পথ ধরিয়া বৌদ্ধ পণ্ডিত ও পরিব্রাজকরা এবং তিব্বতী দূতেরা বঙ্গ দেশ ও মগধের বৌদ্ধ-পীটে যাতায়াত করিতেন। তিব্বতের সহিত সংযোগ স্থাপনের আর একটি পার্ব্বত্য পথ পৌণ্ড্রবর্ধনে ছিল, বোধ হয়।

বগুড়ার মহাস্থানের উত্তরে যে প্রাচীন পথটি শিবগঞ্জ, কীচক হইয়া রাজা বিরাটের দিকে চলিয়া গিয়াছে, উহাই 'পৌণ্ড্রবর্ধন-তিব্বতী পথ' বোধ হয়। এই পথ দিয়া উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং অঞ্চল দিয়া সিকিম ভূটান পার হইয়া হিমালয়-গিরিপথের ভিতর দিয়া তিব্বত হইয়া চীনের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিত। পেরিপ্লাসের গ্রন্থে (প্রথম শতক) উহার ইঙ্গিত আছে। এই পথ দিয়া খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে চীনের রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যাদি বঙ্গ দেশে আসিত[৬৯]। সম্ভবতঃ উপরে বর্ণিত কিংবদন্তী মূলক গল্পে কোরিয়া ও জাপান হইতে যে রেশম ভারতে আমদানির কথা আগে বলিয়াছি, তাহা হয়ত জাপান হইয়া ভারতে আসে নাই। চীন-তিব্বত- পৌণ্ড্রবর্ধন পথ ধরিয়াই ভারতবর্ষে আমদানি হইয়া থাকিবে। কারণ, কোরিয়া জাপানের সহিত ভারতের স্থল ও জল পথের কোন সম্বন্ধ তখন ছিল কিনা, তাহা জানা যায় না। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস চীন-তিব্বত- পৌণ্ড্রবর্ধন পথ ধরিয়াই পৌণ্ড্রবর্ধন (উত্তর বঙ্গ) তথা ভারতবর্ষ, চীন ও মিশর, আরব ইউরোপ প্রভৃতি দেশ সমূহের মধ্যে পরস্পরের ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রাচীনকালে চলিত। উত্তর বঙ্গের প্রাচীনতম নদী করতোয়া টলেমীর ইতিহাসে উহার উল্লেখ আছে[৭০]। সপ্তম শতকেও মহাস্থানের পার্শ্ববর্তী বেণিয়াগণ নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। তাহারা পণ্যদ্রব্য লইয়া পূর্ণভবা নদীতে নৌকা ভাসাইয়া গঙ্গা বাহিয়া গৌড়, সপ্তগ্রাম হইয়া সিংহলে যাইত।

---

৬৯. গ্রন্থকারের প্রস্তাবিত "পূর্বপাকিস্তানের ইতিহাসের" "উত্তরবঙ্গ" খণ্ডের পাণ্ডুলিপিতে প্রাচীন পথ-ঘাট দ্রষ্টব্য ; পৌণ্ড্র বর্ধন ও করতোয়া, পৃঃ–৬০।

৭০. MC crindle's Ptolomy P. 29 and Periplus P. 145 , বিশ্বকোষ, ১১শ ভাগ, ৫১০ পৃঃ ; বঙ্গদর্শন ১৩০৯ ; ১৩৩-১৩৬ পৃঃ ; 'সাহিত্য' ১৩১৭ ; পৃঃ ৩০৭।

পেরিপ্লাসের ইতিহাসে রাজশাহী বিভাগের রংপুরের সন্নিকট তেজপত্রের জন্য বিখ্যাত বলিয়া করতোয়ার তীরে যে স্থানটির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উক্ত স্থানটি বগুড়ার চাঁদনীয়া-শিবগঞ্জের সন্নিকট উথলীর বাজার নয়তো? বগুড়া জেলা সংগঠিত হইবার পূর্বে এই শিবগঞ্জ রংপুরের মধ্যে ছিল। এই সময় শিবগঞ্জের করতোয়ার সমগ্র পূর্বাঞ্চল রংপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখনও এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে তেজপত্র উৎপন্ন হইত[৭১] এবং এই তেজপত্র প্রভৃতি মশলাপাতি কেনাবেচার জন্য এতদঞ্চলের উথলী ও চাঁদনীয়া-শিবগঞ্জ বাজার (মোঘলসেনানিবাস) প্রভৃতি স্থান বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে রংপুরের অন্য কোথাও তেজপত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু, শিবগঞ্জের পূর্বাঞ্চলে এখনও কিছু কিছু তেজপত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া উথলী-বাজারের এতদঞ্চলের একটি প্রাচীন বাজার হিসাবে খ্যাতি আছে। আজও এতদঞ্চলে বিশেষত: উথলী, নারায়ণপুর, সাদুল্লাপুর ও বিহারে এক শ্রেণীর হিন্দু বণিক বা বেণিয়া সম্প্রদায়ের বাস আছে। তাহারা গঠনে খর্বাকৃতি ও গৌরবর্ণ; কিন্তু উহারা প্রাচীন বণিক সম্প্রদায়ের বংশ বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। ইহারা সাধারণত: পোদ্দার ও বাণিয়া বা বেণিয়া নামে পরিচিত। লগ্নি ব্যবসায়ও ইহাদের একচেটিয়া ছিল। মনোহারী, মশলাপাতি তাহাদিগকে কখন কখন গ্রামে গ্রামে ফেরী করিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। মাথায় করিয়া তাহারা পশরা বহন করে। অনেকের এতদঞ্চলের বড় বড় বাজার-বন্দরে স্থায়ী দোকান পশারও দেখা যায়। এই সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে মনে হইতেছে যে, ইহারা সেই বণিক সম্প্রদায়ের বংশও হইতে পারে, যে বণিক সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্বের কথা একটু আগেই মহাস্থানের প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি[৭২]। মহাস্থানের চতুষ্পার্শ্বে ও শিবগঞ্জ থানার বিভিন্ন স্থানে এই সম্প্রদায়ের লোকের বাস এখনও রহিয়াছে। শোনা যায়, এই ব্যবসা তাহাদের মধ্যে একচেটিয়া ছিল, কিন্তু বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বিহার ও শিবগঞ্জের মধ্যবর্তী বহু প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম 'নারায়ণ শহরের' কাজী তৈয়ব আহমদের নিকট-আত্মীয় 'আসেক মামুদ' একটি মনোহারী ও মশলাপাতির দোকান করিলে স্থানীয় লোকেরা তাঁহাকে "বাণিয়ার বেটা" ও "পোদ্দার" নামে দুর্নাম দিত। এই দুর্নাম সহ্য করিয়াও তিনি তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই দোকান চালাইয়াছিলেন। এখন শিবগঞ্জ থানায় বহু লোক এই ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে (বিহারের খাঁ উপাধিধারী তাহাদের মধ্যে নাম-করা বটে) কিন্তু, সে দুর্ণাম আজ আর শোনা যায় না। তবে পাকিস্তান যুগে হিন্দু বাণিয়া ও পোদ্দারের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে।

দেশজ মশলাপাতির উৎপাদন ও ব্যবসার জন্য বগুড়ার করতোয়ার পূর্বাঞ্চল চিরদিনই প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলের মহাস্থান ও গাংনগর মেলার মৌশুমে দেশ বিদেশের সওদাগরেরা ও জনসাধারণ সালতামামি বৎসরের সওদা ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকে। উত্তরবঙ্গে মেলার মৌশুমে করতোয়ার পূর্বাঞ্চলের মশলাপাতি রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়ার বিভিন্ন স্থানে রফতানী হইয়া থাকে। সুতরাং পেরিপ্লাসের গ্রন্থের উল্লেখ একেবারে অমূলক নহে। সম্ভবত: উক্ত উথলী বাজারই পেরিপ্লাসের তেজপত্র কেনাবেচার কেন্দ্র ছিল। হয়ত তখন চীনারাও এ দেশের সহিত পৌণ্ড্রবর্ধন-পথ ও করতোয়া বাহিয়া বাণিজ্য সম্ভার বিনিময় করিত–।

৭১ সাহিত্য পরিষদ, পত্রিকা ; চতুর্থ ভাগ, ১ম সংখ্যা–পৃঃ ৫৩-৫৪।
৭২. 'বগুড়ার ইতিকাহিনী' মহাস্থান অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ভারতবর্ষের সহিত সিংহলের বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রাচীনকালে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল। বাঙলার বাণিজ্যের ইতিহাসে উহার উল্লেখ আছে। একদা জনৈক সিংহল-যাত্রী ধনপতি সওদাগর সিংহলে যাত্রাকালে তাঁহার 'বাণিজ্য-তরী' উত্তরবঙ্গের নদীতীরস্থ বিভিন্ন বাজার-বন্দরে থামাইয়া তীর্থ দর্শন ও সওদা ক্রয় করিয়া সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ- ষোড়শ শতকের সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে উক্ত ধনপতি সওদাগরের নিম্নরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

ধনপতি* যেয়ে উঠিল নায়।
খুলির বহর দক্ষিণ বায়॥
সিংহল যাইতে করিল মনে।
বহিছে তরণী রজনী দিনে॥
কামাখ্যা হইতে ছাড়িল তরী।
আশে পাশে রাখে কতেক গিরি॥
ব্রহ্মপুত্র তীর্থরাজ সুগভীর।
সুঠাম সুগতি উজ্জ্বল নীর।
যার দরশনে মুকতি পায়।
তারপরে তরী বাহিয়া যায়॥
যোগী গোফা[৭৩] আদি রাখিয়া পাছে।
উপনীত করতোয়া কাছে॥
কর্ণধারে সাধু জিজ্ঞাসে কথা।
ক'দিনের পথ আসিছ এথা॥
কর্ণধার বলে দিক্কর[৭৪] হ'তে।
এসেছি শতেক যোজন[৭৫] পথে॥
পাঁচ দিনে এনু বাদাম কলে।
বিশেষ তোমার ভাগ্যের ফলে॥
শুনি সওদাগর হরিষ তায়।
ষোড়া[৭৬] ফেলি দিল কাণ্ডারী গায়॥
পরশুরামের বাড়ী[৭৭] দেখিয়া।
খুলির বহর হরিষ হইয়া॥
ব্রহ্মপুত্র ছাড়ি লাক্ষাতে[৭৮] পড়ি।
আঁটিয়া বাঁধি বাদাম দাঁড়ী॥

৭৩. 'যোগী গোফা'–মহাস্থানেব দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে ৫/৬ মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। কানফট সম্প্রদায়েব তীর্থ হিসাবে ইহা প্রসিদ্ধ।
৭৪. দিক্কর–আসামের একটি বিশিষ্ট স্থানের নাম।
৭৫. যোজন-চারিক্রোশ পবিমাণ দৈর্ঘ্য ১ যোজন।
৬. 'রাজশাহীব ইতিহাস' দ্বিতীয খণ্ডে উক্ত সওদাগর সম্পর্কে 'নন্দপুর গ্রাম' প্রসঙ্গে দ্রঃ।
ষোড়া- নোঙ্গর।
৭০. পরশুবামেব বাড়ী–মহাস্থান গড়ে অবস্থিত কথিত 'পরশুবামেব বাড়ী'।
লাক্ষা– আজিকাব ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের 'লাক্ষা' নদী।

মেঘনাতে ডিঙ্গা ধরিল বলে।
বদর বদর নেয়েরা বলে॥[৭৯]

ভারতবর্ষের রেশমের প্রাচীনত্বের বিষয় আলোচনা করিলে আরও আগে দেখা যায়–ইহা পৌণ্ড্রবর্ধনের উত্তরাংশের সম্পদরূপে রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে।

"মগধায় মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রাংশুঙ্গাংস্তথৈব চ।
ভূমিঞ্চ কোষিকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরং[৮০]।'

রামায়ণের বর্ণনা হইতে মনে হইতেছে হিমালয়ের পাদদেশে অতি প্রাচীন-কালে কোষকার নামক জনপদ ছিল। এই জনপদই পুণ্ড্র দেশ অর্থাৎ প্রাচীন বাঙলার 'পৌণ্ড্রবর্ধন'; ইংরেজ আমলের উত্তর বঙ্গ বা রাজশাহী বিভাগ। বাণ্‌ভট্টের হর্ষচরিতে পৌণ্ড্রবাসের যে উল্লেখ পাওয়া যায়–উহাই পুণ্ড্রদেশীয় রেশমী বস্ত্র[৮১]। চন্দ্রগুপ্তের অন্যতম সভা পণ্ডিত চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে পৌণ্ড্রবর্ধনের উৎকৃষ্ট রেশমের বিষয় বর্ণিত আছে। এই রেশমকে পাতার পশম বা 'পত্রোণ' বলা হইত। উহাতে বর্ণিত আছে যে, পোকাতে পাতা খাইয়া যে রেশম উৎপন্ন করিত, তাহাকেই 'পত্রোর্ন' বলা হইত। সেই 'পত্রোর্ণ' মগধ ও পৌণ্ড্রদেশে জন্মিত[৮২]। উক্ত 'পত্রোর্ণ' আজিকার 'তসরের বস্ত্র' বলিয়া মনে হইতেছে। আগেই বলিয়াছি চীনের রেশম ও তসর হইতে ভারতবর্ষীয় তসর ও রেশম একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এখনও এই তসরের চাষ আসাম ও জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং এর পার্ব্বত্য অঞ্চলে হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে যে সব কীট দেখা যায়, তাহা ভিন্ন প্রকৃতির। আকারে একটু বড় : পূর্ব্ব পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে বনে-জঙ্গলে কখন কখন উহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। নাগবৃক্ষ (নাকেশ্বর), লিকুচ (ডেউয়া+), বকুল ও বট-পাইকড় বৃক্ষে এই জাতীয় পোকা জন্মিত। উহার প্রকারভেদ আছে: যেমন লিকুচের পোকা হইতে গমের রঙ, বকুলের পোকা হইতে শাদা, বট-পাইকড় প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে রেশমের রঙ ননীর মত হয়। চীনের রেশম অধিকাংশই সাদা। তাহা রঙ করিতে হয়। কিন্তু এ দেশের রেশম রঙ করিতে হয় না। এখনও এদেশে বিভিন্ন রঙের গুটি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে রঙদার বৃক্ষ তখনও ছিল, এখনও রহিয়াছে। তাহার প্রচুর নজির আমাদের দেশে রহিয়াছে। এ দেশের রঙদার কারিগরগণ এখন কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম রঙ ব্যবহার করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় দেশী কারিগরগণ এবং গ্রাম্য মহিলারা বাড়ীর আশেপাশের নানাপ্রকার রঙদার গাছ গাছড়া হইতে ফুল, পাতা ও বল্কলাদি সংগ্রহ করিয়া সেগুলির রস হইতে বিবিধ প্রকার রঙ প্রস্তুত করত: তিথি পরবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ও কাপড়ে বা সূতায় ব্যবহার করে। এই রীতি আমাদের দেশে এখনও রহিয়াছে। এক্ষেত্রেও দেখা যায়, পাক-ভারতের পূর্বাঞ্চলে উত্তর বঙ্গে রেশম চাষের আদি জায়গা তো বটেই, উপরন্তু চীন হইতে ভারতে রেশম আসিয়াছে এমন কোন প্রমাণ

৭৯. হিন্দু সর্ব্বস্ব, ৬ষ্ঠ সংস্করণ–পৃঃ ৫০২-৩।
৮০. কিষ্কিন্ধ্যা, ৪০/২৩– শ্লোক।
৮১. গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪০-৪২।
৮২. "মাগধিকা পৌণ্ড্রকা পত্রোর্ণা"।
+. লিকুচফে মহমহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'মাদার' বলিয়াছেন (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩২১ সাল, পৃঃ ২০৯) কিন্তু পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের মতে উক্ত লিকুচ অর্থে 'ডেউয়া'। (সাহিত্য-১৩২৫ সাল, পৃঃ ৫২–।

চাণক্যের অর্থ শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। মৌর্য্য যুগে চীনের রেশম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। কেবল তাহার এতটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার বহুল প্রচলন ছিল একথা জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই। কেননা, চাণক্য স্বয়ং এ দেশের রেশম বা 'পৌণ্ড্রবর্ধনের পত্রোর্ণ' পছন্দ করিতেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বর্ণিত চাণক্যের এতটুকু ইঙ্গিত আছে[৮৩]। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, "চীনের রেশম তুঁত গাছ হইতে হয়; কিন্তু বাঙলার রেশমের সহিত তুঁত গাছের কোন সম্বন্ধ নাই।" এখন আমাদের দেশে যে তুঁতের চাষ হইতেছে, উহা চীন হইতে আমদানী হইয়াছে।" তবে কতকাল পূর্বে উহা এদেশে আসিয়াছে, তাহা বলা যায় না। আমাদের মতে শাস্ত্রী মহাশয়ের ধারণা একেবারে অমূলক নহে। কারণ, বিংশ শতকের গোড়ার দিকে কালিংপং ও দার্জ্জিলিং এর বিভিন্ন জঙ্গলে যে সব জংলী জাতীয় রেশম-কীট দেখা গিয়াছে তাহাই হয়ত শাস্ত্রী মহাশয়ের বর্ণিত বাঙলার আদি তুঁত গাছের রেশম-কীট বলিয়া বোধ হইতেছে।

পৌণ্ড্রবর্ধন (উত্তর বঙ্গ) যেমন বিভিন্ন বর্ণের রেশম উৎপন্ন হইত তেমনই পৌণ্ড্রবাসী রেশম রঞ্জনকারী বিদ্যায় পারদর্শীও ছিল[৮৪]।

এতদ্ব্যতীত এ দেশে (পৌণ্ড্র-বঙ্গ) এক শ্রেণীর গাছের ছাল বা বাকল হইতেও বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এই বস্ত্র ক্ষৌম এবং এই ক্ষৌমের নাম দুকূল'[৮৫] বলা হইত। কৌটিল্যেব অর্থশাস্ত্রে বঙ্গের "দুকূল" শ্বেত স্নিগ্ধ; পৌণ্ড্রের 'দুকূল" শ্যাম বর্ণ মণির মত উজ্জ্বল বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গাঞ্চলের বাকলের বেশ একটু যেন তারিফ করা হইয়াছে। কোটিল্যের ক্ষৌম বা বাকলের বস্ত্র মনুসংহিতার শণ-তান্তবী বলিয়া বোধ হয়।

বাকলেব যন্ত্র

বাঙ্গকং শ্বেতস্নিগ্ধং পৌণ্ড্রকং শ্যামমনিস্নিগ্ধং
সৌবর্ণকুড্যকং সূর্য্যবর্ণমণিস্নিগ্ধোদক বানং
চতুরস্রবানং ব্যামিশ্রবানং চ। এতেষামে-
কাংশুকর্মদ্ধং দ্বিত্রিচতুরং শুকমিতি তেন তেন
কাশিকং পৌণ্ড্রক কংচ মৌক্ষং ব্যাখ্যাতম্[৮৬]।

রোম সাম্রাজ্যে রেশম প্রবর্তন ও চাষের সহিত মতান্তর দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, চীন হইতে চীনা পলুর বীজ রোম সাম্রাজ্যে আনিত হইয়াছিল। সেই বীজ হইতেই ইউরোপে রেশমের চাষের সূত্রপাত ও ব্যবসায়-বাণিজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। সেই জন্য কোন কোন রেশম তত্ত্ববিৎ চীন দেশকেই রেশমের আদি ভূমি বলিয়া থাকেন। কিন্তু জনৈক ফরাসী পণ্ডিত বৈতার (Mr. Baitard) বলেন, "রোমের রেশম ভারতের জিনিষ। চীন হইতে রেশম রোমে যায় নাই। ভারত হইতেই রেশম-বীজ রোম সাম্রাজ্যে গিয়াছে।" মিঃ বৈতারের মতের সপক্ষে কতকগুলি প্রমাণ পাওয়া যায়। রোম সম্রাট জাষ্টিনিযানের (Emperor Justinian) সভায় কয়েকজন ধর্ম প্রচারক সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পাঞ্জাবের অন্তর্গত 'সিরহিন্দী' নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে সম্রাট রেশম বীজ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এতদসহ আরও অবগত

৮৩. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা- ; ১৩২১ সাল, পৃঃ ২০৯।

৮৪. B Vogura District Gazzetteer, P 92-97

৮৫ "কটিতে ছিল নীল দুকুল, মালতী মালা মাথে,
কাঁকন দুটি ছিল দুখানি হাতে।"-রবীন্দ্রনাথ।

৮৬. "পৌণ্ড্রবর্ধন ও করতোয়া" নামক গ্রন্থে এই শ্লোক দ্রষ্টব্য।

হওয়া যায় যে "চীনারা ভারতের সুগন্ধি ও গরম মশলার পরিবর্তে হিন্দুকে রেশম দিয়া যাইত।" এই কথার সত্যতা খুঁজিতে হইলে চীন-ভারত প্রাচীন বাণিজ্য সম্পর্কের কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

জনৈক বিখ্যাত রেশম-তত্ত্ববিৎ প্রোকোপিয়াসের (Procopius de Bllo Gallies) বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "৫০০ হইতে ৫৬৫ শতকের মধ্যে কয়েকজন সন্ন্যাসী ভারত হইতে রোম সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।" বাইজান্তীয় থিওফানেস (Theo Phanes of Byzantian) কর্তৃক খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে লিখিত একটি বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বকালে জনৈক পারসীক লাঠির মধ্যে লুকাইয়া যে সব রেশম-বীজ রোমে আনিয়াছিল, তাহা ভারতের সিরহিন্দ্ নামক স্থানের রেশম-বীজ।" রেশম-বস্ত্র তৎকালে মহার্ঘ ও রাজদরবারী বস্ত্র ছিল। সেই জন্য বোধ হয় ভারতের কোন কোন প্রদেশে রেশম অথবা অন্য কোন মূল্যবান জিনিষ তখন বিদেশে যাওয়া বাধা নিষেধ ছিল। তাই হয়ত জনৈক পারসীক চুরি করিয়া এ দেশীয় রেশম-বীজ বিদেশে পাচার করিয়াছিল। উপরোক্ত মন্তব্যে যেন তাহার একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

যাহা হউক, ইউরোপীয়ানদের বিশ্বাস থাকিলেও চীন হইতে রেশম-বীজ রোম সাম্রাজ্যে যায় নাই। ভারতবর্ষ হইতেই রেশম রোমে পৌঁছিয়াছিল। তাহার পরে মনে হয় রোম অথবা ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে রেশম ব্যবহারের প্রচলন হইয়াছিল। কেননা, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গ ও পৌণ্ড্রদেশে রেশমের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে; খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল এবং গ্রীকভূবেত্তা টলেমীর 'কিরাদিয়ার' রূপান্তরিত করতোয়া বাহিয়া উত্তর বঙ্গের বাণিজ্য-তরী যাতায়াত করিত, তাহার কথা একটু আগেই বলিয়াছি।

সংস্কৃত সাহিত্যে রেশমের নাম

সংস্কৃত শাস্ত্রীয় গ্রন্থে কৌষেয়, পট্ট, ক্রিমিজ, সূত্র, কীট-তন্তু, কীট সূত্র, কীটজ প্রভৃতি কয়েক প্রকার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় নামের সহিত বৈদেশিক নামের কোন সংস্রব দেখা যায় না। বিভিন্ন দেশে রেশম পোকার নাম বিভিন্ন প্রকার নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

বিদেশে নামের তালিকা

| দেশ | রেশম | পোকার নাম |
|---|---|---|
| চীন | " | শী (Tsi) |
| জাপান | " | কাইকো |
| কোরিয়া | " | সির বা সুই |
| ল্যাটিন | " | সেরিকম (Sericum) |
| গ্রীক্ | " | সেরিকোন্ |
| জার্ম্মান | " | সিডেন (Seiden) |
| ফরাসী | " | সোয়ি (Soie) |
| রাশিয়া | " | সিওল্ক্ (Sheolk) |
| ইউরোপ | " | সিল্ক-ওয়ার্ম (Silk-worm) |
| পাক-ভারত | " | রেশম বা রেশমকীট বা পলু |
| ব্রহ্মদেশ | " | সা (Tsa) |

উপরের তালিকায় প্রদত্ত নামগুলি চীন ও মঙ্গোলিয়া হইতে বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষে প্রচলিত নামগুলির মধ্যে চীনের কোন নাম পাওয়া যায় না। চীন হইতে রেশমের বীজ ভারতবর্ষে আনিত হইলে ভারতবাসীরা চীনের নামও গ্রহণ করিত। বরং ইউরোপ হইতে ইংরেজী নাম ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছে। রেশমের বাঙ্লা নাম 'গরদ'। কিন্তু ফারসী নামে ইহা প্রসিদ্ধ। ফারসী ভাষা হইতে রেশম শব্দের উৎপত্তি। ইহার ফারসী মূল শব্দ 'রেশাম'[৮৭]। মুসলমান যুগ হইতে পাক-ভারতে এই নামের খ্যাতি শোনা যায়। ইতিপূর্বে উহা হিন্দুর পুরাণ পরিচিত সংস্কৃত-সাহিত্যের 'কৌষেয়' নামেই বোধ হয় ছিল। ভারতবর্ষে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নাম পাওয়া যায়। এই সব নামের মধ্যেও চীনের কোন নাম পাওয়া যায় না। যেমন আসামী ভাষায় পাট শব্দে কোয়া, কাশ্মীরী ভাষায় পাট শব্দে রেশম, দক্ষিণ-ভারতে তামিল ভাষায় পট্টু শব্দে রেশম বলা হইয়া থাকে[৮৮]। এই সব ভাষাগত শব্দ সংস্কৃত পট্টু শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হইতেছে। ইহাতে একরূপ জোর করিয়া বলা যায় যে, আদিকাল হইতেই ভারতে রেশম আছে। মুসলমানের রেশম, হিন্দুর গরদ ও ইংরেজের সিল্ক–এই তিনটি নাম অনেক পরের। মধ্য যুগে মুসলমান দ্বারা 'রেশম' নাম প্রচলিত হইলে গোঁড়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ দ্বারা তখন হয়ত এই নাম গৃহীত হয় নাই। তাই হয়ত, ফারসী রেশমের আসনে গরদ-হিন্দুদের মধ্যযুগীয় নাম (?)। কিন্তু সিল্ক যে ইংরেজের দেওয়া ইংরেজী নাম, তাহা বলাই বাহুল্য। উপরে উল্লিখিত প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ হইতে অনুমিত হয় যে, আদিকাল হইতে ভারতে রেশম রহিয়াছে। ফারসী ভাষায় রেশম ও তদস্থলে বাঙ্লা ভাষায় গরদ মধ্য যুগীয় ভারতীয় নাম এবং ইংরেজ আমলে সিল্ক শব্দ প্রচলিত হয়। প্রাচীন অংশু পট্ট বা পরবর্তীকালে পাক-ভারতের 'রেশম' এদেশের নিজস্ব সম্পদ। এই উপমহাদেশের নামগুলিতে তাহা প্রতিপন্ন হয়। মহাভারতে পলুপোকা 'কৃমি' নামে উল্লিখিত[৮৯]। কাশ্মীর অঞ্চলে কোন কোন স্থানে পলুকীট পালনকারীদের 'ক্রিমিক' বলা হয়।

পুণ্ড্রবিক বা প্রাচীন রেশমকীট পালনকারী

উত্তরবঙ্গে রেশমকীট পালনকারীদের পুণ্ড্রিক বা পুণ্ড্র বা পঁড়ো নামেও অভিহিত করা হইত। মালদহ জেলাতে এই নামীয় এক শ্রেণীর লোক প্রাচীনকাল হইতে পুরুষানুক্রমে রহিয়াছে। আবার রেশমকীট পালনকারীদের কোন কোন স্থানে "পলিয়া" বলিয়াও অভিহিত করা হয়। বগুড়ার ভাসুবিহারের সন্নিকট 'পলু' পালনকারী একটি প্রাচীন গ্রাম অদ্যাপিও অপভ্রংশে "পলীপাড়া" নামে খ্যাত। যদিও এই গ্রামে এখন পলুর চাষ হয় না; সকলেই কৃষি কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। পশ্চিমবঙ্গে হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেলের সন্নিকট ও বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর এবং বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জের বালুচরে পলিয়া নামক একশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান দেখা যায়। ইহারা অধিকাংশই এখন কাপড়ের ব্যবসায়ী। আর কেহ কেহ কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা। হুগলীর পাণ্ডুয়া অঞ্চলে একশ্রেণীর মুসলমান এখনও 'ধাওয়া' নামে কথিত হইয়া থাকে। ইহারাও নাকি এক সময় রেশম কীট পালন করিত। পলিয়া নামে এখনও ইহাদিগকে দুর্নাম দেওয়া হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব কয়েকশত বৎসর পূর্বে পৌণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত মহাস্থানের সন্নিকট পুণ্ড্রবিক

---

৮৭. The Concise Dictionary by Syed Hossain Ali, P 813

৮৮. বিশ্বকোষ, ৭৫৩, রেশম শব্দ দ্রষ্টব্য।

৮৯. "কৃমিহি কোষকারস্তু বধ্যতে স্ব পরিগ্রহাৎ" মহাভারত ঃ– ১২/৩২/২৯

নামক একটী বণিক শাখার উল্লেখ জৈনদিগের কল্পসূত্রে পাওয়া যায়[৯০]। পলু শব্দ হইতেই পুণ্ড্র বা পুণ্ড্ররিকের উৎপত্তি। পৌণ্ড্রবর্ধনে পলু পালনকারী পুণ্ড্র নামক একশ্রেণীর লোক ছিল[৯১]; তাহারা রেশম উৎপাদন করিত। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রেও ইহার উল্লেখ আছে। এখনও উত্তর বঙ্গের (রাজশাহী বিভাগের উত্তরাঞ্চলে) কোন কোন স্থানে 'পলিয়া' শব্দের প্রচলন আছে। অতীতে ইহারা রেশম উৎপাদন করিত বলিয়া দাবী করা হয়। কোন কোন গ্রন্থে পুণ্ড্র অর্থে ইক্ষুবিশেষের নাম করা হইয়াছে[৯২]। প্রাচীন বঙ্গ বিভাগে 'পৌণ্ড্রবর্ধন' (উত্তরবঙ্গ) পুণ্ড্রজাতির দেশরূপে খ্যাত ছিল। এই পৌণ্ড্রজাতির নামানুসারে যে 'পৌণ্ড্রবর্ধন' নাম করণ হইয়াছে তাহাও আজ প্রায় সকল ঐতিহাসিক নিঃসন্দেহে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

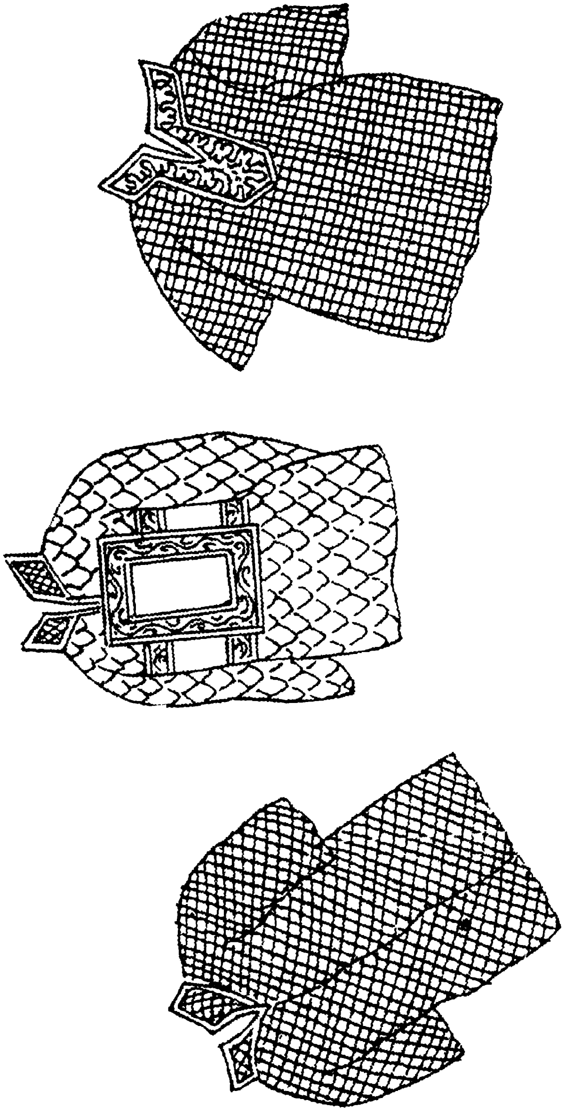
পৌণ্ড্রবর্ধনে রেশম

উনবিংশ শতকে সর্ব প্রথম বঙ্গদেশে বিলাতী পলুর চাষ আরম্ভ হয়। ইং ১৮৩৬ সালে ডঃ স্পিড লিখিয়াছেন, "১২০ বৎসর হইল 'বড় পলু' নামক রেশম কীট ইটালী হইতে বঙ্গদেশে আনিত হইয়াছে।" মিঃ ইটন এই শতকেই (তাঁহার -Silk in India) রেশম কীটের নাম করণ করিতে যাইয়া রেশমকীটের প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়াছেন। দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকিয়া অধিক রেশম উৎপাদন করিতে সক্ষম, কীটগুলিকে বিলাতী পলু (বম্বেস্কটিকসটর); আর ছোট পলুকে চীনা পলু (বম্বেস্কসিনেসশীশ) প্রভৃতি বৈদেশিক নাম করণ করিয়াছেন[৯৩]। কিন্তু "বাঙ্গালী রেশম তত্ত্ববিৎরা বলেন 'বড় পলু' চীন দেশের নহে। উহা বাঙ্লার সম্পদ। এই 'বড় পলু' ভারতীয় পলু নামে খ্যাত। উহা গৌড়ীয় পলু নামে অভিহিত।" এখন হইতে ১৮০-৯০ বৎসর পূর্বে কাশিম বাজার, জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ), হরিপাল, রাধানগর (হুগলী) ও সোনামুখী (বাঁকুড়া), রাজশাহী, নদীয়া, বগুড়া, রংপুর এবং নিম্ন আসামে উক্ত 'বড় পলুর' চাষ হইত। এই উত্তম জাতীয় পলু পাক-ভারতের সম্পদ বলিতে আমাদের কোন দ্বিধা হইতেছে না। কারণ বাঙ্লার ভূমি উত্তাপের সহিত বিদেশী ভূমির উত্তাপের তারতম্য চিরদিনই রহিয়াছে। বিদেশী পলু এদেশের ভূমিতে দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকিয়া পলু উৎপাদন করিয়াছে এমন কোন শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে আমরা বলিতে পারি—এই উত্তম জাতীয় কীটগুলিকে ইংরেজরা তাহাদের সপক্ষে বর্ণনা করিয়াছে। তাহা না হইলে হয়ত তখন তাহাদের গুরুত্ব সুদৃঢ় হইত না।

বিলাতি পলুব চাষ

যে ইংরেজ বণিক বাঙ্লা দেশে একচেটিয়া কর্তৃত্ব করিবার জন্য পাক-ভারতে ইউরোপের অগ্রগামী ব্যবসিকদল 'দিনেমার', 'পর্তুগীজ', 'ওলন্দাজ' 'ফরাসীদের' বিতাড়িত করিয়া নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া ছিল, তাহারা কি রেশম ও নীল বীজ হাতে করিয়া বঙ্গভূমিতে তস্‌রিফ আনিয়াছিল?—হইতে পারে বর্তমান পদ্ধতিতে রেশমের চাষ হয়ত তখন এদেশে ছিল না; ব্যাপক ও বিস্তৃতাকারে রেশম চাষের জন্য আজিকার চাষ পদ্ধতিতে জঙ্গলময় উচ্চভূমি বনবাদাড় হইতে নিম্নভূমিতে চীনা পদ্ধতিতে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পাক-ভারতে রেশম ছিল না—একথা মানিয়া লইবার পক্ষে কোন যুক্তি বা কারণ পাওয়া যায় না।

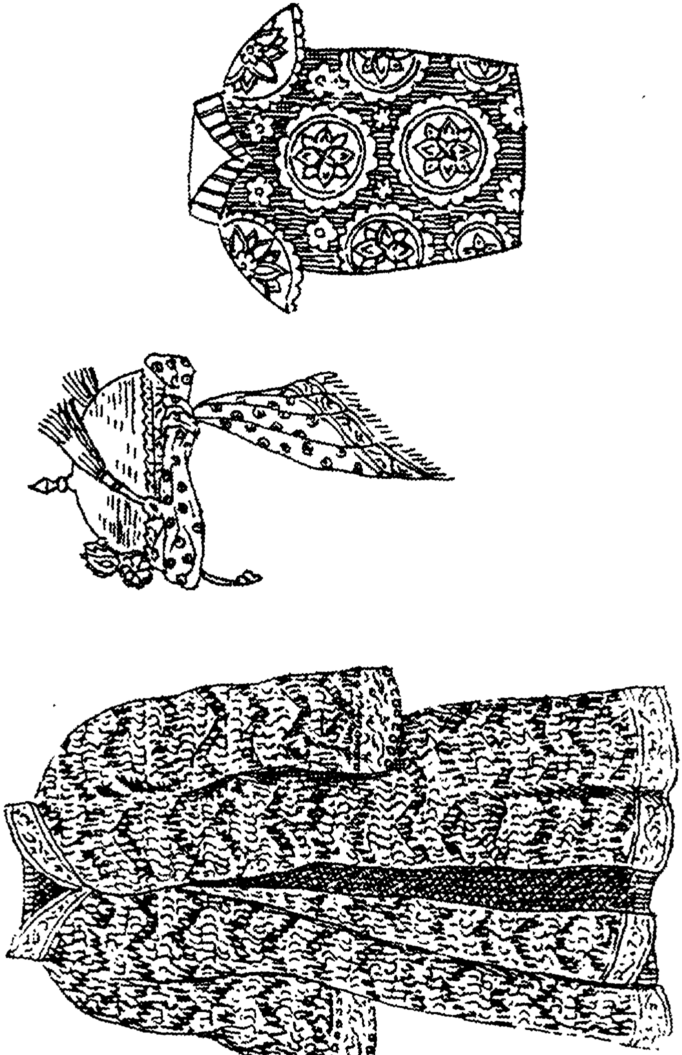
৯০. বগুড়ার ইতিকাহিনী, পৃঃ ৪৪৭।
৯১. Handook of Sericulture, P. 276
৯২. 'পৌণ্ড্রবর্ধন ও করতোয়া' পৃঃ ৬৬।
৯৩. বিশ্বকোষ-৭৫৪ পৃঃ।



মুসলমান শিল্পী কর্তৃক বাঙলার রেশমে প্রস্তুত বাদশাহ ও নওয়াবী আমলের পোশাক পরিচ্ছদের কয়েকটি নমুনা

যুগ পরিবর্তনের জাতীয় সম্পদ বিদেশীদের মসিতে

বলা বাহুল্য একজাতির ভাগ্য পরিবর্তন হইলে সেই জাতির দুর্দ্দিনের সুযোগ লইয়া কিভাবে দুর্ভাগ্য জাতিটির নিজস্ব সম্পদ সৌভাগ্যবানদের মসিতে ধিক্কৃত ও নিকৃষ্ট রূপে চিত্রিত হয়. তাহা



মুসলমান শিল্পী কর্তৃক বাঙলার রেশমে প্রস্তুত বাদশাহ্‌ ও নওয়াবী আমলের পোশাক পরিচ্ছদের কয়েকটি নমুনা

আর বুঝিতে সন্দেহ থাকে না। বাঙ্গালীদের ১৯০ বৎসর পরাধীনতার দুর্দ্দিনে এদেশের কত সম্পদ যে এমনি ভাবে ইউরোপবাসী তথা বিদেশীদের বিবৃতিতে স্বীয় ধনভাণ্ডারের সম্পদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, বিদেশী মোহমুগ্ধ বাঙ্গালী তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পাইলে বড়ই আনন্দের কারণ হইত।

পরিশেষে আমরা বলিতে চাই–চীন পাক-ভারত এই দুই দেশেই রেশমের চাষ পূর্বকাল হইতেই ছিল এখনও রহিয়াছে। তাহা উভয় দেশের নিজস্ব জাতিগত ও ভাষাগত নামগুলিতেই সুস্পষ্ট।

হস্ত শিল্পের মধ্যে মিহি কাপড়ের জন্য পাক-ভারত বহুকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। দেশের গ্রীষ্মাতিশয্যের জন্য রাজা বাদশাহরা সূক্ষ্ম বস্ত্রের পক্ষপাতি ছিলেন। সেই জন্য মিহি কাপড়ের ব্যবসায় খুব উন্নত ও ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল। গুটি পোকা পালন ও রেশম উৎপাদন এবং রেশমী বস্ত্র বয়ন মুসলমানী আমলের আগে হইতেই পাক-ভারতে প্রচলিত ছিল। তাহা একটু আগেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা পৌণ্ড্রিকদিগের জাতীয় শিল্প ব্যবসা ছিল[৯৪] এবং পট্ট ও কার্পাস বস্ত্রের বহুল প্রচার ছিল[৯৫]। মুসলমান আমলে ইহার উন্নতি চরমে উঠিয়াছিল। মখমল, সাটিন প্রভৃতি কাপড় তখন এদেশে প্রস্তুত হইত না। বিদেশ (বিশেষত: ইউরোপ হইতে আমদানি করা হইত। বাদশাহ্ ও নওয়াবেরা এই কাপড়ের খুব আদর করিতেন। মোগল আমলে বিশেষ করিয়া ইউরোপীয়ানরা তখন একচেটিয়া ভাবে মখমল ও সাটিনের ব্যবসা করিত।

মুসলমান আমলে রেশমের উন্নতি

ফুলকাটা (কিংখাব) ও জরির চুমকী সলমার কাজকরা কাপড়ের প্রবর্তন মুসলমান দ্বারাই হইয়াছিল এবং বাদশাহী ও নওয়াবী দরবারে বহু কারীগর ও ওস্তাদ দরজী নিযুক্ত থাকিয়া নানাবিধ কাপড়ের উপর জরির ও রেশমের রঙিন সুতা দিয়া বিচিত্র রঙের নকশা বুনিত এবং সলমা-চুমকীর সূক্ষ্মকাজ করিত। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, মোঘল আমলে কত বিচিত্র ও বিভিন্ন রকমের নকশা তোলা হইত, কত রঙ-বেরঙের সূতার কাজ হইত[৯৬]।

কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের শালের শিল্প মুসলমানের সৃষ্টি। দরবারী পোষাকের জন্য কিংখাব ও জরির কাপড় আবশ্যক হইত বলিয়া নওয়াবেরা প্রত্যেক শহরে বহু শিল্পী দরজী নকাশী পালন করিতেন এবং কোথাও যথার্থ গুণীর সন্ধান পাইলে তাঁহাকে যথোচিত সাহায্য করিতেন[৯৭]। ভারতের গুজরাটের আহমদাবাদ, মাদ্রাজ প্রদেশের মসলীপট্টম, লক্ষ্ণৌ, কাশী; পূর্ব্ব পাকিস্তানের ঢাকা ও রাজশাহী এবং পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি শহর বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং আজাদী উত্তর যুগে সেই খ্যাতি যেন আবার জমকিয়া উঠিয়াছে।

বলা বাহুল্য কার্পেট ও গালিচা প্রভৃতি শিল্প পাক-ভারতে বাদশাহ নওয়াবদের দ্বারাই প্রবর্তিত হয়। কার্পেট ও গালিচার কোমলতা নকশা ও রঙের সুসঙ্গত বাহার (Sitle) প্রভৃতি সৌখিন কালচারের উৎকর্ষ বাদশাহ শাহজাহানের আমলে চরমে উঠিয়াছিল এবং এই সব জিনিষ অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় হইত। বাদশাহী দরবারের জন্য চন্দ্রাতপ (বা সামিয়ানা) বহু টাকা ব্যয়ে বিচিত্র ভূষণে সজ্জিত হইয়া আহমদাবাদ ও কাশ্মীরে প্রস্তুত হইত। এই সব জিনিষ বাদশাহী ও নওয়াবী দরবারে বেশী বিক্রয় হইত। অবশিষ্ট বিদেশে চালান যাইত। বাদশাহ ও নওয়াবী সাহায্যে দেশের বস্ত্র শিল্প রেশমে-পশমে-

---

৯৪. 'রেশম বিজ্ঞান' পৃঃ ২৬৩

৯৫. 'রেমশ শিল্প' পৃঃ ৬৮।

৯৬. Ain-i-Akbari, by Abul Fazal Allami Translanted into English by H. Blochmann, P P.97-115

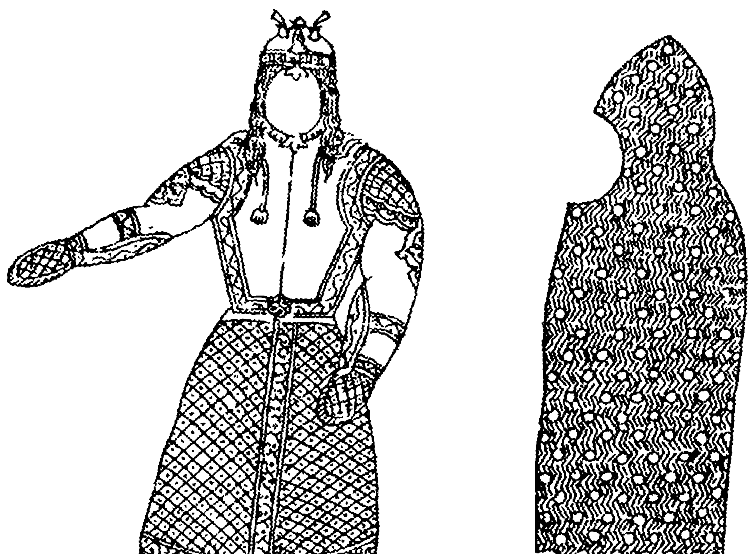
৯৭. "মুসলমানী আমলের ভারত শিল্প"--অধ্যাপক যদুনাথ সরকার লিখিত প্রবন্ধ।

সূতায়-জরিতে ঐশ্বর্য্যবান ও অতুলনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজ বণিকগণ এই সব বস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় করিয়া বিস্তর মুনাফা করিত।

রেশম হইতে রুমাল, চাদর, চেক, থান, শিরস্ত্রাণ, সাটিন, ফিতা প্রভৃতি নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত হইত। কাশী বা বেনারশে যে সব উৎকৃষ্ট রেশমী-শাড়ী প্রস্তুত হইত তাহার অধিকাংশ বঙ্গ দেশীয় রেশম। কেননা, পাক-ভারতের সকল স্থান অপেক্ষা বাঙলার রেশম উৎকৃষ্ট ও বেশী উৎপন্ন হইত[৯৮]। তখন মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী ও বগুড়ার মটকা, এণ্ডি বিখ্যাত ছিল। এই সব রেশমী বস্ত্র কেবল বড় লোকেরাই ব্যবহার করিত না,

**রাজশাহীর রেশমী বস্ত্র**

সাধারণ লোকেরাও অতি কষ্টে ২/১ খানা করিয়া ঘরে রাখিয়া দিত; তিথি পরবে ব্যবহার করিত। রেশমের অবনতি ও বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িলে কিছুকাল (প্রায় অৰ্দ্ধ শতাব্দীকাল?) এই বস্ত্রের সহিত তাহাদেব সাক্ষাৎ হয় নাই। বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব্ব পাকিস্তানে উৎকৃষ্ট রকমের কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। বলা বাহুল্য সম্প্রতি রাজশাহীর শিবগঞ্জে দেশী কারিগরেরা তাঁতে পাড় বিশিষ্ট যে সব গরদের (বা রেশমী শাড়ী প্রস্তুত করিতেছে তাহা পাকিস্তানের বাহিরে বিশেষ সমাদর পাইয়াছে। বিদেশে শিবগঞ্জের এই তাঁতের রেশমী বস্ত্রের চাহিদা অনেক গুণে বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজশাহী শহরে নব প্রতিষ্ঠিত বাষ্প-চালিত কারখানায় যান্ত্রিক তাঁতে যে সব রেশমের বস্ত্র বয়ন এবং ছাপার কাজ হইতেছে তাহা প্রাথমিক পর্যায়ে একেবারে উচ্চ স্তরের বলা না গেলেও ক্রেতাদের সংখ্যা যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।



মুসলমান শিল্পী কর্তৃক বাঙলার রেশমে প্রস্তুত বাদশাহ ও নওয়াবী আমলের পোশাক পরিচ্ছদের কয়েকটি নমুনা

৯৮. বিশ্বকোষ, ষোড়শ ভাগ, রেশম শব্দ পৃঃ–৭৫৫; Handbook of sericulture P. 280

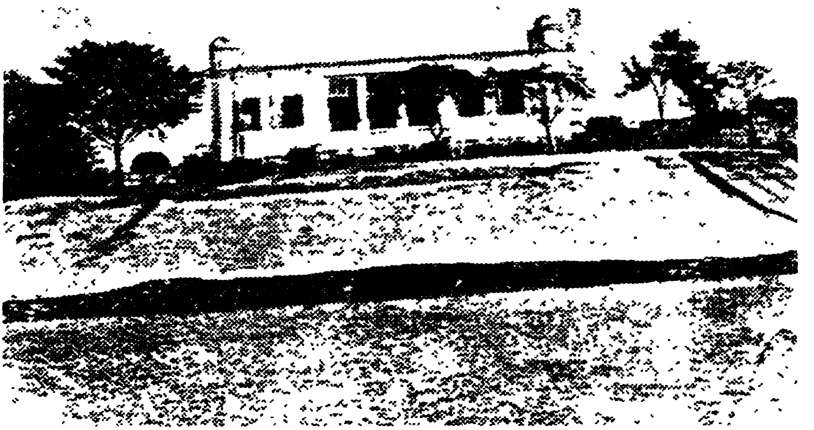
'চন্দ্রহার', 'উদয়', 'আসমানী' 'মীনা', 'চুর', 'চন্দ্রমুখী', 'লালফিতা', 'কুমকুম', 'মালতী', চাটাই', 'শাহীসাটিন, ও বুয়ালিয়া' (ইহা আধুনিক জর্জেট শাড়ীর মতই) প্রভৃতি বর্তমানে এখানকার বেশ নাম করা বস্ত্র।

বিভিন্ন রঙের বস্ত্র

ইংরেজ আমলে বাঙালাদেশে রেশমী বস্ত্রের কোন উন্নতি হয় নাই। তখন তাহারা এদেশে কেবল রেশমের সূতা প্রস্তুত করিয়া বিদেশে চালান দিত। এই সময় এদেশে এক প্রকার যান্ত্রিক তাঁতের প্রচলন হয়; উহা বিলাতী তাঁতের নয়া রূপান্তর। দেশী তাঁত হইতে এই তাঁত ভিন্ন প্রকৃতির[৯৯]।

বাঙলা দেশে খাড়ী করিয়া সকল প্রকার রেশমই রঙ করা হইত। তখন হাটে-বাজারে গাঢ় নীল বা কাল, ফিকে নীল বা ছেয়ে রঙ, লাল, গোলাপী, বাসন্তী, হলুদ, জরদ বা কমলা লেবুর রঙ, সবুজ, বেগুনী, বনেশ বা সুরুপাই, পীতাম্বরী; সোনালী, হিরামন-কণ্ঠি, ময়ুর-কণ্ঠি, ধূপছায়া ও আসমানী প্রধানত: এই ১৪ প্রকার রঙের রেশম বস্ত্র দেখা যাইত। দেশী শিল্পী বা কারিগরেরা এই সব বিবিধ রঙ এদেশের গাছ গাছড়া হইতেই যোগাড় করিত। এখনও এদেশে কিছু সংখ্যক শিল্প রঙ প্রস্তুতে পারদর্শী কারীগর পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাজশাহী, বগুড়া ও ঢাকাতে রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় বিদেশী চাকচিক্যে মুগ্ধ অনেক শিক্ষিত শিল্পীরা দেশী এই সব কারিগরদিগের খোঁজ-খবর রাখে না। অথচ ইহাদেরই পূর্বপুরুষেরা একদিন স্বীয় শিল্প চর্চ্চায় বিদেশীদের মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার দরুণ বিদেশী বণিকেরা বেশ দুই পয়সা রোজগার করিত।

মুর্শিদাবাদের বালুচরে ও রাজশাহীর শিবগঞ্জে রেশমের উপর জরির কাজ করা "রেইয়া" ও "মেখলা" নামক বস্ত্র প্রস্তুত হইত। "রেইয়া" আসামী রমণীদিগের ব্যবহারোপযোগী চাদর ও মেখলায় কমব বন্ধ হইত[১০০]।



বড় কুঠি ইমারত

৯৯. Handbook of Sericulture-এ তাঁত সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

১০০. বিশ্বকোষ. ষোড়শ ভাগ, ৭৫৫ পৃঃ ; a Survey of the Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam. by G N. Gupta P 24,

## রেশমের বহির্বাণিজ্যে বিভাগ-পূর্ব বাঙলা দেশের ভূমিকা :

পাক-ভারতে রেশম চাষের ইতিবৃত্ত এবং উহার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে আমরা আর অধিক অগ্রসর হইব না। এখন আমরা 'বুয়ালিয়া' বন্দরে বিদেশী ও দেশী বণিকদের রেশম-শিল্প ও উহার ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথা বলিবার পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত এই দেশের রেশম উৎপাদন এবং আমদানী রফতানী সম্বন্ধে তুলনা-মূলক আজিকার জনসাধারণের একটা ধারণা জন্মাইবার জন্য এই অধ্যায়ে উনবিংশ শতকের কয়েকটি হিসাবের কথা বলিয়া লইব।

তখন বিদেশে কিলোগ্রামের ওজনে রেশম কেনা বেচা চলিত। বিদেশের সহিত বাঙলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের সংযোগ রক্ষার জন্য উক্ত কিলোগ্রাম অনুসারে এদেশেও রেশম ক্রয়-বিক্রয় হইত। কিলোগ্রামের ওজন ৮২ তোলা। বাঙলা দেশেও উক্ত ৮২ তোলায় = ১ সের ওজন ধরা হইত। ফ্রান্স দেশের রেশম তত্ত্ববিদ পণ্ডিত মঁসিয়ে রেণ্ডো কর্তৃক ১৮৯৪ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রেশম ও চসমের হিসাব সংগৃহীত ও পুস্তকাকারে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার L, Industrie de-La-Soie en France নামক গ্রন্থে এতদ-বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে। প্রত্যয় যোগে কয়েকটি তালিকা প্রদত্ত হইল।[১]

| দেশ | রেশম (সের) | চসম (সের) | মোট উৎপাদন (সের) |
|---|---|---|---|
| চীন (China) | ১০.৫০০.০০০ | ৮,৫০০,০০০ | ১৯,০০০,০০০ |
| জাপান (Japan) | ৩,৯০০,০০০ | ৩,২০০,০০০ | ৭,১০০,০০০ |
| মালয়-উপদ্বীপ (Indo-china) | ৯৫০,০০০ | ৭৫০, ০০০ | ১,৭০০,০০০ |
| ভারতবর্ষ (India) | ৬২৫,০০০ | ৫৫০,০০০ | ১,১৭৫,০০০ |
| মধ্য এশিয়া (Central Asia) | ১,০৪০,০০০ | ৮৬৫,০০০ | ১,৯০৫,৬০০ |
| ইউরোপীয়-রাশিয়া (European Russia) | - | - | - |
| এশিয়াটিক-তুরস্ক (Asiatic Turkey) | ৭০০,০০০ | ৬৫০,০০০ | ১,৩৫০,০০০ |
| ইউরোপীয়-তুরস্ক (Turkey in Europe) | ১৬০,০০০ | ৫০,০০০ | ২১০,০০০ |
| বল্কান (Balkan States) | ৩০,০০০ | ১৫,০০০ | ৪৫,০০০ |
| গ্রীক (Greece) | ৩৫,০০০ | ২০,০০০ | ৫৫,০০০ |
| অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি (Austria & Hungary) | ২৬৫,০০০ | ৩২০,০০০ | ৪৮৫,০০০ |

১. Handbook of Sericulture P. 272.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ইটালী (Italy) | ৪,২০০,০০০ | ৩,৬০০,০০০ | ৭,৮০০,০০০ |
| ফ্রান্স (France) | ৭২০,০০০ | ৬০০,০০০ | ১,৩২০,০০০ |
| স্পেন ও পর্তুগাল (Spain & Portugal) | ৮০,০০০ | ৫০,০০০ | ১৩০,০০০ |
| সুইজারল্যাণ্ড (Switzerland) | ৩০,০০০ | ৫০,০০০ | ৮০,০০০ |
| জার্ম্মানী (Germany) | - | ৫,০০০ | ৫,০০০ |
| গ্রেট ব্রিটেন (Great Britain) | - | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ |
| মরক্কো (Morocco) | ৫,০০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০ |
| ইউনাইটেড ষ্টেটস ও কানাডা (United States & Canada) | ৫,০০০ | ৫০,০০০ | ৫৫,০০০ |
| মেক্সিকো (Mexico) | ১,০০০ | - | ১,০০০ |
| মোট– | ২৩,২৪৬.০০০ | ১৯,২১০,০০০ | ৪২,৪৫৬,০০০ |

এই সময়ে কোন্ দেশে কি পরিমাণ দেশী ও বিদেশী রেশমের ব্যবহার হইত নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

| দেশ | দেশীয় রেশম (সের) | বিদেশীয় (সের) | মোট রেশমের ব্যবহারের পরিমাণ (সের) |
|---|---|---|---|
| চীন | ৫,৭৫০,০০০ | - | ৫,৭৫০,০০০ |
| জাপান | ১,১৫০,০০০ | ১০,০০০ | ১.১৬০.০০ |
| মালয়-উপদ্বীপ | ১,০০০,০০০ | ১৭৫,০০০ | ১.১৭৫,০০০ |
| ভারতবর্ষ | ৪৭৫,০০০ | ৬২৫,০০০ | ১,১০০,০০০ |
| মধ্য এশিয়া | ৮৫০,০০০ | - | ৮৫০,০০০ |
| ইউরোপীয়-রুশিয়া | - | ৪৫০,০০০ | ৪৫০,০০০ |
| লেভাণ্ট | ১১৫,০০০ | ৪০০,০০০ | ৪১৫,০০০ |
| অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গেরী | ১০০,০০০ | ৩৬০,০০০ | ৪৬০,০০০ |
| ইটালী | ১৫০,০০০ | ২৫০,০০০ | ৪০০,০০০ |
| ফ্রান্স | ৬৫০,০০০ | ২,৯৫০,০০০ | ৩,৬০০,০০০ |
| স্পেন ও পর্ত্তুগাল | ৪০,০০০ | ১২০,০০০ | ১৬০,০০০ |
| সুইজারল্যাণ্ড | - | ১,৪০০,০০০ | ১,৪০০,০০০ |
| জার্ম্মাণী | - | ১,৯০০,০০০ | ১,৯০০,০০০ |
| গ্রেট ব্রিটেন | - | ৯০০,০০০ | ৯০০,০০০ |
| ইউনাইটেড ষ্টেটস ও কানাডা | - | ২,৬৫০,০০০ | ২,৬৫০,০০০ |
| মেক্সিকো | - | ১০,০০০ | ১০,০০০ |
| অন্যান্য দেশ | - | ২৫০,০০০ | ২৫০,০০০ |
| মোট- | ১০,২৮০,০০০ | ১২,৪৫০,০০০ | ২২,৭৩০,০০০ |

এই যুগে এদেশের কার্পাস বস্ত্রের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে রেশমেরও অবনতি ঘটিয়াছিল বটে। কিন্তু এই শিল্প এদেশ হইতে একেবারে তিরোহিত হয় নাই। তখন জার্ম্মান, ইংল্যাণ্ড, ইউনাইটেড্ ষ্টেটস, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বহুল পরিমাণে রেশম বস্ত্র প্রস্তুত হইত। কিন্তু সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে রেশম কোষ উৎপাদন হইত না।[২] ভারত ও অন্যান্য দেশ হইতে রেশম রপ্তানী হইত।

উনবিংশ শতকে বেশমের ব্যবহার অনুপাতে বপ্তানীব হিসাব

তখন পাক-ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের বাজার খুবই চঞ্চল ছিল। বিদেশীর উপর সব সময় নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত। নানা কারণে এদেশের পণ্য দ্রব্যের বাজারে অবনতি ঘটিয়াছিল। উপাদান, উৎপাদন, শিল্প- নৈপুণ্য ও শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যাপক প্রচলন; এই তিনটি বিষয় সমভাবে বর্তমান না থাকিলে শিল্প-বাণিজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় না। বলা বাহুল্য প্রাচীনকাল হইতে অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত পাক-ভারতে রেশম বস্ত্রের উক্ত তিনটি অবস্থা প্রায় একইরূপ ছিল। উনবিংশ শতক হইতে বিলাতী কার্পাস বস্ত্রের ব্যাপক প্রচলন হওয়ায় এ দেশের রেশমী বস্ত্রের ব্যবহার হ্রাস পাইয়া যায়। দেশী বস্ত্রের পরিবর্তে এই সময় এদেশে বিলাতী বস্ত্র অধিক মূল্যে বিক্রয় হইত। অথচ বিদেশীরা এই দেশেরই কাঁচা মাল ভাঙ্গিয়া দ্বিগুণ, চতুর্গুণ মুনাফা করিত। তবে সুখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী দেশপ্রেমিকগণ বিদেশী বস্ত্র স্পর্শ করিত না। আজও করে না। বাঙ্গালীদের মধ্যে দেশপ্রেমিকতার ইহাও এক জলন্ত নজিব তখনও ছিল; এখনও আছে। দেশী সম্পদ ব্যবহার করিতে তাহারা গৌবব বোধ করিত ও করে।

স্বদেশী যুগে দেশী বস্ত্রের ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা গ্রামে গ্রামে দেশী তাঁতের প্রচাব ও তাঁতের সংখ্যা বহু গুণে বাড়াইয়াছিল। বহু সংখ্যক ছাত্র ও যুবকেরা শ্রীবামপুর টেকষ্টাইল বিদ্যালয়ে বুনানী কার্য্যের ট্রেনিং লইয়া কো-অপারেটিভ প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁত শিল্পের প্রভূত উন্নতি করিয়াছিল। বাঙ্লার কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র বয়ন বিবরণে উহার উল্লেখ আছে[৩]।

এই সময়ে পাক-ভারতে রেশম উৎপাদনের প্রায় অর্দ্ধাংশ বঙ্গ-আসামে উৎপন্ন হইত।[৪] প্রত্যয় যোগে দেখা গিয়াছে, তখন রাজশাহী, বগুড়া, মালদহ, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে সমগ্র বঙ্গ-আসামের চারভাগের তিন ভাগ রেশম উৎপন্ন হইত। বর্তমানে বগুড়া, রাজশাহী ও মালদহের রেশম অঞ্চল পূর্ব্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত।

ভারতেব মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুগণ স্নানান্তে গরদ ও মটকার কাপড় ব্যবহার করিত। তখন বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যেও ইহার ব্যাপক প্রচলন ছিল। সুতরাং এদেশের রেশমের বাণিজ্যের অবনতি ঘটিলেও উহা একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবার মত কোন অবস্থা ঘটে নাই। যুগে যুগে এই দেশে রেশম উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিয়াছিল। উনবিংশ শতকের শেষ অধ্যায় ও বিংশ শতকের প্রথম অধ্যায়েও এই শিল্পের বহির্বাণিজ্যে বহু টাকা বাঙ্লার ধনভাণ্ডারে আসিত। তখন দেশী তাঁতের কি পরিমাণ মটকার কাপড়

২ রেশম বিজ্ঞান ; পৃঃ ২৬২–২৬৪।

৩. A Sn vey of the Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam, P 21-23.

৪. Handbook of Sericulture P 280

বিদেশে চালান যাইত নমুনা স্বরূপ তাহার একটি হিসাব প্রদত্ত হইল–

| সাল | সের | মূল্য |
|---|---|---|
| ১৮৬৭–৬৮ | ১,১১৩,০০০ | এক কোটি পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক |
| ১৮৮৭-৮৮ | ৮১৩,০০০ | আট চল্লিশ লক্ষ টাকা |
| ১৮৯৩-৯৪ | ৯২০,০০০ | একষট্টি লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা |

পরবর্তীকালে রেশম অপেক্ষা পাট, চা, চাউল ও তৈলবীজ প্রভৃতি রপ্তানী দ্বারা পাক-ভারতে অনেক অর্থ আসিত। তখন রেশমের বহির্বাণিজ্য পূর্বাপেক্ষা অনেক হীন হইয়া পড়িয়াছিল। তৎপূর্বে কেবল দেড় কোটি টাকার বানকী রেশম রপ্তানী হইত। আলোচ্য সময়ে গড়ে চল্লিশ লক্ষ টাকার বানকী রেশম প্রতি বৎসর রপ্তানী হইয়া থাকিত। ১৮৬০ সালের পূর্বে চসম বা রেশমের ছাঁট একেবারে ছিল না। উক্ত সাল হইতে চসম বা ছাঁট রপ্তানী ক্রমশ: কি ভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল তাহা অনুধাবনের জন্য দশ বৎসরের একটি হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

| ইং সাল | রেশম (সের) | চসম (সের) | কোয়া (সের) | মোটমূল্য টাকা– |
|---|---|---|---|---|
| ১৮৮৩-৮৪ | ৩১৮,০০০ | ৪৪৩,০০০ | ২২,০০০ | ৬২,৭৫,০০০ |
| ১৮৮৪-৮৫ | ২৬৫,০০০ | ৪৭৬,০০০ | ৬৪,০০০ | ৪৬,৩৮,০০০ |
| ১৮৮৫-৮৬ | ১৭৯,০০০ | ৫১২,০০০ | ২৮,০০০ | ৩৩,২২,০০০ |
| ১৮৮৬-৮৭ | ২২৪,০০০ | ৫১০,০০০ | ৫৭,০০০ | ৪৮,৪৩,০০০ |
| ১৮৮৭-৮৮ | ২২৬,০০০ | ৪৯৯,০০০ | ৮৬,০০০ | ৪৮,০৮,০০০ |
| ১৮৮৮-৮৯ | ২১৬,০০০ | ৬৫৭,০০০ | ১৮৭,০০০ | ৫১,৮৭,০০০ |
| ১৮৮৯-৯০ | ২৯৬,০০০ | ৬১৬,০০০ | ১৩১,০০০ | ৬৩,৯৮,০০০ |
| ১৮৯০-৯১ | ২৫১,০০০ | ৫৫৬,০০০ | ৭৩,০০০ | ৫২,১০,০০০ |
| ১৮৯১-৯২ | ২৫৯,০০০ | ৫০৬,০০০ | ৬৫,০০০ | ৫১,৮৬,০০০ |
| ১৮৯২-৯৩ | ৩২৭,০০০ | ৫৪৩,০০০ | ৩৮,০০০ | ৬১,৭৫,০০০ |

অতঃপর ছাঁট বা চসম রপ্তানী হইবার পর তসর, মুগা, এণ্ডি ও রেশমের কোয়াও এদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানী হইত। উল্লিখিত তালিকাতে যে কোয়া রপ্তানীর বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অধিকাংশ এণ্ডি, মুগা ও লাট-তসর কোয়া। এই লাট রেশম কোয়ার অধিকাংশই বঙ্গদেশে মটকার কাপড় প্রস্তুত হইয়া ব্যবহার হইত। তসর প্রথমে ভারতবর্ষ হইতেই বিলাতে রপ্তানী হইত। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ অপেক্ষা চীন দেশ হইতে অধিক পরিমানে তসর রপ্তানী হইয়াছে। ১৮৮৬-৮৭ সাল হইতে ১৮৯২-৯৩ সাল পর্য্যন্ত এই সাত বৎসরে পাক-ভারত হইতে যে সমস্ত রেশমের ছাঁট বিদেশে চালান যাইত নিম্নে তাহার একটি হিসাব প্রদত্ত হইল :–

| ইং সাল | সের |
|---|---|
| ১৮৮৬-৮৭ | ২২১,০০০ |
| ১৮৮৭-৮৮ | ২৩৯,০০০ |
| ১৮৮৮-৮৯ | ৩০৯,০০০ |
| ১৮৮৯-৯০ | ৩২৮,০০০ |
| ১৮৯০-৯১ | ১৮৭,০০০ |
| ১৮৯১-৯২ | ১১৯,০০০ |
| ১৮৯২-৯৩ | ১২০,০০০ |

পাক-ভারতের উৎপন্ন উৎকৃষ্ট রেশম বস্ত্র এদেশেই ব্যবহৃত হইত। কোয়া প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতীয় রেশমী বস্ত্র বিদেশে চালান যাইত। ১৮৮১-৮২ সালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ২২ লক্ষ টাকার রেশমী বস্ত্র রপ্তানী হয়। ১৮৮৮-৮৯ সালে, ২,৮৮,৪,০০০ টাকার; ১৮৯০-৯১ সালে ২,০০০,০০০ টাকার; ১৮৯১-৯২ সালে ১,৮০০,০০০ টাকার; ১৮৯২-৯৩ সালে ১,১৭১,০০০ টাকার এবং ১৮৯৩-৯৪ সালে ১,৬৬৫,৫১৪ টাকার রেশম বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছে। মোট কথা ইউরোপে ভারতবর্ষের রেশমী বস্ত্রের রপ্তানী ১৫–২০ বৎসর ধরিয়া কিছু বাড়িয়া গিয়াছিল। তখন অন্যান্য দেশের রেশম বস্ত্রের রপ্তানী ভারতবর্ষ অপেক্ষা কিছু কমিয়া গিয়াছিল।

পাক ভারতে বস্ত্র বিদেশের বাজারে

ইংরেজী ১৮৯৩ সালে মোট ১,৬৬৪,৫১৪ টাকার রেশমী বস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে অন্য দেশে রপ্তানী হইয়াছে। তন্মধ্যে ইংল্যাণ্ডে ১,০১০,৯০১ এবং ফ্রান্সে ২৮৭,৮১৪ টাকার ভারতীয় বস্ত্র বিক্রয় হইয়াছে। এই সমস্ত বস্ত্র অধিকাংশই বাঙ্লা দেশ হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। যেহেতু তখন বঙ্গ ও আসাম ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে রপ্তানী করিবার মত উপযুক্ত রেশম উৎপাদন হইত না।[৫] তখন 'কলিকাতা' 'বঙ্গ-আসামের একমাত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র। সেখানকার প্রসিদ্ধ 'মেসার্স লয়াল মার্শাল এণ্ড কোম্পানী'; 'মেসার্স ওয়ালটার বেয়ার্ড এণ্ড কোম্পানী'; 'মেসার্স আনিবার্ণ এণ্ড কোম্পানী'; 'মেসার্স বামার লরী এণ্ড কোম্পানী'; 'মেসার্স ব্ল্যাকউড এণ্ড কোম্পানী'; 'মেসার্স রাস্কিন এণ্ড কোম্পানী'; 'মেসার্স এ, আসমান এণ্ড কোম্পানী'; 'মেসার্স বি, এল, সেন এণ্ড কোম্পানী'[৬] প্রভৃতি এবং বুয়ালিয়াতে অবস্থিত বিখ্যাত 'রবার্ট' ওয়াট্শন এণ্ড কোম্পানী': 'মেসার্স এণ্ডারেন্স রাইট এণ্ড কোম্পানী': 'মেসার্স লুই পেইন এণ্ড কোম্পানী'; 'বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানী':[৭] 'মেসার্স জর্জ হেণ্ডার সন্স এণ্ড কোম্পানী'; 'মেসার্স জে, হড্শন এণ্ড কোম্পানী' প্রভৃতি কোম্পানীর মাধ্যমে এতদঞ্চলের রেশমী বস্ত্র ও রেশম বিদেশে চালান যাইত।[৮]

ইউরোপীয় বণিকদলের আগমনের পূর্বে বাঙ্লা দেশে গ্রামকেন্দ্রিক বাজার-বন্দরে দেশীয় উৎপন্নজাত দ্রব্য কেনা- বেচা চলিত। ষোড়শ শতক হইতে অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদ পর্য্যন্ত

রামপুর বুয়ালিয়া বন্দরে ইউরোপবাসীর বাণিজ্য

৫. Handbook of Sericulture P. 281

৬. Handbook of Sericulture P 281

৭ The Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam. P. 30

৮ Monograph on the Silk Fabrics of Bengal , P 31 'রেশম তত্ত্ব' কৃত, রমানাথ সেন।

রাজশাহীর বর্তমান ভূমিভাগে বাঘা, প্রেমতলী, নাটোর, তাহিরপুর এ জেলার প্রসিদ্ধ বাজার বন্দর ছিল। মান্দা, আত্রাই ঘাট ও নওগাঁ ঊনবিংশ শতকের কীর্তি। বাঘা, প্রেমতলী তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। মেলা উপলক্ষে এই সব স্থানে মাসাধিককাল ধরিয়া দেশীয় বাজারজাত দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় হইত[৯]। কাঁচা মাল আমদানী রপ্তানীর জন্য তাহিরপুর, নাটোরের তেবাড়িয়া, আত্রাই ও নওগাঁ বর্তমান শতকের প্রথমের দিকেও প্রসিদ্ধ ছিল। বিশেষ করিয়া পাটের জন্য আত্রাই, গাঁজার জন্য নওগাঁ, রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের জন্য নাটোর ও তাহিরপুর; পরবর্তীকালে মীরগঞ্জ ও চারঘাট বিখ্যাত ছিল[১০]। অষ্টাদশ হইতে ঊনবিংশ শতক পর্য্যন্ত বাঙলা দেশের রেশম, নীল ও কার্পাস শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। বিশেষত: অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে ঊনবিংশ শতক পর্য্যন্ত এই দেড় শত বৎসর ধরিয়া রেশম ও নীল প্রভৃতি ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য 'রামপুর-বুয়ালিয়া' বঙ্গদেশে দ্বিতীয় বন্দররূপে আন্তর্জাতিক (International) মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কাঁচা রেশম ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যাদি এখান হইতে চালান যাইত। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপে পশম শিল্পের পরিবর্তে কার্পাস শিল্পের ব্যাপক প্রচলন ও চাহিদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার ফলে এদেশেও রেশম ও কার্পাস শিল্পের উন্নতি ও বিপ্লব ঘটিয়াছিল। এই সময় বুয়ালিয়া বন্দরে রাজশাহী জেলা তথা উত্তর বঙ্গের নানা স্থান হইতে রেশম ও নীল আমদানী হইত এবং এতদসহ অন্যান্য কৃষিজাত খাদ্য; চাউল, পাট, গাঁজা এখানে আসিয়া জমা হইত। তারপর এই 'বুয়ালিয়া' বন্দরে বিদেশী বাণিজ্য-তরি বোঝাই হইয়া দেশদেশান্তরে চলিয়া যাইত। তাহার বিনিময়ে বিদেশ হইতে কার্পাস বস্ত্র (Cotton girrls?), চিনি, ঘৃত, কাষ্টগুঁড়ি (Timber) লবণ, কেরোসিন তৈল, মশলাপাতি, নানাপ্রকার শস্য (Grain of Various sorts) প্রভৃতি এখানে আমদানী হইত। অষ্টাদশ শতক হইতে ঊনবিংশ শতক পর্য্যন্ত বিশেষ করিয়া রেশমের সূতা প্রস্তুতের জন্য 'বুয়ালিয়া' উত্তর বঙ্গের একমাত্র বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল[১১]। এখানে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া তুঁতের চাষ হইত। তাহা অন্যান্য স্থান অপেক্ষা লাভজনক ছিল; সেই জন্যই এতদঞ্চলের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য-বন্দর রূপে রামপুর-বুয়ালিয়াতে ওলন্দাজগণের গুরুত্বপূর্ণ কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল। এবং সেই কুঠিতেই পরবর্তীকালে ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইংরেজগণ এখান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে রেশম বিশ্বের বিভিন্ন বাজারে চালান করিয়া রাশি রাশি টাকা মুনাফা করিত। মিঃ হলওয়ের (ইং) ১৭৫৯ সালে লিখিত একটি বিবরণী (Report) হইতে জানা যায়, "কেবলমাত্র নাটোর হইতে ৬ প্রকারের বস্ত্র ও কাঁচা রেশম ইউরোপ এবং বসরা, মক্কা, জেদ্দা, পেগু, আচেন (Acheen) ও মালাক্কার (Malacca) বাজারে রপ্তানী হইত[১২]। বলা বাহুল্য, তখন বিশ্বের বাজারে রাজশাহীর রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের কতখানি সমাদর ও চাহিদা ছিল তাহা উক্ত বিবরণী হইতে সহজেই অনুমিত হয়।

৯. Statistical Account of Rajshahi district, P 88

১০. গ্রন্থকারের রাজশাহীর ইতিহাসে দ্বিতীয় খণ্ডে এ জেলার প্রাচীন বাজার-বন্দর দ্রষ্টব্য।

১১ Imperial gazetteer of India, Provincial Series, P 198 , the fifth Report, Vol. 1, P. 259

১২. Mr Holwel, writing in 1753, mentions six kinds of cloths and raw silk as being exported from Natore both to Europe and the Markets of Basra, Mecca, Jedda, Pegu, Acheen and Malacca. (Rajshahi gazetteer, p, 107.)

তখন উত্তর বঙ্গের প্রায় গ্রামে সূতা কাটার কারখানা ছিল ও দেশী তাঁতে বস্ত্র বয়ন হইত। বুয়ালিয়ার কুঠিয়াল সাহেবেরা এইসব কারখানা হইতে তাহাদের চাহিদা মত মালামাল পাইকার দ্বারা খরিদ করিয়া লইত। ইউরোপে ও বিশ্বের অন্যান্য বাজারে, এখানকার রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের যেমন চাহিদা ছিল তেমনই মুনাফাও হইত প্রচুর।

বিদেশী বণিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ওলন্দাজগণ বুয়ালিয়াতে কুঠি স্থাপন করিয়া রেশম ও অন্যান্য ব্যবসায়ে যোগদান করিয়াছিল[১৩]। তাহা একটু আগেই উল্লেখ করিয়াছি। তারপর 'ফরাসী ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' কারবারও ছিল। ইং ১৭৮৪ সালের জনৈক মিঃ কলিশনের এক বিবরণী হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "ফরাসী ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বুয়ালিয়াতে একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছিল বটে কিন্তু তাহা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। তিনি বলিয়াছেন "৯ বৎসর পূর্বে তাহারা রামপুরের নিকট একটী ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া স্থানীয় (Native) গোমস্তার পরিচালনাধীনে কেবল মাত্র দেশীয় রেশমের সূতা প্রস্তুতের কারবার করিত; ব্যবসার মধ্যে ইহাই ছিল তাহাদের প্রধান ব্যবসা। স্থায়ী কোন ফ্যাক্টরী তাহাদের ছিল না[১৪]। এই বিবরণীকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে ওলন্দাজগণের পরেই বুয়ালিয়াতে ফরাসীদের আগমন হইয়াছিল এবং পরবর্তীকালের তথ্যাদিতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকের প্রথম দশকেও এখানে ফরাসীদের বিরাট কুঠি স্থাপিত হইয়া রেশম এবং নীলের কারবার চলিয়াছিল।

যাহা হউক, ওলন্দাজ ও ফরাসীদের পরে পরেই 'রামপুর-বুয়ালিয়াতে' ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তার ও কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ইংরেজগণ অপ্রতিহত প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছিল। ওলন্দাজগণ ইংরেজদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া কুঠি ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ফরাসীরা ইংরেজদের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইয়াছিল। অতঃপর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া- কোম্পানীর ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ বুয়ালিয়া বন্দর ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীরাও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এই স্থান ত্যাগ করিয়াছে।

ইংরেজগণ বুয়ালিয়াতে কতকগুলি আবাসিক কুঠি স্থাপন করিয়া এতদঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়াছিল। তাহার বহু প্রমাণ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে[১৫]। ইং ১৭৮৭ সালে বুয়ালিয়ার এক আবাসিক কুঠি হইতে কাশিম বাজারে কেবলমাত্র রেশমের জন্য ৭৫০০০ হাজার টাকা অগ্রিম বরাদ্দ হইয়াছিল[১৬]। এই সব আবাসিক বাণিজ্য

**আবাসিক কুঠি**

কুঠিতে ব্যবসায় সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ থাকিত। প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্ব এক একজন দেওয়ান বা ম্যানেজারের উপর ন্যস্ত থাকিত এবং উর্দ্ধতন কুঠি পরিচালকের (Director) নির্দ্দেশ মানিয়া ও নির্দ্ধারিত মূল্যে তাহারা রেশম ও নীল কেনাকাটা করিত। ভারপ্রাপ্ত প্রত্যেক কুঠিয়াল সাহেবের অধীনে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রেশম সূতা প্রস্তুতকারী শ্রমিক বা কারিগর থাকিত। তাহাদের

১৩. Hunter's statistical account of the Rajshahi district p, 53.

১৪. Towards the end of the Eighteenth Century the Franch also set-up a small ... . . ... by the Franch East India Company .. ... ... ... (Rajshahi gazetteer. pp. 179-180)

১৫. . .. . It was for man the Head quaters ... ... ... . of an En ... ... ... ..

১৬. In 1787 the commercial Resident was given an advance of Rs. 75000 ... ... ... . to Cassimbazar for Silk (Rajshahi gazetteer p. 180)

মধ্যে কতক কোম্পানীর বেতন ভুক্ত, আর কতক ঠিকা চুক্তিতে কার্য্য করিত। কুঠির আইন অনুসারে পাইকার অথবা মধ্যস্থ (ফড়িয়া) ব্যক্তির মাধ্যমে টাকা পয়সা আদান-প্রদান এবং পলু ক্রয় ও তুঁতের চাষ করান হইত। এই মধ্যস্থ ব্যক্তি পলু পোকা পালনকারী ও তুঁত চাষীদের সহিত অগ্রিম দাদন দিয়া সূতা প্রস্তুত ও রেশমের গুটি ক্রয় ব্যাপারে বন্দোবস্ত করিত। তারপর বন্দোবস্তের সর্ত অনুসারে ওজন দরে পলু ও সূতা উৎপন্নের পরিমাণ অনুযায়ী সূতা সংগ্রহ করিত। এতদব্যতীত তুঁত চাষী ও পলু পালনকারীগণও নিজেদের ব্যয়ে পলু পালন করিয়া রেশমের সূতা প্রস্তুত করিত। পলু পোকা পালনের মৌসুমে যাহারা সর্ত সাপেক্ষে দাদন লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করিতে না পারিত; তাহাদিগকে আদালতের আইনের আওতায় পড়িতে হইত। বিদেশী কোম্পানীর কারখানাতে রেশমের সূতা প্রস্তুত করিয়া উহার কাঁচা অবস্থায় বিদেশে চালান দেওয়া হইত[১৭]। বস্ত্র বয়ন বা অন্য কোন প্রকারের বুনানীর কাজ এখানে হইত না।

ইং ১৮৩৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজশাহীর কারখানা মেসার্স রবার্ট ওয়াট্‌শন এণ্ড কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। মেসার্স ওয়াট্‌শন কোম্পানীর পরিচালনায় এখানকার রেশম ব্যবসায় যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল এবং উৎকৃষ্ট রকমের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রেশম উৎপাদন হইত। ইহার অধিকাংশ ইউরোপে চালান যাইত। মেসার্স ওয়াট্‌শন কোম্পানীর কারখানা ও কুঠি ব্যতীত এখানে আরও কতকগুলি সূতা প্রস্তুতের দেশী বিদেশী কারখানা ও কুঠি 'রামপুর-বুয়ালিয়া' তথা উত্তর বঙ্গের (ইংরেজ আমলের রাজশাহী বিভাগের) বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ছিল। এই সব কারখানায় উৎপন্ন রেশম 'বুয়ালিয়ার' বড় বড় কুঠিয়াল কোম্পানীর মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানী হইত। ইং ১৮৭১ সালের রাজশাহীর কালেক্টরের এক বিবরণ (Report) হইতে জানা যায়, মেসার্স ওয়াটশন কোম্পানীর কারখানায় ৮,০০০ হাজার হইতে ৯,০০০ হাজার লোক দৈনিক কাঁচা রেশমের কাজ করিত এবং প্রতি বৎসরে ১৬ হইতে ১৭ লক্ষ টাকা মূলধন খাটিত; ইউরোপীয় ও দেশী কারখানাগুলিতে মোট ৪,০০০ পাউণ্ড অথবা ১৮০ টন কাঁচা রেশম উৎপাদিত হইত। প্রতি বৎসরে গড়ে উহার মূল্য দাঁড়াইত ৩৭ লক্ষ টাকা। মেসার্স ওয়াটশন কোম্পানীর কারখানায় উৎপাদিত রেশমের পরিমাণ ছিল ২০০০ মণ এবং ইহা ব্যতীত ফরাসী ও অন্যান্য দেশী বিদেশী কোম্পানীর কারখানা তো ছিলই।[১৮]

রামপুর-বুয়ালিয়াস্থিত ছোট ছোট দেশী কোম্পানী গঠন করিয়া যাহারা ইউরোপীয় কোম্পানীর[১৯] মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত নিম্নে তাহাদের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

১৭. Silk was not manufactured at the Company's establishment but after being reded off at the filatures was imported in its raw state .
Hunters statistical account of Rajshahi, P 83 ; Rajshahi Gazetteer P 108

১৮. In 1871 the Collector reported that in Messers Watson and Company's factories employment was given from 8,000 to 9.000 persons ...
(Hunter's statistical account of Rajshahi and Bogura 83.)

১৯. Handbook of Sericulture P. 281, আগের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য;
Monograph on the Silk Fibrics of Bengal p. 31 and also See-রেশম তন্ত্র, by রমানাথ সেন।

| নাম | দেশ | মন্তব্য |
|---|---|---|
| খাঁ সাহেব | ভারতের ইউ, পি | সাগরপাড়া ও রেশম পট্টিতে কুঠি ছিল। |
| গদু বাবু | ঐ | রেশম পট্টিতে কুঠি ছিল। |
| জয়রাম সিংহ ও রামরতন সিংহ ভারতী | বিহার | ইহারা বৈষ্ণব ভক্ত বাউল সন্ন্যাসীরূপে এখানে আগমন করিয়া মঠস্থাপন করতঃ ধর্ম প্রচার করিত। পরে রেশম ও লগ্নী ব্যবসায় যোগদান করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করে এবং তাহারা শেষে জমিদারী পর্যন্ত ক্রয় করিয়াছিল।[২০] |
| দুলাল সা | বর্গীর হাঙ্গামার সময় মুর্শিদাবাদ হইতে আগত | সপুরাতে ইহাদের কুঠি ছিল। সপুরার মঠ ও দিঘী ইহাদের পূণ্য কীর্তি। |
| রাম রতন, মদন গোপাল | ভারতের যোধপুর | মাড়োয়ারী পট্টিতে ইহাদের কুঠি ও আড়ত ছিল। |
| নগেন দাস, ফুলচাঁদ (চিনাই) | ভাবতেব আহমদাবাদ | রেশম পট্টিতে ইহাদের কুঠি ও মন্দির স্থাপিত ছিল। |
| লাল বিহারী বাবু | বর্গীয় হাঙ্গামার সময় ইহারা মুর্শিদাবাদ হইতে আগত। | সিরইলে ইহাদের কুঠি ছিল। |
| খেতু বাবু | ঐ | আলুপট্টিতে ইহাদের কুঠি ছিল। |
| কার্ত্তিক সা | ঐ | সপুরাতে ইহাদের কুঠি ও আড়ত ছিল |
| কোকারাম মণ্ডল | ঐ | বায়ার নিকট ইহাদের কুঠি, আড়ত ও লগ্নী ব্যবসা ছিল। |
| শ্রীঅনাথবন্ধু মণ্ডল (জীবিত) | রাজশাহীব অধিবাসী | মির্জ্জাপুরে ইহাদের কুঠি ও কারখানা ছিল। |
| এনায়েত মণ্ডল | ঐ | বেলঘরিয়াতে ইহাদের কুঠি ও কারখানা ছিল। |
| নবীরুদ্দীন | রাজশাহীব অধিবাসী | সাংসাদীপুরে ইহাদের কুঠি ও কারখানা ছিল। |
| হরেকৃষ্ণ সরকার | ঐ | খোজাপুরে ইহাদের কুঠি ও কাবখানা ছিল। |
| নুরুদ্দীন মিঞা | ঐ | বশরীতে ইহাদের কুঠি ও কারখানা ছিল। (আদি বশরী পদ্মা গর্ভে নিমজ্জিত) |
| * সাহাবাজ তালুকদার | ঐ | কাপাশিয়াতে ইহাদের কুঠি ও আড়ত ছিল। |
| * হাজী নফরুদ্দীন মণ্ডল | ঐ | মহানন্দাখালিতে ইহাদের কুঠি ও আড়ত ছিল। |
| * মিঞাজান দালাল | ঐ | রেশমপট্টিতে ইহাদের আড়ত ছিল। |
| * হাজী মনিরুদ্দীন | ঐ | সপুরাতে ইহাদের আড়ত ছিল। |

২০. অত্র ইতিহাসের ইংরেজ আমলে গোঁসাই কুঠি প্রসঙ্গে ইহাদের পরিচয় দ্রষ্টব্য।
২১. তারকা চিহ্নিত ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র আড়তদারী ও দালালী ব্যবসা করিত।

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে রেশম শিল্পের বাজারে অবনতি ঘটিলে বহু চাষী তুঁত চাষ বন্ধ করিয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করে। ফলে উৎপাদন শক্তি হ্রাস পাইয়া এক তৃতীয়াংশে নামিয়া আসে। ইং ১৮৭১ সালে বাঙলা দেশে মাত্র ১৫৫,০০০ পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হয়। ইহার কয়েক বৎসর পর ওয়াটশন কোম্পানীর[২২] সমস্ত কারবার বন্ধ হইয়া যায়। তখন বাঙলা দেশে 'মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী' নামে আর একটি জমিদারী কোম্পানীর আবির্ভাব হয়। এই সময় রাজশাহী তথা উত্তর বঙ্গের ওয়াটশন কোম্পানীর রেশম ও নীল চাষের সমস্ত কুঠি ও কারখানা উক্ত মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর অধিকার ভুক্ত হয়। জমিদারীতে বিস্তর মুনাফা দেখিয়া তখন এই কোম্পানী প্রধানত: জমিদারীর প্রতি মনোযোগী হইয়া পড়ে। ফলে নীলের চাষ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে। অবশেষে যখন নীল চাষ বন্ধ হইয়া যায়, তখন উক্ত কোম্পানীর নীল চাষের পতিত ভূমিতে অন্য কোন প্রকারের ফসল ফলান সম্ভব নয় হেতু ঐ সমস্ত ভূমি তুঁত চাষের উপযোগী মনে করিয়া তুঁতের চাষ আরম্ভ করা হয়। অতঃপর রামপুর-বুয়ালিয়ার কুঠি ও কারখানা মেদিনীপুর জমিদারী কর্তৃক পুন: সংস্কার হয়। তখন এই কোম্পানী 'মেসার্স লুই পেইন এণ্ড কোম্পানী' এক যোগে রাজশাহী, মালদহ ও অন্যান্য স্থানে আরও কয়েকটি কারখানা ও কুঠি স্থাপন করিয়া ওয়াটশন কোম্পানীর ভগ্নস্তুপে নয়া উদ্যমের দ্বীপ শিখা জ্বালাইয়া কারবার করিতে থাকে। এদিকে রেশমের বাজারে ক্রমশ: অবনতি দেখিয়া বাঙলা সরকার ও সেরিকালচারের (Sericulture) উন্নতির জন্য শেষ চেষ্টা করিতে থাকে। এইভাবে সরকার ও কোম্পানী যৌথ চেষ্টা

মেদেনীপুর জমিদারী কোম্পানীর আবির্ভাব ও ওয়াটশন কোম্পানীর পতন

২২. বাঙলা দেশে রবার্ট ওয়াটশন কোম্পানীর ১৫২টি কুঠি ও কারখানা ছিল বলিয়া জানা যায়। উত্তর বঙ্গের বড় বড় নদীর তীরে এই কোম্পানীর বেশীর ভাগ কুঠি ও কারখানা স্থাপিত হয়। অধিকাংশ কুঠি ও কারখান তে রেশম ও নীলের কারবার হইত। রাজশাহী জেলার বুয়ালিয়া, মতিহার, বিনোদপুর পানানগর, সিরইল, সরদা, বিড়ালদহ, নন্দনপুর, বিলমাবিয়া, মুলাডুলী, খরচাকা, দুর্গাপুর, বাঘমারা, আচিনঘাট, সুরস্যা প্রভৃতি স্থানে চাষ ও কুঠি ছিল। এই সব স্থানে এখনও কুঠির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে।

বুয়ালিয়ার বড় কুঠির ঠিকুজী।

ওলন্দাজ কর্তৃক বুয়ালিয়াতে কুঠি স্থাপিত হইলে পর্যায়ক্রমে চার (৪টি) কোম্পানীর হাত বদল হইয়া ইহা বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ার ভুক্ত হইয়াছে।

ওলন্দাজ
|
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী
|
রবার্ট ওয়াটশন কোম্পানী
|
মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী
|
বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানী

অতঃপর পাকিস্তান যুগে এই কুঠি বিভাগীয় খাদ্য দপ্তরের অধীনে চলিয়া যায়: ইং ১৯৫৫ সাল হইতে ইহা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আসিলে আবাসিক কুঠি রূপে এই সুদৃশ্য ইমারতটীর প্রাচীন সৌন্দর্য্য অনেকাংশে বিনষ্ট হইয়াছে।

করিয়াও যখন ইহার কোন উন্নতি করা সম্ভবপর হইল না তখন উত্তম বীজ পালন ও সেরিকালচারের উন্নতির জন্য বাঙলা সরকার কৃষি বিভাগের সহকারী পরিচালক (Asstt. Director) বাবু এন, জি, মুখার্জ্জিকে ইং ১৮৮৮ সালে বিশেষ ট্রেনিং লইবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স ও ইটালীতে প্রেরণ করে।[২৩] তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাঙলার রেশমের উন্নতির জন্য খাঁটি বীজ উৎপাদন নিমিত্তে কয়েকটি জেলাতে বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেন। তদনুযায়ী রাজশাহীতে একটি বিদ্যালয়* ও দুইটি গুটি পরিচর্যা কেন্দ্র (Nurseri) স্থাপন নিমিত্তে বাঙলা সরকার ইং ১৮৯৫ সালে অতিরিক্ত ৩,০০০ টাকা মঞ্জুর করে। ইহার দুই বৎসর পর রেশমের উন্নতির জন্য অর্থাৎ ইং ১৮৯৮ বেঙ্গল সিল্ক কমিটি গঠিত হয়। এই সময় মালদহ জেলাতে উত্তম বীজ উৎপাদন হইত; সেই জন্য কমিটি মালদহ জোয়াড়ে উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদনের জন্য একজন উর্ধ্বতন সুপারিন্টেডেণ্ট নিযুক্ত করে। অতঃপর উক্ত কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত সুপারিন্টেডেন্ট, বাবু এ, কে, ঘোষ উচ্চ প্রশংসার সহিত মালদহে কৃতকার্য্য হন। এই সময় পুনরায় বহু পরিবার তুঁতের চাষ ও কীট পালন শুরু করে এবং এখান হইতে উৎকৃষ্ট বীজ বা পলু চারিদিকে বিতরিত হইতে থাকে। এই সালে কেবল পূর্ব বঙ্গেই ৯৬,০০০ মণ রেশম উৎপাদন হয় এবং মালদহ একাই ৪০,০০০ মণ রেশম উৎপাদন করে।[২৪]

তখন প্রতি কাহন বীজের মূল্য ছিল দুই টাকা। সাধারণত: মালদহের রেশম তখন ৩০ হইতে ৪০ টাকা মণ দরে কোয়া বিক্রয় হইত। যখন মালদহ, বগুড়া, রাজশাহী ও বঙ্গের অন্যান্য স্থানে রেশম চাষের উন্নতি দেখা দিল তখন পুনরায় বিশ্বের রেশম বাজারের প্রতিযোগিতায় এদেশের রেশমের সাধারণ বাজারেও অবনতি নামিয়া আসিল। পরের বৎসরে রেশমের বাজারের অবনতির কথা বাঙলা সরকার ঘোষণা করিলে সঙ্গে সঙ্গে এখানকার বহু দিনের প্রতিষ্ঠিত বহু কারখানা চিরতরে বন্ধ হইয়া গেল।

এই সময় দুই প্রকারের সুতা কাটা পদ্ধতি ছিল। সাহেব কোম্পানীর পদ্ধতি ও ঘাইয়ের সাহায্যে দেশী পদ্ধতি। মিঃ মুখার্জ্জি তাঁহার 'মনোগ্রাফে'[২৫] এদেশীয় সূতা

বিদেশী সুতা কাটা পদ্ধতি

কাটার পদ্ধতি চিত্রের সাহায্যে বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। ইং ১৭৭০ সালে 'মেসার্স ওয়েআর এণ্ড রবিনশন' কর্তৃক বিলাতী পদ্ধতিতে এদেশের সূতা কাটার নিয়ম প্রথম চালু হয়। বাষ্প চালিত ইঞ্জিনের সাহায্যে গরম জলে কোয়া ভিজাইয়া দেশী পদ্ধতিতে এই সূতার রিল প্রস্তুত হইত। এই রীতি এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। Bengal Silk Co. এবং মেসার্স লুই পেইন এণ্ড কোম্পানী কারখানাতে সূতা কাটার কাজ চলিত। এতদব্যতীত দেশী ব্যবসায়ীদের কতিপয় কারখানা এবং আর কতক ইউরোপীয় কারখানা চুক্তি হিসাবে সূতা কাটান হইত[২৬]।

রামপুর-বুয়ালিয়াতে যে সব উত্তম সূতা কাটান হইত তাহা 'বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানী'

---

২৩. The Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam by G N Gupta P. 30.
* অত্র ইতিহাসের ইংরেজ আমলে 'বুয়ালিয়াতে' রেশম বিদ্যালয় প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।
২৪. A Servey of the Industries and Resources of Eastern Bengal and Assa'n P. 30
২৫. See- Monograph on the Silk Fabrics of Bengal.
২৬. The Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam, P. 30.

সুতা কাটান ব্যাপারে দেশী কারীগর

(Bengal Silk Co.) এবং মেসার্স লুই পেইন এণ্ড কোম্পানী ইউরোপে প্রেরণ করিত। এই সময় দেশী উত্তম সূতা প্রস্তুত কারীদের মধ্যে বুয়ালিয়ায় দেব কুণ্ডু ও হাজী নকু মণ্ডল বিখ্যাত ছিল। ইহারা ইউরোপীয় কোম্পানীর মাধ্যমে কেনাবেচা করিত[২৭]। ইং ১৮৮৮ সালে নিম্ন বর্ণিত তিনটি কোম্পানীর ১৪টি কারখানায় মোট ১৫৫,৪৫২ পাউণ্ড সূতা উৎপাদিত হইয়াছিল।[২৮]

| | | | |
|---|---|---|---|
| মেসার্স এণ্ডার সন্স | ১৮৯৮ সালে উৎপাদন ১১,৬০০ পাউণ্ড | প্রথম মহা যুদ্ধের পর এই কুঠি বন্ধ হয়। | সিরইলের ওয়াটশন কোম্পানীর নিকট হইতে পার্শ্বে উল্লিখিত ফরাসী কোম্পানী ক্রয় করে। ইহার শেষ দেওয়ান মিঃ ম |
| বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানী | ৯৮,৭৩২ পাউণ্ড | ঐ | এখানে এই কোম্পানীর ৮টি মতান্তরে ১০টি কুঠি[২৯] ও কারখানা ছিল। বুয়ালিয়া কুঠির শেষ দেওয়ান মিঃ ই, এস, হুড্। তখন মিঃ ডবলিউ, ভি, ওয়েষ্টটন এই কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার। |
| মেসার্স লুই পেইন এণ্ড কোম্পানী | ৪৫,১০০ পাউণ্ড | | এই কোম্পানীর খোজাপুর, কাজলা ও সাহেবগঞ্জ এই তিন স্থানে তিনটি কুঠি ও কারখানা ছিল[৩০]। মিঃ এফ, এল, পেরিন শেষ ম্যানেজার। |

২৭. Monograph on the Silk Fabrics of Bengal p 31

২৮. Monograph on the Silk Fabrics of Bengal p 31-32

২৯. The Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam, P 30.

৩০. খোজাপুর ও সাহেবগঞ্জ বর্তমানে পদ্মা গর্ভে সমাধিস্থ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ভোলাহাটে লুই পেইন এণ্ড | ১৯০৪-৫ | ১১,১১৫ | মূল্য ৯,৬৯৪ টাঃ | পাউ |
| কোম্পানীর | ১৯০৫-৬ | ২৪,০৮০ | ১,৯৭,৪৯৭ ,, | ঐ |
| কারখানায় উৎপাদন। | ১৯০৬-৭ | ২০,০১৮ | ১,৮৫,৭৪২ | ঐ |
| বারোঘরিয়া বেঙ্গল | ১৯০৪-৫ | ৭,১৪৮ | ৬২,০৬০ টাঃ | ঐ |
| সিল্ক কোম্পানীর | ১৯০৫-৬ | ৯,২৬৪ | ৭৭,৭৮৩ টা: | ঐ |
| কারখানায় উৎপাদন | ১৯০৬-৭ | ১০,৫৪৮ | ৯৪,২৩৩ টা: | ঐ |

সুতা কাটার পদ্ধতি

ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে প্রধানত: মেসার্স লুই পেইন এন্ড কোম্পানী এবং বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানী বাঙলা দেশে প্রায় একক ভাবে রেশমের কারবার করিত। কাঁচা রেশমের দেশী ঘাইয়ে পাকান সূতা এবং মটকার কাপড় বুনানের কাজ প্রধানত: মালদহ জেলাতেই হইত। এই সময় মালদহ জেলাতে নিয়মিত ১৫০০টি সূতা কাটার দেশী ঘাই ছিল। টাউনে প্রায় ৫০ টি ঘাই ছিল। এক সময় খংরুর রেশম শিল্পের জন্য মালদহ জেলা বিখ্যাত ছিল। 'মিঃ মুর্খাজ্জি বলিয়াছেন, "রাজশাহী, বীরভূম ও মালদহে বিশেষ করিয়া খংরুর সিল্কের ব্যাপক প্রচলন ছিল। পরে বাবু জি, এন, গুপ্ত দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, 'মিঃ মুখাজ্জির কথা যথার্থই সত্য কিন্তু বর্তমানে মালদহ ব্যতীত অন্য কোথাও ইহার প্রচলন দেখা যায় না। রাজশাহীতে ইহার ব্যবসা অতি মন্দ'। এই সময় রাজশাহীতে কেবল মাত্র দুইটি কারখানা ছিল। একটি মুসলমানের অপরটি মাড়োয়ারীর। মালদহের ইংরেজ বাজারের সন্নিকট ও ইংলিশ বাজারে এবং পুরাতন মালদহে প্রায় ২,০০০ মণ খংরুর রেশম উৎপাদন হইত। মালদহের এই খংরুর সিল্ক উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইত। ইহার প্রতি সেরের মূল্য ১২ হইতে ১৬ টাকা পর্যন্ত ছিল। বেনারস, নাগপুব, করাচী, মহিশূর, শোলাপুর ও ভারতের অন্যান্য স্থানের বণিকেরা ইহা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত।

বগুড়া জেলাতে এই সময় সূতা কাটার সুনিপুণ বহু কারিগর ছিল। তাহারা অধিকাংশেই মুসলমান এবং নুন-গোলা হাটের নিকট বারোপুবের (বারবাক্‌পুর) অধিবাসী ছিল। প্রকাশ এই গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণে বগুড়া শহরের সন্নিকটে 'নওয়াদাপাড়াতে' ঊনবিংশ শতকে রেশমের বিরাট কারখানা ও কুঠি ছিল[৩১]।

বগুড়া

এই সময় বগুড়া টাউনে (মালতী নগরে) বেশ কিছু সংখ্যক তাঁতী ছিল। তাহারা যে সকল বস্ত্র বয়ন করিত তাহা স্থানীয় লোকদেরই চাহিদা মিটাইতে পারিত না। অধিকাংশ তাঁতী বেশীর ভাগ গরদের ধুতি ও উত্তম চাদর বুনাইত। কোট ও আছকান তৈয়ারীর জন্য থান এবং রুমাল ও পাড়' বিশিষ্ট আলোয়ান প্রভৃতি বস্ত্র ও প্রস্তুত হইত। বাউল চান্দর বসাক নামক জনৈক ব্যক্তি তখন খুবই নাম করা তাঁতী ছিল। বগুড়ার এক প্রদর্শনীতে সে স্বর্ণ- মেডেল পুরস্কার পাইয়াছিল।

রাজশাহী

তখন রাজশাহীর গরদের মটকা খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁতীর কাঠোর পরিশ্রম করিত। ড্যাকড়াতে ৩০ ঘর সুনিপুণ কারিগর মটকার বস্ত্র বয়ন করিত। মীরগঞ্জ অথবা ড্যাকড়া মটকার জন্য বিখ্যাত ছিল। তিথি পরবে বায়না পাইলে

৩১. The Inaustries and Resources of Fastern Bengal and Assam P, 32

খংরুর রেশম মিশ্রিত করিয়া তাহারা উত্তম প্রণালীতে এক প্রকার মটকা প্রস্তুত করিয়া দিত। সেই মটকার উত্তম শাড়ী ও ধুতির কেনা বেচার একমাত্র স্থান ছিল রাজশাহী ও কলিকাতা।

মালদহে রেশমী শাড়ী, ধুতি, রুমাল সাটিন কোটিং থান প্রস্তুত হইত। উত্তম শাড়ী ও ধুতি (১৫ ফিট -; ৪৪ হইতে ৪৬ ইঞ্চি) প্রতি খন্ড বিক্রয় হইত ১০ হইতে ১৫ টাকা। চওড়া ৪৪ ইঞ্চি দশ গজী কোটিং থান বিক্রয় হইত ২০ হইতে ২৫ টাকা মাত্র। ৬ হইতে ৭ হাত লম্বা চাদর শীতের মৌসুমে ব্যবহৃত হইত। ২$^{৩}/_{৪}$ হইতে ৩ হাত চওড়া র‍্যাপার ২৫ হইতে ২৮ টাকা প্রতি জোড়া বিক্রয় হইত। ইহা ব্যতীত ৬×৩ হাত চাদর গরমের সময় ব্যবহৃত হইত। উহার প্রতি খন্ডের মূল্য ছিল ৫ হইতে ৬ টাকা। প্রকাশ থাকে যে, মালদহে ইহা মুর্শিদাবাদ ও মীর্জাপুর রেশম অপেক্ষা বেশী বিক্রয় হইত।

এই বস্ত্র বয়নের জন্য মালদহে দুইটি কেন্দ্র ছিল। একটি ইংলিশ বাজারের সন্নিকট শাহাপুর অপরটি শিবগঞ্জ (বর্তমানে রাজশাহী)। শিবগঞ্জে প্রায় ১৪০ ঘরে ১৮০টি রেশমী বস্ত্র বয়নের তাঁত ছিল। ইহাদের মধ্যে ৫০ ঘর মটকার বস্ত্র বয়ন করিত। অবশিষ্ট কেবল খাঁটি সিল্কের কাজ করিত। শিবগঞ্জে ব্যবহারিক তাঁতের মূল্য ছিল তখন প্রায় ১২ টাকা। এই সময় শিবগঞ্জের অধিকাংশ লোক এই রেশম বয়ন ইত্যাদি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। মাত্র কতিপয় লোক কৃষি কার্য্য করিত।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সিল্ক শিল্পের ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁতের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। প্রায় দেড় লক্ষ টাকার রেশমী বস্ত্র উৎপাদন হইতে থাকে। তন্মধ্যে ৫০,০০০ হাজার টাকার মটকা ছিল। তখন শাড়ির পাড় ব্যতীত অন্য কোন প্রকার নকশার কাজ করা হইত না। বিভিন্ন রঙের শাড়ী প্রস্তুত হইত। ইংলিশ বাজারের সন্নিকট শাহাপুর ও ফুলবাড়ী অথবা মুশিদাবাদে প্রেরিত করা হইত এবং সেখান হইতে রঙিন মটকা মাদ্রাজ ও বম্বে প্রেরিত হইত। শাহাপুরে ২০০ শত ঘর কারিগর ছিল। 'বুলবুল' ও গুলটিশ নামে এবং অন্যান্য প্যার্টাণে রেশমী বস্ত্র বয়ন করা হইত। তখন সেখানে মাত্র ৭ ঘর রঞ্জনকারী ছিল তাহারা পাকান সূতা রঙ করিত এবং তাহারা বৎসরে অর্দ্ধ লক্ষ টাকার সূতা বম্বে, আহমদাবাদ ও নেপালে রফতানী করিত। গুলটিশ এবং বুলবুল-চশম স্থানীয় বাজারে প্রতি খান বিক্রয় হইত ৩৷৷০ হইতে ৮ টাকা পর্য্যন্ত। কদমফুলি' থান বিক্রয় হইত ১২ হইতে ১৬ টাকা।[৩২]

উনবিংশ শতকের শেষের তিন বৎসরে রামপুর-বুয়ালিয়াতে গড়ে ৯৭,০০০ পাউণ্ড রেশম উৎপাদন হয়। তখন উহার মূল্য দাঁড়ায় মাত্র ৮,২০,০০ টাকা। ইং ১৯০৬-৭ সালে পূর্বাপেক্ষা উৎপাদন কমিয়া ৩৪,০০০ পাউণ্ড রেশম পাওয়া যায়। ইং ১৯০৯ সালে বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানীর সূতা প্রস্তুত একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তদস্থলে ইউরোপীয় আর কয়েকটি ছোট ছোট প্রাইভেট সূতা কাটা কারখানা শেষ মুহূর্তে টিকিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়া তাহারা পূর্বগৌরব রক্ষা করিতে অক্ষম হয়। ক্রমশঃ ঘাটতি হইতে থাকে। ইং ১৯১১ সালে মাত্র ২২,০০০ পাউণ্ড রেশম উৎপাদন হয়। অবশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পরেই রামপুর-বুয়ালিয়াস্থিত ইউরোপীয় কোম্পানী চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়। যে সব

উনবিংশ-বিংশ শতকে শ্রমিকের সংখ্যা

৩২. Survey of Industris and Resouroes of Eastern Bengal and Assam P, 35

কর্মচারী, কুলি-মজদুর দেশী বিদেশী কোম্পানীর কুঠি ও কারখানাতে নিত্যনৈমিত্তিক কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছিল—ঐ সমস্ত কুঠি ও কারখানা বন্ধ হইয়া গেলে কুলি-মজদুর ও কর্মচারীরা বেকার সমস্যার সম্মুখীন হইয়া পড়ে। ইং ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে যেখানে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৭,৪০০ জন এবং ইং ১৯১১ সালের আদম-শুমারিতে সেখানে শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৩,০০০ হাজার।[৩৩]

তারপর যে ২/৪ জন স্থানীয় দেশী রেশম ব্যবসায়ী টিকিয়া থাকিবার শেষ চেষ্টা করিতেছিল। বহু চেষ্টা করিয়াও যখন তাহারাও পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারিতেছিল না তখন তাহারাও একে একে কারবার বন্ধ করিয়া দিল। ইং ১৯৩২ সালে মির্জাপুরের (রাজশাহীর) বাবু অনাথ বন্ধু মণ্ডল তাহার কারবার ও কুঠি বন্ধ করিয়া বুয়ালিয়ার রেশম ঐতিহ্যের গৌরবময় অধ্যায়ের যবনিকা পাত করেন। অতঃপর বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আসিয়া বুয়ালিয়ার অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িলে কতিপয় জমিদার জোতদারের প্রাধান্য ঘটে। কিন্তু তখন তাহারা সাধারণের সুখ দুঃখের দিকে দৃষ্টি রাখিবার অবসর পায় না। অতএব এই সময় এখানকার কয়েক হাজার শ্রমিক ও বেকার সমস্যাব সম্মুখীন হইয়া অন্ন-বস্ত্রের সন্ধানে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন উপায় করে।

বেশম শিল্পেব অবনতিব কাবণ

পাক-ভারতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে এদেশের রেশমের বাণিজ্য ইউরোপীয় বণিকদের প্রায় একচেটিয়া ছিল এবং তাহাদের সময়ে এদেশে রেশম শিল্পের চরম উন্নতি হইয়াছিল। অতীতের বিভিন্ন বিববণে উহার উল্লেখ আছে[৩৪]। তাহারা তখন এখানকার উৎপাদিত অধিকাংশ কাঁচা রেশম ইউরোপে রপ্তানী করিয়া রাশি রাশি অর্থ লুণ্ঠন করিত এবং রেশমী বস্ত্র ফ্রান্স ও ইটালীতে বিক্রয় করিয়া অত্যধিক মুনাফা করিত। তারপর বিশ্ব বাণিজ্যের পূর্বদ্বার "সুয়েজখাল" খননের পর পাক-ভারতের সহিত চীন ও জাপানের প্রতিযোগিতা এবং ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্স ও ইটালীর প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হয়। কেন না বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত ধরণের উৎপাদিত চীন ও জাপানের রেশম অল্প মূল্যে বিশ্বের বাজাবে রপ্তানী হইতে থাকে। তখন তদনুরূপ মূল্যে এদেশীয় রেশম বাজারে রপ্তানী করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না; ফলে এদেশের ইউরোপীয় ব্যবসায়ীর বহু ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিলে ইং ১৮৩৩ সালে ইংলন্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়াম এক ঘোষণা করেন।[৩৫] তদনুযায়ী ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী রেশম ব্যবসা পরিত্যাগ করিলে কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীরা প্রাইভেট (যথাঃ রবাটওয়াটশন এন্ড কোম্পানী, মেদিনীপুর জমিদারী কোং ইত্যাদি) কোম্পানী গঠন করিয়া বাঙলা দেশে পুনরায় ব্যবসা আরম্ভ করে। তখন এই সমস্ত প্রাইভেট কোম্পানী রেশমের চাষ ও পশু পালনের উন্নতির জন্য বার বার চেষ্টা করা সত্বেও যখন বিশ্বের প্রতিযোগিতার বাজারে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না তখন এই সকল স্থানীয় দেশী ও বিদেশীয় কোম্পানী তাহাদের ক্ষতি পূরণের জন্য চাষীদের মধ্যে উচ্চহারে খাজনার নিরিখ বৃদ্ধি করিতে থাকে। ইহা ব্যতীত এই সময়ে নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া

৩৩. Rajshahi Gazetteer PP. 103-12

৩৪. A letter to our Agent Council in fort George, 9th November, 1670.

৩৫. 'রেশম তত্ত্ব' পৃঃ-৩-৪, কাজলা কুঠি হইতে প্রকাশিত।

পলু পোকারও মড়ক দেখা দেয়। তাহার ফলে, বহু বড় বড় কোম্পানী তাহাদের কারখানা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হয়। যে ২/৪ জন ছোট খাট পলু পালনকারী যৎ সামান্য রেশমগুটি উৎপাদন করিত, বড় বড় কারখানা বন্ধ হইয়া যাওয়ার দরুণ তাহারাও উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেয়। অতঃপর তখন এই রেশম শিল্পের অবনতির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা করা হয় নাই। অতএব ধীরে ধীরে ইং ১৯৩০-৩২ সাল নাগাদ রামপুর-বুয়ালিয়ার রেশম শিল্পের যবনিকা পাত হয়।[৩৬]

আমাদের কথা

আজ রেশম ব্যবসায়ের পুনরুজ্জীবনের জন্য আমাদের জাতীয় সরকার বিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন। বিভিন্ন স্থানে সরকারী ব্যয়ে (Sericulture Institute) রেশম ও লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপন করিয়া এবং বিদেশ হইতে কারিগরী শিক্ষা প্রাপ্ত কর্মচারী নিয়োগ করিয়া রেশমের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি করিতে মনযোগী হইয়াছেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে এতটুকু বলা অবান্তর হইবে না যে, কেবল মাত্র সরকারী প্রচেষ্টায় রেশম শিল্পের সামগ্রিক উন্নতি বিধান সম্ভব নয়। রেশমের উন্নতির ঢেউ গ্রামে গ্রামে পৌছাইয়া দিতে হইবে, ইহার ব্যাপক বিস্তারে প্রতিটি দেশবাসীকে আগ্রহশীল করিয়া তুলিতে হইবে। কেবল মাত্র প্রচারের উপরও নির্ভর না করিয়া দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের রেশম সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে সরকারকে সচেষ্ট হইতে হইবে। তবেই রেশমের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আয়ের মানও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

রাজশাহী শহরের অর্থনৈতিক অবস্থার অতীত ও বর্তমান

শ্রীরামপুর বা রামপুর-বুয়ালিয়াতে যে দিন ওলন্দাজগণের আগমন হইয়াছিল সেই দিন হইতেই রাজশাহী শহরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির গোড়া পত্তন হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বসতি বিস্তার দেশী বিদেশী সওদাগরদের আনাগোনায়, বাণিজ্য সম্ভার বিনিময়ের মধ্য দিয়া এখানকার সভ্যতা সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্য ভাগ হইতে উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত ইহার উন্নতি চরমে উঠিয়াছিল। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইতে দেশী বিদেশী বণিকদের মধ্যে স্বার্থ সংঘাত শুরু হইয়া যায়। ক্রমশ: ইহার অবনতি হইতে থাকে। বিংশ শতকের দুই দশকের মধ্যে রামপুর-বুয়ালিয়ার অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় ঘটে। দেশ বিভাগকাল পর্য্যন্ত ইহার কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না। তারপর পাকিস্তান আমলে আসিয়া ইহার সর্বত্র একটি প্রাণ চাঞ্চল্যের সাড়া পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে ইহা আর 'রামপুর-বুয়ালিয়া' নয়-রাজশাহী শহর'– শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি সভ্যতার জ্ঞানে-মানে উত্তর বঙ্গের কেন্দ্রীয় মর্য্যাদা পাইয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র রাজধানী' ঢাকার পরেই 'রাজশাহী শহর'। হয়ত এমনিই একদিন আসিতে পারে সেদিন এই রাজশাহীই আবার অতীত গৌড়ীয় সমৃদ্ধির সূচনা করিবে।

**নীল পরিচয় :**

সাধারণত: দো-আঁশ জমিতে নীলের চাষ হয়। বড় বড় নদীর তীরে, দীঘি পুষ্করিণীর পাড়ে নীলের চাষ ভাল হইয়া থাকে। নীলের জমি রীতিমত কর্ষণ করিতে হয়।

৩৬. সেরিকালচারের (Sericulture)অবনতি ও উহার প্রতিকার ব্যাপারে - Report on the Indian Tariff Board কর্তৃক প্রকাশিত Garnt of protection to the Sericultural Industry দ্রষ্টব্য ।

পাট বোনার মতই ইহার জমি প্রস্তুত করিতে হয়। নীলের গাছ দেখিতে কতটা শনের গাছের মত[৩৭]। উচ্চতাও শণের গাছের মত পাঁচ-ছয় ফিট হইয়া থাকে। সাধারণত: বর্ষার শেষের দিকে ইহা বোনা হইত। নীলের বীচিগুলি পাকিয়া উঠিলে গাছগুলিও পুষ্ট হয় এবং চৈত্র মাসের শেষে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথমের দিকে কাটা হইত।

শণ যেমন পানিতে জাগ দিয়া পচাইয়া আঁশ ছাড়াইতে হয়, নীল জাগ দিবার পদ্ধতি তেমন নহে। নীল গাছ কাটিয়া আনিয়া পাতা সহ বড় বড় চৌবাচ্চায় কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তারপর যখন গাছ পচিয়া পানি হলুদ বর্ণ ধারণ করে তখন সেই নীল জাগের চৌবাচ্চায় মানুষ অথবা গরু মহিষ নামাইয়া দিয়া রীতিমত মাড়াই করিয়া উহাতে 'ফাওড়া' নামক এক প্রকার (ঢাকা জাতীয় যন্ত্র) যাঁতা দিয়া ঘাঁটাইতে হয়। অতঃপর ঘন জাল অথবা মশারীর মত কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া সিটি (ডাল পালা বা ছোবড়া) পরিষ্কার করিতে হয়। তারপর পানি অথবা ঐ রস ঘন হইলে (ক্বাথ) পুনরায় উহা চৌবাচ্চার ছাকনী সদৃশ একটি ছিদ্রের সাহায্যে বাহিরে আনিয়া ঐ ঘনীভূত রস একটি বড় আকারের গামলায়[৩৮] ঢালিয়া ফুটানো হইত। কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিবার পর ঐ রস আঁখের গুড়ের ন্যায় দানা কাটিতে থাকিলে তখন ঘোটনা দিয়া ঘাটিয়া শুকাইতে হইত। অতঃপর গুড় প্রস্তুতের মত নীলের ঢিমা বা নীল রঙ্ প্রস্তুত করা হইত।

হিন্দুর পৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যের মতে প্রাচীনকালে একমাত্রও পাক-ভারতেই নীলের চাষ হইত এবং এই দেশ হইতেই পৃথিবীর নানাস্থানে রফতানী হইত। প্রাচীনকালে অনেক দেশেই নীল ব্যবহার হইত। মিশরের অনেক মমির পোষাকের পাড় নীলের রঙে রঞ্জিত।

এই নীল হিন্দুস্তান বা ইণ্ডিয়া হইতে বিদেশে রফতানী হইত বলিয়া ইহাকে গ্রীসে ও রোমে 'ইণ্ডিগো' (Indigo), পারশ্যে "তখমে নীল", আরবে "নাভুন নীল" বলা হইত। সংস্কৃতে নীলকে "বিষ শোধনী" বলা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে গ্রীক লেখক 'ডিওস- কোরিডেস' ইণ্ডিগো'র উল্লেখ করেন। রোমান লেখক প্লিনীর লেখা হইতে জানা যায় যে, সিন্ধু নদীর তীরে (বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানে) অবস্থিত 'বারবারিকন' বন্দর হইতে ইণ্ডিগো বিদেশে রফতানী হইত।

ঐতিহাসিক প্রমোদ সেন গুপ্ত মহাশয়ের মতে সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় তিন শত রকমের নীল গাছের চাষ হইত। তন্মধ্যে পাক-ভারতেই প্রায় চল্লিশ প্রকার গাছের সন্ধান পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ার (Indian) নীল গাছের জাতিগত ল্যাটিন নাম 'ইণ্ডিগোফেরা'। উৎকৃষ্ট নীল গাছের নাম 'ইণ্ডিগোটেস্কুটারিয়া'। ইহা কেবল মাত্র পাক-ভারতেই জন্মাইত। ইহার উচ্চতা ৪ হইতে ৬ ফুট। নীলের বীজ হইতে এক প্রকার তেলও প্রস্তুত হইত। উহা মানুষ ও পশুর নানাপ্রকার চিকিৎসায় ব্যবহার হইত।

প্রকারভেদ

মধ্য যুগে পাক-ভারতের নীল বিখ্যাত ছিল। প্রখ্যাত ভেনিসিয়ান পরিব্রাজক মার্কো

৩৭ পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার বেতিল- সোহাগপুর-এনায়েতপুর প্রভৃতি গ্রামে প্রচুর পরিমাণে শণের চাষ হইয়া থাকে।

৩৮. নীল প্রস্তুতের একটি গামলার অংশবিশেষ এখনও রংপুর জেলার উলিপুর থানার (গুপিচাঁদের পাঠের সন্নিকট) উঁয়ারী গ্রামে রহিয়াছে। এখানে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে প্রচুর নীলের চাষ হইত। এখানে কুঠিয়াল সাহেবদের একটি নীল-কুঠির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পোলো ত্রয়োদশ শতকে ভারতে আসিয়া ত্রিবাঙ্কুর রাষ্ট্রের কলিয়ম (পরে ইংরেজদের কালিকট?) নামক বন্দরে নীল উৎপাদনের কারখানা দেখিয়াছিলেন। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে নীল বিদেশে চালান যাইত। পঞ্চদশ শতকে কন্তে, ষোড়শ শতকে জন হুউঘেন ভান্ লিনসোটেন ও সপ্তদশ শতকে ত্রাভারনিয়ার তাঁহাদের বই পুস্তকে পাক-ভারতে নীল প্রস্তুতের কথা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আইন-ই-আকবরী হইতে অবগত হওয়া যায় যে, আগ্রার নিকট বায়নাতে ও গুজরাটের অন্তর্গত আহমদাবাদে উৎকৃষ্ট নীল রঙ প্রস্তুত হইত। এবং তাহার মূল্য ছিল প্রতিমণ দশ হইতে বারো টাকা।[৩৯] বার্ণিয়ারের গ্রন্থের মতে বায়না প্রভৃতি স্থানে নীল সংগ্রহের জন্য ওলন্দাজ বণিকেরা বসবাস করিত।[৪০]

পঞ্চদশ শতকে সমুদ্র পথে ইউরোপের সহিত পাক-ভারতের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পূর্বে এদেশের অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যাদির সহিত নীল পারশ্য উপসাগর দিয়া আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর হইয়া সুদূর ইউবোপে পৌঁছিত! দক্ষিণ ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরের বাণিজ্য ইতিহাসের মতে ইং ১২২৪ সালে সেখানে যে নীল পৌঁছিয়া ছিল, তাহা বাগদাদের নীল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা ভারতবর্ষেরই উৎপন্ন নীল বাগদাদ হইয়া ইউরোপে পৌঁছিত। কেননা, পরে পাক-ভারতের অনেক স্থানে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ ব্যবসায়ী নীলের চাষ ও ব্যবসায় করিত। ষোড়শ শতকের শেষ পর্যন্ত পাক-ভারত ও এশিয়ার নীল এবং আরও অন্যান্য পণ্য দ্রব্যেব বাণিজ্য সম্পদ পর্তুগীজদের একচেটিয়া ছিল। প্রায় শত বর্ষ ব্যাপী 'পর্তুগালের রাজধানী "লিসবন" শহর ইউরোপ ও এশিয়ো পণ্য দ্রব্যের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। এশিয়ার এই পণ্য দ্রব্যের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ভাগ বাটোয়ারা লইয়া পরবর্তীকালে ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও পর্তুগীজদের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত শুরু হয়। ফলে ইং ১৫৯৯ সালে ইংরেজগণ, ইং ১৬০২ সালে ওলন্দাজরা নিজেদের মধ্যে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী' গঠন করে। ফরাসীরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্তুত হইতে ছিল। ওলন্দাজরা যখন পাক-ভারত হইতে সরাসরি নীল আমদানী করিতে আরম্ভ করিল, তখন ইউরোপের নীল প্রতিদ্বন্দ্বী ভোড চাষীরাও তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিল।

যাহা হউক, অষ্টাদশ শতকের শেষার্দ্ধে বাঙলাদেশে বিদেশী নীলকরদের আবির্ভাব হয়। ইহাবা প্রায় সকলেই দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী ও দুর্বৃত্ত ছিল। তাহারা নীল চাষের ক্ষেত্রে বাঙ্লার চাষীদের মধ্যে এমনই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল যে বহু চাষীকে বাধ্য হইয়া নীল বুনিতে হইত। একবার কোন চাষী নীলের দাদন লইয়া চাষ আরম্ভ করিলে সারা জীবন তাহাকে নীল চাষ করিতে বাধ্য থাকিতে হইত; পুরুষানুক্রমিক পরিশ্রম করিয়াও নীল চাষের দেনা হইতে মুক্তি পাইত না। এমন ভাবেই বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইত।

তখনকার দিনে নীলকর শ্বেতাঙ্গরা আদালতকে বড় ভয় করিত না। ইংরেজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণও তাহাদিগকে বিরক্ত করিতে সাহস পাইত না।

নীলের অর্থনীতি বিশ্লেষণ করিলে জানা যায় যে, নীলকররা স্বদেশ হইতে মূলধন

---

৩৯. Agra Histoical Description (With M P) P 294 . Ain-i-Akbari by Jurrt, Vol, II PP. 181, 241.
৪০. Pernıar's Travels (Banga bashi) P. 275.

আনিত না। এই দেশের মূলধন দিয়া এই দেশেই নীলের চাষ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত। রাশি রাশি অর্থ মুনাফা করিয়া স্বদেশের ভাণ্ডারে প্রেরণ করিত। মোট কথা স্বার্থ সিদ্ধিই ছিল তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। আর এই স্বার্ধ সিদ্ধিময় লোলুপ জীবনে দেখা যাইত বিলাস ব্যসনের প্রাচুর্য্য–আর অত্যাচারের তাণ্ডব লীলা।

বলা বাহুল্য, বাঙলার বুকে এই অত্যাচারের তাণ্ডব ও বিলাস ব্যসনের প্রাচুর্য্য বাঙ্গালী বেশী দিন সহ্য করে নাই। তাহারা নীলকরদের বিরুদ্ধে বহু খণ্ড যুদ্ধ করিয়াছে এবং এই খণ্ড খণ্ড যুদ্ধের পরিনতিই ইং ১৮৫৯-৬১ সালে বাঙলার বুকে 'নীল বিদ্রোহের' সূচনা করে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ইং ১৮৫৭ সালের 'সিপাহী বিদ্রোহ' যেমন অবিস্মরণীয় অধ্যায়–ইং ১৮৫৯-৬১ সালের 'নীল বিদ্রোহ' তেমনই তাৎপর্য্য পূর্ণ। সেই জন্যই ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে নীলকরদের উৎপাত বন্ধ করিতে সাহিত্য সম্রাট "বঙ্কিম বাবুর আগ্রহ দেখিয়া নীলকরেরা তাঁহার মাথার জন্য লক্ষ টাকা পুরষ্কার ঘোষণা করিয়াছিল।" সেই জন্যই বাঙ্‌লা সাহিত্যে 'দীনবন্ধু' মিত্রের 'নীল দর্পন' নীল বিদ্রোহীদের জন্য অমৃত ফল আনিয়াছিল। সেই জন্যই মীর মোসারফ হোসেনের সাহিত্যে এই বিদ্রোহের স্বাক্ষর রহিয়াছে। এই সব বিষয় বাঙ্গালীদের ভুলিয়া যাওয়া অনুচিত।

নীল বিদ্রোহের মধ্য দিয়া বাঙলার পল্লী সমাজে অনেক বীর সন্তানের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। যাহারা অসাধারণ সাহস, কর্মকুশলতা; সাংগঠনিক ক্ষমতা ও বৈপ্লবিক উদ্যোগের স্বাক্সর রাখিয়া গিয়াছে। বাঙলার কৃষক সমাজ যে অপূর্ব বৈপ্লবিক শক্তির ধারক ও বাহক, নীল-বিদ্রোহের ইতিহাসই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নীল আন্দোলন শুরু হইয়াছিল বিদেশী নীলকরদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রাম হিসাবে; কালক্রমে তাহা রূপান্তরিত হইয়া বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। এই দিক দিয়া বাঙলার নীল চাষীদের সংগ্রামে বা নীল আন্দোলন আমাদের আজাদীর ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। সময় ও সুযোগের অল্পতা হেতু এই অধ্যায়ে আমরা কেবলমাত্র দীপ জ্বালিয়া গেলাম। উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পাইলে আগামীবারে স্বতন্ত্র ভাবে ইহার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

ঊনবিংশ শতকে রাজশাহীতে নীলের চাষ বিখ্যাত ছিল। এবং এখানকার উৎপাদিত নীল খুবই লাভজনক ও উৎকৃষ্ট ছিল। দো-আঁশ ভূমি ও পদ্মার চর অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে নীলের চাষ হইত। মেসার্স ওয়াট্‌শন এণ্ড কোম্পানী এখানে নীলের চাষও করিত। ইং ১৮৯৬ সালেও এখানে ৮,০০০ একর জমিতে নীলের চাষ হইয়াছিল[৪১]। তারপর বিশ্বের নীল প্রতিযোগিতার বাজারে বিশেষত: কৃত্রিম নীল উৎপাদন এবং তাহা অল্প মূল্যে বাজারে রফতানী হইতে থাকিলে, এদেশের ইউরোপীয় কোম্পানী বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অবশেষে নীল চাষ পরিত্যাগ করে।

রাজশাহী

এখন আমরা রামপুর-বুয়ালিয়ার (বর্তমান রাজশাহী শহরের) পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে সমস্ত ইউরোপীয় কোম্পানীর নীল কুঠি স্থাপিত ছিল নিম্নে সেই সব স্থানের উল্লেখ করিয়া আপাতত: এই খানেই নীল প্রসঙ্গের বিরতি করিলাম। তালাইমারী, বিলমারিয়া,

৪১. Rajshahi Gazetteer P. 111

খোজাপুর, শাহপুর (পদ্মা গর্ভে নিমজ্জিত), ভারতীপাড়া (রবী ঠাকুরের পূর্ব-পুরুষ কর্তৃক নীল ও রেশম কুঠি স্থাপিত ছিল), চারঘাট, সরদা, বালুয়া মীরগঞ্জ, খরচাকা, বড়গাছী প্রভৃতি স্থান উল্লেখযোগ্য[৪২]।

**কার্পাস চাষ :**

রাজশাহীর অর্থকরী শিল্প-সম্পদগুলির মধ্যে কার্পাস একটী বিশিষ্ট সম্পদ। আগের প্রবন্ধে আমরা 'রেশম ও নীল' চাষের বিষয় আলোকপাত করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের নিত্য আবশ্যক কার্পাসের কথা কিছু বলিব।

বস্ত্র শিল্পের গোড়ার কথা বলিতে গেলেই কার্পাসের কথা বা কার্পাস চাষের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কার্পাস নামক গাছ হইতে আমরা তুলা পাইয়া থাকি। এই তুলা হইতে সূতা কাটিয়া বস্ত্র বয়ন করা হয়। সেই বস্ত্রই আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় পোষাক-পরিচ্ছদ যত কিছু। সুতরাং কার্পাস বা কার্পাসের উপকারিতা সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বর্তমান শতকের গোড়ার দিকেও রাজশাহী জেলার বিভিন্ন স্থানে কার্পাসের চাষ হইত। এই চাষের উন্নতির জন্য তাহিরপুরের জমিদার রাজা শশি শিখরেশ্বর রায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এবং তাহিরপুর হইতে প্রকাশিত কৃষিবিষয়ক পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে কার্পাস ও তুঁত চাষের গুণাগুণ প্রচার করিতেন[৪৩]।

রাজশাহীতে রেশমের চরম উন্নতির দিনে হাটে বাজারে কার্পাসের তুলা ও সূতা বিক্রয় হইত। তখন প্রায় পল্লীতে কার্পাসের চাষ ছিল। বাড়ী বাড়ী চরখা ছিল। প্রত্যেক পল্লীতে সূতা কাটা হইত। সেই সূতার দ্বারা দেশী তন্তুবায়রা তাঁতে কাপড় বুনানী করিত। রেশমী বস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে কার্পাস বস্ত্রও অল্প বিস্তর বিদেশে রপ্তানী হইত। অষ্টাদশ শতকের শেষে ও ঊনবিংশ শতকে ইউরোপে এদেশের কার্পাস বস্ত্রের উপর প্রথমত: কয়েকবার নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা হওয়ায় তখন হইতে এদেশের কার্পাস-বাণিজ্য স্তিমিত হইয়া পড়ে। চাষীরা নিজেদের প্রয়োজন ব্যতীত অধিক চাষ বন্ধ করিয়া দেয়। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আসিয়া রেশম বাজারের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে কার্পাস-শিল্পেরও অবনতি ঘটে। এই সময় কেবল মাত্র ১,২০০ শত জন কারিগর রামপুর-বুয়ালিয়াতে তাঁত-শিল্পের কাজ করিত। তখন কিছু সংখ্যক লোক এখানে কার্পাস বস্ত্রে রঙ ও ছাপার কাজ করিত[৪৪]। তারপর রেশম শিল্পের কারবার বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্পাস চাষ ও সূতা উৎপাদন বন্ধ হইয়া যায়। রাজশাহীর পল্লীতে এখন আর কার্পাস চাষের কথা শোনা যায় না। চরখাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না[৪৫]।

এখন বাষ্প ও বিদ্যুৎ চালিত বিদেশী মিলের উৎপাদিত দেশী ও বিদেশী সূতার দ্বারা হস্ত-চালিত দেশী তাঁতীরা বস্ত্র বয়ন করে। তাহা এক দিক দিয়া লাভজনক হইলেও তাহাতে আমাদের গর্বের কিছুই নাই। অথচ কার্পাস শিল্প আমাদের নিজস্ব সম্পদ; আমরাই তাহার আদি চাষী। বিজ্ঞানের উন্নতি হওয়ায় আমাদের অধ্যবসায়, ত্যাগ ও

৪২. রাজশাহীর ইতিহাসের 'দ্বিতীয় খণ্ডে' জেলার অন্যান্য নীল কুঠির পরিচয় দ্রষ্টব্য।

৪৩. রাজশাহীর ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে তাহিরপুর প্রসঙ্গে কার্পাস বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৪৪. Rajshahi Gazetteer p. 111.

৪৫. রাজশাহীর খাদি শিল্পের কথা–'দ্বিতীয় খণ্ডে' দ্রষ্টব্য।

অবহেলার দরুন বিদেশীরা আজ উহার সর্বসত্ত ভোগ করিতেছে। কিন্তু, আমরা এখনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারি নাই।

আমাদের দেশে কতকাল পূর্ব হইতে কার্পাসের চাষ প্রচলিত আছে তাহার সঠিক ইতিহাস জানা যায় না তবে খৃষ্ট জন্মের ৩,০০০ হাজার বৎসর পূর্বে এদেশে (পাক-ভারতে) কার্পাসের চাষ ও তাহার ব্যবহার ছিল। মোয়েঞ্জোদারোতে আবিস্কৃত প্রাচীন প্রত্ন-তাত্ত্বিক সম্পদ হইতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়[৪৬]। মিশর ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে কার্পাসের এত প্রাচীন নিদর্শন ও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশগুলির মধ্যে আমেরিকা বর্তমানে পাক-ভারতের এই প্রাচীনত্বের কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছে[৪৭]। বলিতে বাধা নাই সম্ভবতঃ পাক-ভারত কার্পাস চাষের অন্যতম আদি ভূমি। মনুসংহিতার যুগে কার্পাস সূত্রের বহুল প্রচার ছিল। তখন তন্তুবায়কে ১০ পল[৪৮] সূতা দিলে সে ১১ পল সূতা প্রদান করিত[৪৯]। যে হেতু সূতায় কলপ দিলে ওজন কিছু বেশী হইত। কার্পাস সূত্রে কলপ প্রয়োগের প্রথা তখনও ছিল এখনও আছে। বলা বাহুল্য বেদে মাড়ের লোভে ইঁদুরের সূতা কাটার ও সূতায় মাড় প্রয়োগের একটি সুন্দর গল্প আছে[৫০]।

কার্পাস চাষে আদি ভূমি ও বিস্তার

পাক-ভারত হইতে এই কার্পাস চাষ পাশ্চাত্য দেশে বিস্তার লাভ করে। ফারসী কুরপাশ শব্দের অপিভ্রংশ সংস্কৃত কার্পাস এবং এই কার্পাসের অপভ্রংশ 'কাপড়' বলিয়া বোধ হয়। আরবী 'কতনুন্' শব্দ, ইটালিয়ান 'কতোন', ফরাসীর 'কোতান' ও ইংরেজী 'কট্ন' হইয়া থাকিবে।আমাদের দেশের কোন কোন অঞ্চলে কার্পাস 'বাঙ্গা' নামেও কথিত হয়। সাধারণতঃ মেয়ে মহলে রাজশাহী তথা উত্তর বঙ্গে এই কার্পাসের অপর নাম বাঙ্গা বা কাপাস নামে ইহা সমাধিক পরিচিত। এখনও এই কার্পাস আমাদের দেশ হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া যায় নাই। রাজশাহীর অনেক বাড়ীর আশে পাশে বনে-জঙ্গলে কদাচিত কার্পাস গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুর মন্দির মঠের পাশেও কখন কখন কার্পাস গাছ জন্মিয়া থাকে। ব্রাহ্মণরা সেই সব কার্পাস গাছ হইতে তুলা সংগ্রহ করিয়া সূতা কাটিয়া পৈতা বা উপবীৎ প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

গ্রীক্ ভ্রমণকারীরা সর্ব প্রথম ভারতবর্ষের বরোচ নগরে কার্পাস দেখিয়াছিলেন। তথা হইতে কার্পাস বিদেশে রপ্তানী হইত। কিন্তু, সিন্ধু নদীর তীরবর্তী কার্পাসের কথা খুবই প্রাচীন। মেয়েঞ্জোদারোতে আবিস্কৃত তথ্যাদি পাক-ভারতের প্রাচীন জনের কাপড় ব্যবহারের কথা পরবর্তী বর্ণনাকে সুদৃঢ় করিয়াছে। গঙ্গার তীরে (পদ্মার তীরে ?) যে সব কার্পাস হইতে বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহাকে তাহারা 'গাঙ্গিতিকি' বলিত। চীনের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রাচীন। কিন্তু, ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে তাহারা কার্পাসের চাষ ও ব্যবহার জানিত না। মুসলমান যুগে পোষাক-পরিচ্ছদের বাহার ও ব্যবহার প্রণালী

৪৬. Mohenjo-daro and the Indus Civilization by Sir John Marshall Vol. I pp, 358-359.

৪৭. The American Peoples Encyclopaedia p. 6-404

৪৮. ১ = ৪ তোলা।

৪৯. তন্তুবায়ো দশপলং দদ্যাদেশ পলাধিকম্। মনু-৮/৩৯৭।

৫০. মুষো ন শিশ্ন ব্যদন্তি মাধ্যঃ। ঋক্ সংহিতা-১/১০৫/৮।

চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কার্পাস বস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়। এই যুগে চীন, ইটালী, স্পেন ও ইউরোপে ভারতীয় কার্পাস বিস্তৃত হয়।

বর্তমানে মিশর ও আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কার্পাস চাষের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। বিশ্বের বাজারে মিশরের কার্পাস তুলা দীর্ঘকায় শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট। ভূমির প্রকার ভেদে আমেরিকার সি-আইল্যাণ্ডের কার্পাসের ফলন খুব বেশী। বৈজ্ঞানিক চাষ পদ্ধতিতে–আমেরিকাতে কার্পাসের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। পৃথিবীর তিন চতুর্থ ভাগ কার্পাস তুলা বর্তমানে আমেরিকা হইতে বিশ্বের বাজারে রপ্তানী হইয়া থাকে। একথা অনস্বীকার্য্য যে, প্রায় দুইশত বৎসর আগে সমগ্র পৃথিবীর কার্পাস ও কার্পাস বস্ত্রের অধিকাংশই ভারতবর্ষে একাই সরবরাহ করিত।

মিশরের কার্পাস উন্নতির ঘটনা আশ্চর্য্যজনক। জুমেল নামক একজন ফরাসী, কাইরো নগরে তাঁহার এক বন্ধুর বাগানে, এক প্রকার উৎকৃষ্ট কার্পাস গাছ দেখিতে পান। সেই গাছগুলি মিশরের ভূমি ও জল বায়ুর পক্ষে উপযোগী বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। পরে সেই গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া অন্যত্র পরীক্ষামূলক = করাইবার পর সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। ইহা ইং ১৮২০ সালের ঘটনা। তারপর হইতে মিশরে কার্পাস চাষের উন্নতি হয়। ঐ কার্পাস জুমেল বা মাকো কার্পাস নামে খ্যাত।

ইং ১৬২১ সাল হইতে ইউরোপীয় উপনিবেশিক দ্বারা আমেরিকার সি-আইল্যাণ্ডে কার্পাস চাষের চেষ্টা চলিতে থাকে। ইং ১৭৮১ সালে তাহারা ৮ বস্তা কার্পাস সর্বপ্রথমে ইংলণ্ডে প্রেরণ করে। অতঃপর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্তমানে আমেরিকার কার্পাস চাষের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে ইউরোপে কার্পাস প্রচলিত ছিল না। মুসলমান যুগে ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য সম্বন্ধ হইবার পর কার্পাসের চাষ ও কার্পাস বস্ত্র সেখানে প্রচলিত হয়। মুসলমান উপনিবেশিক দ্বারাই কার্পাস চাষ ইউরোপে প্রবর্তিত হয়। ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে এই কার্পাস ভারতবর্ষ হইতেই প্রেরিত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতকের মধ্য ভাগে ইংলণ্ডে হস্ত চালিত তাঁত দ্বারা সর্বপ্রথম কার্পাস বস্ত্র বয়ন প্রবর্তিত হয়। ঊনবিংশ শতকের মধ্য ভাগেও বিলাতে হস্ত চালিত তাঁত দৃষ্ট হইত।

ইং ১৫৯৯ সাল হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত পাক-ভারতের বাণিজ্যিক সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়। মাদ্রাজের কালিকট হইতে কার্পাস বস্ত্র রফতানী হইত বলিয়া উহার নাম 'কালিকো বা কেলিকো' বলা হইত। ইং ১৬৭৬ সালে বিলাতে সর্বপ্রথম ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র রপ্তানি হইতে থাকিলে বিলাতের তাঁতিরা উহার বিরুদ্ধে "The ancient tredes decayed and repaired again" নামক একখানা বই প্রকাশ করে। এই বই প্রকাশিত হইলে তাহাদের স্বদেশী পশম শিল্প রক্ষার জন্য চেষ্টা চলিতে থাকে। অনেক স্থানে দেশী বিদেশী শিল্পজাত বস্ত্র কেনা-বেচার পরিপ্রেক্ষিতে দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় ইং ১৭০০ সালে একটি আইন করিয়া ভারতীয় কার্পাস বস্ত্রের প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা হয়। তাহা সত্ত্বেও গোপনে গোপনে ভারতীয় বস্ত্রের ব্যবহার চলে। এই গোপনীয় ব্যবসা চলিতে থাকিলে–ইং ১৭০৮ সালে মিঃ ডিকো বিলাতের এক সাপ্তাহিক কাগজে উহার প্রতিবাদ করেন। ইং ১৭২০ সালে আর এক আইনে ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড ও আইসলণ্ড প্রভৃতি স্থানে কার্পাসের ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য উহা আইনতঃ

দণ্ডনীয়, ঘোষণা করা হয়। তবুও উহা রোধ করা সম্ভবপর হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত ভারতের কার্পাস আমদানী করিবার জন্য ইং ১৭৮৮ পালে বিলাতের 'কোর্ট অফ ডিরেক্টরস (Court of Directors) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট পত্র লিখেন। অতঃপর ইং ১৮৫১ সালে ভারতে একটি সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতি ইং ১৮৫৪ সালে বোম্বেতে সর্বপ্রথম কাপড়ের কল স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করে। তারপর হইতে পাক-ভারতের বিভিন্ন স্থানে কাপড়ের মিল বা কল স্থাপিত হয়। ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে আসিয়া দেখা যায়– বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ২৩টি, বোম্বাই শহরে ৫২টি, ইন্দোরে ১টি, জববলপুরে ১টি, হিঙ্গনঘাটে ১টি, নাগপুরে ১টি, বুদনেবায় ১টি, আওরঙ্গবাদে ১টি, হায়দরাবাদে ১টি, কলবগায় ১টি, কানপুরে ৪টি, আগরায় ১টি, কলিকাতার সন্নিকট ৭টি, মাদ্রাজে ৪টি, বেরিলীতে ১টি, কালিকটে ১টি, বাঙ্গোলারে ২টি, পণ্ডিচেরীতে ১টি, কল স্থাপিত হইয়াছে। এই ১০৮টি মিলের মধ্যে ৫০টিতে সুতা ও কাপড় উভয়ই প্রস্তুত হইত। ৫৩টিতে কেবল সূতা এবং অবশিষ্ট ৫টিতে কেবল মাত্র বস্ত্র বয়ন করা হইত। তখন এই সমস্ত মিলে ২২,১৫৬টি তাঁত এবং ২,৬৬৬৯,৯২২ টি টাকু ছিল। প্রতি বৎসরে গড়ে ৪৩ লক্ষ মণ তুলার প্রয়োজন হইত এবং ৫৩,৩১৭ জন পুরুষ, ১৮,০৩১ জন স্ত্রীলোক, ১৫,৩০৯ জন যুবক ও ৩৪৬৯ জন বালক দৈনিক কাজ করিত[৫১]।

এই সময় পাক-ভারতে উৎপাদিত কার্পাস তুলার ৬০ ভাগ উল্লিখিত ভারতীয় মিলের প্রয়োজনে লাগিত। তখনও রাজশাহীর বাগমারা, বাঘা, নাটোর ও নওগাঁতে কার্পাস চাষ ছিল। রামপুর-বুযালিয়াতে সূতা প্রস্তুত ও কার্পাস বস্ত্র বয়ন হইত। তাহা একটু আগেই উল্লেখ করিয়াছি। বর্তমানে রাজশাহী তথা রাজশাহী বিভাগের অন্য কোথাও কার্পাস চাষ দেখা যায় না। তবে একটা সুসংবাদ এই যে, বগুড়াতে কটন স্পিনিং মিল স্থাপিত হইবার পর বগুড়ার স্বনামধন্য শিল্পপতি মরহুম মজিবর রহমান ভাণ্ডারী কর্তৃক ইং ১৯৪৮–৫৯ সালে বগুড়া জেলার কয়েক স্থানে (শেরপুর ও মহাস্থান গড় অঞ্চলে) মিশরীয় কার্পাস বীজের পরীক্ষামূলক চাষ আরম্ভ করিলে তাহার ফলন সন্তোষজনক হয়। এখন সেখানে কার্পাস চাষের উন্নতির জন্য (তুঁত চাষের বিস্তৃত পতিত ভূমিতে) একটি পরিকল্পনা চলিতেছে। সেখানে প্রায় কয়েক হাজার বিঘা ভূমি পতিত আছে[৫২]। বলা বাহুল্য, আজাদী যুগে আমাদের জাতীয় সরকার দেশী লুপ্ত সম্পদ উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছে– যেমন রেশম চাষের নিমিত্ত সচেতন হইয়াছেন তেমনই যদি কার্পাস চাষের পুনঃ প্রবর্তন করিবার জন্য সচেতন হইয়া উঠেন–তাহা দেশের পক্ষে সুখকর হইবে।

৫১. Vide-Indian Census Report, 1901, 1911.

৫২. উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

# নওয়াবী-আমল

(১৬০৮-১৭৫৭ সাল)

দিল্লীর তখ্‌তে বাদশাহ আওরঙ্গজেব[১]। বঙ্গে তখন মীর জুমলার আমল। এই যুগে রাজশাহী শহরের (বুয়ালিয়ার) উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল।

নওয়াবী আমলের প্রথম দিকে ইংরেজী ১৬৩৪ সালে জনৈক আলী-কুলীবেগ কর্তৃক শাহ্ মখ্‌দুমের সমাধি পুনঃনির্মিত হয়[২] এবং এই সময় একটি বাদশাহী পথে* 'বুযালিয়া' নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়[৩]। তারপর ঢাকা হইতে–রাজশাহীর চাপিলা, নাটোর লস্করপুর (পুঠিয়া) ও মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা ও ঢাকার জাফরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নৌকা পথে যাতায়াত চলিত। এই সব স্থানে বাজার বন্দর ছিল। এই সময় ভগবানগোলা হইতে আর একটি পথে সওদাগরী নৌকা বুয়ালিয়াতে (রাজশাহী শহরে) ভিড়িত। এই পথই ছিল তখন জল পথে মুর্শিদাবাদ হইতে 'বুয়ালিয়া' যাতায়াতের এক মাত্র পথ। বর্ষার সময় ইহার দূরত্ব ছিল সাড়ে ৯০ মাইল[৪]। সম্ভবত: ষোড়শ শতকে প্রসিদ্ধ শাহ্ মখ্‌দুম আউলিয়ার এখানে আগমনের পর তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যে মুসলমান জন বসিত গড়িয়া উঠে; তাহাই পরে শাহ্ দরবেশের নামানুসারে এই স্থান 'বুয়ালিয়া' নামে অভিহিত হয়। যথা–বু + আউলিয়া = বুআউলিয়া বা ওলন্দাজদের 'বাউলিয়া' নামের উৎপত্তি। 'রাজশাহী' নাম করণও এই যুগের একটি বিশিষ্ট ঘটনা 'এবং ইহা ব্যতীত বুয়ালিয়াতে ওলন্দাজদের যাতায়াত ও ব্যবসায়িক কুঠি স্থাপন;[৬] মারাঠা কর্তৃক মুর্শিদাবাদ আক্রান্ত এবং মুর্শিদাবাদ হইতে বুয়ালিয়া প্রভৃতি স্থানে মোহাজেরদের আগমন ও বসতি স্থাপন[৭]; ফানডেন্ ব্রুকের বঙ্গ-নকশায় বুয়ালিয়া বন্দরের উল্লেখ[৮] ইত্যাদি স্মরণীয় ব্যাপার। তারপর এই সময় ব্রুকের উক্ত নকশায়[৯] উল্লিখিত একটি শাহী পথ বুয়ালিয়া অতিক্রম করিয়াছে। অতঃপর একটি ছোট বন্দর হিসাবে বুয়ালিয়া তখন দেশী ব্যবসায়ীগণের কাছে বেশ পরিচিত হইয়া উঠে এবং স্থায়ী ব্যবসাযীগণ সেখানে কেনা বেচা করিতে থাকে। তখন কাঁচা

সমাধি নির্মাণ, চাপিলা, ভগবানগোলা, জাফরগঞ্জ, বাদশাহী পথ

১. Stewarts History of Bengal, P, 312, History of Bengal Vol II P (D U) 342
২. Inscriptions of Bengal, Vol IV P 272
*. রাজশাহীর ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে পথ–ঘাট দ্রষ্টব্য।
৩. বগুড়ার ইতিকাহিনী, পৃঃ ৩৬৫।
৪. রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃঃ ৩৩৪।
৫. আগের অধ্যায়ে বর্ণিত 'নামকরণ' দ্রষ্টব্য।
৬. Hunter's Statistical Account of Bengal, Rajshahi, P 53
৭. Sier-u-Matakharin-Vol II, P 396
৮ See Venden Bruck's Map, V, 1660
৯. বগুড়ার ইতিকাহিনী পৃঃ ১১২, Rajshahi Gazetteer P. 173

মালের মধ্যে রেশম ও কার্পাসের ব্যবসায়ই ছিল বুয়ালিয়া-বন্দরের প্রধান বাণিজ্য-সম্পদ। কারণ এই সময় রাজশাহী জেলায় কার্পাস ও রেশম বস্ত্র বয়ন এবং কারবার চলিত। এশিয়ার গরম প্রধান দেশগুলিতে নওয়াব ও সুলতানেরা তখন দেশী উৎপন্নজাত বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী করিয়া প্রচুর অর্থ আয় করিতেন। বঙ্গ দেশে তখন 'কুমারখালি' 'কাশিমবাজার' ও বুয়ালিয়া' রেশম এবং কার্পাসের এক মাত্র বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল[১০]।

যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার জন্য এই যুগে নদী পথে নৌকা, স্থল পথে গো-যান, ঘোড়া, পালকী, ডুলী প্রভৃতি যান-বাহনের বাহন হিসাবে ব্যবহার হইত। রাজ-রাজড়ারা ও বিত্তশালী লোকেরা হাতী পুষিতেন এবং যান-বাহনের কার্য্যে উহা ব্যবহার করিতেন। যুদ্ধাভিযানেও তখনও হাতীর ভূমিকা ছিল।

যানবাহন

পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর এক মাত্র পরিধেয় বস্ত্র ছিল। পায়ে নাগরা বা চটী ও বৃদ্ধরা সাধারণতঃ হাতে লাঠি ব্যবহার করিত। সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা মাথায় টুপী, পাগড়ী এবং ঢিলা পাজামা-আছকান রেশমী ফুলকাটা জামা, সদরিযা, কুরতা ব্যবহার করিতেন। নওয়াবী আমলের প্রথম ভাগে এখানে দোচালা ঘরের (বাংলা-ঘর) আধিক্য ছিল। ঘরের খিরকীগুলি খুব ছোট। প্রতি ঘরে মাত্র ২/১টি করিয়া খিরকী থাকিত।

পোশাক পরিচ্ছদ

বালিময় ভূমির জন্য মাটীর ঘর প্রায়ই টিকিত না। বাঁশের ছেচার দ্বারা চারি ধারে বেড়া দিয়া ঘর প্রস্তুত হইত। ইষ্টক নির্মিত পাকা বাড়ীর মধ্যে শাহ্ মখ্দুমের সমাধি, সাধন-পীঠ ও ওলন্দাজদের কুঠি; আর তিনটি মসজিদ ব্যতীত তখন্ উল্লেখযোগ্য কোন পাকা বাড়ীর খোঁজ এখানে ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় না।

বাড়ী-ঘব

১০. Hunter's Statistical Account of Bengal, Rajshahi, P. 20.

## ॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

# ইংরেজ আমল

(১৫৭৫-১৯৪৭ সাল)

ইংরেজী ১৭৫৭ সালে ২৩শে জুন[১১] (তারিখে) পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের কাছে বাঙ্গলার নওয়াব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় বরণ বাঙ্গালীর ইতিহাসে ১৯০ বৎসরের একটি কলঙ্কময় অধ্যায়। ১৭৬৫ সালে দিল্লীর নাম সর্বস্ব বাদশাহ্ শাহ্ আলমের নিকট হইতে ক্লাইভ বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব ধার্য্যে সুবে-বাঙলা-বিহার-ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। রাজস্ব আদায়ের সময়ে রামপুর-বুয়ালিয়াতে তখন ইংরেজদের কোন আধিপত্য ছিল না ইং ১৭৬৫ সাল হইতে ১৭৯৩ সাল পর্য্যন্ত তাহারা দেওয়ানীর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। তারপর ইং ১৭৯৩ সাল হইতে ইং ১৮২৫ সাল পর্য্যন্ত ইংরেজেরা রাজস্ব আদায় ও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে নাটোরে হেড কোয়ার্টার্স স্থাপন করিয়া যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিল। তাহারা কলিকাতা হইতে হুগলী নদী বাহিয়া মুর্শিদাবাদ; তারপর পাগলা বা ভৈরব কখন বা ভগবানগোলায় পদ্মার স্রোতে তরী

**রাজশাহী জেলার সদর স্থনান্তরিত**

ভাসাইয়া নারদ হইয়া নাটোরে যাতায়াত করিত। লর্ড আমহার্ষ্টের (ইং ১৮২৩ -১৮২৮ সাল) সময়ে নারদ নদীর পদ্মামুখ বন্ধ হইয়া গেলে নদীর গতি প্রবাহ ক্ষীণতর হইতে থাকে এবং নিম্ন ভূমি হেতু নাটোর টাউন অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। নদী সংস্কারের কোন চেষ্টা করা হয় না। অবশেষে দূষিত আবহাওয়ার দরুণ টাউনবাসী বার বার নানা পীড়াগ্রস্থ হইতে থাকিলে ইং ১৮২৫ সালে রাজশাহী জেলার সদর দপ্তর রামপুর-বুয়ালিয়াতে স্থানান্তরিত করা হয়[১২]। তখন বুয়ালিয়া বিখ্যাত বাণিজ্য-বন্দর; আবাসিক স্থায়ী কুঠির মধ্যে ওলন্দাজদের কুঠি, ফরাসীদের ভাড়াটিয়া কুঠি ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কারবার ইত্যাদি ছিল।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে ওলন্দাজদের এতদঞ্চলের বাণিজ্যিক কেন্দ্রীয় কুঠিরূপে এই 'বড় কুঠি'[১২] কামরা বিশিষ্ট দ্বিতলাকারে স্থাপিত হয়[১৩]। এই মূল কুঠির দৈর্ঘ্য ৮২ ফুট; প্রস্থ ৬৭ ফুট। একটি সভা কক্ষ বিশিষ্ট উপরে ৬টি কামরা আছে। ইহার

**বড় কুঠি**

দরজা ও জানালাগুলি অধিকাংশই সুপ্রশস্থ ও প্রায় একই মাপের দেখা যায়। নীচের কামরাগুলি বর্তমানে বহু কামরায় বিভক্ত করা হইয়াছে। উপরে উঠা নামার জন্য পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া একটি প্রশস্ত সিঁড়ি রহিয়াছে। ইংরেজ আমলে এই সুবৃহৎ কুঠির সহিত আরও কতকগুলি কামরা

---

১১. বগুড়ার ইতিকাহিনী পৃঃ ৪৯৫-৪৯৭।

১২. Statistical Account of Bengal, Rajshahi, pp 53-54, রাজশাহীব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পৃঃ ৫৬; মহারাণী শরৎ সুন্দরীর জীবন চরিত, পৃঃ ১৫; Rajshahi Gazetteer. p. 170, Imperial Gazetteer of India, Provincial Series p. 209, পুঁঠিয়ার রাজ বংশ পৃঃ ৩০১-৩২।

১৩. Important Centre of Commerce it was first Selected by the Dutch. as the Seat of a factory Statistical Account of Bengal, Rajshahi, p 53.

সংযোজিত করিয়া কুঠির আকার বড় করা হইয়াছিল। কিন্তু, বাঙ্‌লা ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে (ইং ১৮৯৭ সাল) উক্ত সংশ্লিষ্ট কামরাগুলি ভূমিস্মাৎ হইয়া গেলে যে অংশটি অবশিষ্ট থাকে, উহাই আদি ও বর্তমান 'বড় কুঠি'। নীচের কামরাগুলি অপেক্ষাকৃত অন্ধকার পূর্ণ। তখন এই কামরাগুলি রেশমের গুদামরূপে ব্যবহৃত হইত। উপরের কামরাগুলি আবাসিক বাংলোর জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত। ওলন্দাজগণের সময়ে এই দুর্গবিশিষ্ট সুদৃশ্য সৌধটি সুরক্ষিত ছিল। যে কোন দিক হইতে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে, সেই জন্য কুঠির প্রত্যেক ধারে শান্ত্রি-গৃহ (Towors) ছিল। উহার প্রাচীর-দেওয়ালে শত্রু সৈন্য লক্ষ্য করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল এবং শান্ত্রি-গৃহগুলিতে বন্দুকধারী পাহারারত রক্ষী থাকিত। এই সময়ে কুঠির ছাদের উপরে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ধরণের কামান স্থাপিত ছিল। পরবর্তীকালে সেই সব মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী কর্তৃক নদীয়ার শীকারপুর কুঠিতে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে উহার একটি কামান রামপুর-বুয়ালিয়ার পুলিশ লাইনে রক্ষিত ছিল। উহা মধ্যাহ্নকালীন তোপধ্বনি করিবার জন্য ব্যবহার করা হইত। (Where it served still a few years ago as the midday gun) সেই কামানের নলে বন্ধুর ভাবে ভি, ও, সি, এ (V. O. C. A.) অক্ষর কয়েকটি উৎকীর্ণ ছিল। ইহার প্রথম তিনটি অক্ষর যুক্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভেরিনিগডি ওস্‌টেনডিশ্ (Vereenigde ostindiche) কোম্পানীর পরিচায়ক বলিয়া অনুমিত হয়। এতদব্যতীত এ বিষয়ে আর কোন বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না। সম্ভবত: উহা বড় কুঠিতে ওলন্দাজগণের রক্ষিত একটি কামান ছিল বলিয়া মনে হয়। অপর একটি অচল ৭ ফিট লম্বা ক্ষুদ্র কামান বিশেষ বুয়ালিয়া কুঠি হইতে 'মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী' মুর্শিদাবাদের মরিচাই কুঠির ম্যানেজার সাহেবের বাংলোতে স্থানান্তরিত করে। অনুসন্ধানে জানা যায় যে মালয়ে বাণিজ্যকালে ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজদের বিরুদ্ধে পূর্ব দেশীয় জলদস্যুগণ কর্তৃক এই জাতীয় কামান ব্যবহৃত হইত। পরবর্তীকালে শান্তির সময়ে মালয় জলদস্যু এই সব প্রয়োজনীয় বহু অস্ত্রশস্ত্র ওলন্দাজ ও পর্ত্ত্যগীজদিগকে দিয়া ছিল। এই ক্ষুদ্র কামানটি সাধারণত: আত্মরক্ষা মূলক কার্য্যে ব্যবহার করা হইত। খুব সম্ভব এই বিশেষ কামানটি ওলন্দাজগণ নদী পথে রেশম অথবা অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদির সহিত নৌকার মধ্যে লুকাইয়া এখানে আনিয়াছিল[১৪]। এতদব্যতীত পুলিশ লাইনে বর্তমানে দুইটি ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কুঠিতে একটি প্রাচীন কামান রক্ষিত আছে। এই তিনটি কামান কোথা হইতে আনা হইয়াছে তাহার সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে প্রাচীন লোক মুখে শোনা যায়। এই সব কামান বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে বুয়ালিয়ার ইংরেজদের স্থানীয় কুঠি হইতে সেখানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

যাহা হউক, ওলন্দাজগণ এই কুঠি ইং ১৮৩৩ সালে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে উহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক আবাসিক কুঠিরূপে পরিণত হয়। তৎপর ইং ১৮৩৫ সালে উহা মেসার্স রবাট ওয়াট্‌শন এণ্ড কোম্পানীর হাতে চলিয়া যায়। মেসার্স

১৪. রাজশাহীর গেজেটিয়ার লেখক মিঃ ও'মেলী এই খবরটি মরিচাই (মুর্শিদাবাদ) কুঠির জনৈক মিঃ আর, জি, ম্যাকডনেল এর কাছে সংগ্রহ কবিয়াছিলেন। তিনি উহার ফটোগ্রাফ দেখিয়াছেন। উহা দোনলা বিশিষ্ট কামান। বারুদ ভর্তি করিবার পর, ব্যবহার করিবার সময় পর পর দুইবার উহার আওয়াজ হইত। ইহাই ছিল এই কামানের বৈশিষ্ট।

ওয়াট্‌শন কোম্পানী দীর্ঘ দিন ধরিয়া রেশম ও নীল কারবারের জন্য এই কুঠি ব্যবহার করে।

সিপাহী বিপ্লবের সময় এই কুঠি ইংরেজদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জন্য এতদঞ্চলের বিশেষ হেড্ কোয়াটার্স নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঊনবিংশ-বিংশ শতকে এই কুঠি মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর অধিকার ভুক্ত হয়। পরে এই কুঠির আংশিক মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী 'ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন এণ্ড রিভার্স ষ্টিম' কোম্পানীর বুয়ালিয়া শাখার (Local Agent) কর্মচারীদের বাসস্থান ও আফিস গৃহের জন্য ভাড়া দিয়াছিল। তারপর ইং ১৯৫১ সালে জমিদারী একোয়ার্ড করা হইলে তখন এই কুঠি পাকিস্তান সরকারের খাস মহল (Koas mahal) ভূক্ত হইয়া যায়। অতঃপর এই কুঠি রাজশাহী জেলা তথা বিভাগীয় খাদ্য বিভাগের আফিসাদির জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে। পরবর্ত্তীকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে এই দ্বিতল সৌধটি (বড় কুঠি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলারের অস্থায়ী আফিস ও আবাসিক কুঠিরূপে রূপান্তরিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। উক্ত কুঠির চতুষ্পার্শ্বে ইংরেজ সাহেবদের বসতি ছিল। রামপুর-বুয়ালিয়ার প্রাচীন ভূমি নক্‌শাতে এই সবের উল্লেখ আছে। ওলন্দাজদের এই বড় কুঠি ব্যতীত ইংরেজদের (বিশেষতঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর) আর একটি কীর্ত্তি এই 'সাহেব বাজার'।

ইংরেজ রেশম কুঠিয়ালদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সময়ে এখানে তাহাদের একটি কলোনী ও বাজার গড়িয়া উঠে। তাহা 'সাহেবগঞ্জ' নামে খ্যাত ছিল, এই 'সাহেবগঞ্জ' নদী গর্ভে ভাঙ্গিয়া গেলে বর্তমান 'সাহেব বাজারের' সৃষ্টি হয়। এই সময়ে (ইংরেজ আমলে) প্রাচীন পাকা বাড়ীগুলির মধ্যে কেমিষ্ট্রী বিল্ডিং; কলেজের মেইন বিল্ডিং, মাদ্রাসা বিল্ডিং, উল্লেখযোগ্য[১৫]। কলেজিয়েট স্কুল বিল্ডিংও প্রাচীন। এতদব্যতীত রাজশাহী সেণ্ট্রাল জেলের চত্বরের উত্তর ধারে পূর্ব-পশ্চিম লম্বা একটি বিশিষ্ট ব্যারাক প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। এই জেলখানার দক্ষিণে শ্রীরামপুর মৌজায় ইংরেজদের আর একটি কলোনী গড়িয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর শ্রীরামপুর মৌজায় অবস্থিত সরকারী আফিসাদি সহ কলোনীটি পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গেলে জেলখানার চত্বরে ইংরেজ আমলের উক্ত সুবৃহৎ এক তালা ব্যারাকটিকে কেন্দ্র করিয়া ইং ১৮২৫ সালে বুয়ালিয়াতে প্রথম জেলখানা স্থাপিত হয়[১৬]।

ব্যারাক বা প্রথম জেলখানা

এতদব্যতীত মতিহার, কাজলা প্রভৃতি স্থানে এবং বুয়ালিয়া, রাণীবাজার প্রভৃতি প্রাচীন পল্লীতে অনেক পুরাতন পাকাবাড়ী ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে রেশম ব্যবসায়ী কর্তৃক বিনির্মিত হইয়া ছিল। তাহার নিদর্শন এখনও এই সব অঞ্চলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ওলন্দাজ, ইংরেজ ও দেশী রেশম ব্যবসায়ীদের কর্ম কীর্তির ইহাই হইল মোটামুটি কথা।

ইংরেজী ১৮২৫ সালে জেলার সদর দপ্তর রামপুর-বুয়ালিয়াতে স্থানান্তরিত হইবার পর হইতে ইংরেজ শাসকদেব হস্তক্ষেপ ও রাজশাহীর রাজা জমিদারদের প্রচেষ্টায় বুয়ালিয়া-টাউনের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিবিধ জন কল্যাণ মূলক সংস্থার মাধ্যমে রামপুর-বুয়ালিয়ার আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

---

১৫. Rajshahi Gazetteer. P 183.

১৬. Vide old records of the Rajshahi Centaral Jail.

ইং ১৮২৫ সালের পর

আমরা এখন সেই সব প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক ফিরিস্তি প্রদান করিব। প্রথমেই বলিতে হয় রাজশাহীর শিক্ষা ব্যবস্থার কথা। ইং ১৮২৮ সালে বুয়ালিয়াতে ইংলিশ স্কুল স্থাপিত হইবার পূর্বে স্থানীয় দরগাপাড়া মহল্লায় মখ্‌দুম সাহেবের মসজিদে ও হাতেম খাঁর ওয়াহাবী মস্‌জিদে দুইটি মক্তবে মুসলমান ছেলে-মেয়েদের আরবী, ফারসী ও কোরাণ, হাদিস শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। এতদব্যতীত মেহেদীপুর (লক্ষ্মীপুর), কাদিরগঞ্জ ও সাহেব বাজার মস্‌জিদেও দর্স (পড়ান) হইত। তখন ইংরেজী পড়া ঘৃণীত বিবেচিত হওয়ায় মুসলমান ছেলেরা ইংরেজী প্রায়ই পড়িত না। এই সময় এখানে হিন্দুদেরও শিক্ষা-দীক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। নাটোর রাজশাহী জেলার কেন্দ্রস্থল থাকায় নাটোরকে কেন্দ্র করিয়া উহার চারি পার্শ্বে বহু টোল ও বঙ্গ ভাষা শিক্ষার জন্য প্রাইভেট বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজা জমিদারদের অর্থে সেই সব বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করা হইত। তখন বুয়ালিয়াতে অবস্থিত অধিকাংশ বিদেশী হিন্দু রেশম ব্যবসায়ীদের বাস। স্থানীয় হিন্দুরা অধিকাংশই গরীব ছিল। সাধারণত: শিক্ষা-দীক্ষার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল না। তবে প্রাচীন কাগজ পত্রে কোরাণ-হাদিস, ফারসী ব্যাকরণ ও হিসাব শিক্ষার জন্য উল্লিখিত মক্তব-মাদ্রাসার কথার উল্লেখ আছে[১৭]। সপুরার মাদ্রাসা হিসাব ও ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বহু দূর হইতে ছাত্ররা আসিয়া পড়াশুনা করিত। শহরের হাতেম খাঁ মস্‌জিদে (ওয়াহাবীদের মস্‌জিদ) দর্সে নিজামিয়া পড়ান হইত। পূর্ব রীতি অনুসারে বর্তমানে এই হাতেম খাঁ মস্‌জিদে এখনও মাদ্রাসা কায়েম রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই মাদ্রাসার প্রাচীন কাগজ পত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকটি হস্ত লিখিত কোরাণ শরীফ ও কয়েক খণ্ড ফারসী কেতাব ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাজা জমিদারদের আগমন

জেলার সদর রামপুর-বুয়ালিয়াতে স্থানান্তরিত হইবার পর, ধীরে ধীরে জেলার রাজা জমিদারদের আনাগোনা চলিতে থাকে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নাটোর, দিঘাপতিয়া, পুঁঠিয়া তাহিরপুর, দুবোলহাটি, কাশিমপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদারদের আবাসিক কুঠি প্রভৃতি স্থাপিত হইয়া যায়।

কলেজিয়েট স্কুল (১৮২৮ সাল)

ইংরেজী ১৮২৮ সালে ইতিহাস প্রসিদ্ধ গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংকের ঐকান্তিক চেষ্টায় 'বুয়ালিয়া ইংলিশ স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহাই রাজশাহী জেলার প্রাচীনতম ইংরেজী বিদ্যালয়। আজ যাহা 'রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল' নামে খ্যাত। প্রকাশ, পদ্মাতীরে ক্ষুদ্র একটি বাংলো প্যাটার্ণে খড়ের ঘরে এই ইংরেজী বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয়। ইংরেজী ১৮৩৬ সালের পূর্ব পর্য্যন্ত ইহা স্থানীয় দানশীল ব্যবসায়ী ও ইংরেজ কোম্পানীদের সাহায্যে উহার ব্যয়ভার বহন হইতে থাকে। ইংরেজীর মাধ্যমে এই স্কুলের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়[১৮]।

প্রথম পাকা বাড়ী

ইংরেজী ১৮৩৬ সালে মিঃ এডামের বিখ্যাত শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টের (Mr. Adam's Report on Education) পর উক্ত সালের ২০শে জুন 'বুয়ালিয়া ইংলিশ স্কুল' সরকারী

১৭. সপুরার পীর সাহেবের বাড়ীতে রক্ষিত কয়েকটি চিঠিতে এবং দরগার প্রাচীন কাগজ পত্রে উহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৮ Rajshahi College-Prospectus-P. 1933-1934; and see-College Magazing-Form 1933-36, and Iso-Collegiate School's History on the Black Board.

স্কুলের মর্য্যাদায় উন্নীত হইয়া 'জেলা স্কুল' নামে অভিহিত[১৯] হয়। জনৈক সারদা প্রসাদ বোস তখন এই স্কুলের প্রথম ও প্রধান শিক্ষক। এই সময় স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল মোট ৮৩ জন। তন্মধ্যে ৭৮ জন হিন্দু, দুই জন মুসলমান, তিন জন খৃষ্টান। ছাত্রদের মাসিক বেতন ছিল ১ টাকা। ইং ১৮৩৯ সালে ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮৮ জন। তখনও উপর শ্রেণীর ছাত্রদের মাসিক বেতন ছিল মাত্র ১ টাকা। ইং ১৮৪৯ সালে এই 'জেলা স্কুলের' বাড়ী পাকা করা হয়; বর্তমান স্কুলের "মেইন বিল্ডিং" তাহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

ইং ১৮৩৬ সাল হইতে ১৮৪৪ সাল পর্য্যন্ত শ্রীবোস অতি সুনামের সহিত এই স্কুলে কার্য্য করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ইং ১৮৪৪ সাল হইতে এই স্কুলের ছাত্রদের বৃত্তি লাভ শুরু হয়। প্রথম চারি বৎসরের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

| | | |
|---|---|---|
| বৃত্তি | ইং ১৮৪৪ সাল | ১ জন |
| বৃত্তি | ইং ১৮৪৫ সাল | ১ জন |
| | ইং ১৮৪৭ সাল | ৩ জন |
| " | ইং ১৮৪৯ সাল | ২ জন |

এই স্কুল সরকারী মর্য্যাদায় উন্নীত হইবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত কম বেশী প্রায় বৎসরই একাধিক ছাত্র প্রত্যেক বৎসরে প্রথম ও দ্বিতীয় মানের অধিকার লাভ করিয়া বৃত্তি পাইয়া আসিতেছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রত্যেক বৎসরে এখানকার অধিকাংশ ছাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। ইং ১৯২৪ সালের ৩০ জন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ২৭ জনই প্রথম বিভাগে পাশ করিয়া এক বিরাট কীর্তি স্থাপন করিয়াছে।

ইংরেজী ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত এই স্কুলের কয়েকজন কৃতী ছাত্রদের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ইং ১৮৭৮ সাল শ্রীকিশোরী মোহন চৌধুরী, শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্র

" ১৮৭৯ " শ্রীরামচন্দ্র রায়

" ১৮৮৭ " শ্রীসুদর্শন চক্রবর্ত্তী। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ৮টি বিষয়ে ৮০ নম্বরের অধিক পাইয়া বঙ্গ দেশে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। তাঁহার প্রত্যেকটি খাতা বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রশালায় সংরক্ষিত আছে। শ্রীযদুনাথ সরকারও এই সালের একজন কীর্তি ছাত্র।

ইং ১৮৮৯ সাল জনাব ইমাদ্ উদ্-দীন[২০] চৌধুরী

১৮৯৩ " শ্রীসুরেন্দ্র মোহন মৈত্র

১৯০৪ " শ্রী বি, এম, সেন

১৯০৯ " শ্রী চন্দ্র শেখর সরকার

১৯১২ " শ্রীব্রজেন্দ্র মোহন মৈত্র[২১]

---

১৯. রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—পৃঃ ৮০: Rajshahi College Magazine 1934 Vol, XXIII, No 1. V. P. 82

২০. ইনি পূর্বে মালদহ জেলার (এখন রাজশাহীর অন্তর্ভুক্ত) রাজারামপুর নিবাসী ছিলেন।

রাজশাহীর প্রাচীন বিদ্যালয়গুলির মধ্যে বলিতে গেলে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের পরেই রাজশাহী লোকনাথ স্কুলের নাম করিতে হয়। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে তখন দরিদ্র ছাত্রদের বেতন ব্যতীত (Fee) শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা না থাকায় রামপুর-বুয়ালিয়াস্থিত পাবনা জেলার শীতলাই নিবাসী প্রসিদ্ধ দানশীল জমিদার রায় লোকনাথ মৈত্র' ইং ১৮৪৭ সালে বুয়ালিয়াতে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য প্রাথমিক অবৈতনিক 'ইংরেজী-বাঙ্লা স্কুল' স্থাপিত করেন[২২]। সেই বিদ্যালয়টিই আজ "লোকনাথ হাই স্কুল" নামে খ্যাত। ইংরেজী ১৮৬২ সাল হইতে ইং ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত ইহা মধ্য ইংরেজী স্কুল নামে পরিচিত ছিল। ইংরেজী ১৯২১ সালে রায় লোকনাথ মৈত্রের উত্তরাধিকারী বাবু যোগীন্দ্র নাথ মৈত্রের অর্থানুকূল্যে ইহা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় (Up to Class X)।

রাজশাহী লোকনাথ উচ্চ বিদ্যালয় (ইং ১৮৪৭)

শহরের [illegible]স্থলে রাজশাহী কলেজ সংলগ্ন এই বিদ্যালয়ের দ্বিতল "প্রাসাদোপম পাকা-বাড়ী" এক খণ্ড স্বতন্ত্র ভূমির উপর অবস্থিত। বিরাট তোরণ বিশিষ্ট পূর্বদিকে প্রবেশ পথে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলে ইহা একটি রাজবাড়ী বলিয়া ভ্রম হইবে।

ইংরেজী ১৯২১ সালে এই বিদ্যালয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় উন্নীত হইলে শ্রীনিত্য গোপাল সান্যাল প্রথম ও প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন। তাঁহার পর যিনি এই বিদ্যালয়কে লালন-পালন করত: বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন তিনি হইলেন 'শ্রীগোষ্ট বিহারী মজুমদার'। বিভাগ পূর্বকালে ইনিই ছিলেন এই বিদ্যালয়ের প্রকৃত জনক। তাঁহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও যত্নে এই বিদ্যালয়ের আয়তন বাড়িয়া যায় এবং করগেটের টিন হইতে বিরাট অট্টালিকায় পরিণত হয়। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল এই বিদ্যাপীঠের সেবা ও যত্ন করিয়া নানাবিধ উন্নতি করিয়াছেন। ইং ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগকালে এই বিদ্যালয় হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁহার সময়ে এই বিদ্যালয় হইতে যে সব কৃতী ছাত্র সরকারী বৃত্তি ও প্রশংসা সূচক পদক পাইয়া ধন্য হইয়াছেন, নিম্নে তাঁহাদের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

| | |
|---|---|
| ইং ১৯২৫ সাল | শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, জনাব শুকুর মুহাম্মদ মিঞা |
| " ১৯২৭ " | শ্রীগোপাল কৃষ্ণ সরকার |
| " ১৯৩৪ " | শ্রীবীরেন্দ্র নাথ লাহিড়ী |
| " ১৯৩৬ " | জনাব হাসানাজ্জামান, শ্রীবিভূতি ভূষণ পাল চৌধুরী |
| " ১৯৩৯ " | শ্রীসত্যব্রত মৈত্র |
| " ১৯৪০ " | শ্রীঅমীয় কুমার সেন, শ্রীসুশান্ত কুমার সরকার |
| " ১৯৪৪ " | শ্রীরবীন্দ্র নাথ ধর |

---

[illegible]

গবর্ণর সর্ব প্রথম এই স্কুল পরিদর্শন করিয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

২২. রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পৃঃ ৮০-৮১; Hunter's statistical account of Bengal, Rajshahi P 92 and also see-108-115.

দেশ বিভাগের পর নানা কারণে এই বিদ্যালয়ের অবনতি ঘটে। ফলে, ছাত্র সংখ্যাও হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু বিদ্যালয়-পরিচালক কমিটির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই বিদ্যাপীঠের বর্তমান অবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত।

এই স্কুলের অভ্যন্তরে, এক তালা বিশিষ্ট বাংলো প্যাটার্ণের প্রাচীন দালানটি .এই বিদ্যালয়ের আদি ভবন বলিয়া মনে হয়। ইহা একটি রেশম কুঠি ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন।

প্রাচীন দালান

তদানীন্তন বাঙলার লেপ্টন্যাণ্ট গবর্ণর স্যার জন্ পিটার গ্রাণ্ট (ইংরেজী ১৮৫৯-৬২ সালে) বাঙলার নিম্ন শিক্ষার উন্নতির ব্যাপারে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তিনি বালক বালিকাদের 'শিক্ষার' উন্নতির জন্য 'গুরু মহাশয় প্রস্তুত' ট্রেনিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া অমর হইয়া আছেন।

বালক পাঠশালার শিক্ষক প্রস্তুতের জন্য ইং ১৮৬৫ সালে ১৫ই নভেম্বর বুয়ালিয়াতে 'রাজশাহী ট্রেনিং স্কুল' নামে একটি স্কুল স্থাপিত হয়। উহার চারি বৎসর পর ইং ১৮৬৯ সালে নাটোরের ছোট তরফের রাজা চন্দ্রনাথ রায়ের মাসিক ১২৫ টাকা সাহায্যে ও বাঙলা সরকারের মাসিক ১৫০ টাকা নির্দ্ধারিত সাহায্যে বালিকা পাঠশালার শিক্ষয়িত্রীর ট্রেনিং জন্য 'ফিমেল নরমাল স্কুল' নামে আর একটি স্কুল উক্ত সালের অক্টোবর মাসে স্থাপিত হয়। কিন্তু এই 'ফিমেল নরমাল স্কুল' নানা কারণে বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে নাই।[২৩] বালকদিগের পাঠশালার পণ্ডিতদের ট্রেনিং জন্য যে পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা পরিবর্তিত হইয়া পরে প্রথম শ্রেণীর 'নরমাল স্কুলে' পরিণত হয়। কোন কারণ বশত: এখানে অনাবশ্যক বিধায় এই বিদ্যালয়টি পরে রংপুরে উঠিয়া যায়[২৪]। রংপুরে এখনও উহার অস্তিত্ব আছে। উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে এখন রাজশাহীর সুবিখ্যাত কলেজ প্রসঙ্গে কিছু আলোকপাত করিব।

ট্রেনিং স্কুল
(ইং ১৮৬৫ সাল)

ফিমেল নরমাল স্কুল
(ইং ১৮৬৯ সাল)

ইংরেজ কোম্পানীর আমলের তিনটি কীর্তি উত্তর বঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। কলিকাতার সহিত উত্তরবঙ্গের সংযোগ রক্ষার জন্য পদ্মার উপর 'সাঁড়াব্রিজ' স্থাপন 'প্রথম কীর্তি'। উত্তরবঙ্গের জনসাধারণের যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার জন্য "উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের' (North Bengal Railway) ব্যবস্থা প্রবর্তন 'দ্বিতীয় কীর্তি'; উত্তর বঙ্গে উচ্চ শিক্ষার প্রসার ও ব্যাপক উন্নতি কল্পে 'রাজশাহী কলেজ' স্থাপনের অনুমতি দান 'তৃতীয় কীর্তি'। অবিভক্ত বঙ্গে 'রাজশাহী কলেজ; সরকারী মর্যাদায় প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় কলেজ হিসেবে বরাবরই সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। বঙ্গ ভঙ্গের পরেও পূর্ব বঙ্গ ও আসামে ইহাই প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসাবে মর্যাদা পাইয়াছে। আজ পাকিস্তান যুগেও পূর্ব পাকিস্তানে ইহাই এক মাত্র আবাসিক প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সরকারী কলেজ। অতীতে এই কলেজের অধিক সংখ্যক কৃতী ছাত্র পাক-ভারতে উচ্চ-পদমর্যাদার সহিত সুনাম, সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। এখানকার কৃতী ছাত্রগণ অনেকেই জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার. চিফ- সেক্রেটারী, ভাইস-চ্যান্সেলর, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ প্রভৃতি পদ অধিকারের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন।

রাজশাহী কলেজ
(ইং ১৮৭৩ সাল)

---

২৩. Hunter's statistical account of Bengal, Rajshahi. P. 92 and also see-108-118

২৪. রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃঃ ৮৪।

ইংরেজী ১৮৯৫ সালে সর্বপ্রথম এই কলেজ হইতে দুই জন ছাত্রকে এম, এ, পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রথম জন নাটোর নিবাসী জনৈক 'জনাব চয়েন উদ্দিন আহম্মদ' ইংরেজীতে তৃতীয় স্থান লাভ করিয়া তিনি কলেজকে ধন্য করেন। পরে তিনি খান বাহাদুর ও বাঙলা সরকারের চিফ-সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় জন শ্রীএন, এন, লাহিড়ী কেমিষ্ট্রিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়া ধন্য হন। তিনি রায় বাহাদুর এবং সেশন জজ-রূপে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রথম কৃতী ছাত্রদ্বয়

লর্ড মেয়োর আমলে বাঙলা-ইংরেজী উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে কল্পনা জল্পনা চলিতে থাকে।[২৫] কিন্তু তিনি উচ্চ শিক্ষার পক্ষপাতী না হইয়া বরং নিম্ন শিক্ষা প্রসারের জন্য অর্থব্যয় করিতে থাকেন। পরবর্তী গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক এদেশে ইংরেজী উচ্চ শিক্ষার পক্ষপাতিত্ব করেন।[২৬] ইতিপূর্বে উত্তর বঙ্গের রাজা জমিদারগণ উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে এখানে চেষ্টা করিতেছিলেন। বলা বাহুল্য, নর্থব্রুকের আগমনের প্রাক্কালে রাজশাহীর দুবোলহাটির জমিদার হরনাথ রায় বাহাদুর উচ্চ শিক্ষা প্রসারে অগ্রগামী হইয়া রাজশাহীর বুয়ালিয়াতে একটি কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে 'কোম্পানীর কাগজে' সর্বপ্রথম ৫০০০ টাকা তদানীন্তন বাঙলা সরকারকে প্রদান করেন। নর্থব্রুক ইং ১৮৭২ সালে গবর্ণর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই শিক্ষার ব্যাপারে রায় বাহাদুর হরনাথের এই মহৎ দান আগ্রহের সহিত অনুমোদন করেন। অতঃপর ১৮৭৩ সালে বুয়ালিয়া ইংলিশ স্কুলে ১লা এপ্রিলে ৬ জন ছাত্র লইয়া (১ম ও ২য় বর্ষ) এফ, এ, ক্লাস শুরু হয়। তখন তদানীন্তন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীহরগোবিন্দ সেনের উপর এই কলেজ পরিচালনার ভার অর্পিত হয়। খুশীর বিষয় এই যে, হরগোবিন্দ বাবু ইং ১৮৪৮ সালের 'বুয়ালিয়া ইংলিশ স্কুলের' একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। কিছুকাল পরে এই কলেজকে একটি উন্নত শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে দিঘাপতিয়ার স্বনাম ধন্য জমিদার রাজা প্রমথনাথ রায় ১,৫০,০০০ টাকা রাজশাহী সভার (Rajshahi Association) মাধ্যমে দান করেন। ইং ১৮৭৭ সালে বাঙলা সরকার ২৮৭৮ নম্বরের একটি চিঠিতে ১লা অক্টোবর, অনুমোদন করিলে ইং ১৮৭৮ সালে এই কলেজে বি, এ, ক্লাস খোলা হয়। এই সময় উহা বুয়ালিয়া ইংলিশ স্কুল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া 'রাজশাহী কলেজ' নামে অভিহিত হয়।[২৭]

বি. এ.

ইংরেজী ১৮৭৬ সালে মিঃ, এফ, টি, ডাউডিং কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে তাঁহার চেষ্টায় ইং ১৮১৮ সালে এম, এ, এবং (ইং ১৮৮২ সালে পুঁঠিয়ার রাণী মনোমোহিণী দেবী আইন ক্লাস (Law) খোলার জন্য ২০,০০০ হাজার টাকা এই কলেজে দান করেন)– ইং ১৮৮৩ সালে আইন ক্লাস খোলা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন কারিকুলাম অনুযায়ী এই কলেজ হইতে এম, এ, 'ল' ক্লাস উঠাইয়া লওয়া হয়।

এম. এ.
বি. এল, ডিগ্রী

প্রথমত: কলেজের বার্ষিক পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হয় নাই। প্রথম বর্ষে ৫ জন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইলে উক্ত ৫ জন ছাত্রই অকৃতকার্য্য

২৫ History of Bengal for Beginners by Raj Krishna Mukherjee P 103.
২৬. Do Do Do
২৭. Vide The Rajshahi College Magazine, February, 1934. Vol. XXIII. No. 1

প্রথম পরীক্ষার ফলাফল

হন। ইং ১৮৭৫ সালে ৭ জন ছাত্রকে ফাইনাল পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইলে তন্মধ্যে দুইজন উত্তীর্ণ হন; একজন প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করেন।

এই কলেজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য কয়েকটি সাধারণ তহবিল খোলা হয়। সর্বপ্রথম ইং ১৮৮৩ সালে ৩,০০০ হাজার টাকা মূলধন লইয়া 'মোহিনী মোহন রায় প্রাইজ ফান্ড'; ইং ১৮৮৪ সালে 'রাজশাহী সভার' (Rajshahi Association) মাধ্যমে ১,০০০ হাজার টাকার তহবিল লইয়া 'মেয়োমেমোরিয়াল ফাণ্ড' খোলা হয়। ফলে, ইহার দ্বারা কলেজের বহু গরীব ছাত্রদের শিক্ষার পথ সুগম হয়। এতদব্যতীত গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য 'মহসেন ফাণ্ড' ছাড়াও আরও কয়েকটি স্বতন্ত্র ফান্ড হইতে বৃত্তির ব্যবস্থা হয়। এই ভাবে কতকগুলি উদ্দেশ্য মূলক ফাণ্ডের সাহায্যে এই কলেজের বিবিধ উন্নতি হইতে থাকে। অতঃপর অল্প দিনের মধ্যেই রাজশাহী কলেজ বঙ্গদেশে একটি প্রসিদ্ধ কলেজে পরিণত হয়।

সাধারণ তহবিল

বলা বাহুল্য, এই কলেজের, বেসরকারী বেশীর ভাগ দান দিঘাপতিয়ার জমিদার, পুঁঠিয়ার রাণী হেমন্ত কুমারী ও দুবোলহাটির জমিদার কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু দিঘাপতিয়ার রাজা বাহাদুরের দান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং তাহা রাজশাহী সভার (Rajshahı Association) মাধ্যমে প্রদত্ত হয়।[২৮]

উল্লেখযোগ্য দান

কলেজের ইমারতাদি নির্মাণ অভিযান

রাজশাহী সভার মাধ্যমে এই কলেজের ইমারতাদি নির্মাণ অভিযান শুরু হয়। উক্ত সভার মাধ্যমে অর্থ সংগৃহীত হইতে থাকে। পুঁঠিয়ার রাণী শরৎ সুন্দরী প্রথমত: ১০,০০০ টাকা দান করেন। অতঃপর রাজশাহীর রাজা জমিদার ও বিত্তশালী লোকদের মুক্ত হস্তে ইং ১৮৮৪ সালে ৬১,৭০৩ টাকা ব্যয়ে ইংলিশ প্যাটার্ণে একটি সুদৃশ্য সৌধ নির্মাণ হয়। উহাই কলেজের বর্তমান 'মেইন বিল্ডিং' নামে পরিচিত। এই বিল্ডিং নির্মিত হইলে কলেজিয়েট স্কুল হইতে কলেজের যাবতীয় কার্যাদি সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। এই কলেজের কেমিষ্ট্রি ভবন কলেজ চত্বরের প্রাচীনতম ইমারত বটে। কোম্পানীর শাসন-সংস্কার আমলে রামপুর-বুয়ালিয়াতে উক্ত ভবনে সরকারী হাঁসপাতাল স্থাপিত ছিল। কলেজ সম্প্রসারণের তাগিদে উক্ত বিল্ডিং ৩৫,৮৪৭ টাকায় ইং ১৯০৩ সালে কলেজ কর্তৃপক্ষ খরিদ করিয়া লন। তাবপর ক্রমশ: ফিজিক্স বিল্ডিং নিউ আর্ট বিল্ডিং ও বোটানিক্যাল ল্যাবরেটারী প্রভৃতি স্থাপিত হয়।

ইং ১৮৮৪ সালের শেষের দিকে 'রাজশাহী মাদ্রাসার' জন্য এই প্রাঙ্গণে ৪৭,০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি সুদৃশ্য ইমারত নির্মিত হয়। জেলখানার পূর্ব পার্শ্বে বিস্তৃত ময়দানে মাদ্রাসা স্থানান্তরিত হইলে মাদ্রাসা বিল্ডিংটি কলেজ কর্তৃপক্ষের অধীনে চলিয়া যায়।

লাইব্রেরী

রাজশাহী কলেজ লাইব্রেরীটি পূর্ব পাকিস্তানে একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরী। এখানে অতীতের বহু দুষ্প্রাপ্য বই পুস্তক,

২৮. Vide- The old records of Rajshahi Association at the local office.

পুঁথিপত্র, পত্রিকা প্রভৃতির সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হইবে। ইং ১৯৩৩ সালে সর্ব প্রকার বই পুস্তকের সংখ্যা ছিল, ১৮,৭৬৭।

উনবিংশ-বিংশ শতকে রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ 'রায় বাহাদুর কুমুদিনী কান্ত ব্যানার্জ্জি' একজন নামকরা শিক্ষাবিদ ও আদর্শ গুরু ছিলেন। তিনি একাধিকক্রমে প্রায় (১৮৯৭-১৯১৯ ও ১৯২০-২৪) ২৬ বৎসর ধরিয়া সুনামের সহিত এই কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। তাহার সময়ে এই কলেজে উত্তর বঙ্গের জেলাগুলি ছাড়াও সুদূর চট্টগ্রাম, ঢাকা, ফরিদপুর ও সিলেট প্রভৃতি স্থান হইতে শিক্ষার্থীগণ আসিয়া এখানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। রায় কুমুদিনীর আমলে এই কলেজের আয়তন ও ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়া যায়। কলেজ চত্বরের দক্ষিণ প্রান্তে বিরাট দিঘী, ঠেলা-রেলগাড়ির সাহায্যে পদ্মা হইতে বালী আনিয়া দিঘী ভরাট করিয়া বিরাট ময়দানে পরিণত করা হয়। বর্তমানে ইহা খেলাধূলার মাঠ হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে।

রাজশাহী কলেজে কুমুদিনী ব্যানার্জ্জি

বিখ্যাত ড: পি, ডি, শাস্ত্রী রাজশাহী কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালে (ইং ১৯৩৬ সালে?) এখানে সহশিক্ষা প্রবর্তিত হয়।

সহ শিক্ষা

রাজশাহী কলেজ একটি সমৃদ্ধ কলোনী বিশেষ, আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া ভ্রম হইবে। পদ্মার উত্তর তীরে ৩৪ একর এক খণ্ড বিস্তৃত ভূমির উপব ইহার অবস্থান। প্রাচীর বেষ্টিত কলেজ চত্বরের পশ্চিম পার্শ্বে দ্বিতলাকার ৫টি ব্লক বিশিষ্ট কলেজের ছাত্রাবাস অবস্থিত। প্রত্যেক ব্লকে ৫০ জন করিয়া ছাত্র থাকিতে পারে, এমন সুব্যবস্থা আছে। ছাত্রাবাসটিও একটি কলোনী বিশেষ। কলেজ চত্বরের বাহিরে নাটোর রাজপথের উত্তর ধারে পাশাপাশি ছাত্রীনিবাস (New Girls Hostel) ও ছাত্রদের কমন রুম (রাজা কৃষ্ণান্দ হল) এক খণ্ড পৃথক ভূমির উপর অবস্থিত। পদ্মার তীরে এই কলেজের অবস্থান, নানা প্রকার সৌখিন তরুরাজিব দ্বারা পরিবেষ্টিত; চত্বরাস্থিত দৃশ্যাবলী অতি মনোরম, আবহাওয়া সমুন্নত ও স্বাস্থ্যকর।

কলেজের অবস্থান ও ছাত্রাবাস

ইং ১৮৭৩ সালে একজন মুসলমান ছাত্র সহ, মোট ৬জন ছাত্র লইয়া এই কলেজের যাত্রা শুরু হয়। ইং ১৮৭৮ সালে ১০০ শত; ইং ১৯০০ সালে ২০০ শত; ইং ১৯১০ সালে ৪০০ শত; ইং ১৯২০ সালে ৮০০ শত; ইং ১৯২৪ সালে ছাত্রের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক হাজার। ইং ১৮৭৮ সালে ১ জন মুসলমান ছাত্র ছিল। ইং ১৯১৬ সালে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৬ জনে। ইং ১৯২৪ সালে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ২১৬ জন। বিভাগ পূর্বকাল পর্যন্ত কলেজের ছাত্র সংখ্যা বরাবরই সহস্রাধিক ছিল। বিভাগোত্তরকালে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা প্রায় সার্দ্ধ সহস্রাধিক।

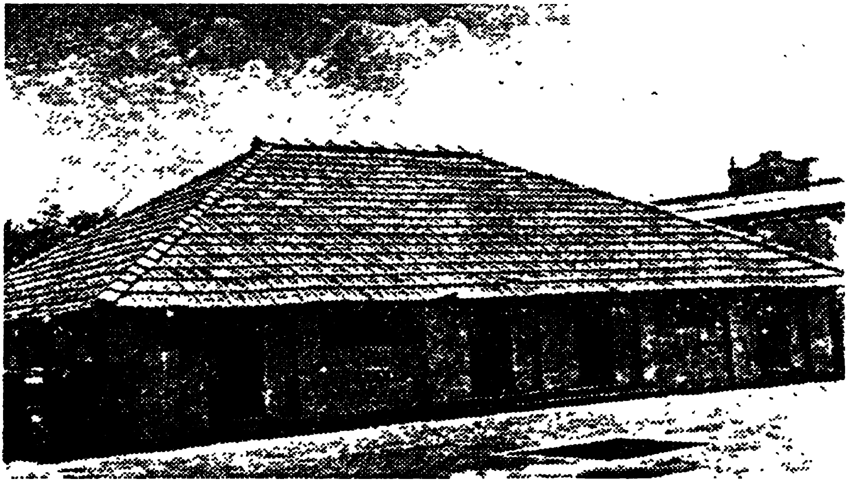
প্রাথমিক ও বর্তমান ছাত্র সংখ্যা

কৃষি বিষয়ক 'ডিগ্রী কোর্স' শিক্ষার জন্য দিঘাপতিয়ার 'ছোট তরফ' কুমার বসন্ত কুমার রায় রাজশাহী কলেজে কৃষি ইনস্টিটিউট স্থাপন উদ্দেশ্যে বাঙলা সরকারের হাতে একটি 'দান পত্রে' ৪ লক্ষ ৫ হাজার ৩ শত টাকা প্রদান করেন। অতপর ইং ১৯৩৪-৩৫ সালে রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষের অধীনে 'বসন্ত কুমার কৃষি ইনস্টিটিউট' নামে একটি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দেশ বিভাগের

কৃষি বিদ্যালয় (১৯৩৪-৩৫)



রাজশাহী সবকারী কলেজেব আদি-ইমারত



ডায়মণ্ড জুবিলী স্কুলের প্রাচীন গৃহ

পর উক্ত 'দান পত্র' ফেরৎ না পাওয়ায় ইং ১৯৪০ সালে এই কলেজ উঠিয়া যায়। উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আজ পর্য্যন্ত তেমন কোন চেষ্টা করা হয় নাই।

রাজশাহী কলেজ চত্বরে 'কলেজিয়েট স্কুলের' পূর্ব ধারে যে বিল্ডিংটি এখন 'রাজশাহী বিভাগীয় শিক্ষা বিভাগের' ডিপুটি ডাইরেক্টরের আফিস গৃহ, উহা 'রাণী হেমন্ত কুমারী সংস্কৃত কলেজের' নিজস্ব ভবন। ডেপুটি ডাইরেক্টরের আফিস এখানে স্থানান্তরিত হইলে সংস্কৃত কলেজের যাবতীয় কার্যাদি কলেজ চত্বরের অন্য আর একটি ভবনে সম্পাদিত হইতেছে। সংস্কৃত কলেজের এই বিল্ডিং নির্মাণের জন্য রাণী হেমন্ত কুমারী ইং ১৯০৭ সালে ১৭,০০০ হাজার টাকা ব্যয় করেন।

সংস্কৃত কলেজ (ইং ১৯০৬-৭)

রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষের অধীনে এই সংস্কৃত কলেজটি পরিচালিত হইয়া থাকে। এখানে সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। কলেজের সমাপ্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান অনুযায়ী বর্তমানে ঢাকা বোর্ড হইতে 'সার্টিফিকেট' দেওয়া হয়। এই কলেজের ব্যয় বাবৎ তদানীন্তন বাঙ্লা সরকার বার্ষিক ১৮০০ শত টাকা দান করিতেন। অবশিষ্ট ব্যয় বাবৎ রাণী হেমন্ত কুমারী প্রতি বৎসরের জন্য ১৭৮০ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়া গিয়াছেন। এই কলেজের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বাবৎ কোন প্রকারের বেতন দিতে হয় না। বরং ৮ টাকার ১২টি বৃত্তির ব্যবস্থা আছে এই কলেজের ছাত্রাবাসের জন্য 'মহারাণী হেমন্ত কুমাবী হোষ্টেল' নামে একটি হোষ্টেল আছে। ইহাতে ৭০ জন ছাত্র থাকিতে পারে। সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য এই ছাত্রাবাসে থাকিতে কোন ভাড়া দিতে হয় না। বাহিরে আহারাদি কবিয়াও এখানে থাকিয়া উক্ত কলেজে পড়াশুনা করা যায়। বিভাগোত্তর কাল হইতে এই কলেজের অবনতি ঘটিয়াছে। ছাত্র সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। বিভাগ পূর্ব কালে বহু দূর দেশ হইতে ছাত্ররা আসিয়া এখানে সংস্কৃত শিক্ষা করিত। বর্তমানে রাজশাহী বিভাগে সংস্কৃত চর্চ্চার ইহাই একমাত্র স্বতন্ত্র বিদ্যাপীঠ। আজ হইতে ৩০ বৎসর পূর্বে এই রাজশাহী জেলাতেই[২৯] সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রায় ২৫টি বিদ্যালয় বা টোল ছিল। রাজা জমিদারদের অর্থ সাহায্যে সেই সব টোলের ব্যয় নির্বাহ হইত। যুগ পবিবর্তনে এই সব টোলের জ্যোতি নিভিয়া গিয়াছে। কেবল মাত্র অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় 'রাণী হেমন্ত কুমারী সংস্কৃত কলেজটি' কালের সাক্ষী স্বরূপ টিকিয়া আছে। অনতিবিলম্বে পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাবগ এই বিদ্যালয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে উত্তর বঙ্গের (রাজশাহী বিভাগের) সংস্কৃত চর্চার রাজশাহীর এই গৌরবময় প্রতিষ্ঠানটি চিরতরে নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ইং ১৯১৭ সালের বিখ্যাত স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে (Report) রাজশাহী কলেজের দ্রুত উন্নতি ও অবস্থান প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, "রাজশাহী কলেজ অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব অর্জ্জন করিবে, সেই ভাবে ইহা গড়িয়া উঠিতেছে"। বাস্তবিক পক্ষে স্যাডলারের স্বপ্ন সফল হইয়াছে। কিন্তু, যদিও তাহা এই কলেজকে কেন্দ্র করিয়া বাস্তবায়িত হয় নাই। এই কলেজেরই একজন সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডঃ ইতারাত হুসেন জুবেরীর ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে এই রাজশাহীতেই 'রাজশাহী বিদ্যালয়ের' সূচনা ও ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। যাহা হউক, রাজশাহী কলেজ প্রসঙ্গ আপাতত: এই খানেই

২৯. 'রাজশাহীর ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

রাজশাহী কলেজ প্রসঙ্গে স্যাডলার কমিশনের মন্তব্য

সমাপ্তি দিলাম। এখন আর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে আলোকপাত করিতেছি– যাহার আলোকে একদিন রাজশাহীর মুসলমান একতাবদ্ধ, সামাজিক সংগঠনে ও ধর্মীয় শিক্ষায় প্রাণবন্ত হইয়া উইঠয়াছিল। সেই প্রতিষ্ঠানটিই হইল রাজশাহীর বিখ্যাত মাদ্রাসা।

কালের ইতিহাস সেই খানেই সৃষ্টি হইয়াছে। যেখানে মানুষ স্বীয় কর্মের দ্বারা মানবোচিত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। আজ হইতে শত বর্ষ পূর্বে রাজশাহী জেলার মুসলমানগণ স্বীয় কওমের আমুল উন্নতি ও ধর্মীয় জীবন যাপন উদ্দেশ্যে উচ্চ শিক্ষার জন্য খুবই সচেতন ছিল। রাজশাহী মাদ্রাসার প্রাচীনত্ব তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রাজশাহী মাদ্রাসা (ইং ১৮৭৪ সাল)

ইংরেজি উচ্চ শিক্ষার নিমিত্তে স্থানীয় রাজা জমিদারগণ রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে যেমন নিজেদের যোগ্য ভূমিকার পরিচয় দিয়াছেন তেমনই রাজশাহীর আলেম সম্প্রদায় ও কতিপয় উৎসাহী কর্মী রাজশাহীতে আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চ শিক্ষার জন্য 'বুয়ালিয়াতে' মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার আত্মনিয়োগ করিয়া নিজেদের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।[৩০]

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলার গবর্ণরগণ বঙ্গ দেশে ইংরেজী ও আরবী শিক্ষা ব্যাপারে সম উৎসাহী ছিলেন। তাই দেখিতে পাই কলিকাতার পরেই উত্তর বঙ্গে ইং ১৮৭৩ সালে 'রাজশাহী কলেজ' স্থাপনের উৎসব শেষ হইতে না হইতেই রাজশাহীতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ধুম পড়িয়া যায়। ইং ১৮৭৪ সালেই জানুয়ারিতে দর্সে নিজামিয়া 'সিনিয়ার মাদ্রাসা' স্থাপিত ইহয়া যায়। কিন্তু, পরবর্তীকালে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তাব করিতে থাকে; সরকারী অফিস আদালতে চাকরীর লোভ ও সাময়িক লাভের আশায় অধিকাংশ মুসলমান ছাত্র স্থানীয় স্কুল কলেজে ইংরেজীর মাধ্যমে পড়াশুনা করিতে থাকে। ফলে ক্রমশ: মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পাইয়া যায় এবং ১৮৮৩ সালে সিনিয়র মাদ্রাসা জুনিয়ার মাদ্রাসায় পরিণত হয়। তখন কলিকাতার 'মাদ্রাসা আলিয়া' ও 'হুগলী মাদ্রাসা' ব্যতীত বাঙলার অন্যান্য আরবী শিক্ষা কেন্দ্রগুলির একই অবস্থা ঘটিতে থাকে। বাঙলা দেশের সিনিয়ার মাদ্রাসাগুলির এমনিতর অবনতি লক্ষ্য করিয়া আরবী শিক্ষার কারিকুলামকে কিছু পরিবর্তন করত: 'ইংরেজীকে' শিক্ষার মাধ্যম করিয়া নূতন একটি কারিকুলাম ঘোষণা করা হয়। তখন আবার মাদ্রসার ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইং ১৯৩০ সালে বাঙলা সরকারের নূতন কারিকুলাম অনুযায়ী রাজশাহী মাদ্রাসা হাই মাদ্রাসায় পরিবর্তিত হয়। সেই সময় হইতে এই মাদ্রাসার উন্নতি অপরিবর্তিত রহিয়াছে। পরে রাজশাহী মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করিয়া এখানে একটি 'ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ' স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়া আসিতেছে– যদিও এখনও তাহার কোন সুরাহা হয় নাই। অথচ পাকিস্তান যুগে পাকিস্তানী শিক্ষার লক্ষ্যে ইসলামিক আদর্শই যে হওয়া উচিৎ, তাহা বলাই বাহুল্য।

বার্ষিক পরীক্ষায় এই মাদ্রাসার শতকরা ৮০ জন ছাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর গড়ে ২/১টি করিয়া ছাত্র প্রথম শ্রেণীর সরকারী বৃত্তি লাভ

৩০. তৎকালিন সূফী-দরবেশ-আউলিয়াদের আস্তানায় প্রায়ই মক্তব, মাদ্রাসা থাকিত। অনুরূপ একটি মাদ্রাসা এখানেও স্থাপিত ছিল। দবগার প্রাচীন কাগজ পত্রে উহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

করে। উপর শ্রেণীতে (Up to Class X) মাসিক মাত্র এক টাকা পাঁচ আনা (১ .) করিয়া বেতন দিতে হয়। দানবীর হাজী মুহম্মদ মুহসিন'-এর দানে মুসলমান ছাত্রদের জন্য তখন এইরূপ নাম মাত্র বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এখনও উহা অপরিবর্তিত রহিয়াছে। এদেশের অন্যান্য সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়গুলির মতই সমমর্যাদা ও কারিকুলামানুযায়ী ইহা পরিচালিত হয়। উপরন্তু এখানে ইসলামিক শিক্ষার প্রাথমিক সূচনা হইয়া থাকে। রাজশাহী মাদ্রাসার বহু কৃতী ছাত্র আজ সরকারী বেসরকারী উচ্চ পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ও বেতন

সম মর্যাদা ও শিক্ষা

রাজশাহী কলেজ চত্বরে 'রাজশাহী মাদ্রাসার' আদি ছাত্রাবাসটি অবস্থিত। উহা 'ফুলার (ইং ১৯১১ সালে নির্মিত) মোহমেডান হোষ্টেল' নামে পরিচিত। ইহাতে ৮০ জন ছাত্র থাকিবার সুব্যবস্থা আছে। মাদ্রসাার ছাত্রদের জন্য উহা বিনির্মিত হইয়াছিল। পরে কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রদিগকেও বাস করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। বর্তমানে এই ফুলার হোষ্টেলটি কলেজ কর্তৃপক্ষের অধীনে চলিয়া গিয়াছে।

রাজশাহী কলেজ' চত্বর হইতে মাদ্রাসা বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হইলে মাদ্রাসা ভবনটী কলেজ কর্তৃপক্ষের অধীনে চলিয়া যায়। বর্তমান মাদ্রাসা ভবনটী রাজশাহী ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের আবাসিক কুঠি ছিল। মাদ্রাসার এই প্রসাদোপম একতলা বিল্ডিংটি জনৈক মিঃ পারভেজ মতান্তরে ডাক্তার বিলশীল সাহেবের রেশম কুঠি ছিল বলিয়া জানা যায়।

বর্তমান মাদ্রসা ভবন

এই মাদ্রাসার প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট (ইং ১৮৭৪ সাল) মওলানা আব্দুল কাদির একজন বিখ্যাত ইসলামিক শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত) তিনি 'শামসুল-উলামায়ে বাঙ্গালা' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট

শ্রীঅনুকুল চক্রবর্তী ও সুদর্শন চক্রবর্তী প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের প্রাণপণ চেষ্টায় ইং ১৮৯৮ সালে (বাং ১৩০৫ ২৮শে আষাঢ়) এই বিদ্যালয় 'রাজশাহী একাডেমী' নামে রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরীর প্রাঙ্গণে স্থাপিত হয়।[৩১] কিছুদিন পরেই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যালয়টি স্থানীয় জমিদার কুঞ্জমোহন মৈত্র রায় বাহাদুরের বাড়ীতে একটি স্বতন্ত্র গৃহে মাসিক ভাড়া বন্দোবস্তে স্থানান্তরিত করা হয়। অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্থায়ী অনুমোদন লাভ করিলে খাঁজুরিয়ার জমিদার মুঘল সহোদর জীবন্তিনাথ ও জ্ঞানেন্দ্র নাথ খাঁ এই বিদ্যালয়কে বিশেষভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁহাদের পিতৃদেবের নামানুসারে রাজশাহী একাডেমীর স্থলে "রাজশাহী ভোলানাথ একাডেমী" নামকরণ করেন। ইং ১৯১৯ সালে উক্ত যুগলসহোদর এই বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বভার অনুকুল চক্রবর্তী প্রমুখের ওয়ারিসদের উপর রেজেষ্ট্রিকৃত দলিল মূলে সম্পাদন করিয়া দেন। পরে অনুকুল চক্রবর্তীর ওয়ারিসগণ চক্রবর্তী মহাশয়ের পিতার নাম উক্ত বিদ্যালয়ের নামের সহিত যুক্ত করিয়া "রাজশাহী ভোলানাথ বিশ্বেশ্বর একাডেমী" নামে অভিহিত করেন। অতঃপর পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়ে হিন্দু কৃষ্টিমূলক ভাব ধারায়

রাজশাহী ভোলানাথ বিশ্বেশ্বর হিন্দু একাডেমী (ইং ১৮৯৮ সাল)

---

৩১. Rajshahi Gazetteer P. 151

ছাত্র-ছাত্রী গড়িয়া তুলবার জন্য বিদ্যালয়ের নামের সহিত 'হিন্দু' শব্দ সংযোগ করিয়া উহার নাম রাখা হয় "রাজশাহী ভোলানাথ বিশ্বেশ্বর হিন্দু একাডেমী"। এই বিদ্যালযের সহিত 'হিন্দু' নাম সংযুক্ত হইলে তখন মুসলমান ছাত্রগণ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে। বিভাগোত্তরকালে (ইং ১৯৫২ সাল হইতে) পুনরায় মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া পড়াশুনা করে। কিন্তু তাহাদের বর্তমান সংখ্যা অতি নগণ্য। এই বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এখানকার অধিকাংশ শিক্ষক হিন্দু। তাঁহারা অতি অল্প বেতনে শিক্ষকতা করিয়া থাকেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল বেশ সন্তোষজনক। প্রত্যেক বৎসরই ২/১ জন করিয়া ছাত্র বা ছাত্রী বৃত্তি পাইয়া থাকে।

ইংরেজী ১৮৬৮ সালে 'রামপুর বুয়ালিয়াতে' একটি বালিকা বিদ্যালয় ছিল[৩২]। মিঃ হান্টারের একাউন্টে এখানে দুইটি বালিকা বিদ্যালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়[৩৩]। একটি মিশন কর্তৃক পরিচালিত, অপরটি সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত। কিন্তু এই দুইটি বিদ্যালয়ের অবস্থানের কথা পরবর্তীকালে পরিস্কার ভাবে জানা না গেলেও বর্তমান রাজশাহী শহরে

বালিকা বিদ্যালয় (ইং ১৮৬৮ সাল)

খ্রীষ্টান মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়টি সেই সময়ের মিশন বালিকা বিদ্যালয়; আর আজিকার পি,এন, বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সেই সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের প্রাথমিক রূপ বলিয়া বোধ হয়। এতদব্যতীত তখন আর কিছু সংখ্যক বালিকা স্থানীয় বিভিন্ন পাঠশালায় যাইত। ইং ১৮৭২-৭৩ সালে এই সব বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৭ জন। নারী শিক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের তৎপূর্বে তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। এই সময় নারী শিক্ষার প্রসার কল্পে জেলা 'স্কুল কমিটী' প্রাইজ প্রভৃতি লোভনীয় বিষয় বস্তু দ্বারা নানা ভাবে বালিকাদের উৎসাহিত করিতে থাকিলে ক্রমশঃ ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

রাজশাহী পি,এন, বালিকা বিদ্যালয়ের' লিখিত কোন কাগজ পত্র পাওয়া যায় না। রায় বাহাদুর ধরণীমোহন মৈত্র মহাশয়ের বাড়ীতে রক্ষিত এক খণ্ড খসড়া কাগজ সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, দিঘাপতিয়ার জমিদার রাজা পি, এন, রায় বাহাদুর ইং ১৮৮৬ সালে রাজশাহী জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের হস্তে এই প্রাইমারী বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ৬৩০০ টাকার একটি দান পত্র সম্পাদন করেন। উক্ত কাগজের সত্তানুসারে জেলা

পি, এন, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (ইং ১৮৮৬ সাল)

বোর্ডের চেয়ারম্যান এই তহবিল পরিচালনা করিতেন। পূর্ব উল্লিখিত বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠাতাদের কোন উল্লেখ না পাওয়া গেলেও কলিকতা রিভিউ, রাজাস্ চিপ্স এণ্ড জমিন্দার্স (Calcutta review; Rajas Chefs and Zamiders[৩৪]) এর মতে সাধারণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি বালিকা বিদ্যালয় পরে রাজা বাহাদুর পরিচালনা করিতেন। ইং ১৯২৮ সালে উহা উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তৎপর দিঘাপতিয়াব ছোট তরফ কুমার বসন্ত কুমার রায় এই বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য দশ হাজার দুই শত টাকার 'কোম্পানীর কাগজ' দান করেন। সর্বপ্রথম কত ছাত্রী লইয়া কোথায় কিভাবে এই বিদ্যালয় শুরু হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। তবে রাজা বাহাদুরের দশ হাজার টাকা

৩২. Calcutta Review No. CXI. January 1873,

৩৩. Hunter's statistical Account of Bengal, Rajshahi. P 115.

৩৪. Calcutta Review CXI January 1873, The Modern History of the India Chiefs Rajas and Zamiders, Part II P, 375

ব্যয়ে বর্তমান স্থানে একটী ইমারত নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে রাজা প্রমোদানাথের অণুজ কুমার হেমেন্দ্র কুমার রায় আর দশ হাজার টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয়ের আফিস গৃহ নির্মাণ করিয়া দেন। অতঃপর ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে বাঙলা সরকারের ৭০৯০ টাকা ব্যয়ে নূতন দ্বিতল ভবনটি নির্মিত হয়। এই ভাবে সরকারী ও দিঘাপতিয়া রাজাদের দানে এই বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ ও প্রতিষ্ঠা হয়।

দিঘাপতিয়ার রাজ পরিবার এই বিদ্যালয়ের স্থায়ী প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমি ও অধিকাংশ অর্থ ব্যয় করেন। সেই জন্য রাজা প্রসন্ন নাথ রায় বাহাদুরের নামানুসারে 'প্রসন্ন নাথ বালিকা বিদ্যালয়' (P. N Girl's School) নামকরণ হয়। বিভাগ পূর্বকাল পর্যান্ত দিঘাপতিয়ার রাজ পরিবার কর্তৃক প্রধান হিসাবে এই বিদ্যালয় পরিচালিত হইত। বিভাগোত্তর কালে ৩০।৩।৪৭ তারিখে নূতন কমিটী গঠিত হয়। পদাধিকার বলে রাজশাহী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই কমিটির সভাপতি হন[৩৫]। বর্তমানে এই বিদ্যালয়টি সরকারী মর্যাদা লাভ করিয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ইহা পরিচালিত হইয়া থাকে।

নামকরণ

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে উত্তর বঙ্গের রেশম শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য 'রামপুর-বুয়ালিয়াতে' একটি উন্নত শ্রেণীর 'রেশম বিদ্যালয়' স্থাপন উদ্দেশ্যে 'রাজশাহী জেলা বোর্ডের' তদানীন্তন চেয়ারম্যান মহোদয়ের হস্তে নাটোরের মহারাজা ৫০০০ টাকা, কাশিমপুরের রায় কেদার প্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুর ১৫০০০ টাকা; রাণী হেমন্ত কুমারী ৬০০০ টাকা; দুবোলহাটির রাণীদ্বয় ২০০০ টাকা; রানী মনোমোহিণী ৫০০০ টাকা; চৌগ্রামের রাজা রমণী কান্ত রায় ৫০০ টাকা; ভূবন মোহন মৈত্র ৩০০০ টাকা; দান করেন। তদনুযায়ী ইং ১৮৯৮ সালে বর্তমান স্থানে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অতঃপর রাজশাহী জেলা বোর্ড কর্তৃক এই বিদ্যালয় পরিচালিত হইতে থাকে[৩৬]। তদানীন্তন বাঙলা সরকারের কৃষি বিভাগ হইতে এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য রীতিমত সাহায্য বরাদ্দ হয়। গুটি পোকার বীজ প্রস্তুত করা এবং সূতা প্রস্তুত ও সূতা রং করিয়া মটকার বস্ত্র বয়ন প্রভৃতি প্রধানত: এই বিদ্যালয়েব মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তখন বাঙলা সরকারের কৃষি বিভাগের ট্রেনিং প্রাপ্ত উচ্চ শিক্ষিত জনৈক সীতানাথ গুহ এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক। অল্প সময়ের মধ্যে সীতানাথ মহাশয়ের যত্নে এই স্কুলের সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এখান হইতে গুটি পোকার বীজ জাপান, ইটালী, ইংলণ্ড ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত[৩৭]। এই বিদ্যালয় বোর্ডের অবৈতনিক সম্পাদক বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্র তাঁহার লিখিত বিবরণে এখানকার উন্নত ধরনের রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যাদি সম্পর্কে সময়ে সময়ে তদানীন্তন বাঙলা সরকারকে অবগত করাইতেন[৩৮]। এই ভাবে এই রেশম বিদ্যালয়ের সুনাম সমগ্র বঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিংশ শতকের গোড়ার

ডায়মণ্ড জুবেলী ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল (ইং ১৮৯৮ সালে স্থাপিত)

৩৫. Vide-D. M. Rajshahi, letter No 2496/J. dated 7th July 1947 Approval from the Calcutta University letter No. 4094 dated 16th July 1949

৩৬. Vide Administration Report of District Magistrate, Rajshahi, 1898.

৩৭. "The Sericultural School Rampore Boalea supplied cocoon seeds to Japan. Italy, England and to several places in India" (The Indian Empire, Decembar 26th, 1899)

৩৮. Rajshahye was looked upon in the last century as one of the best silk-producing districts of Bengal. . . (A letter dated the 5th Feb 1900 from Babu Akshoy Kumar Matra B1. to D P. I of Bengal

দিকে রাজশাহীর রেশম শিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটিরও অবনতি ঘটে। অবশেষে পাকিস্তান আমলে আসিয়া এই বিদ্যালযের নাম পরিবর্তন করিয়া ইং ১৯৫৫ সালে ইহাতে 'ইঞ্জিনিয়ারিঙ এণ্ড সার্ভে বিদ্যালয়ে' রূপান্তরিত করা হয়। এই সময় 'ইণ্ডাষ্ট্রিযাল স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট পদের স্থলে অধ্যক্ষ পদের সৃষ্টি হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড সার্ভে বিদ্যালয়

বর্তমানে এখানে সাব-ওভারসিয়ার, আমিন, সার্ভে-কাননগো প্রভৃতি বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স শিক্ষা দেওয়া হয়। রাজশাহী জেলা কাউন্সিল ইহার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিয়া থাকে। এই জেলা কাউন্সিলের ইহা একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। পূর্ব্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা হইতে ছাত্রগণ আসিয়া এখানে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্ব-পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগ হইতে মাসিক নির্দ্দিষ্ট হারে আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ আছে। এই জাতীয় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাজশাহী জেলা কাউন্সিলের 'ইঞ্জিনিয়িারিং এণ্ড সার্ভে বিদ্যালয়টির' অনবদ্য ভূমিকা আমাদের জাতীয় আয়ের মান উন্নয়নে নানা ভাবে সাহায্য করিতেছে। এই কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির আকার ও কলেবর বৃদ্ধির জন্য জেলা কাউন্সিলের আগামী পরিকল্পনা সত্যই বৃহত্তম ভূমিকা গ্রহণ করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে এই বিদ্যালযের বর্তমান অধ্যক্ষের কর্ম কুশলতার কথা অনস্বীকার্য্য। ইহার অগ্রগতির মূলে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম বাস্তবিকই উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। বর্তমান (ইং ১৯৬২-৬৩) ছাত্র সংখ্যা ২১০ জন এবং ১৫ জন শিক্ষক ইহার বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। রেশম সংক্রান্ত বিষয়ে এক্ষনে এখানে কোন কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় না। শহরের মধ্যস্থলে মিউনিসিপ্যালিটির চত্বরে সোনা দীঘির পশ্চিম তীরে অবস্থিত বিদ্যালয়টির মনোরম পরিবেশ মনোমুগ্ধকর।

বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তাঁহার বিবরণীতে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তারিখ ইং ১৮৯৭ সাল, উল্লেখ করিয়াছেন। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারেও উহার উল্লেখ আছে। সম্ভবত: ইং ১৮৯৭ সালে ইহার প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলে এবং ইং ১৮৯৮ সালে ইহার কার্য্যারম্ভ হয়[৩৯]।

বিখ্যাত সমাজ কর্মী মরহুম পারভেজ আলী প্রমুখ উদ্যোগী হইয়া মুসলমান মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা নিমিত্তে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সূত্রপাত করেন। পরে অবসর প্রাপ্ত 'জেল স্কুল পরিদর্শক' মরহুম বসির উদ্দিন ও মরহুম মওলানা আবেদ আলী প্রমুখ অবৈতনিক ভাবে কয়েক বৎসর যাবৎ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কার্য্য করিয়া বিদ্যালয়টিকে যখন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া তোলেন—তখন তদানীন্তন এম, এল, সি, খান বাহাদুর ইমাদ উদ্দীন আগাইয়া আসিয়া ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

রাজশাহী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে রাজশাহী শহরের মুসলমান মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাহা ছাড়া সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের পর্দার বাহিরে যাওয়া নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। স্থানীয় পি,এন, বিদ্যালয়ে নানা অসুবিধার দরুণ মুসলমান মেয়েরা ভর্তী হইত না। বিশিষ্ট পরিবারের খানকায় বা দহলিজে অথবা নিজ নিজ বাড়ীতে মুন্সী, মৌলবী রাখিয়া ধর্মীয় রীতি নীতি অনুযায়ী

৩৯. Vide-The Report of Akshay Kumar Maitra B L on Silk-1900

আরবী, ফারসী প্রভৃতি শিক্ষা করিত। কিন্তু এই রীতি দীর্ঘ দিন স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। অল্পকাল মধ্যেই নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি হইতে থাকিলে এখানকার মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধ হয়। অতঃপর পারভেজ আলী সাহেবের দহলিজে সর্ব প্রথম ১৫/২০ জন মেয়েকে লইয়া মক্তব আকারে এই বিদ্যালয়ের গোড়া পত্তন হয়। ১৯২৬-২৭ সালে (?) ইহা জুনিয়ার মাদ্রাসায় উন্নীত হইলে সরকারী ও বেসরকারী এবং স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির আর্থিক সাহায্যে ইহার অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। ইং ১৯৫৭ সালে ১৫ই জানুয়ারী হইতে ইহা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের গৌরব লাভ করে।

সূত্রপাতের কারণ

বর্তমানে 'রাজশাহী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়' যে ভবনে অবস্থিত আছে -পূর্বে ইহা রাজশাহী মোহমেডান সমিতির নিজস্ব কার্য্যালয় গৃহ ছিল। বিদ্যালয়টীর সম্প্রসারণের প্রয়োজন অনুভুত হইলে উক্ত সমিতি সেই গৃহটিকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করে এবং সেই গৃহটিকে কেন্দ্র করিয়া এই বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ ও সুপ্রতিষ্ঠা হয়।

বিদ্যালয় ভবন

বর্তমানে ইহার ছাত্রী সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। শিক্ষক ও শিক্ষিকা মোট ১৫ জন। বর্তমান পরিচালক মন্ডলী এই বিদ্যালয়কে একটি উন্নত ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য বিবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

ছাত্রী সংখ্যা ও পবিচালক মণ্ডলী

ইংরেজী ১৯২৮ - ২৯ সালে 'হরি চরণ মৈত্রের' মহাশয়ের বাড়ীতে 'হরি চরণ শিশু বিদ্যালয়' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরে দিঘাপতিয়ার কুমার হেমন্ত কুমাব রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি এই বিদ্যালয়কে একটি উন্নত শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত করিতে আগাইয়া আসিলেন। অতঃপর তিনি এই বিদ্যালয়ের বর্তমান ভবনটি নিজ ব্যয়ে খরিদ করিয়া উহাতে সেই 'হরি চরণ শিশু বিদ্যালয়' স্থানান্তরিত করত: নাম রাখিলেন "সাবিত্রী শিক্ষা বিদ্যালয়"। কুমার বাহাদুরের চেষ্টায় এই বিদ্যালয়' উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছিল। বিভাগোত্তর কালে ইহার অধিকাংশ হিন্দু শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী স্থানান্তরে গমন করিলে ছাত্রী সংখ্যা হ্রাস পাইয়া যায়। যোগ্য পরিচালক মন্ডলীর অভাব হেতু বিদ্যালয়টির দুর্দ্দিন ঘটে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়টির পুনর্গঠন চলিতেছে। ইং ১৯৬১ সালে ইহা সরকারী অনুমোদন লাভ করিযাছে।

সাবিত্রী শিক্ষা বিদ্যালয় (ইং ১৯২৮-২৯ সাল)

রাজশাহী মিউনিসিপ্যালিটির চত্বর প্রাঙ্গণে অবস্থিত 'মূক ও বধির বিদ্যালয়টির প্রয়োজনীয়তার বিষয় আজ অনস্বীকার্য্য। আশার কথা এই যে, বিদ্যালয়টির উন্নয়ন পরিপ্রেক্ষিতে স্থানান্তরে স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। বর্তমানে এখানে উপযুক্ত শিক্ষক না থাকায় বিদ্যালয়টির আশাতীত উন্নতি হয় নাই।

বাজশাহী মূক ও বধির বিদ্যালয় (ইং ১৯৩১ সাল)

বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে 'সাহেব বাজার মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে-'এড্ওয়াড্ সেমিনারী স্কুল' নামে একটি স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা কত দিন চলিয়াছিল তাহার বিস্তারিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

এডওয়ার্ড সেমিনারী স্কুল

**জন কল্যাণে রাজশাহীবাসীর অবদান :**

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে রামপুর-বুয়ালিয়ার জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহিরপুরের জমিদার রায় বাহাদুর চন্দ্রশিখরেশ্বর রায় কর্তৃক ইং ১৮৫৪[৪০] সালে স্থাপিত রামপুর বুয়ালিয়ার সর্ব প্রথম একটি জাতি কল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া যায়। তাহিরপুর জমিদারী হইতে প্রতি বৎসর গড়ে এই

সদাশ্রম
(১৮৫৪ সাল)

প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১২০ পাউন্ড করিয়া ব্যয় বাবৎ ধার্য্য ছিল। উদ্দেশ্য - নিরাশ্রয়কে টাউন অথবা অন্য যে কোন স্থানে আশ্রয় দান ও দুঃস্থদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হারে প্রতি মাসে এক আনা হইতে এক টাকা করিয়া সাহায্য করা হইত। এই প্রতিষ্ঠান কত দিন এখানে স্থাপিত ছিল তাহা জানা যায় না। তবে ইং ১৮৭১ সালে ১৩৭ জন দুঃস্থকে সাহায্য করা হয়। উহাদের মধ্যে এক জন ব্যতীত অধিকাংশই রাজশাহী জেলার অধিবাসী ছিল। প্রতি বৎসরে পৌষ মাসের শেষ দিনে কাঙ্গালদের মধ্যে কাপড় ও খাদ্য বিতরণ করা হইত। ইং ১৮৭১ সালে একটি বিশেষ পর্বে ১২০৩ জন কাঙ্গালদের সাহায্য করা হইয়াছিল[৪১]।

রাজশাহী সদর
হাসপাতাল
(ইং ১৮৬৫ সাল)

আজ হইতে শত বর্ষ পূর্বে রামপুর-বুয়ালিয়াতে' একটি ক্ষুদ্র দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্ম হয়। উহাই বর্তমান রাজশাহী শহরের বিখ্যাত 'সদর হাসপাতাল'।

কোম্পানীর শাসন আমলে এই রাজশাহী শহরে রাজশাহী সরকারী কলেজ চত্বরে' বর্তমান 'কেমিক্যাল ল্যাবোরেটারী ভবনে' ইং ১৮৬৫ সালে এই ক্ষুদ্র দাতব্য চিকিৎসালয়টি স্থাপিত হয়। তখন উহা 'জেলা দাতব্য চিকিৎসালয়' নামে পরিচিত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে, দিঘাপতিয়ার জমিদার পরিবারের কুলতিলক রাজা প্রসন্ন নাথ রায় উহার বৃহত্তর স্বার্থে হাসপাতাল স্থাপন উদ্দেশ্যে ইং ১৯০২ সালে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির' পূর্ব ধারে এক খণ্ড ভুমি দান করিয়া নিজ ব্যয়ে একটি এক তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মিত করেন। এই ভবন নির্মিত হইলে, এই সালেই রাজশাহী মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক রোগীর স্থায়ী সেবা-শুশ্রুষার জন্য কয়েকটি বেড (bed) খোলা হয়। তদুপরি উক্ত কলেজ চত্বর হইতে দাতব্য চিকিৎসালয়টীও সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। অতঃপর যখন এই নূতন ভবনে মিউনিসিপ্যালিটির বদান্যতায় ও আংশিক সরকারী সাহায্যে হাসপাতাল খোলা হইল, তখন রাজা বাহাদুর এই হাসপাতালের দ্রুত উন্নতির জন্য ১,৭২,০০০ টাকার 'কোম্পানীর কাগজ' দান করেন। ইহার বার্ষিক ১২০০ শত টাকা আয় হইতে হাসপাতালের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকে[৪২]। ইং ১৯৩৭ সালে বাঙলা সরকারের অর্থ সাহায্যে পুনরায় এই হাসপাতাল দ্বিতল ভবণে উন্নীত হয়। এই সময় উক্ত কলেজ কেমিক্যাল ল্যাবোরেটারীস্থিত চিকিৎসালয়টি এই প্রধান হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত হাসপাতাল হিসাবে স্থানীয় জমিদার হিরালাল ঘোষের অর্থে ও 'ডায়মণ্ড জুবেলী তহবিল হইতে ৭০০০ টাকা সাহায্যে কার্য্য চালাইয়া আসিত। অতঃপর রাজশাহী 'বয়েজ স্কাউট তহবিল' হইতে ৪০০০ টাকা ব্যয়ে হাসপাতালের 'এক্স্রে (X-Ray) বিভাগটির সূত্রপাত

---

৪০. 'রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' পৃষ্ঠা ৫৬।

৪১. Hunter's statistical Account of Bengal, vol, VIII, PP, 90&190

৪২ Hunter's statistical Account of Rajshahi, P 90.

হয়।

ইংরেজী ১৯৫৪ সালে রাজশাহী সদর হাসপাতাল যখন প্রাদেশিক হাসপাতালে' উন্নীত হয় তখন উহার বেড্ (bed) সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৮টি। ক্রমশ: যখন ইহার রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন ইহার আয়তন ও বেড্ সংখ্যার বৃদ্ধির আবশ্যকতা দেখা দেয়। তারপর ইহার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ৪০০,০০০ টাকা পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকার বরাদ্দ করেন। ইং ১৯৫৬ সালে আসিয়া সরকারের বর্তমান পরিকল্পনা সাফল্য মণ্ডিত হয়। যদিও ৬৮ হইতে বর্তমান বেড্ সংখ্যা ১৫০টিতে উন্নীত হইয়াছে–তথাপিও রোগীর সংখ্যা দৈনন্দিন এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে অনেক সময় কৌশলে দুই শত বেড্ সৃষ্টি করিয়াও স্থানাভাবে কতক রোগীকে নিরাশ করিতে হইতেছে৪৩।

রাজশাহী সভা
(ইং ১৮৭৮ সাল)

মূখ্যত: সাহিত্য আলোচনা ও জন সাধারণের হিত সাধনার্থে বাং ১১৭৯ সালে রাজশাহী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভার অধিবেশনে একটি সভা (Rajshahi Association) স্থাপিত হয়[৪৪]। এক সময় এই সমিতির খুব খ্যাতি ছিল। ইহার সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক সভায় সাহিত্য ও ইতিহাস মূলক প্রবন্ধাদি পঠিত ও আলোচিত হইত। রাজশাহীর রাজা জমিদার বিত্তশালী ও সাহিত্যিকবৃন্দ এই সভার সভ্য ছিলেন। ইহার মাধ্যমে রাজশাহীর বুকে বহু জনহিতকর কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমোদা নাথ রায় এই সভার মাধ্যমে রাজশাহী কলেজের উন্নতি কল্পে ১,৫০,০০০= টাকা দান করিয়া সভার গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন[৪৫]।

এই সভার একটি গঠনতন্ত্র আছে। তাহাতে সভার উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অনেক সময় ইহার মাধ্যমে রাজ কার্য্যের সমালোচনা করা হইত। গঠণতন্ত্রে উহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজশাহীর বুকে ইহা জনসাধারণের একটি সামগ্রীক প্রতিষ্ঠান বটে। যদিও ইহার আয় আজ সীমাবদ্ধ। তবুও কখন কখন কোন কোন সদানুষ্ঠানে এই সমিতি সাহায্য করিয়া থাকে।

এই সভার একটি নিজস্ব লাইব্রেরী আছে। সেখানে দৈনিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা রাখা হয়[৪৬]। স্থানীয় 'রাজা প্রমোদা নাথ টাউন হলের' আয় হইতে এই সভার যাবতীয় কার্য্যাদি সম্পাদিত হইয়া থাকে। উক্ত হলটি রাজা বাহাদুর' রাজশাহী সভাকে দান করিয়া গিয়াছেন।

রাজশাহী পাবলিক
লাইব্রেরী
(ইং ১৮৮৪ সাল)

'রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরী' রাজশাহীর একটি গর্বের প্রতিষ্ঠান। এক সময় বঙ্গে ইহার খ্যাতি ছিল। তখন নানা প্রকার কৃষ্টিমূলক অনুষ্ঠানাদির দ্বারা লাইব্রেরী চত্বর আনন্দমুখর থাকিত। দেশ বিভাগের পর এখানকার উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু ও জমিদারগণ স্থানান্তরে গমন করায় সুষ্ঠু পরিচালক মণ্ডলীর অভাবে পাঠক সংখ্যা হ্রাস পাইয়া যায়। সুখের বিষয় বর্তমানে ইহার আমূল উন্নতি কল্পে রাজশাহীর স্বনাম ধন্য জেলা শাসক মনোযোগী হইয়াছেন।

---

৪৩. অন্যান্য বিষয়ে 'রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ' প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৪৪. 'রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' পৃঃ ৩৩৮।

৪৫. Hunter's statistical Account of Bengal, Rajshahi, P. 91.

৪৬. Bengal Districts Gazetteer, Rajshahi P. 66.

বলা বাহুল্য, এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়ন মুখী গৃহীত পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত হইলে পুনরায় ইহা নূতন জীবন লাভ করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রাজশাহীর রাজা জমিদারদের অর্থানুকূল্যে ইং ১৮৮৪ সালে ইহা স্থাপিত হয়[৪৭]। ইহার উন্নতি কল্পে স্থানীয় সাহায্য বাবৎ নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের বার্ষিক ২০ পাউণ্ড সাহায্য বন্দোবস্ত ছিল। তদুপরি বাঙলা সরকার প্রতি বৎসরে বিনা মূল্যে পুস্তকাদি দান করিত। ইং ১৮৭১-৭২ সালে সর্বপ্রকার গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ৩২৪৭। এই সময় প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা করিয়া লাইব্রেরী খোলা থাকিত। ১৮ জন নিয়মিত চাঁদা দিত। তন্মধ্যে ৬ জন খ্রীষ্টান ছিল[৪৮]। রাজা জমিদারদের কর্তৃত্বাধীনে এই সম্ভ্রান্ত লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করিয়া রাজশাহীতে সাহিত্য মূলক সভার অধিবেশনগুলির আয়োজন এই লাইব্রেরী পরিচালকবৃন্দরাই করিতেন। মোট কথা রাজশাহীর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবন যাত্রার মূলে এই লাইব্রেরীর অনবদ্য ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয় ছিল।

এখানে যথেষ্ট পরিমাণে মূল্যবান গ্রন্থাদি রক্ষিত আছে। নাই কেবল উপযুক্ত সংখ্যক পাঠক। এমন কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এখানে আছে যাহা অনেক স্থানে নাই। অথচ এই সব মূল্যবান বই পুস্তক অযত্নে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। যাহা উপযুক্ত টাকা ব্যয় করিয়াও বিশ্বের বাজারে পাওয়া দুষ্কর। আমাদের পাঠক সমাজের জ্ঞান আহরণের এত সমস্ত সম্পদ চোখের সম্মুখে থাকা সত্বেও আমাদেরই অবহেলায় তাহা ধ্বংস হইয়া যায়, ইহার চেয়ে আজ আর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে।

লাইব্রেরী কক্ষে শ্বেত প্রস্তরের আবক্ষ মূর্তিটি বিখ্যাত পানিনি ব্যাকরণবিদ পণ্ডিত হরিশ চন্দ্র গোস্বামীর প্রতিমূর্তি। বিভাগ পূর্বকালে বরদাতে আচার্য্য পি, সি, রায়ের সভাপতিত্বে অল-ইণ্ডিয়া বেসরকারী গ্রন্থাগার সম্মেলনে রাজশাহীর পাবলিক লাইব্রেরী বঙ্গদেশের লাইব্রেরীগুলির মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া রাজশাহীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল। বর্তমানে (ইং ১৯৬২-৬৩ সালে) এই লাইব্রেরীতে সর্ব প্রকার গ্রন্থের সংখ্যা ১৩,২৫০। তাহা ছাড়া পত্র-পত্রিকা তো আছেই।

রাজা প্রমোদা নাথ রায় এই পাঠাগারের স্থায়ী বাড়ীর জন্য বর্তমান ভূমি খণ্ড দান করিলে, কাশিমপুরের জমিদার রায় বাহাদুর কেদার নাথ প্রসন্ন লাহিড়ী নিজ ব্যয়ে লাইব্রেরী ভবনটি নির্মান করিয়া অক্ষয় হন।

যাঁহাদের পাদস্পর্শে এই লাইব্রেরী ধন্য হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, আচার্য্য পি, সি, রায়, নেতাজী সুভাস চন্দ্র বোস, কবি জলধর সেন, সজনী কান্ত দাস, কান্তকবি রজনীকান্ত সেন প্রমুখ উল্লেখ যোগ্য। এতদব্যতীত বহু মণীষীবৃন্দের প্রতিকৃতি লাইব্রেরী কক্ষে শোভা পাইত। বিভাগোত্তরকালে ধ্বংসের হাত হইতে এই ঐতিহাসিক গ্রন্থাগারটিকে রক্ষা করিয়া রায় বাহাদুর ধরণী মোহন মৈত্র ও য়্যাডভোকেট বীরেন্দ্র নাথ সরকার রাজশাহীবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরী ব্যতীত পারিবারিক লাইব্রেরাগুলির মধ্যে 'দয়ারামপুর' কুমার শরৎকুমার রায় বাহাদুরের 'লাইব্রেরী' দিঘাপতিয়ার 'রাজ লাইব্রেরী', আচার্য্য যদুনাথ সরকারের লাইব্রেরী' বিশেষ ভাবে

অন্যান্য লাইব্রেরী

৪৭. Rajshahi Gazetter, P 183.

48 Statistical Account of Bengal, Rajshahi, P. 91

উল্লেখযোগ্য। আচার্য্য যদুনাথ সরকারের লাইব্রেরীর অধিকাংশ মূল্যবান গ্রন্থাদি তাঁহার বর্তমান ওয়ারিস বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়া আজ 'জিন্না ইস্‌লামিক ইনষ্টিটিউট লাইব্রেরীর কথাও স্মরণীয়।

**বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি (স্থাপিত ১৯১০ সাল)।**

রাজশাহী শহরে (পুঁঠিয়ার পাঁচ আনীর বাড়ীর চত্বর প্রাঙ্গণে) ইং ১৯০৯ সালে আচার্য্য পি, সি, রায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বসিয়াছে। এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতি কর্তৃক রচিত (স্থানীয় আঞ্চলিক মৌলিক তথ্য সম্বলিত) একটি প্রবন্ধ রমাপ্রসাদ চন্দ[৪৯] (পরে রায় বাহাদুর) কর্তৃক পঠিত হয়। মৌলিক তথ্য সম্বলিত এই প্রবন্ধ উপস্থিত নবীন ও প্রবীন সাহিত্যিকদের মনে রেখাপাত করে। অতঃপর এই সম্মেলনের একটি প্রস্তাব ক্রমে রমাপ্রসাদ চন্দ্‌কে এতদঞ্চলের (উত্তর বঙ্গের) প্রত্ন সম্পদের উপর আর একটি প্রবন্ধ রচনা করিবার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং উহা আগামী অধিবেশনে পঠনীয় রূপে সাবাস্ত হয়। ইং ১৯১০ সালে ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে কুমার শরৎ কুমার রায়, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ও রমা প্রসাদ চন্দ্‌ কর্তৃক পঠিত হইলে উপস্থিত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণ ইহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। অতঃপর এই সম্মেলনের শেষে রাজশাহীর এই তিন জন প্রতিনিধি, ঐতিহাসিক রাখাল দাস ব্যানার্জ্জি ও ভাগলপুরের উকিল শ্রীনরেশ চন্দ্র[৫০] সমভিব্যবহারে ভাগলপুরের অন্তগৃত পুরাকীর্তি সমূহ দর্শন করেন এবং বহু প্রত্ন সম্পদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। পরে এইগুলি ভাগলপুরের তদানীন্তন জমিদাবেব অনুমতিক্রমে কলিকাতা বঙ্গীয় পরিষদে দান করা হয়। এই সব সংগৃহীত প্রত্ন সম্পদের সমাবেশ দেখিয়া প্রকৃতপক্ষে এইখানেই বরেন্দ্র ভূমির প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রত্ন সম্পদের সম্বন্ধে রাজশাহীর প্রতিনিধিত্রয় চিন্তা করিতে থাকেন। অতঃপর এই দলের সব চেয়ে উৎসাহী কর্মী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় কুমার শরৎ কুমার রায়কে মালদহের গৌড় পরিদর্শনের জন্য ইঙ্গিত করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া কোন কারণ বশত: তখন গৌড় পরিদর্শন সম্ভবপর হয় না। তাঁহারা গোদাগাড়ী থানা পর্য্যটন করা স্থির করেন। তদনুযায়ী দেওপাড়া, খেতুর, মাড়ওইল, ভান্‌পুর, কুমারপুর প্রভৃতি প্রাচীন পল্লী পর্য্যটনস্থির করিয়া তাঁহারা 'ববেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটী' নামক একটি সোসাইটী গঠন বিষয়ে বিবেচনা করিতে থাকেন। অতঃপর ইং ১৯১০ সালেব এপ্রিলের প্রথমের দিকে অক্ষয় কুমার মৈত্র, রমা প্রসাদ চন্দ্‌ শশধর রায় ও কুমার শরৎ কুমার রায় এই চারি জন "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠন করেন। পরে এই সমিতিতে কলিকাতা চিত্রশালার (Calcutta Museum) তদানীন্তন সুপারিনটেনডেন্ট রাখাল দাস ব্যানার্জ্জি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রামকমল সিংহ যোগদান করেন। তারপর তাঁহারা উত্তর বঙ্গের (বরেন্দ্র ভূমির) অনুসন্ধান কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। মোটামুটি ভাবে ইহাই হইল "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির" গোড়ার কথা।

পূর্বাভাষ

ববেন্দ্রভূমির স্বপ্ন

তদানীন্তন এম, এল, সি ও গুলাইয়ের জমিদার সরদার হাজি লাল মহাম্মদের

৪৯ এই সময় বমা প্রসাদ চন্দ্‌ রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের একজন সহকারী শিক্ষক ছিলেন

৫০. ইনি ভাগলপুরের তদানীন্তন উকিল ও জমিদার ছিলেন।

কাচারী বাড়ীতে (গুলাইয়ে) প্রথম বৈঠক (Camp) করিয়া অনুসন্ধানী দল দেওপাড়া, পালপাড়া, মালঞ্চি, জগৎপুর, আতাহার, চব্বিশনগর, তালাই ও মাড়ওইল প্রভৃতি প্রাচীন পল্লী পর্য্যটন করেন। অতঃপর ভানপুরের জমিদার চৌধুরী হরিমোহন মহাশয় এই অনুসন্ধানী দলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন, তারপর সাহা কালীচরণ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলে তাঁহারা কুমারপুর, বিজয়নগর, খেতুর প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়া প্রাথমিক সূচনাতেই এই দল পাঁচ দিনে একটি[৫১] চণ্ডি মূর্তি সহ বত্রিশ খণ্ড প্রত্ন সম্পদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। পরবর্তী কালে দেওপাড়ার পুদ্ধ্যমে[৫২] শ্বরের (দেওপাড়ার দিঘীর) পঙ্কোদ্ধার কালে একটি গঙ্গা মূর্তি ও একটি লিপি সহ বহু মনসার প্রতীক আবিস্কৃত হয়। এই সময় কলিকাতা যাদুঘরের তদানীতন অধ্যক্ষ ঐতিহাসিক রাখাল দাস ব্যানার্জ্জি এখানকার সংগৃহীত কতকগুলি প্রত্ন সম্পদ 'কলিকাতা যাদুঘরে (Calcutta Museum) ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় দান করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু এই প্রস্তাবে তখন রমা প্রসাদ বাবু আপত্তি জানান। অতঃপর অনুসন্ধান সমিতির এই অভূতপূর্ব কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাজশাহীর তৎকালীন জন নায়ক ভুবন মোহন মৈত্রেয় উক্ত সমিতিকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনার্থে এক সভা আহ্বান করেন। তিনি এক অভিনন্দন পত্রে এতদঞ্চলের (উত্তর বঙ্গের) প্রত্ন সম্পদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া প্রকারান্ত রে রাজশাহীতে একটি যাদুঘর স্থাপনের ইঙ্গিত দেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রাজশাহী শাখার অবৈতনিক সেক্রেটারী বাবু শশধর রায় ইহার পূর্ণ সমর্থন করেন। তারপর এই প্রস্তাবের পর হইতে কুমার শরৎ কুমার রায়ের মনে উত্তর বঙ্গের ঐতিহাসিক সম্পদ সম্পর্কে একটি গবেষণাগার স্থাপনের বিষয় দোলা দিতে থাকে। পরে বগুড়ার খঞ্জনপুর বৈঠকে (Camp) ক্ষেতলাল, শিবগঞ্জ ও মহাস্থানগড় প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচুর পরিমানে প্রত্ন সম্পদ সংগৃহীত হইলে সমিতির বিশিষ্ট কর্মী পেট গ্রাম নিবাসী শ্রীরাম মৈত্রেয়[৫৩] রাজশাহীতে একটি যাদুঘর স্থাপন করিয়া এই সব সম্পদ সংরক্ষণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। অবশেষে কুমার বাহাদুর রাজশাহীতে একটি মিউজিয়ম (Museum) প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়তা প্রকাশ করেন। তৎপর সমিতির বিশিষ্ট সদস্য বাবু রমা প্রসাদ চন্দ্ সমিতির সেক্রেটারী হিসাবে তৎপরতার সহিত সংগ্রহ কার্য্য চালাইতে থাকেন। বিভিন্ন জেলাতে সংগ্রহ কার্য চলিতে থাকে।

সমিতি গঠন (ইং ১৯১০ সাল)

কালীচরণ সাহা ও চৌধুরী হরিমোহন

প্রথমত: সংগৃহীত সম্পদ সংরক্ষণের জন্য রাজা প্রমোদা নাথ রায়ের বাড়ী, পরে চৌধুরী মহেন্দ্র কুমার সাহা ও কালী প্রসন্ন আচার্য্যের বাড়ীতে রক্ষিত হইতে থাকে। পরিশেষে রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরীর একটি কামবায় এই সব মূল্যবান প্রত্ন সম্পদ স্থানান্তরিত করা হয়[৫৪]।

প্রথম সংগৃহীত উপাদান

---

৫১. উক্ত চণ্ডী মূর্তি মাড়ওইলের ধ্বংস স্তূপ হইতে সংগৃহীত হয়। (The address delivered by Kumar Sarat Kumar Ray of Dighapatia of Annual meetting, 1930)

৫২. দিঘীর পঙ্কোদ্ধাব কালে রাজশাহী জেলা বোর্ড সর্ব প্রথম এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানকে দুই হাজাব টাকা সাহায্য করেন।

৫৩. শ্রীরাম মৈত্রেয় মহাশয়ের নিকটে মিউজিয়ামেব প্রচুব প্রত্নসম্পদ পাওয়া গিয়াছে। ইং ১৯৬২ সালে ৯৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

৫৪. প্রবাসী ১৩২৬, ফালগুণ, ৫ম সংখ্যা-পৃঃ ৪৩৭-৪৮।

ইং ১৯১২ সালে রাজশাহী জুন মাসে তদানীন্তন গবর্ণর বাহাদুরকে রাজশাহীতে প্রস্তাবিত মিউজিয়াম ব্যাপারে ওয়াকেবহাল করাইবার জন্য কুমার শরৎ কুমার রায় ও বাবু রমাপ্রসাদ চন্দ্ বিভাগীয় কমিশনারের ব্যবস্থাক্রমে দার্জ্জিলিং গমন করেন। তৎপর গবর্ণর বাহাদুর লর্ড কারমাইকেল আগষ্ট মাসে রাজশাহীতে অনুসন্ধান সমিতির সংগৃহীত প্রত্ন সম্পদগুলির একটি প্রদর্শনী দেখিয়া মুগ্ধ হন। অতঃপর ইং ১৯১৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী একটি চিঠিতে 'রাজশাহী শহরে একটি বেসরকারী মিউজিয়ম স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন। গবর্ণর বাহাদুরের অনুমোদন সাপক্ষে কুমার শরৎ কুমার রায়ের মাসিক ২০০= শত টাকা সাহায্যে অনুসন্ধান সমিতির কার্য্য পূর্ণদ্যমে চলিতে থাকে। অতঃপর গবর্ণর এই সমিতির স্থায়ী উন্নতির জন্য মাসিক ১০০= শত টাকা করিয়া সাহায্য করিতে থাকেন। সরকারী সাহায্য পাওয়ার পর রায় বাহাদুর তাঁহার সাহায্য কমাইয়া ৫০= টাকা ধার্য্য করেন।

মিউজিয়ম স্থাপনেব অনুমতি লাভ (১৯১৩ সাল)

রাজশাহীতে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির' প্রস্তাবিত যাদুঘর (Museum) নির্মানের জন্য কুমার বাহাদুর তদানীন্তন বাঙলা সরকারের নিকট প্রতিশ্রুত হন। তদনুযায়ী যাদুঘর গৃহের জন্য রাজা প্রমোদা নাথ বর্তমান মিউজিয়মের ভূমি খণ্ড খরিদ করিয়া দান করেন। তৎপর তৎসংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট ভূমিখণ্ড মিউজিয়মের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য বাবু দুর্গা দাস ভট্টাচার্য্য দান স্বরূপ ছাড়িয়া দেন। ইং ১৯১৬ সালে ১৩ই নভেম্বর তদানীন্তন গবর্ণর কারমাইকেল কর্তৃক মিউজিয়ম ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। কুমার বাহাদুর নিজ ব্যয়ে মিউজিয়ম ভবনের কার্য্য আরম্ভ করিলে, পরে কুমার বাহাদুরের ভ্রাতা কুমার বসন্ত কুমারের পাঁচ (৫০০০) হাজার টাকা, এবং অগ্রজ রাজা প্রমোদ নাথ রায় বাহাদুরের দারুময়[৫৫] উপকরণাদি এবং প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র দ্বারা মোট ৬৩,০০০ টাকা ব্যয়ে এই মিউজিয়ম ভবন বিনির্মিত হয়[৫৬]। প্রাচীন গৌড়ের স্থাপত্য শিল্পকলার অনুকরণে বর্তমান মিউজিয়ম ভবনটি নির্মিত হইলে উহার উদ্বোধনের আয়োজন চলে। ইত্যবসবে ইং ১৯১৯ সালে অনুসন্ধান সমিতির লাইব্রেরী ও মিউজিয়ম সম্বন্ধে একটি প্রাইভেট ট্রাষ্টি বোর্ড গঠিত হয়। অতঃপর এই সালের ২৭শে নভেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড রোলাণ্ডশ্বে কর্তৃক মিউজিয়মের দ্বারোদঘাটিত হয়।

মিউজিয়ম ভবন নির্মাণ

মুর্শিদাবাদ নিবাসী শামসুল হুদা বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির এই মিউজিয়মের উন্নয়ন ব্যাপারে স্বকীয় ভাবে সাহায্য করেন। মিউজিয়মের দ্বারোদঘাটিত হইলে এক জন সুপারিনটেনডেন্ট প্রয়োজন হওয়ায় তদানীন্তন বাঙলা সরকারের কাউন্সিলের প্রভাবশালী সদস্য নওয়াব সৈয়দ শামসুল হুদার দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়। তৎপর এই ব্যাপারে নওয়াব সাহেব সরকারকে বার বার অনুরোধ করিতে থাকেন। এই সময় মিউজিয়মের সাহায্য বাবদ

মিউজিয়ম উন্নযনের ব্যাপারে সৈয়দ শামসুল হুদা

৫৫. বর্তমান জিন্না হলের সন্নিকট পদ্মা তীরে দিঘাপতিয়ার রাজার স্বাস্থ্য-নিবাস 'বাংলো' পদ্মার কোপে পতিত হইবার উপক্রম হইলে তিনি তাঁহার 'বাংলোর' দারুময় আসবাব পত্র মিউজিয়ম ভবন নির্মানের জন্য দান করিয়া দেন।

৫৬. এই কারুকার্য্যময় সৌধটির প্লান নকশা কুমাব শরৎ কুমার রায় স্বয়ং প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তত্বাবধানে ও মিউজিয়মের তৎকালিন অবৈতনিক সেক্রেটারী ইঞ্জিনিয়ার (স্যার যদুনাথ সরকারের ছোট ভাই) বিজয় নাথ সবকারের পূর্ণ সহযোগীতায় এই সুদৃশ্য ভবনটি বিনির্মিত হয়।

সরকারের পূর্ব নির্দ্ধারিত যে এক শত টাকা বরাদ্দ ছিল সৈয়দ সাহেবের চেষ্টা শিক্ষা বিভাগ হইতে আর এক শত টাকা ১৯২২ সালে মঞ্জুর হয়। ইং ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে সৈয়দ সাহেব গবর্ণর লর্ড লিটনের নিকট হইতে তিন বৎসরের জন্য আর দুই মত পঞ্চাশ টাকা (২৫০=) সাহায্য বাবদ মঞ্জুর করাইয়া লন। তারপর মাসিক দুই শত (২০০=) টাকা বেতনে একজন সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর এই অনুসন্ধান সমিতির মিউজিয়ম উন্নয়ন ব্যাপারে পঞ্চাশ (৫০,০০০) হাজার টাকার একটা পরিকল্পনা গৃহীত হয়। তদনুযায়ী মিউজিয়মের স্থায়ী উন্নতির জন্য মিউজিয়ম ট্রাষ্টির সদস্য কুমার বসন্ত কুমার রায় ত্রিশ (৩০,০০০) হাজার টাকার একটি 'কোম্পানীর কাগজ' দান করেন[৫৭]।

ইং ১৯২৭ সালে আগষ্ট মাসের বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ব্যাপক উন্নতি কল্পে এক অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে কুমার শরৎ কুমার রায়, ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, রায় বাহাদুর রমা প্রসাদ চন্দ, আচার্য্য যদুনাথ সরকার, চৌধুরী মহেন্দ্র কুমার সাহা ও সরকার বিজয় নাথকে লইয়া একটি নূতন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি মিউজিয়মের উপাদান সংগ্রহের জন্য একটি তহবিল খোলেন। ইং ১৯২৮ সালে বাঙ্‌লা সরকার এক শত পঞ্চাশ (১৫০=) টাকার একটি অতিরিক্ত গ্রাণ্ট কয়েক বৎসরের জন্য মঞ্জুর করেন। এই ১৫০= টাকা ও মঞ্জুরীকৃত স্থায়ী (২৫০) দুই শত পঞ্চাশ টাকা, মোট (৪০০=) চারি শত টাকা মাস বর্তিলে মিউজিয়মের প্রথম কিউরেটর (অধ্যক্ষ) বাবু ননীগোপাল মজুমদারকে ময়েঞ্জোদারোতে খনন কার্য্য ব্যাপারে দুই বৎসরের জন্য প্রেরণ করেন। তখন আর একশত টাকা ১০০= কুমার বাহাদুর নিজ হইতে ব্যয় করিয়া ননী গোপালকে সাহায্য করিতে থাকেন। এতদব্যতীত উত্তর বঙ্গের আরও কয়েকটি স্তুপে খনন কার্য্য চালাইবার জন্য তিনি অর্থ ব্যয় করেন। এই ভাবে কুমার বাহাদুরের অকাতরে অর্থ ব্যয় ও অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ও রমা প্রসাদ চন্দের বন্ধুজনসুলভ সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান বঙ্গে সুপরিচিত হইয়া উঠে।

বিভাগোত্তরকালে এই মিউজিয়ম নানা সম্মুখীন হয়। তখন নাকি কয়েকটি মূল্যবান উপাদানও মিউজিয়াম গ্যালারী হইতে উধাও হইয়া যায়। তারপর যোগ্য ব্যক্তির উপর ইহার পরিচালনার ভার অর্পিত হইয়া অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। অতঃপর ইং ১৯৬২ সালে মিউজিয়ম চত্বরের উত্তর ধারে সতন্ত্র একটি একতালা বিশিষ্ট লাইব্রেরী গৃহ নির্মাণের জন্য পাকিস্তান সরকারের সেন্ট্রাল ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট হইতে ৪২,০০০ হাজার টাকা সাহায্য পাওয়া যায়। এক্ষণে মিউজিয়ম লাইব্রেরী সেই স্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এই লাইব্রেরী গৃহে প্রায় ৫০ জন ছাত্র অথবা গবেষক একযোগে বসিয়া পড়াশুনা ও গবেষণা কার্য্য করিতে পারেন। তাছাড়া ইহা কখন কখন মিউজিয়মের বক্তৃতা মঞ্চ হিসাবেও ব্যবহার হইয়া থাকে।

পি. এ. নাজির
(সি.এস পি)

বর্তমানে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির এই মিউজিয়মের উন্নয়ন কল্পে রাজশাহীর স্বনামধন্য বিদ্যোৎসাহী ডেপুটী কমিশনার ও মিউজিয়ম কমিটির চেয়ারম্যান জনাব পি, এ, নাজির ১৫,০০০ হাজার টাকা

৫৭. কুমার বসন্ত কুমার রায় বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিব প্রাতষ্ঠাতা রায় বাহাদুর কুমার শরৎকুমার রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহারা দিঘাপতিয়া বাজ-পরিবাবের ছোট তরফ।

সেক্রেটারী ও কিউরেটর

সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। তিনি ইতিমধ্যেই জেলা কাউন্সিল হইতে ১০,০০০ হাজার টাকা দান করিয়া মিউজিয়মের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিলেন এবং এই মহৎ দানের জন্য তিনি রাজশাহী তথা বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির নিকট কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

যাঁহারা বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির, এই মিউজিয়ম রচনায় নিঃস্বার্থ ভাবে আজীবন সহযোগিতা করিয়া গিয়াছেন ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় শ্রদ্ধার সহিত 'গৌড় রাজমালা' নামক গ্রন্থে তাঁহাদিগের নামের একটি তালিকা দিয়া কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। এই তালিকায় রাজশাহী বিভাগের প্রত্যেকটি জেলার রাজা, জমিদার ও কতিপয় উৎসাহী ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

এই অনুসন্ধান সমিতির ৮ জন অবৈতনিক সেক্রেটারী গত হইয়া গিয়াছেন। প্রথম সেক্রেটারী ছিলেন শ্রীরমা প্রসাদ চন্দ্। বর্তমান সেক্রেটারী অধ্যাপক ক্ষিতিশ চন্দ্র সরকার। বড়ই দুঃখের বিষয়, ইঁহার সময়ে আসিয়া (বর্তমানে) বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। অথচ এই সমিতিই এই মিউজিয়মের জনক জননী। এই ব্যাপারে মিউজিয়ম পরিচালক মণ্ডলী কতখানি সচেতন আছেন, তাহাই আজ সাধারণ্যে প্রশ্ন[৫৮]। মিউজিয়মের প্রথম কিউরেটর ছিলেন অধ্যাপক ননীগোপাল র। বর্তমান কিউরেটর অধ্যাপক মুখলেছুর রহমান। মধ্যে ৫ জন কিউরেটর গত হইয়াছেন। ড: ইতরাত হুসেন জুবেরী, মরহুম অধ্যাপক মীর জাহান[৫৯] ও ড: গোলাম মখসুদ[৬০] হেলালী তন্মধ্যে অন্যতম।

যাঁহারা পুঁথি, পুস্তক, প্রত্ন-সম্পদ দ্বারা মিউজিয়মকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন ও তুলিতেছেন এবং যাঁহারা গবেষণা কার্য্যে লিপ্ত আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে ড: মহম্মদ

বর্তমানে যাঁহারা সংগ্রহ ও গবেষণা কার্য্যে লিপ্ত আছেন

এনামূল হক (চট্টগ্রাম-রাজশাহী) মৌঃ সমস উদ্দীন আহম্মদ (রাজশাহী) অধ্যাপক ক্ষিতিশ চন্দ্র সরকার, শ্রীদ্বিজেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী (রাজশাহী), জনাব কে. এম. মিছের (বগুড়া), পণ্ডিত মণীন্দ্র মোহন চৌধুরী (রাজশাহী) প্রমুখ স্মরণ যোগ্য। বিভাগোত্তরকালে গ্রন্থকারের কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ এখানে সংরক্ষিত আছে।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও এই মিউজিয়মের প্রকাশনা বিভাগের কৃতিত্বের পরিচয়

প্রকাশনা বিভাগ

এতটুকু না থাকিলে তিউজিয়মের কতা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থানীয় রাজা, জমিদার ও কতিপয়

---

৫৮. গৌড় রাজমালা, উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

৫৯. ডঃ ইতরাত হুসেন জুবেরী রাজশাহী সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এই মিউজিয়মে ইস্‌লামিক্ শাখার সৃষ্টি করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

৬০. অধ্যাপক মীর জাহান (ঢাকার জিন্‌জিরা নিবাসী) ও ডঃ হেলালী রাজশাহী সরকারী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। দেশ বিভাগের পর মিউজিয়মের দুর্দিন ঘটে ও অসহায় হইয়া পড়ে। তখন মরহুম মীর জাহান কিউরেটর নিযুক্ত হইয়া সেই সব সমস্যা কাটিয়া এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং মিউজিয়মের বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়ন কল্পে একটি পবিকল্পনা প্রস্তুত করেন। আজ তাহা নানা ভাবে বাস্তবায়িত হইতে চলিয়াছে। মরহুম ইতিহাসের একজন নামকরা শিক্ষক ছিলেন। রাজশাহী সরকারী কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান থাকাকালে তিনি এই মিউজিয়মের কিউরেটর ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে রাজশাহীবাসী ও ছাত্রবৃন্দ খুবই দুঃখ প্রকাশ কবিয়াছেন।



রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিব মিউজিয়ম



রাজশাহী পৌরসভা গৃহ

উৎসাহী ব্যক্তিদের অকৃপণদানে যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি ও বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহার তুলনায় আমাদের সরকারী মিউজিয়মগুলি কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ছোট-বড় প্রকাশিত ২৭ খানা গবেষণা মূলক পুস্তকের মধ্যে ৯ খানা প্রাচীন পুঁথি হইতে সঙ্কলিত; এতদব্যতীত ৪/৫ খানা গবেষণা মূলক পুস্তক প্রেস হইতে আত্ম প্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে[৬০]।

এই মিউজিয়মের গ্যালারীতে যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক উপাদান সংরক্ষিত আছে তাহার একটি তালিকা পেশ করিবার পূর্বে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি মূল্যবান উপাদানের কথা আগে বলিয়া লইব।

১। সচিত্র অষ্টসহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা॥ ইহা একটি বৌদ্ধ দর্শন গ্রন্থ। রাজা হরি বর্মার ঊনবিংশতম রাজত্বকালে আনুমানিক ইংরেজী ১১০৩ সালে অনুলিখিত। অন্য আর একটি বহু চিত্র সম্বলিত অষ্টসহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা, ইং ১২৭৩ সালে অনুলিখিত।

২। আদ্য পরিচয়॥ শেখ জাহিদ কর্তৃক ইং ১৪৯৮ সালে রচিত। বাঙ্লা পুঁথির মধ্যে ইহা প্রাচীনতম পুঁথি। ১৪ পাতা - ২৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহা একটি পরিপূর্ণ যোগের বই।

৩। বাদশাহ শাহ জাহানের সময়ে লিখিত কোরাণ শরীফ ও পারসিক জ্যোতিষ।

৪। রোমান হরপে বাঙ্লা দুর্গেশনন্দিনী।

৫। মথুরেশ লিখিত শব্দ রত্নাবলী নামক 'কোষ'; বাঙ্লার বারভূঁয়া শ্রেষ্ঠ ইশা খাঁর পুত্র মূসা খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত।

৬। বঙ্গের স্বাধীন সুলতান - মাহমুদ শাহের রাজত্বে ইংরেজী ১৫৩৩ সালে একটি সেতুর উদ্বোধন কালে প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত শিলালিপি।

৭। মুসলিম সুলতানদের আমলে প্রস্তর লিপিগুলির মধ্যে সুরফুদ্দীন ফিরোজ শাহের লিপিটি প্রাচীন।

৮। মাহধীসন্তোষ মসজিদের 'হোসেন শাহী মিহরাব'-পাঠান স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

৯। শের শাহী কামান। ইংরেজী ১৫৪১ সালে বাদশাহ শের শাহের রাজত্বকালে সৈয়দ আহমদ রুমী কর্তৃক নির্মিত।

১০। দলিল দস্তাবেজ চিঠিপত্র ফরমানগুলির মধ্যে বাদশাহ জাহাঙ্গীর, আহমদ শাহ, ফররুখ শিয়ারের ফরমান উল্লেখযোগ্য।

(ক) ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত, সাদুল্লার মৃত্যুতে আলী মর্দান খানের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিত শাহ জাহানের একটি পত্রের হুবহু নকল।

(খ) একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠায় যথাক্রমে বাদশাহ আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহ জাহানের হস্ত লিপি।

(গ) মোগল আমলের একটি পাসপোর্টে রাজকীয় কর্মচারীকে কাবুল যাইবার অনুমতি দানের নির্দ্দেশ।

১৩। মোঘল যুগে অঙ্কিত (Paintings) চিত্রগুলির মধ্যে (ক) সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পিতা ইতিমদুদ্দৌলার ছবি; (খ) রফিউদ্দৌলার (দ্বিতীয় শাহজাহান) ছবি, (গ) অযোধ্যার নওয়াব আসাদুদ্দৌলার ছবি অন্যতম।

৬০. Vide - Museum's Catelogue

মিউজিয়মে রক্ষিত প্রত্ন সম্পদ প্রভৃতির আনুমানিক তালিকা -

| | | |
|---|---|---|
| ১ | গুপ্ত তাম্রশাসন ও পাল-সেন পর্বের শিলালিপি | ১২টি |
| ২ | সর্ব প্রকারের মূর্তির সংখ্যা | ১১০০ শত |
| ৩ | সর্ব প্রকার গ্রন্থের সংখ্যা (বিশেষতঃ ইতিহাস ও বিবরণী মূলক পুস্তক) | ১২,০০০ হাজার |
| ৪ | হস্ত লিখিত বাঙলা প্রাচীন পুঁথির সংখ্যা | ১,৫৫৩ হাজার |
| ৫ | বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত পুঁথির সংখ্যা | ৩০০০ হাজার |
| ৬ | বিবিধ মাসিক, সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা | ৩০০০ হাজার |
| ৭ | হস্তলিখিত আরবী, ফারসী এবং কোরাণ শরীফ | ১২ টি |
| ৮ | আরবী ফারসী শিলালিপি | ৩০ টি |
| ৯ | বাঙলা শিলালিপি | ৬ টি |
| ১০ | সংস্কৃত শিলালিপি | ১০ টি |
| ১১ | তিব্বতীয় শিলালিপি | ১ টি |
| ১২ | সর্ব প্রকার মুদ্রা (স্বর্ণ,রৌপ্য ও তাম্র) | ৯৫০ শত |
| ১৩ | হাতে আঁকা ছবি - দলিল, দস্তাবেজ, চিঠি পত্রফরমান, শীল ও নানা প্রকার ফটো, ঢাল, তলোয়ার, বন্দুক, কামান প্রভৃতি আনুমানিক | ২০০ শত |
| ১৪ | ধাতু নির্মিত মূর্তি | শতাধিক |
| ১৫ | ময়েঞ্জোদারো, পাহাড়পুর প্রভৃতি প্রত্নসম্পদের প্রদর্শনী কাঁচের বাক্স (Show case) | ৫ টি |

মিউজিয়মের অবস্থান

রাজশাহী শহরের মধ্যস্থলে সদর হাসপাতালের পশ্চিম ধারে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির এই সুদৃশ্য মিউজিয়ম ভবনটি অবস্থিত। প্রতি বৃহস্পতিবারে ইহা বন্ধ থাকে। সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য সকল দিনে সকাল ১২ ঘটিকা হইতে বৈকাল ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত দর্শকের জন্য খোলা থাকে। এই মিউজিয়মকে সুন্দর ভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া একটি প্রাণ কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে সহ-কিউরেটরের প্রয়াস প্রশংসনীয়।

জাতীয় মিউজিয়মই (চিত্রশালা সহ) হইল জাতির পাদ প্রদীপ বা দেশ পরিচয়। কোন দেশকে জানিতে হইলে সেই দেশের মিউজিয়মে সর্বাগ্রে প্রবেশ করা উচিৎ। মিউজিয়মে প্রবেশ করিলে তখন সেই দেশের বিভিন্ন যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্মারক স্মৃতি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে। যে দেশে মিউজিয়ম নাই, সেই দেশের পরিচয় ইতিহাসের পাতায় নগণ্য। সুতরাং কোন দেশের সংস্কৃতি এবং সভ্যতা জানিতে হইলে সেই দেশের মিউজিয়মই যথেষ্ট। এই জন্যই উন্নত ও সভ্য দেশের রাষ্ট্র' প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ ও মিউজিয়মের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মিউজিয়ম ক্ষুদ্র হইলেও ইহার ভূমিকা অনন্য সাধারণ। বরেন্দ্র মিউজিয়ম বরেন্দ্র ভুমি (উত্তর বঙ্গ) তথা বাঙলার প্রায় তিন সহস্রাধিক বৎসরের সংস্কৃতির এবং সভ্যতার ধারক। সেই জন্য সরকারের এই মিউজিয়মের সর্বাঙ্গীন উন্নতির দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিৎ বলিয়া মনে করি।

জনৈক ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য ও কমনওয়েল্‌থ্‌ মিউজিয়ম সেক্রেটারী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মিউজিয়ম পরিদর্শন করিয়া মন্তব্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে 'One of the most finest and smallest Museum in Asia' এতদব্যতীত দেশ বিদেশের খ্যাতনামা বহু মণীষীবৃন্দ যেমন–ঢাকার নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার আজিজুল হক; স্যার নাজিমুদ্দিন, মহাত্মা গান্ধী, লর্ড লিটন, স্যার জন এণ্ডারসন, ষ্টেলা, ক্যামারিস, ফরমিকী, টুসি, ডঃ রমেশ চন্দ্র মজমুদার, ডঃ নিহার রঞ্জন রায়, প্রমুখ তাঁহাদের অকুণ্ঠ প্রশংসালিপি রাখিয়া গিয়াছেন[৬১]।

বাঙ্‌লা সরকারের ইং ১৮৯০ সালের চ্যারিটেবল এন্‌ডৌমেণ্ট য়্যাক্ট অনুসারে অনুসন্ধান সমিতি ইং ১৯৩৭ সালে এই মিউজিয়মের যাবতীয় সম্পদ ও ইমারতাদি

**মিউজিয়ম ও অনুসন্ধান সমিতি**

সরকারের হস্তে অর্পণ করেন। অতঃপর ইহার একটি পৃথক পরিচালনা কমিটী গঠিত হয়। তদানুযায়ী রাজশাহীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পদাধিকার বলে এই কমিটীর সভাপতি বা চেয়ারম্যান রূপে ইহা পরিচালনা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারে শিক্ষাবিভাগ ইহার ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন।

রাজশাহী শহরে সুপেয় পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত হইবার পূর্বে এই শহরে প্রায়শ: কলেরা, বসন্ত ও আমাশয় প্রভৃতি নানাপ্রকার জটিল ব্যাধিতে শহরবাসী আক্রান্ত হইত।

**মহাবাণী হেমন্ত কুমারী মিউনিসিপ্যাল ওয়াটাব ওয়ার্কস (ইং ১৯৩৭ সাল, ১৪ই আগষ্ট)**

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধি কখন কখন মহামারী আকার ধারণ করিত এবং বহু নাগরিক মৃত্যুমুখে পতিত হইত। অতঃপর পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত হইলে সংক্রামক ব্যাধি হ্রাস পাইতে থাকে। পাকিস্তান আমলে যদিও কয়েকবার বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে নাগরিকবৃন্দ আক্রান্ত হইয়াছিল তাহা পূর্বের ন্যায় ততখানি ব্যাপকতর হইতে পারে নাই।

পুঁঠিয়ার মহারাণী হেমন্ত কুমারী ও কতিপয় দানশীল লোকের বদান্যতায় এবং রাজশাহী পৌরসভা, জেলা বোর্ড ও সরকারী অর্থ সাহায্যে ইং ১৯৩৭ সালে ১৪ই আগষ্ট ২,৫৭,২৮৫= টাকা ব্যয়ে ইহা স্থাপিত হয়। জাতির এই বৃহত্তম কল্যাণে মহারাণী হেমন্ত কুমারী ৬৫,০০০= টাকা দান করেন। তাঁহার এই উল্লেখযোগ্য দানের জন্য ইঁহার 'মহারাণী হেমন্ত কুমারী ওয়াটার ওয়ার্কস' নাম করা হইয়াছে। রাজশাহী জেলা বোর্ড ওয়াটার ওয়ার্কস আফিসাদির ভূমি খণ্ড দান করিয়াছেন।

**রাজশাহী ইলেকট্রিক সাপ্লাই**

এই ইলেকট্রিক সাপ্লাই প্রতিষ্ঠান রাজশাহী পৌর সভার একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ইং ১৯৩৬ সালে জানুয়ারী মাসে ইহা স্থাপিত।

শহরের আদি টাউন 'বুয়ালিয়া' পদ্মা গর্ভে নিমজ্জিত হইলে আলুপট্টির নীচে (বর্তমানে পদ্মাগর্ভে) সাহেবগঞ্জ নামক একটি বাজার কিছু দিন টিকিয়া ছিল। অতঃপর সাহেবগঞ্জ পদ্মাগর্ভে সমাধি লাভ করিলে বর্তমান 'সাহেব বাজার' প্রবল হইয়া উঠে।

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে এই সাহেব বাজারের সংবাদ শোনা যাইতেছে। স্থানীয় প্রবীণ লোকের সাক্ষ্য প্রামাণিকে ও প্রাচীন ব্যবসায় সংক্রান্ত কাগজপত্রমূলে

৬১. Museum's visit book দ্রষ্টব্য–

যতদূর অবগত হওয়া যায় তাহাতে অনুমান করা যায় যে, আদিতে ক্ষুদ্র একটি তহবাজার হইতে এই সাহেব বাজারের ভিত্তি রচিত হয়। সকালের দিকে মুষ্টিমেয় লোকজন ২/৪টি দোকান পসারা লইয়া আসিয়া 'বেচাকেনা করিয়া আবার দুপুরের দিকে চলিয়া যাইত। তারপর যখন সাহেবগঞ্জও পদ্মা গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গেল তখন এই বাজারে কিছু কিছু লোকজন আসিয়া কেনাবেচা করিতে থাকিত। এই সময় স্থানীয় দোকানদারদের মধ্যে ভাদু, দুষর, আলেক ও হেকমত প্রভৃতি খলিফার নাম শোনা যায়। উহারা হাতে সিলাই করিয়া পিরহান, জুব্বা, কুরতা, টুপি, প্রভৃতি জামা কাপড় বিক্রয় করিত। নীলমণি পোদ্দার নামক ব্যক্তি মনোহারী দোকান খুলিয়াছিল। ইনিই নাকি এই বাজারে সর্ব প্রথম হাঁস মার্কা কেরোসিন টিন দ্বারা চার চালা বিশিষ্ট একটি ঘর বাঁধিয়াছিলেন। আড়তদারীদের মধ্যে মোহিনী সাহা ও জামাল ব্যাপারীর নাম শোনা যায়। বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে জমারত, মহিম, আলীমুদ্দী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিল। ইহারা দেশী তাঁতের উৎপাদিত ধুতি মারকিন, মাঠা প্রভৃতি কাপড় বিক্রয় করিত। এতদব্যতীত রেশমপট্টির ২/১ জন মাড়োয়ারীও বাহির হইতে নুন ও মারকিন কাপড় অল্প বিস্তর আমদানী করিত।

সাহেব বাজার

পরবর্তীকালে মোমেনশাহী জেলার জঙ্গলবাড়ী নিবাসী ১ নং গদির প্রতিষ্ঠাতা নইমুদ্দীন প্রমুখ স্বীয় ভাগ্যান্বেষণে এখানে আসিয়া সর্ব প্রথম অদৃষ্টবলে জনৈক সেরয়াগী মাড়োয়ারীর দোকানে থাকিয়া স্বহস্তে তামাক প্রস্তুত করিয়া হাটে-বাজারে গ্রামে গ্রামে ফেরি করিত। ঘটনাক্রমে সেরয়াগী স্থান পরিবর্তনের সময় তাহার তামাক পাতার দোকানটি নাম মাত্র মূল্যে নইমুদ্দীনের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। অতঃপর সেই দোকানই ১নং গদির সম্পদ সমৃদ্ধির মূল কারণ হয়।

তখন মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর রামপুর বুয়ালিয়াস্থিত ম্যানেজার মিঃ অষ্টিন সাহেব 'সাহেব বাজারের' স্থায়ী উন্নতির জন্য স্থানীয় সিরইলের জমিদারের–নিকট হইতে বার্ষিক সাত শত টাকা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া অত্র বাজারের পূর্ব দিকে একতলা বিশিষ্ট একটি লম্বা দালান প্রস্তুত কবিয়া দেন। বাজারের অগ্রগতি দেখিয়া তিনি পরে তৎসংশ্লিষ্ট আর একটি অনুরূপ দালান ও ডালপট্টির টিনের সেডের বর্তমান চারচালাটি প্রস্তুত করিয়া উহাতে বাজারজাত তরিতরকারী প্রভৃতি দোকান-পসার বসাইবার চেষ্টা করিতে থাকিলে উহার পশ্চাতে সাহেবদের কোন ষড়যন্ত্র আছে, মনে করিয়া স্থানীয় দারিদ্র জনসাধারণ প্রথমত: রাজি হইতেছিল না। এমতাবস্থায় একরূপ জোরজবরদস্তি করিয়া অষ্টিন সাহেব দোকান-পসার বসাইতে থাকেন। অতঃপর ধীরে ধীরে ঢাকা, মোমেনশাহী ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের। লোকজন আসিয়া ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে বসিয়া পড়ে। এই ভাবে 'সাহেব বাজারের সূচনা ও ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

যেহেতু মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর অষ্টিন সাহেবের চেষ্টা ও যত্নে সাহেববাজার বাস্তবায়িত হইয়াছে। সেই হেতু 'কোম্পানীর সাহেববাজার' নামে ইহা কথিত হইতে থাকে। পরে 'কোম্পানীব' নাম বিলুপ্ত হইয়া 'সাহেববাজার' নাম মশহুর হইয়া পড়ে। অতঃপর কাগজপত্রে চিঠিপত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে ইহার 'সাহেববাজাব' নাম স্বার্থক হইয়া উঠে।

নামকরণ

তারপর মাড়োয়ারী, তেলী, সাহা প্রভৃতি বিদেশাগত ব্যবসায়ীদের আগমন ও দোকান-

পসার স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে ইহার আয়তন বাড়িয়া যায়। বাজারের গঠন কার্য্য চলিবার সময় কয়েকবার অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া বহু দোকান-পসার ভস্মীভূত হয়। অতঃপর ক্রমশ: স্থায়ী দোকান ঘরগুলি পাকাবাড়ীতে পরিণত করা হয়।

রাণীবাজার ও রেশমপট্টি

রেশম পট্টি সংলগ্ন আর একটি বাজার যেটি, 'রাণীবাজার' নামে খ্যাত। রাজশাহীতে রাণী ভবানী, রাণী শরৎ সুন্দরী, রাণী হেমন্ত কুমারী প্রভৃতি দানশীলা মহিলার নাম মশহুর। এই রাণীবাজার কাহার স্মৃতি বহন করিতেছে তাহা জানা যায় না। সেখানে য়িহুদী জাতীয় জনৈক মোনা সাহেবের মনোহারী দোকান বেশ পরিচিত ছিল। তিনি উচ্চ মূল্যে জিনিষ পত্র বিক্রয় করিলেও–তাহার দোকানে নাকি মাদক দ্রব্যাদি ও হরেক রকম দুষ্প্রাপ্য জিনিষপত্র পাওয়া যাইত। এখানকার রেশমপট্টি রেশম ব্যবসায়ীদের স্মৃতি বহন করিতেছে।

আজাদী আমলে সাহেব বাজারের বহু সমৃদ্ধ হিন্দু ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ স্থানান্তরে গমন করিলে ইহার গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পাইয়া যায়। তারপর পশ্চিম বঙ্গ ও বিহার প্রভৃতি স্থান হইতে মোহাজের ব্যবসায়ীরা আগমন করিয়া ক্রমশ: ইহার অবস্থার পরিবর্তন করিতে থাকে। বর্তমানে স্থানীয় ও বিদেশাগত ব্যবসায়ীদের সমাবেশে 'সাহেব বাজার' পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং উত্তরোত্তর ইহার অগ্রগতি অব্যাহত রহিয়াছে। যে সমস্ত মোহাজের ব্যবসায়ীরা এখানে আগমন করিয়া নিজেদের অধিকার

স্বাধীনতা উত্তরযুগে সাহেব বাজারের ভূমিকা

প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে মরহুম হাজি আবদুল জলীল বিশ্বাসের নাম উল্লেখ করা যায়[৬২]। এতদব্যতীত পশ্চিম পাকিস্তানের বহু ব্যবসায়ী এখানে আগমন করিয়া নানা প্রকারের ব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্য দিয়া সাহেব বাজারের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। সম্প্রতিকালে বগুড়ার বিখ্যাত রহমান ব্রাদার্সের একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা এখানে 'পাকিস্তান টবাকো' কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে সিগারেট প্রভৃতির ব্যবসায় যোগদান করিয়াছেন।

এখানকার 'কাদিরগঞ্জ বাজার' এক সময় 'বুয়ালিয়া টাউনের খাদ্য সরবরাহ করিত। ইহা ধান, চাউল ও পাটের বিখ্যাত আড়ত ছিল। এখন ইহার অস্তিত্ব মাত্র রহিয়াছে।

কাদিরগঞ্জ

কাদিরগঞ্জের বেত শিল্পের একটি বিখ্যাত কারবার ছিল। জনৈক চীনদেশের একজন কারিগর এখানে বেতের চেয়ার প্রভৃতি প্রস্তুত করিত। সে 'চীনা সাহেব' নামে পরিচিত ছিল।

**খেলাধূলা ও ক্লাব :**

বুয়ালিয়া ও ভিক্টোরিয়া ক্লাব

রাজশাহী শহরে অবস্থিত পুঁঠিয়ার পাঁচ আনীর ময়দানে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে (?) তদানীন্তন কুঠিয়াল সাহেব ও স্থানীয় জমিদারদের যুক্ত চেষ্টায় 'ভিক্টোরিয়া ক্লাব' নামে একটি ক্লাব স্থাপিত হইয়াছিল। কুঠিয়াল

৬২. তিনি এখানে বহু সদানুষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। বঙ্গ ভাষায় নাম স্বাক্ষর ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন শিক্ষা ছিল না। অথচ তিনি ব্যবসার ক্ষেত্রে সুখ্যাতি লাভ করিয়া ছিলেন। তাহার আদি নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান গ্রামে। জন্ম (ভবানী মাটি)– ১৩১১, মৃত্যু ১৬ই পৌষ–১৩৬৮ সাল।

সাহেবদের আমদানীকৃত বিলাতী খেলাধূলার চর্চ্চাই ছিল এই ক্লাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রধানত: এখানে ক্রিকেট, হকি, ফুটবল প্রভৃতি খেলা হইত। যতদূর অবগত হওয়া যায় পাশ্চাত্য খেলাধূলা এখান হইতেই রাজশাহী তথা উত্তর বঙ্গের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রেশম কুঠিগুলি বন্ধ হইয়া গেলে সাহেবদের স্থানান্তরে গমন করায় এখানকার খেলাধূলা স্তিমিত হইয়া পড়ে। তারপর যখন পাঁচ আনীর ময়দানের বহুলাংশ পদ্মা গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায় তখন ক্লাবের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। প্রত্যেক বৎসরে এই ময়দানে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার আসর জমিত। অনেকে বলেন ইং ১৮৮২ সালে এই ক্লাব স্থাপিত হইয়াছিল।

ইংরেজী ১৮৮৪ সালে বুয়ালিয়া ক্লাবটি স্থাপিত হয়। ইহা একটি নৈশ ক্লাব। এই ক্লাবে অনুষ্ঠিত কুকীর্তির কথা এখনও মানুষের মুখে মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। পাশ্চাত্য সুসভ্য ফিরিঙ্গী বণিকদের নানা প্রকার খেলাধূলার মধ্যে তাস, দাবা, উলঙ্গ (?) নৃত্য, অবৈধ আমোদ-প্রমোদ, ভোগ বিলাস মদ মত্ততা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। এই সব অবৈধ আমোদ প্রমোদ মদ মত্ততার অভিশাপে কয়েক জন ইংরেজ সাহেব নাকি প্রাণ হারাইয়াছে। এখানে কত সতীর সতীত্ব, কত অবলা ললনার ইজ্জৎ লইয়া ছিনিমিনি খেলা হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অসভ্য বরবর্ ইংরেজ কুঠিয়াল সাহেবেরা স্থানান্তরে গমন করিলে এই সব কুকীর্তি কিছু দিনের জন্য ভাটা পড়িয়া গিয়াছিল। তারপর পাকিস্তান আমলে আসিয়া আমাদের বাঙ্গালী সাহেবেরা আবার উহা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, তাহা সম্ভবপর হয় নাই। বর্তমানে ক্লাব ইমারতটি কালের সাক্ষীস্বরূপ সেই ইংরেজ কুঠিয়ালদের কুকীর্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

এই ক্লাবের আদি ইমারতটি পাপিষ্ঠদের পাপে ভারাক্রান্ত হইয়া পদ্মা গর্ভে আত্ম বিসর্জ্জন করিলে, রাজশাহীর পানসিপাড়ার জমিদার মোহিনী মোহন রায়ের স্বাস্থ্য নিবাস কুঠিটি ভাড়া করিয়া উহাতে সেই ক্লাব স্থানান্তরিত করা হয়। ইহাই বর্তমান 'বুয়ালিয়া ক্লাব' নামে পরিচিত।

মোহামেডান স্পোর্টিং
টাউন ক্লাব

কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নামানুসারে রাজশাহীতে একটি "মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ইং ১৯০৬ সালে স্থাপিত হয়। এখনও ইহার অস্তিত্ব আছে। এতদব্যতীত এখানে স্থানীয় যুবকদের চেষ্টায় 'টাউন ক্লাব' নামে আর একটি ক্লাবের প্রতিষ্ঠার কথা শোনা যায়। বর্তমানে ইহাব কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

রেসকোর্স ময়দান

বর্তমান পুলিশ লাইনের পূর্ব ধারে ময়দানে ঘোড়দৌড় হইত। প্রত্যেক বৎসরে এখানে রীতিমত প্রতিযোগিতামূলক বাজি চলিত। তখন এখানকার কুঠিয়াল ইংরেজ সাহেবেরা এই রেসের জন্য ঘোড়া পুষিতেন।

স্থানীয় জমিদারদের অনেকেই এই রেসে যোগদান করিতেন। দিঘাপতিয়ার বিখ্যাত জমিদার কয়েকটি রেসে ইংরেজদের নাকি হার মানাইয়া দিয়াছিলেন। দিঘাপতিয়া-বাজের ঘোড়ার বিখ্যাত আস্তাবলটি এখনও অভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। রেসকোর্স ময়দানের ঘোড়দৌড় ও 'পোলোর' বেশ খ্যাতি ছিল।

বিভাগ পূর্বকালে রাজশাহীতে খেলাধূলার ব্যাপারে নাম মাত্র একটি এসোসিয়েশন বা সমিতি ছিল। বিভাগোত্তরকালে ইং ১৯৪৭ সালে স্থানীয় যুব সমাবেশে পূর্ব সমিতিকে পূণর্গঠন করা স্থির হয়। অতঃপর একটি ভাড়াটিয়া ঘরে ইহার আফিসাদি স্থাপিত হয়। তারপর কিছু দিনের জন্য ইহা স্তিমিত হইয়া যায়। পরে ইং ১৯৫৭ সালে পুনরায় ইহার পুণর্গঠনের কার্য্য চলে। অতঃপর পুরাদমে খেলাধূলা চলিতে থাকে।

বাজশাহী জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশন (R.D S A).

ইং ১৯৬১ সালে রাণীবাজারে একটি পতিত বাড়ী হুকুম দখল করিয়া এই নব গঠিত সমিতির আপিসাদি স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। রাজশাহীর জেলাশাসক পদাধিকার বলে এই সমিতির সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন।

## কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে রাজশাহী শহর :

ইং ১৯৪১ সালে বৃটেন ও মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ ঘোষণায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘোরতর হয়। এই যুদ্ধে প্রথমের দিকে জাপানী শক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যকে প্রকম্পিত করিয়া তোলে। পরে জাপান ইঙ্গ-আমেরিকার নিকট আত্ম সমর্পন করিয়া নিজেদের আত্মরক্ষা করে। যাহা হউক, এই যুদ্ধ চলাকালে ইং ১৯৪১-৪২ সালে শীত (?) মৌশুমে কলিকাতায় জাপানী বিমান হইতে কয়েকবার বোমা বর্ষণ করা হয়। ফলে কলিকাতাবাসী অনেকেই প্রাণ ভয়ে বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া বিভিন্ন স্থানে গমন করে। নাগরিকদিগের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। সরকারী ও বেসরকারী কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর অস্থায়ী ভাবে বাঙ্লার বিভিন্ন জেলাতে স্থানান্তরিত হয়। এই সময় বাঙ্লা সরকারের স্বায়ত্ব-শাসন বিভাগ (L.S.G. Deptt.), শিক্ষা বিভাগ (Education Deptt.) সমবায় (Co-operative and Registration Deptt.) ও রেজিষ্ট্রেশন এবং চিকিৎসা (Health Deptt) প্রভৃতি বিভাগ রাজশাহী শহরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে কলিকাতার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পৃথিবীর নানা স্থানে খাদ্য ও অর্থ সংকটের মোকাবেলায় সমগ্র পাক-ভারতের জনগণ অধির হইয়া উঠিয়াছিল। এই সংকটকালে বাঙ্লার প্রতিটি জেলা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইয়াছিল। সাধারণ লোকেরা ক্ষুধার জ্বালায় পিতা পুত্রের হাত হইতে রুটির টুকরা কাড়িয়া খাইত এবং মানুষ ও কুকুরকে একই সঙ্গে উচ্ছিষ্ট খাদ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে দেখা যাইত। পল্লীর বহু গরীব দুঃখী জনগণ বন-জঙ্গলের কচু ও শাক সব্জি সিদ্ধ ইত্যাদি অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া (ইং ১৯৪২-৪৩ সালে) রাজশাহী শহরে তখন বহু লোক অকালে প্রাণ হারাইয়াছে।

বিশ্বযুদ্ধের পরিনতি ও মানব চরিত্র

এই ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালীন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসক গোষ্ঠী ও মুনাফালোভী মানুষের শত্রু শোষক সম্প্রদায় কতিপয়

ধনী লোকের চক্রান্তে লক্ষ লক্ষ মণ ধান চাউল গোলাজাত করিয়া রাখায় ও যুদ্ধে সরবরাহর জন্য বিদেশে রফতানী ও অবস্থার প্রতিকূলে তাহা বিনষ্ট করিয়া ফেলার দরুন এই ভয়াবহ ও জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই সময় (ইং ১৯৪২-৪৩ সালে) বাঙলার বিভিন্ন শহরে 'কণ্ট্রোল প্রথা' প্রবর্তিত হইলে, রাজশাহী শহরেও তখন 'রেশন প্রথা' চালু হয়। খাদ্যাভাবে দেশে হাহাকার রব উঠে। এমতাবস্থায় মুসলিম লীগের অন্যতম কর্মী জনাব আতাউর রহমান (প্রাক্তন এম, এল, এ) কংগ্রেসের শক্তিভূতি চৌধুরী, সুভ্রাংশু মৈত্র প্রমুখ কতিপয় সমাজ হিতৈষী কর্মীবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে রাজশাহী শহরের কয়েক স্তানে (দরগাপাড়া, কলেজ প্রাঙ্গনে, পাঁচ আনীর ময়দান, ধর্মসভা, তালাইমারী, প্রভৃতি) লঙ্গরখানা স্থাপিত হয়। এই সব লঙ্গরখানায় 'মাড়ীঘাটা' ও 'লাবসী' (লাবরা) খাইয়া ভুখাগণ নানা ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া পড়ে এবং পরিণামে অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তৎকালীন খাদ্য বিভাগের এক শ্রেণীর কর্মচারীগণের অমানুষিক ও মানবতাহীন দুর্নীতি পূর্ণ কলঙ্কময় কার্য্যকলাপ ও দারুণ অর্থ সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া শহরের শিক্ষিত অশিক্ষিত ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারী বেসরকারী কর্মচারীগণ ও এক শ্রেণী লোকের নৈতিক চরিত্রের চরম অধঃপতন ঘটে ও জাতির দেহ বিষাক্ত করিয়া তোলে। খাদ্য ও বস্ত্রাভাবে শত শত রমণী ভ্রষ্টা হইয়া পড়ে। তখন মুনাফাখোর নরপিশাচগণের হৃদয় হীনতায় কালোবাজারী পুরাদমে আত্ম প্রকাশ করে।

ইং ১৮৩৮ এবং ১৮৬৫ সালে রাজশাহীতে ভীষণ বন্যা হয়। ১৮৬৫ সালের বন্যার দরুণ ভীষণ জলবিপ্লব ঘটে। তাহার ফলে পদ্মা ভাসিয়া যায়। কয়েক স্থানে বাঁধ ভাঙ্গিয়া শহরে জল প্রবেশ করে এবং তাহার দরুণ বহু কাঁচা বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া পড়ে। আগষ্ট মাসের শেষে এই জল বিপ্লব ঘটে। ইংরেজ আমলে এত বড় বন্যা ও জলবিপ্লব আর ঘটে নাই। এই ভয়াবহ বন্যায় বহু গৃহ পালিত পশু ভাসিয়া গিয়াছিল। নীচু ভূমির লোক জন উঁচু জমিতে আশ্রয় লইয়া প্রাণ বাঁচাইয়া ছিল। বন্যা নামিয়া গেলে কলেরা মহামারীতে বহু লোকের প্রাণহানী হইয়াছিল। শস্যাদির প্রচুর ক্ষতি হইয়া দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল[৬৩]। এই বন্যায় বহু জলাশয় শস্য ক্ষেত্রের উপযোগী হইয়াছে এবং বহু শস্য ক্ষেত্র জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে।

ইং ১৮৩৮, ১৮৬৫ সালে বন্যা ও মহামারী, ১ নং ড্রেন

এই সময় রাজশাহী শহরের মধ্যস্থলে প্রবাহিত বারাহী নদী পদ্মার বালুকা রাশির চাপে পড়িয়া নালায় (বা ড্রেনে) পরিণত হয়। এই নালাটি এখন অত্র শহরে ১ নং ড্রেন নামে খ্যাত। এক সময় ইহার প্রবল স্রোত আজিকার রাজশাহী শহরের মধ্য দিয়া বায়া হইয়া নওহাটাতে পতিত হইত। মাল বোঝাই বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিত। এখনও এই নদীর মরাখাত সিরইল হইতে নওহাটা পর্য্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে। রেনলের নক্শায় (Map) এই ড্রেন বা বারাহী নদীর উল্লেখ আছে। আজ হইতে শতবর্ষ পূর্বে এই নদীতে খেয়া পারের দক্ষিণা স্বরূপ ১ পয়সা ধার্য্য ছিল। এই নদীর বুকের উপর-গনকপাড়া ও বুয়ালিয়া থানা স্থাপিত, বলিয়া বোধ হয়। এই নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত ভূমি—শাহ মখ্দুম আউলিয়ার পাদস্পর্শে ও সমাধিলাভে ধন্য হইয়াছে। কালে পশ্চিম পাড়ই শহরের মর্য্যাদা পাইয়া বসে।

৬৩. Hunter's statistical Account of Bengal, Rajshahi district P 79

বাং ১৩০৪ সালের ভূমিকম্প সাধারণত: এদেশে "বড় ভূমিকম্প" নামে বিখ্যাত। এই ভূমিকম্পে রাজশাহী তথা সমগ্র পূর্ব্ব পাকিস্তানের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। রাজশাহী জেলার অধিকাংশ রাজা জমিদারদের পাকা বাড়ী ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। নাটোর ও রাজশাহী শহরের বহু ইমারত ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। নীল ও রেশম কুঠিগুলি ভূমিস্মাৎ হইয়া গিয়াছিল। এই সর্বনাশা প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজশাহী জেলার স্থাপত্য শিল্পের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। কতক চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে কতক চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে[৬৪]। যাহা অবশিষ্ট আছে আমাদের অবহেলার দরুণ তাহারও আজ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। পুঁঠিয়া নাটোর, দিঘাপতিয়া প্রভৃতি রাজ বাড়ী ও শহরের বড় কুঠি সংশ্লিষ্ট বহু কুঠি, সাহেবদের ঘোড়ার আস্তাবল ভূমিস্মাৎ হইয়া যায়। বহু লোক দালান চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কতক সাংঘাতিক রূপে আহত হয়। কিন্তু সরকারী বিবরণে মাত্র ৯ জন লোকের মৃত্যু সংবাদ ও কিছু সংখ্যক লোক আহত হয়[৬৫] বলিয়া জানা যায়।

বাং ১৩০৪ সালে ভূমিকম্প (১৮৯৭ খ্রীঃ)

এই ভূমিকম্পে রাজশাহী শহরের সরকারী বেসরকারী বিস্তর ধন সম্পত্তি, প্রাচীন কাগজ পত্র প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়াছে। স্থানীয় সরকারী বিল্ডিং- জজকোর্ট, কালেক্টরী, রেকর্ড রুম, সার্কিট হাউস, পুলিশ ব্যারাক, জেলখানা, পোষ্টাফিস, কলেজ বিল্ডিং, এবং মতিহার-কাজলা-শাহাপুর, খোঁজাপুর প্রভৃতি স্থানের কুঠির ভীষণ ক্ষতি ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। সরকারী বিবরণে (Report) কেবলমাত্র দেড় লক্ষ টাকার সরকারী সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ার বিষয় অবগত হওয়া যায়। অথচ বেসরকারী কোন হিসাব জানা যায় নাই।

সমগ্র জেলার বিভিন্ন স্থানে ভূমি ফাটিয়া রাশি রাশি বালী উঠিয়া স্তুপীকৃত হয়। রাস্ত াপথ এমনভাবে ফাটিয়া গিয়াছিল যে, কিছুদিন যাবৎ কোন কোন রাস্তা দিয়া চলা ফিরা বন্ধ ছিল। বৃহৎ বৃহৎ ফাটল হওয়ার দরুণ বহু শস্য ক্ষেত্র দীর্ঘদিন যাবৎ অকেজো হইয়া পড়িয়াছিল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোথাও কোথাও অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ ফাটিয়া গিয়াছিল। এই সব ফাটলের ফাঁক ছিল ৯ অথবা ১০ ফিট। নীচে হইতে জল ও বালুকা রাশি উঠিয়া শস্যাদির বিস্তর ক্ষতি করিয়াছিল। আত্রাই ও বড়াল রেলওয়ে ব্রীজ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল। কয়েকদিন যাবৎ রেল চলাচল বন্ধ ছিল। তাছাড়া জেলার রাজপথগুলির বহু সাঁকো ও কাল্‌ভাট ভাঙ্গিয়া দীর্ঘদিন ধরিয়া সাঁকোগুলি অকেজো হইয়া পড়িয়াছিল।[৬৬]

রাজশাহী শহর, নাটোর, নওগাঁ ও মনাকসা, তোহাখানায় বহু পাকা বাড়ীর প্রাঙ্গণ ও রাস্তা ফাটিয়া জল ও বালুকা রাশি উঠিয়াছিল। কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি যে উপড়িয়া পড়িয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, বাং ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পের পর হইতে পদ্মার গর্ভে নবীনগর, কাঁঠালবাড়িয়া, বশরী, হাবাসপুর প্রভৃতি সমৃদ্ধ পল্লীর পাকা বাড়ীগুলি-ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়। এই দুর্যোগের পর হইতে পদ্মা তাহার উত্তর কোলে রাজশাহী শহরের সহিত আমরণ সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। শহরের

রাজশাহী শহর ও পদমার স্রোত

৬৪. স্থাপত্য শিল্পের বিষয়–'রাজশাহীর ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

৬৫. Bengal District Gezetteer, Rajshahi, P. 93 and also 180.

৬৬. Bengal District Gezetteer, Rajshahi, P 93

প্রাচীন প্রত্যক্ষ দর্শীরা সেই সর্বনাশা ভূমিকম্পের নানা কথা ও কাহিনী এখনও অবিকল বর্ণনা করিয়া থাকেন। বাং ১৩২৯ সালের আশ্বিন[৬৭] মাসে উত্তর বঙ্গের বন্যায় রাজশাহী জেলার বিস্তর ক্ষতি হয়। এই বন্যায় রাজশাহী শহরের কাঁচা পাকা–পুরাতন ও নূতন বিস্ত র বাড়ী ঘর ধ্বংস হইয়া যায়। পদ্মার চর হইতে বহু গৃহ পালিত পশু ভাসিয়া যায়। বহু দিনের পুরাতন শস্য শোভিত কতকগুলি চর ভাঙ্গিয়া নূতন চরের সৃষ্টি হয়। সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত শহর জল মগ্ন থাকে। বন্যা কমিয়া গেলে শহরে নানা প্রকার ব্যাধি প্রকোপ অনুভূত হয় এবং কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কিছু সংখ্যক লোকের প্রাণহানী হয়।

ইং ১৯৩৮ সালের প্রবল বর্ষণে পদ্মা ভাসিয়া যায়। পাঠান পাড়ার পুরাতন বাঁধ ভাঙ্গিয়া পাঠানপাড়া, দরগাপাড়া. হোসেনীগঞ্জ প্রভৃতি স্থান সমূহের বিস্তর ক্ষতি হয়। অত্র অঞ্চলের বহু কাঁচা ও পাকাবাড়ী ভূমিস্মাৎ হইয়া যায়। তখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সমভিব্যহারে রাজশাহীর যুব কর্মীরা বৃক্ষ ও বালির বস্তা দ্বারা উহা রোধ করিয়াছিলেন। তারপর ১৯৪৪ সালে সেখানে বাঁধ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা হয়।

বিগত ইং ১৯৪০ সালে পদ্মায় ইলিশ মাছের অত্যাধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। যত্রতত্র পচা মাছের উপর স্তুপীকৃত মাছি জমিয়া থাকিত। পদ্মার তীরে প্রায়শ: ভ্রমণ করা দুরুহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলে আবহাওয়া দূষিত হইয়া এই শহর কলেরা, পরে বসন্ত মহামারীতে আক্রান্ত হইয়াছিল। ইহাতে প্রায় সহস্রাধিক লোক অকালে মৃত্যুর কবলে প্রাণ দিয়াছে।

**শাসন দপ্তর :**

নওয়াবী আমলে প্রকারান্তরে নাটোর রাজ কর্তৃক রাজশাহীর বিস্তৃত অঞ্চল শাসিত হইত। তখন 'নাটোর' রাজশাহীর সদর হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্য ইংরেজ আমলেও নাটোরকেই রাজশাহী জেলার সদরের মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছিল এবং ইং ১৭৯৩ হইতে ১৮২৫ সাল পর্য্যন্ত এই জেলার শাসন সংক্রান্ত সদর কার্য্যালয় নাটোরেই স্থাপিত ছিল। এই সময় বুয়ালিয়া বিখ্যাত বাণিজ্য বন্দর। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে পদ্মার প্রবল বন্যায় নারদ নদীর পদ্মা দিকস্থ মুখে স্তূপীকৃত বালুকা রাশি জমিয়া নারদ ক্ষীণতর হইয়া যায়। নাটোর নিম্ন ভূমি। বান বন্যাব দূষিত জল রীতিমত প্রবাহিত না হওয়ায় নাটোর টাউন অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। ফলে টাউনবাসী বার বার নানা পীড়ায় আক্রান্ত হইতে থাকে। এমতাবস্থায় জেলার শাসন কর্তৃপক্ষ জেলার সদর দপ্তর' স্থানান্তরিত করা স্থির করেন। শেষ পর্য্যন্ত 'বুয়ালিয়ার সন্নিকট শ্রীরামপুরকে উপযুক্ত স্থান মনে করিয়া ইং ১৮২৫ সালে নাটোর হইতে শ্রীরামপুরে সরকারী দপ্তর স্থানান্তরিত করা হয়।[৬৮] ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে অর্থাৎ ইং ১৮৫০ সালে পদ্মায় বিরাট জল বিপ্লব ঘটে এবং শ্রীরামপুর টাউন পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হয়। অতঃপর সরকারী দপ্তরাদি (কোর্ট-কাচারী) বলুনপুরে (বর্তমান স্থানে) স্থানান্তরিত হয়[৬৯]। জেলার সরকারী দপ্তরাদি এখনও সেখানেই স্থাপিত আছে।

৬৭. 'বসুমতি'–১৩২৯-কার্তিক সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬৮. গ্রন্থকারের রাজশাহীর ইতিহাসে–দ্বিতীয় খণ্ড 'শাসন বিভাগ' দ্রষ্টব্য।

৬৯. Hunter's statistical Account of Rajshahi district PP 53-54;

শ্রীরামপুর হইতে সরকারী দপ্তরাদি বলুনপুরে স্থানান্তরিত হইলে প্রথমতঃ খড়ের চালা ঘরে, তারপর করগেটের টিন প্রভৃতি দ্বারা ঘর প্রস্তুত করিয়া কোন রকমে সরকারী কার্য্যাদি সম্পাদিত হইতে থাকে। অতঃপর ইং ১৮৬৪-৬৫ সালে কালেক্টরী ও জজকোট বিনির্মিত হয়[৭০]। পরে পুলিশ দপ্তর ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কতকগুলি ইমারতাদি নির্মিত হয়।

কালেক্টরী ও জজকোট

বিভাগ পূর্বকালে 'রাজশাহী বিভাগীয়' শাসন দপ্তর জলপাইগুড়িতে স্থাপিত ছিল। ইং ১৯৪৭ সালে চৌদ্দই আগষ্ট বাঙলা বিভাগ হইয়া গেলে জলপাইগুড়ি টাউন পশ্চিমবঙ্গের অধীনে চলিয়া যায়। অতঃপর বিভাগীয় সরকারী কার্য্যালয় রাজশাহী শহরে উঠিয়া আসে। তখন সরকারী শাসন সংক্রান্ত কতকগুলি নথি-পত্র ব্যতীত অন্যান্য মূল্যবান বিবরণী সম্বলিত কোন প্রকারের বই পুস্তক প্রভৃতির ভাগ নেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। যাহা হউক, এই সময় জনাব টি, আই, এম, নূরুন্নবী চৌধুরী রাজশাহী বিভাগের কমিশনার রূপে জনৈক তালুকদার মহাশয়ের নিকট হইতে বিভাগীয় চার্জ গ্রহণ করেন।

বিভাগীয় শাসন দপ্তর

তৎপূর্বে রাজশাহী বিভাগের সদর দপ্তর মুর্শিদাবাদ জেলার সদর 'বহরমপুরে' স্থাপিত ছিল। অতঃপর ইং ১৮৭৫ সালে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রেসীডেন্সী বিভাগে সংযুক্ত হইয়া গেলে এই সালেই 'রাজশাহী বিভাগীয় দপ্তর' রামপুর-বুয়ালিয়াতে (আজিকার রাজশাহী শহরে) স্থানান্তরিত করা হয়। তখন বুয়ালিয়া টাউন হইতে অত্র বিভাগের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত না থাকায় ইং ১৮৮৮ সালে বিভাগীয় দপ্তর জলপাইগুড়িতে নীত হয়[৭১]। বাঙলা বিভাগের পূর্বদিন পর্য্যন্ত সেখানেই ইহা স্থাপিত ছিল।

রাজশাহী শহরে অবস্থিত দিঘাপতিয়ার জমিদারের একটি বাড়ীতে বর্তমানে 'রাজশাহী বিভাগীয় শাসন দপ্তর' স্থাপিত আছে। জনাব কাজী মখ্‌লেসুর রহমান এই বিভাগের বর্তমান কমিশনার।*

কোম্পানীর আমলে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার (ইং ১৮৩৭-১৯০১) রাজত্বকালে আমাদের দেশের জনকল্যাণে যত কিছু ব্যয়ের সূত্রপাত হয়। পল্লীর তুলনায় নগর বা শহরের লোক সংখ্যা বেশী। নাগরিকদের কার্য্য প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। সুতরাং পল্লী অপেক্ষা নগর বা শহরের শাসন অধিকতর জটিল ব্যাপার। সেই হেতু পল্লি-মঙ্গলের জন্য যে পরিমাণ আয়োজন হইয়া থাকে, নগরের জন্য তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী করিতে হয়। রাস্তা ও

পৌর সভার কর্তব্য ও রাজশাহী পৌরসভা

---

৭০. Rajshahi Gazetteer, P. 179

৭০. (১) কালেক্টরী বিলডিং ঃ- জনৈক ফরাসী প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়াব' এর (Executive Engineer Mr. E. S. B. Pereira) তত্ত্বাবধানে ১৮৬৪ সালেব এপ্রিল মাসে এই বিলডিং এর কার্য্যারম্ভ হয় এবং ১৮৬৫ সালের অক্টোবব মাসে উহা সম্পন্ন হয়। এই বিল্‌ডিং প্রস্তুতকারীদের মধ্যে হেড্ রাজ-মিস্ত্রি ছিলেন স্থানীয় লক্ষীপুর নিবাসী জনৈক মহাম্মদ কুরান সরকার।

(২) জজকোট বিলডিং ঃ- উল্লিখিত ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে ইং ১৮৬৪ সালের মার্চ্চ মাসে ইহার কার্য্যারম্ভ আর ১৮৬৫ সালের আগষ্ট মাসে সম্পন্ন হয়। বুলনপুর নিবাসী শ্রীবিনোদ বিহারী ও শেখ কিনু মিস্ত্রী হেড্ মিস্ত্রী ছিলেন। তখন রাজ-মিস্ত্রীকে "মেশন" বলা হইত।

৭১. Rajshahi Gazetteer P. 180.

* ইনি অত্র বিভাগের বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল থানার অধীন কালাই গ্রামের অধিবাসী।

পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করা এবং তাহা মেরামত ও নিয়মিত পরিষ্কার রাখা, রাস্তায় আলো দেওয়া, হাট বাজারের সুবন্দোবস্ত করা প্রভৃতি তাহার মামুলী কর্তব্য। নগরের স্বাস্থ্য রক্ষা, মুক্ত বায়ু সেবন ও সূর্য্যের আলোর ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা, এবং দুগ্ধ-ঘৃত প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যে যাহাতে ভেজাল মিশ্রিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রাথমিক শিক্ষা প্রবৃতি পৌর সভার অবশ্য বক্তব্য। এই সমস্ত বিবিধ কার্য্যাদির আয়োজন ও তাহার প্রতিকার করা পৌর সভার আইনের অন্তর্ভুক্ত। রাজশাহী পৌর সভা সাধারণতঃ এই সব কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে রাজশাহী পৌর সভার বর্তমান ভূমিকা প্রশংসনীয়। পৌর সভার অন্তর্ভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ছাড়াও স্থানীয় বেসরকারী কোন কোন উচ্চ বিদ্যালয়েও ইহার অনবদ্য ভূমিকা রহিয়াছে।

শিক্ষা

বড় বড় শহরের সাদৃশ্যে রাজশাহী পৌর সভার উদ্যোগে সর্বসাধারণের উন্মুক্ত বায়ু সেবন এবং বালক বালিকাদের জন্য খেলাধূলার ময়দান ও ভ্রমণোদ্যান (Park) স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক নূতন পুরাতন কাঁচা পাকা বাড়ীতে এবং সরকারী বেসরকারী অফিসাদির প্রাঙ্গণে পরিমাণ মত খোলা জায়গা ও ফুলের বাগান অথবা বিবিধ বর্ণের বৃক্ষাদি রহিয়াছে। তবে পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকদের জন্য এখানে ভ্রমণের বর্তমানে ব্যবস্থা নাই। নাগরিকদিগের যাতায়াতের সর্ববিধ সুবিধার জন্য পাকা পথের বন্দোবস্ত আছে।

অন্যান্য সুবিধা

কোম্পানীর শাসন আমলে পাক-ভারতে প্রায় ৮ শত পৌর সভা ছিল। তখন শাসন কার্য্যে অপটুতার দরুণ কখন কখন কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটী অযোগ্য ঘোষিত হইত। বিভাগোত্তর কালেও পাকিস্তানের কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটীকে এমনিতর দুঃখজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। বলাবাহুল্য সামরিক শাসন আমলের এক ঘোষণা বলে পাকিস্তানের সমস্ত পৌর সভাগুলি অযোগ্য ঘোষিত হয়। ইং ১৩/১০/৫৮ তারিখে 'রাজশাহী পৌর সভার' যাবতীয় দায়িত্বভার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর অর্পিত হয়। অতঃপর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতিনিধি হিসাবে জনৈক এডমিনিসট্রেটিভ (প্রশাসক) অফিসার ইহা পরিচালনা করিতে থাকেন।

কোম্পানীর আমল ও সামরিক শাসনে

ইং ১৯৬০ সালে[৭২] 'পাকিস্তান মিউনিসিপ্যাল শাসন' নামক এক নূতন অর্ডিনেন্স প্রণীত হইলে, মিউনিসিপ্যালিটীর নাম পরিবর্তিত হইয়া তদস্থলে মিউনিসিপ্যাল কমিটি এবং ওয়ার্ডের স্থলে 'ইউনিয়ান কমিটি' নামকরণ করা হয়। অধিকন্তু, অন্যান্য মহকুমাগুলিতে জনসংখ্যার অনুপাতে কোনটি মিউনিসিপ্যাল কমিটি ও কোনটি টাউন কমিটি গঠিত হয়। অতঃপর ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও মিউনিসিপ্যাল কমিটির ভাইস- চেয়ারম্যান পদের সৃষ্টি হইলে জেলা শাসকের প্রতিনিধি হিসাবে উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী অথবা এক জন অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার পদাধিকার বলে মিউনিসিপ্যাল কমিটীর চেয়ারম্যান এবং মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট পদাধিকার বলে টাউন কমিটি অথবা মিউনিসিপ্যাল কমিটীর চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন।

ইং ১৯৬৩ সালের নয়া বিধান অনুযায়ী

৭২. Vide Gazette of Pakistan, Extra Ordinery, the 11th April, 1960.

উক্ত নয়া অর্ডিনেন্স অনুযায়ী রাজশাহী মিউনিসিপ্যাল কমিটিকে ৮টি ইউনিয়ন কমিটিতে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ইউনিয়ন কমিটিতে একজন কবিয়া চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সরকার কর্তৃক মনোনীত আরও ৭ জন সদস্য সমন্বয়ে মিউনিসিপ্যাল কমিটী পুনর্গঠিত হয়। সরকার কর্তৃক পূর্বোক্ত মনোনীত চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান (যিনি জেলা শাসকের প্রতিনিধি হিসাবে চেয়ারম্যান থাকেন) এবং উল্লিখিত ১৫ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচক মণ্ডলীর মাধ্যমে ইউনিয়ন কমিটীর চেয়ারম্যানদিগের মধ্য হইতে এক জন ভাইস- চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

নয়া অর্ডিনেন্স অনুযায়ী, ৭/৯/৬০ তারিখে রাজশাহী মিউনিসিপ্যাল কমিটীর প্রথম চেয়ারম্যান হন রাজশাহীর অতিরিক্ত ডেপুটী কমিশনার জনাব এম, আই, কে খলিল (C. S. P.)। তিনি স্থানান্তরে বদলী হইয়া গেলে তদস্থলে জনাব তোফাজ্জল হোসেন মনোনীত হন।* জনাব হোসেন অন্যত্র বদলী হইলে উক্ত পদে জনাব এস. এম, মৌলা বখ্‌শ চেয়ারম্যান মনোনীত হইয়াছেন।

নির্বাচিত প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যান ডাঃ মোঃ আবদুল আজিজ। তিনি এই পদে কিছু দিন অধিষ্ঠিত থাকার পর স্বীয় পদে স্বেচ্ছায় ইস্তাফা দেন। তদস্থলে জনাব রইস-উদ-দীন আহম্মদ ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়া উক্ত পদে বহাল আছেন।

গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিটনের আমলে বঙ্গে লেফটন্যান্ট গবর্ণর ছিলেন (১৮৭৪ - ১৮৭৬ সাল) স্যার রিচার্ড টেম্পল। তাহার শাসন কালে ইং ১৮৭৬ সালে ১লা এপ্রিল মাসে 'রাজশাহী মিউনিসিপ্যালিটী গঠিত হয়।[৭৩] ইং ১৮৮৪ সালে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটী আইনের তিন ধারা (111BC) অনুসারে এই মিউনিসিপ্যালিটীতে ২১ জন কমিশনার নিদ্ধারিত হয়।[৭৪] তন্মধ্যে ৭ জন মনোনীত ১৪ জন নির্বাচিত কমিশনার। এই মিউনিসিপ্যালিটীর সর্বপ্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান ছিলেন রাজশাহীর অধিবাসী বাবু হরগোবিন্দ সেন।

পূর্ব কথা

অত্র মিউনিসিপ্যালিটীর প্রাচীন কাগজ পত্র উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই। তবে যতদুর অবগত হওয়া যায় ইং ১৮৬৯ সালে পরীক্ষামূলক আদমশুমারীতে 'রামপুর-বুয়ালিয়া' টাউনের ফলাফল এইরূপ ছিল: আয়তন ৩২০০ একর, বাড়ীর সংখ্যা ৪২২৪, জনসংখ্যা পুরুষ ৯৫৮৪, স্ত্রী লোক ৮৯১৩; মোট ১৮,৪৯৭; গড়ে শতকরা ৫১.৮১ জন পুরুষ ছিল। ইং ১৮৭২ সালের সাধারন আদম শুমারীতে রামপুর-বুয়ালিয়া টাউনের লোক সংখ্যা মুসলমান পুরুষ ৫৯০৩, স্ত্রীলোক ৫৬৬৬ -মোট ১১,৫৬৯ জন। হিন্দু পুরুষ ৬০৪৭, স্ত্রীলোক ৪৫২৪ -মোট ১০,৫৭১ জন। বৌদ্ধ পুরুষ ৫, স্ত্রীলোক ৫ -মোট ১০জন। খ্রীষ্টান পুরুষ ৪৪, স্ত্রী লোক ৩৯ মোট ৮৩ জন। অন্যান্য পুরুষ ২৮, স্ত্রীলোক ৩০ জন মোট ৫৮ জন।

ইং ১৮৬৯ সালে 'রামপুর-বুয়ালিয়া' টাউন কমিটিতে আয় ছিল ১৪৭২ পাউন্ড এবং ব্যয় হইয়াছিল ১০৯৪ পাউন্ড ১৯ শিলিং। ইং ১৮৭১ সালে আয় ছিল ১৪১৮ পাউন্ড ৪ শিলিং এবং ব্যয় হইয়াছিল ৯৯৮ ১৬ শিলিং। জন প্রতি গড়ে ট্যাক্স ছিল ১০ আনা ২

* ইঁনি ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের অধিবাসী। বাজশাহীতে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার থাকা কালে স্বীয় কর্মগুণে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

৭৩. History of Bengal (for Beginners) by R.M.M A. and B1,PP 1021 -103.

৭৪. রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস -পৃঃ ৩৩৬-৩৩৭।

পাই।[৭৫]

ইং ১৮৭২ সালে পুরুষ ১২,০২৭; স্ত্রীলোক ১০,২৬৪; মোট ২২,৮৯১। ১৮৮১ সালে পুরুষ ১০২১০; স্ত্রীলোক ৯,০১৮; মোট ১৯২২৮। ১৮৯১ সালে পুরুষ ১১,৭৫১; স্ত্রীলোক ৯,৬৫৬; মোট ২১,৪০৭। ১৯০১ সালে-পুরুষ ১১,৫৯৬; স্ত্রীলোক ৯,৯৯৯; মোট ২১,৫৮৯। ইং ১৯১১ সালে–পুরুষ ১৩,০৫৭; স্ত্রীলোক ১০,৩৪৯; মোট ২৩,৪০৬। ইং ১৯৫১ সালে মোট সংখ্যা ৩৯,৬৬ জন। ইং ১৮৬১ সালে–পুরুষ ৩২৩১১; স্ত্রীলোক ২৫,৫৭৪; মোট ৫৬,৮৮৫।*

আদমশুমারী

এই মিউনিসিপ্যালিটী টাউন কমিটীরূপে সর্বপ্রথম ভূবন মোহন পার্কের চত্বরে একটি ছোট ঘরে স্থাপিত ছিল। তারপর উহা বর্তমান সবকারী কলেজ প্রাঙ্গণের একটি ঘরে স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর ইং ১৯২১ সালে 'রাজশাহী মিউনিসিপ্যালিটীর বর্তমান ইমারতটি বিনির্মিত হইলে কলেজ প্রাঙ্গণ হইতে মিউনিসিপ্যালিটী দপ্তর এই স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

বিভাগোত্তর কালে বাবু সনৎ কুমার মৈত্র বি, এল অত্র মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁহার সময়ে 'মহারাণী হেমন্ত কুমারী ওয়াটার ওয়ার্কস' মিউনিসিপ্যালিটীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রাধীনে চলিয়া যায়। পরবর্তীকালে জনাব মাদার বখ্‌শ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ইঁহার সময়ে অত্র মিউনিসিপ্যালিটীর উন্নয়ন মূলক বিবিধ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। তন্মধ্যে বহু পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ায় 'রাজশাহী মিউনিসিপ্যালিটীর' আয়তন ও গুরুত্ব অনেকখানি বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী চেয়ারম্যান ক্যাপটেন শামসুল হক সাহেবের সময়ে সামরিক শাসনের নয়া অর্ডিনেন্স অনুযায়ী মিউনিসিপ্যালিটী বাতিল হইয়া যায়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতিনিধি হিসাবে জনৈক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিউনিসিপ্যালিটীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন।

বিভাগোত্তর কালে

পরিশেষে রাজশাহী মিউনিসিপ্যাল কমিটী সম্পর্কে আমরা এতটুকু বলিয়া রাখিতে চাই, কেবল বিভাগীয় শহর হিসাবে নয়, উচ্চমানের শিক্ষাদীক্ষা ও আঞ্চলিক দপ্তরাদির কেন্দ্রস্থল ক্রমবর্ধমান রাজশাহী মিউনিসিপ্যাল কমিটীর গুরুত্ব আজ নানাভাবে উপলব্ধি করা যায়। সেই হেতু ইহার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়নে ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সকল প্রকার লোভ লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া দক্ষ-শিক্ষিত সাধক কর্মীদের আগাইয়া আসা উচিত।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে

**জেলা পরিষদ (District Council) :**

পল্লীর স্বাস্থ্য ও সুখ সুবিধার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ (Union Board) যে সব কার্য্য করিতে অপারগ, তাহার দাযিত্ব ভার জেলা পরিষদের উপর থাকে। অধিকন্তু বড় রাস্তা, সেতু ইত্যাদি পল্লীর মধ্যে অবস্থিত থাকিলেও পল্লীবাসীরা তাহা রক্ষা করিতে পারে না। সেই সবের দায়িত্বভারও জেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকে। দাতব্য চিকিৎসালয়

৭৫. Dist Gazetteer-B, Vol, P. 3, statistical Account of Bengal, Rajshahi District, P 54.

* স্থানীয় দপ্তরাদিতে আমাদের চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও মধ্যে ২১, '৩১ ও ৪১ সালের আদম-শুমারীর বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

পরিচালনা, ডাকবাংলা খেয়াঘাটের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি জেলা পরিষদেব কার্য্য। জনস্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা, আপৎ কালে অথবা দৈব দুর্ঘটনায়, দুর্ভিক্ষের সময় আর্তের সাহায্য করা ও প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিশেষ কোন শিক্ষা ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতি লক্ষ্য রাখাও জেলা পরিষদের কর্ত্তব্য।

জেলা পরিষদের স্বতন্ত্র 'কর্মপরিষদ' আছে। জন সাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকার মনোনীত প্রতিনিধি ইহার সদস্য। জেলার জন্য যে পরিষদ আছে, তাহাকে জেলা পরিষদ (District Board) এবং মহকুমর জন্য যে পরিষদ গঠিত হইত তাহাকে লোকাল বোর্ড (Local Board) বা স্থানীয় পরিষদ বলা হইত। কিন্তু ইং ১৯৪২ সালে লোকাল বোর্ডের বিলুপ্তি সাধন হইয়া উহার যাবতীয় দায়িত্ব ভার জেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। রাজশাহী জেলা পরিষদের অধীনে, নাটোর, নওগাঁ ও বুয়ালিয়া' এই তিনটি লোকাল বোর্ড ছিল।

বঙ্গীয় স্বায়ত্ত শাসিত আইনানুসারে পদাধিকার বলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট (District Magistrate) তখন জেলা পরিষদের (District Board) চেয়ারম্যান থাকিতেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে মিঃ এ, এইচ, রডক্ রাজশাহী জেলা পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন। পরবর্তী কালে স্বায়ত্ত-শাসিত আইন সংশোধিত হইলে ইং ১৯২০ সালে

সবকাবী বেসরকাবী প্রথম ও শেষ চেয়াবমান

এপ্রিলে, বেসরকারী সদস্য হিসাবে জেলা পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব এমাদু-দ্দীন আহ্‌মদ (পরে খান-বাহাদুর)। পাকিস্তান আমলে ইং ১৯৫৮ সালে ১০ই নভেম্বর তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট খান মুহম্মদ শামসুর রহমান (C.S P.) বোর্ডের শেখ চেয়ারম্যান জনাব আবদুস্ সামাদ সাহেবের নিকট হইতে জেলা পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তখন হইতে বেসরকারী চেয়াবম্যান পদের বিলুপ্তি সাধন হয়। বলা বাহুল্য মধ্যবর্তীকালে রাজা বি, এন,. রায়; পি, এন, রায় ও মৌঃ মনিরুদ্দীন আকন্দ বি-এল সাহেবও রাজশাহী জেলা পরিষদের বেসরকারী চেয়ারম্যান্ ছিলেন।

অতঃপর সামরিক শাসনের সময়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আইন বাতিল হইয়া গেলে মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন হয় এবং পুনবায় জেলা পরিষদে সরকারী চেয়ারম্যান্ পদের সৃষ্টি হয়৭৬। তদনুযায়ী ১৯৫৯ সালের ১১ই জুলাই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ জনাব শামসুর রহমান

বর্তমান চেয়ারম্যান ও সেক্রেটাবী

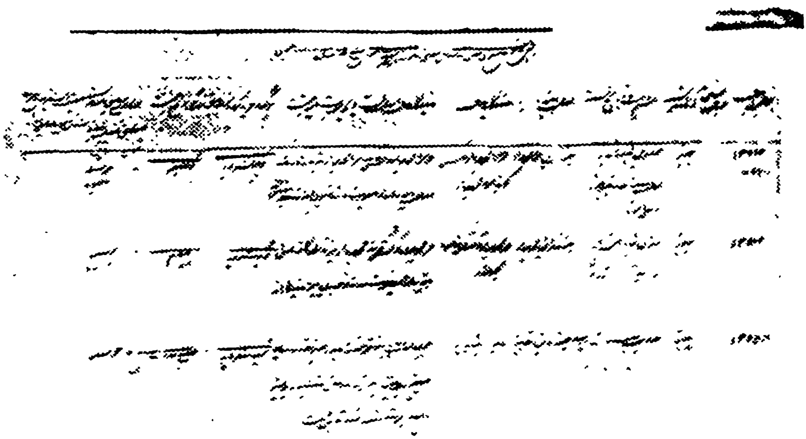
(খান মুহম্মদ) পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান্ হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন এবং গণতন্ত্র আইনের বলে এই দিনেই 'জেলা বোর্ডের'ও নাম পরিবর্তিত হইয়া 'ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল' (District Council) বা 'জেলা পরিষদ' নামকরণ হয়*। পরবর্তী ডেপুটী কমিশনার জনাব মুহম্মদ মুজিব-উল-হক্ (C.S.P) চেয়ারম্যান্ হন। তৎপর ডেপুটী কমিশনার স্বনামধন্য জনাব পি, এ, নাজির (C.S.P) রাজশাহী জেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান্ আছেন। এখন জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৪৬ জন। ২৩ জন সরকারী সদস্য আর ২৩ জন

৭৬. Vide, A Handbook of Basic Democracies, Part-I

* মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন হইলে ইউনিয়ন বোর্ডের স্থলে 'ইউনিয়ন কাউনসিল' বা ইউনিয়ন পরিষদ নামকরণ হইয়াছে। অধিকন্তু থানা কাউন্সিল, বিভাগীয় কাউন্সিল প্রভৃতি নূতন পবিষদ ও উহাব কর্মকর্তার সৃষ্টি হইয়াছে। বাজশাহী জেলায় বর্তমানে ২৪৯টি ইউনিয়ন কাউন্সিল ৎ ২৯টি থানা কাউন্সিল আছে।



রাজশাহী জেলা পরিষদ গৃহ



মূল তায়েদাদের ফারসী নকল

মনোনীত বেসরকারী সদস্য। গণতন্ত্র আইনে জেলার অতিরিক্ত একজন ডেপুটী কমিশনার জেলা শাসকের প্রতিনিধি হিসাবে 'জেলা পরিষদের' সেক্রেটারীর কার্য করিতেন। কিন্তু ১৯৬২ সাল হইতে উক্ত পদে অতিরিক্ত ডেপুটী কমিশনারের পরিবর্তে একজন অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার এ-ডি-বি-ডি হিসাবে জেলা পরিষদের সেক্রেটারির পদে বহাল হইয়াছেন।+

স্থাপনা

ইং ১৮৮৬ সালে ২২ জন সরকারী- বেসরকারী সদস্য সমন্বয়ে 'রাজশাহী জেলা পরিষদ' (District Board) গঠিত হয়।[৭৭] নিম্নে বর্ণিত ভদ্রমহোদয়গণ এই জেলা পরিষদের সর্বপ্রথম চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান্ ও সদস্য ছিলেন।

(১) মিঃ এ, এইচ, রডক্ (জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও চেয়ারম্যান্)
(২) " সি, আর, মেরিয়েট।
(৩) " ই, এল, ল্যাঙ্গ।
(৪) " সি, বি, ওয়ালটন্
(৫) " এস, জে, এণ্ড্রুজ।
(৬) " ডবলিউ, জে, ডনেল।
(৭) " ডাঃ মরিশন্।
(৮) " এল, কেমিরেন (ভাইস চেয়ারম্যান্)
(৯) জনাব সৈয়দ তোফাজ্জল হোসেন।
(১০) " শাহ্ জহরুল হোসেন।
(১১) " মৌঃ মুহম্মদ তাহের।
(১২) শ্রী ব্রজ গোপাল বাগচী।
(১৩) " কিশোরী মোহন চৌধুরী।
(১৪) " কালীনাথ চৌধুরী প্রমুখ ২২ জন সদস্য বিশিষ্ট এই পরিষদ গঠিত হইয়াছিল।

১৯১১ সালে জেলা পরিষদের ভূমিকা

ইং ১৯১১ সালে জেলা পরিষদে ২৩ জন সদস্য ছিলেন। ৫ জন পদাধিকার বলে সদস্য, ১১ জন নির্বাচিত সদস্য ও ৭ জন মনোনীত সদস্য। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তখনও পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান থাকিতেন। এই সালে জেলা পরিষদের আয়, পূর্বের ১,২৬,০০০ হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ২,৩৩,০০০ টাকা হইয়াছিল। তৎপর সেস আদায় হইতে থাকিলে ইং ১৯১৪-১৫ সালে ইহার আয় দাঁড়ায় ৩,৩৪,০০০ টাকায়। এই সময় ১৩৬টি মেলা হইতে ১৮০০০ টাকা আয় হইত; ১৩টি ফেরী-ঘাট হইতে ১২০০০ টাকা আসিত। এই ফেরীগুলি একজন ওভারসিয়ারের তত্ত্বাবধানে ছিল।

শিক্ষা বিস্তারে জেলা পরিষদ

তখন রাজশাহী জেলা পরিষদ ৩টি মধ্য বাঙলা স্কুল (বাসুদেবপুর, ধুরইল ও গাঙ্গুর), ৩টি উচ্চ প্রাইমারী স্কুল (ধর্মপুর, চকগৌরী, ইসবপুর) এবং ১৯৭টি নিম্ন প্রাইমারী স্কুল পরিচালনা করিতেন। এতদব্যতীত ২০টি

+ শ্রী এ, কে, মোড়ল বর্তমান সেক্রেটারী।

৭৭. Vide-The Bengal Local Self government Act of 1885. Bengal Act III of 1885), Page-4 and 5

মাইনর স্কুল (এম, ই, স্কুল), ৬৪টি উচ্চ প্রাইমারী স্কুল. ৪৩৬টি নিম্ন প্রাইমারী স্কুল এবং ১২টি অন্যান্য যথা–মাদ্রাসা ও মক্তব (নৈশ বিদ্যালয়?)-কে সাহায্য করিতেন। ইহা ছাড়া স্থানীয় 'ডায়মণ্ড জুবিলী স্কুল' পরিচালনা করিতেন*। প্রয়োজনবশতঃ বিদ্যালয়ের পাকা বাড়ী নির্মাণের জন্যও এককালীন অর্থ দান করিতেন।

জনস্বাস্থ্যে

জেলা পরিষদের সাহায্যে তখন ৮টি দাতব্য চিকিৎসালয় চলিত। কলিকাতা ক্যাম্পবেল ও ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে রাজশাহীবাসী ছাত্রদের জন্য বৃত্তি দেওয়া হইত। পানি সরবরাহ কেন্দ্রে ও নলকূপ বসান, পুকুর খনন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য মোটা অঙ্ক বরাদ্দ থাকিত। প্রয়োজনবোধে তখনকার লোকাল বোর্ডের বরাদ্দকৃত অর্থের দুই তৃতীয়াংশ জেলা বোর্ড বহন করিতেন। এতদব্যতীত জন-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ও তিনটি পশু-চিকিৎসালয় কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন।

বর্তমান রাস্তার পবিমাণ

জেলার পুরাতন রাস্তার মেরামতি ও নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিবার দায়িত্বও জেলা বোর্ডের কার্য ছিল। ইং ১৮৮৮ সালে মোট ৪৮৬ মাইল ৪ ফারলং রাস্তা জেলা বোর্ডের অধীনে ছিল। তন্মধ্যে ৩৭ মাইল (নাটোর ও নওহাটা রোড) পাকা রাস্তা ছিল। বর্তমানে জেলা কাউন্সিলের মোট কাঁচা রাস্তার পরিমাণ ১৮৮৩ মাইল। তন্মধ্যে প্রায়* ৮ মাইল পাকা।

বর্তমান ব্যয়েব পরিমাণ

পূর্বাপেক্ষা বর্তমানে জেলা পরিষদের দায়িত্ব ও গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনকল্যাণে জেলার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য কোটির উপর অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। গত ১৯৬২-৬৩ সালে ১,০১,৮৭,০৩৯ টাকা। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয় করা হইয়াছে।

বর্তমান জেলা পবিষদেব নিজস্ব ভূমিকা ও আয়

স্থানীয় কর, ট্যাকস্, খেয়াঘাট, বিদ্যালয় ও চিকিৎসা, নিজস্ব ভূমি, ডাকবাংলো, সরকারী সাহায্য প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে মূখ্যত: জেলা পরিষদের আয় হইয়া থাকে।

ডাক্‌বাংলো ২৫টি, দাতব্য চিকিৎসালয় ৪৪টি, জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩২টি, মূক ও বধির বিদ্যালয় ১টি, সার্ভে ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্‌সটিটিউট্ ১টি, খেয়াঘাট ৩৫টি, পশু চিকিৎসালয ৪টি-ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ বর্তমান জেলা পরিষদের প্রধান দায়িত্ব।

জেলা পরিষদের কর্ম বিভাগ ও নিজস্ব ভবন

রাজশাহী জেলা পরিষদের কর্মবিভাগ মূখ্যত: তিন ভাগে বিভক্ত। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও সাধারণ বিভাগ। সাধারণ বিভাগ কর্তৃক প্রধানত: চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় পরিচালিত হইয়া থাকে।

আদি ভবন

প্রথমত: রোড সেস আদায়ের জন্য ইং ১৮৭৪-৭৫ সালে বর্তমান কাচারী প্রাঙ্গণে জেলা পরিষদ ভবনের দক্ষিণাংশে বাঁশের কাঠামোর উপরে টালী দ্বারা চৌচালা ও ক্ষুদ্র জানালা বিশিষ্ট একটি কাঁচা-পাকা ছোট ঘর নির্মিত

---

* আগের অধ্যায়ে–১২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
জেলা বোর্ডের বহু মাইল বিস্তৃত পাকা বাস্তা অধুনা সরকাবী 'পথ বিভাগের' তত্ত্বাবধানে চলিয়া গিয়াছে

হইয়াছিল। যে ঘরটিতে এখন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ স্থাপিত আছে, উহাই জেলা কাউন্সিলের আদি ভবন। পরে 'জেলাবোর্ড' গঠন হইবার পর ইং ১৮৯৬-৯৭ সালে ৫,২৪৫ টাকা ব্যয়ে সংশ্লিষ্ট বর্তমান জেলা কাউন্সিল ভবনটি বিনির্মিত হয়।

ডাকবাংলোগুলির মধ্যে তানোর 'ডাকবাংলো' সর্বপ্রাচীন। জেলার রাস্তাদি পরিদর্শনের জন্য ইং ১৮৭৪ সালে মাটির দেওয়াল, পাকা মেজে চারি পার্শ্বে বারান্দা ও দুই কামরা বিশিষ্ট এই বাংলো নির্মিত হইয়াছিল। গোদাগাড়ী ডাকবাংলো ইং ১৮৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের সময় নির্মিত। পদ্মার তীরে মনোরম স্থানে ইহা অবস্থিত। এতদব্যতীত বানেশ্বর, নাটোর ও মীরগঞ্জ এই তিনটি বাংলোও ১৮৭৯-৮৩ সালে নির্মিত। নওগাঁ, পাঙ্খা ও হাট- গোদাগাড়ী ডাক্ বাংলো—১৮৮৫ সালে বিনির্মিত।[৭৮] উল্লিখিত কয়েকটি প্রাচীন 'বাংলো' প্রথমতঃ রাস্তা পরিদর্শন গৃহ হিসাবে (Road Inspection Houses) নির্মিত হইয়াছিল। পরে ইহাকে সাধারণ ডাকবাংলোর রূপান্তরিত করিয়া লওয়া হয়।

ডাকবাংলো

ইং ১৯০৬ সালে প্রধান কামরা সহ পাঁচ কামরা বিশিষ্ট রাজশাহী শহরের ডাকবাংলো নির্মিত হয়। বর্তমানে প্রয়োজনের তাগিদে ইহার আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। পদ্মার তীরে সার্কিট হাউসের উত্তর ধারে শহরের বিশিষ্ট সরকারী কুঠিগুলির মধ্যস্থলে চৌরাস্তার মোড়ে ইহা অবস্থিত।

শহরের বাংলো

রাজশাহী জেলা পরিষদেব একটি সাধারণ সভাগৃহ (Meeting Hall) আছে। পরিষদের নির্দ্ধারিত মাসিক সাধারণ সভা মুখ্যতঃ সেখানেই অনুষ্ঠিত হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান্ মহোদয় পরিষদ প্রতীক-চিহ্নিত সভামঞ্চে আগমন করিলে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ দাঁড়াইয়া তাঁহাকে খোশ আমদেদ জানাইয়া থাকেন। অতঃপর কোরাণে পাক্ তেলাওতের পর সভার কার্য্য শুরু হয়।

সাধারণ সভা

বিশালকায় পদ্মার উত্তর তীরে অবস্থিত এই 'সার্কিট হাউস' একটি উল্লেখযোগ্য সরকারী ভবন। ইহা ঊনবিংশ শতকের শেষ অধ্যায়ের কীর্তি। আধুনিক ধরণের রুচিসম্মত করিয়া ইহার উত্তরাংশে আর একটি দ্বিতল ইমারত নির্মিত হইয়াছে। মনোরম পরিবেশে ইহার অবস্থান পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, প্রাদেশিক গবর্ণর, ঊর্ধতন সরকারী কর্মচারীরা রাজশাহীতে শুভাগমন করিলে এখানে অবস্থান করিয়া থাকেন। অধিকন্তু বিদেশী পর্যটকদেরও সেখানে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

সার্কিট হাউস

**জেলখানা :**

নওয়াব মুর্শিদ কুলী খাঁর আমলে বাঙলার বিশিষ্ট রাজা জমিদারগণ নিজ নিজ জমিদারীর মধ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার কার্য্য সম্পাদন করিতেন এবং অপরাধীকে স্বীয় কারাগারে শাস্তি দিতে পারিতেন। তখন তাহাদের কারাগার, সৈন্য, গড় যুদ্ধের উপকরণের যাবতীয় হাল-হাতিয়ার ইত্যাদি থাকিত। প্রয়োজনবোধে জমিদারগণ

৭৮. Vide Rajshahi district Schedule of All Public Works-From the year 1888-1918

৭৯. 'History of Bengal' by P. N. Mallick-P. 118;
শ্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'বাঙলার ইতিহাস' পৃষ্ঠা ৭০ (ইং ১৮৮০)।

বিদ্রোহী সামন্ত সেনাদের কোন এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া সাহায্য করিতেন। বাঙ্লার প্রাচীন ইতিহাসে উহার স্বাক্ষর রহিয়াছে।[৭৯]

যাহা হউক নাটোর রাজবাটিতে 'কারাগার' ছিল। সেখানে অপরাধীদের রাখিয়া শাস্তি দেওয়া হইত। ইং ১৭৮২ সালে ওয়ারেণ হেষ্টিংস (১৭৭২-১৭৮৫ খ্রী:) বাঙ্লার গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিয়া নূতনভাবে ৫ বৎসরের চুক্তিতে রাজস্ব আদায় ও প্রতি জেলায় ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত স্থাপন করেন। তখনও নাটোর রাজার মাধ্যমেই এই কার্য্য সম্পাদিত হইত। লর্ড কর্ণ ওয়ালিশের (১৭৮৬-১৭৯৩ খ্রী:) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত নাটোররাজই রাজশাহীর শান্তি রক্ষা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারাদি করিতেন[৮০] এবং অপরাধীকে শাস্তির জন্য কারাগারে প্রেরণ করিতেন। তাঁহার শাসন-সংস্কারের সময়ে প্রত্যেক জেলায় কারাগারের পুনঃ সংস্কার হয়। এই সময় রাজশাহী জেলার কারাগার পুনঃসংস্কৃত হইয়া নাটোরের "তে-বাড়িয়াতে" প্রথম সরকারী জেলখানা বা কারাগার পুনঃস্থাপিত হয়। তখন হইতে উহা জেলা কালেক্টারের অধীনে পরিচালিত হইতে থাকে।

তে বাড়িয়াতে জেলখানা

নাটোরের এই কারাগার বা জেলখানা এখন নাটোরের চৌধুরী পরিবারের সম্পত্তি, আম্রকাননে পরিণত। সেখানে এখনও সেই জেলখানার একটি বিরাট ইন্দারার চিহ্নাবশেষ রহিয়াছে। এই জেলখানা কোন্ সময়ে উঠিয়া আসিয়া রামপুর বুয়ালিয়াতে স্থাপিত হয় তাহার সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে খুব সম্ভবত: ইং ১৮২৫ সালে নাটোর হইতে জেলার সদর দপ্তর রামপুর বুয়ালিয়াতে স্থানান্তরিত হইলে সেই সময়ে রাজশাহী জেলখানাও সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে ইহা রাজশাহী বিভাগীয় সেণ্ট্রাল জেলে পরিণত হয়। ইহাই হইল রাজশাহী সেণ্ট্রাল জেলের আদ্য পরিচয়।

রাজশাহী সেন্ট্রাল জেল

রাজশাহী শহরে অবস্থিত এই বিরাট কারাগার এখন রাজশাহী জেলার ও বিভাগীয় কারাগারের কার্য্যাদি করিয়া থাকে। ইং ১৯১৪ সাল হইতে এই জেল সেণ্ট্রাল জেল বা বিভাগীয় কারাগারের মর্য্যাদা লাভ করে এবং তদনুযায়ী অন্যান্য জেলা হইতে বিশেষত: রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলের দীর্ঘমেয়াদী কয়েদী ও রাজবন্দীদের সেখানে রাখা হয়।

পশ্চিমমুখী এক তোরণ বিশিষ্ট এই বিরাট কারাগার পদ্মার উত্তর তীরে বিস্তীর্ণ খোলা ময়দানে অবস্থিত। চতুর্দ্দিকে সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহার উত্তর-দক্ষিণ দৈর্ঘ্য ১১২৫ ফিট; পূর্ব-পশ্চিম ৭৪২ ফিট। সর্ব প্রকারের মোট ১০২৭ জন কয়েদী ইহাতে বাস করিতে থাকে।

আয়তন

পূর্বে ৮৪০০০ বর্গ গজ আয়তক্ষেত্রে এই কারাগারে ৮৩৩ জন কয়েদী থাকিবার ব্যবস্থা ছিল; তন্মধ্যে সাজাপ্রাপ্ত ৭৭৯ জন, বিচারপ্রার্থী ৪০ জন, সাধারণ (Civil) ১৪ জন। ইং ১৯১৪ সালে ৮১৯ জন কয়েদীর মধ্যে গড়ে ২২ জন স্ত্রী-কয়েদী ছিল। স্ত্রী-কয়েদীর জন্য পৃথক চত্বর আছে। ইহাতে ৪১ জন স্ত্রী-কয়েদী থাকিতে পারে। ১৮ হইতে ২১ বৎসর বয়স্ক তরুণদের জন্যও (Javenile) একটি পৃথক চত্বর আছে। তখন

৮০. At the time of Permanent Settlement the Chief of the Nator Raj exercised Civil and Criminal Powers . (Rajas of Rajshahi-Calcutta Review 1875)

ইহাতে ১০ জন যুবক বা তরুণ থাকিত[৮১]। ১৮৫৭-৫৮ সালে রামপুর বুয়ালিয়া জেলে ও নাটোর হাজত থানায় গড়ে সাধারণ সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীর সংখ্যা ছিল ৫১৬ জন। এই সালে ডাকাতি ও অন্যান্য বিচারপ্রার্থী কয়েদীর মোট গড় সংখ্যা ছিল ৬৮৪ জন[৮২]।

রাজশাহী শহরে (রামপুর বুয়ালিয়া) প্রথম জেলখানা স্থাপিত হইবার পর এই জেলের বর্তমান তোরণ ছাড়াও হাসপাতালের পূর্ব দিকে আর একটি ক্ষুদ্র তোরণ ছিল। এতদব্যতীত একটি হাজতখানা (Lock-up) ছিল[৮৩]।

১৯৬২ সালের গড়

ইং ১৯৬২ সালে গড়ে ১১৩৪ জন কয়েদীর মধ্যে সাজাপ্রাপ্ত ৯৭০ জন; স্ত্রী-কয়েদী গড়ে ১৮ জন, তরুণ কয়েদী গড়ে ১৪ জন (?), রাজবন্দী গড়ে ৩০ জন ও বিচারপ্রার্থী গড়ে ১২৪ জন ছিল।

সেল ও হাসপাতাল

পাকিস্তানের অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর কারাগারের আহার ও বাসস্থানের ন্যায় রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলেও সেইরূপ বন্দোবস্ত আছে। পূর্বে ইহাতে একটি ফাঁসীর কয়েদীর সেল সহ ২০টি সেল ছিল। বর্তমানে আরও ৩০টি সেল বেশী হওয়ায় মোট ৫০টি সেলে দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে একটি হাসপাতাল আছে। পূর্বে এই হাসপাতালে ৪টি বিভাগে ৮৯ জন রোগী থাকিতে পারিত। একজন সিভিল সারজনের অধীনে কয়েকজন সহকারী ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারের সাহায্যে ইহার চিকিৎসাদি হইত। সম্প্রতি আরও একটি দ্বিতল বিল্ডিং নির্মিত হইয়াছে। ইহাতে সংক্রামক ব্যাধির রোগীরা থাকিয়া চিকিৎসা হইয়া থাকে। বর্তমানে একজন সিভিল সারজনের অধীনে দুইজন সহকারী ডাক্তার ও একজন কম্পাউণ্ডার ইহাদের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। সাধারণত: কয়েদীরাই এখানে নার্সের কার্য্য করে।

জেলের শিল্প

কয়েদীদের উপযোগী এই কারাগারে নানা প্রকার কুটির শিল্পের ব্যবস্থা আছে। ব্লাঙ্কেট, চৌকিদারী পোষাক, কয়েদীদের যাবতীয় সূতীর পোষাক, গালিচা, নকাশী জায়নামাজ, মশারী, গামছা, তোয়ালে, ধুতি, লুঙ্গি, বিছানার চাদর, মামুলী ধরনের শাড়ী, নারিকেল ছোবড়ার পাপোশ প্রভৃতি এখানকার উল্লেখযোগ্য শিল্প। এতদ্‌ব্যতীত বেত, বাঁশ ও কাঠের কার্য্যাদিও হয়। পূর্বে এখানে ঘানি টানা, গম ভাঙ্গা, রেড়ি- পেষাই, ধান ভানা, মাখন টানা প্রভৃতি কার্য্য হইত। এখন কয়েদীর পরিবর্তে মেশিনে এই সব কার্য্যাদি হইয়া থাকে। তখন এখানে রেড়ির তৈল (Castor Oil) উৎকৃষ্ট ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইত। উহা বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রভৃতি স্থানের চিকিৎসালয়ে চালান[৮৪] যাইত। এখানকার কয়েদী কর্তৃক উৎপাদিত জিনিষ পত্র কয়েদীদের ব্যবহারে লাগিয়া যাহা উদবৃত্ত থাকিত, তাহা জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে চুক্তি হিসাবে বাহিরে বিক্রয় হইত। কিছু দিন আগেও এখানে কয়েদীদের দ্বারা রুটী প্রস্তুত হইত। তাহা স্থানীয় আবাসিক কুঠিতে বিক্রিত হইত।

বাহিরের চাহিদা অনুযায়ী ইং ১৯১৪ সালে এখানে ১৯৪৩৮ ব্লাঙ্কেট ও ৭৭৬১৪

৮১. Rajshahi Gazetteer P 130

৮২ Statistical Account of Rajshahi District P. 106

৮৩. Do Do

৮৪. Rajshahi Gazetteer-P. 130.

খানা চৌকিদারী পোষাক প্রস্তুত হইয়াছিল। ঢাকা জেলে মিল স্থাপিত হওয়ায় এখন পশমের কম্বল ও ব্লাঙ্কেট এখানে প্রস্তুত হয় না।

জেলখানায় পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত আছে। ইতিপূর্বে স্থানীয় ইংরেজ কুঠিয়ালরা জেলখানার বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করিতেন।

সেল ও হাসপাতাল

সে জন্য মূল্য হিসাবে প্রতি টিনে ১ আনা করিয়া দিতে হইত। এই পানীয় জল জেলখানার কয়েদীরা ছাড়াও কর্মচারীবৃন্দও ব্যবহার করিতেন। পদ্মা হইতে পাইপ দ্বারা এই পানি আনিয়া বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ করিয়া জেলখানায় চৌবাচ্চায় রাখা হইত। পরে তাহা জেলের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হইত। 'রাজশাহী ওয়াটার ওয়ার্কস' স্থাপিত হইবার পর ইংরেজরা জেলের পানীয় জল ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেয় এবং তখন হইতে জেলখানাতে– ও বড় বড় ইন্দারা খনন করিয়া হাতল ও মেশিনের সাহায্যে পানি উত্তোলন করা হইয়া থাকে।

'জেলের শাসন ব্যবস্থা' অন্যান্য শাসন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। পাকিস্তানের সমস্ত কারাগারগুলি সেই একই শাসনের আওতাভুক্ত। রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের শাসন ব্যবস্থা

অবস্থান ও জেলের শাসনব্যবস্থা

পূর্বাপেক্ষা কিছুটা উন্নত হইয়াছে। বিখ্যাত পদ্মার তীরে ইহার অবস্থান। সে জন্য এখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ। জেলের ভিতরে কয়েদীদের ব্যারাকগুলি স্বতন্ত্রভাবে স্থাপিত। কোন কোন ব্যারাকের সম্মুখ ফুলের বাগানে সজ্জিত। জেলখানার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিশেষ লক্ষনীয়। রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের আভ্যন্তরীন পথগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বটে, কিন্তু পায়খানার ব্যবস্থা অত্যন্ত জঘন্য। কয়েদীরা যাহাতে অন্য মনস্ক না হইতে পারে সেই জন্য দলগত বা এককভাবে উহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত রাখা হয়। জেল কয়েদীদের পরিচালনার ইহা একটি বিশেষ কৌশল। এবং কয়েদীদের উপর ন্যস্ত কার্য্যাদি যথা নিয়মে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। তরুণ কয়েদীরা যাহাতে অন্য মনস্ক না হয় এবং তাহারা যাহাতে আনন্দে কাল কাটাইতে পারে সেই জন্য নানা প্রকার খেলাধূলার বন্দোবস্ত আছে। ঢোল করতাল বাদ্য যন্ত্রের তালে তালে তরুণদের ব্রতচারী নৃত্যের দৃশ্য সত্যিই উপভোগ্য। অন্যান্য কয়েদীদের দল বিশেষে পি, টি, প্যারেডের ব্যবস্থা আছে। রান্নাশালার কয়েদীদের রান্না কার্য্যে কর্মতৎপরতা ও স্নানাহারের দৃশ্য বেশ চমৎকার। জেলখানায় মশা মাছির উপদ্রব খুব বেশী, তজ্জন্য কয়েদীর মশারীর সাহায্যে এক অভিনব উপায়ে মাছি বিনাশ করিয়া থাকে। চারিত্রিক দিক হইতে বিবেচনা করিয়া তরুণ কয়েদীদের পৃথক পৃথক 'সেলে' থাকিবার ব্যবস্থা আছে। বলা বাহুল্য বিশিষ্ট সেলের ভিতরে তারের জাল দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোপ আছে। এই খোপে তাহারা একে অপরের সহিত কথা বার্তা বলিতে পারিবে কিন্তু, কেহ কাহাকেও স্পর্শ করিতে পারিবে না এইরূপ ব্যবস্থা আছে। এই খোপকে 'জাল ডিগ্রী' বলে। মারাত্মক বা দুর্দ্দান্ত কয়েদীদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। যেন তাহারা নিজের অথবা অন্যের ক্ষতি করিতে না পারে বা আত্মগোপন করিয়া পলাইয়া যাইতে না পারে সে জন্য বিশেষ সতর্কতা মূলক পৃথক সেলে একাকী রাখিবার ব্যবস্থা আছে। স্ত্রী কয়েদীদের মধ্যে যাহারা দুষ্টা ও ভীষণ প্রকৃতির তাহাদিগকে স্ত্রী কয়েদীর ব্যারাকে পৃথকভাবে জাল দ্বারা বেষ্টিত সম্পূর্ণ পৃথক খোপে থাকিতে হয়। স্ত্রী কয়েদীর ব্যারাকে একজন স্ত্রী সিপাই আছে। সে তাহাদের দেখাশুনা করিয়া থাকে। ইহাদের

মধ্যেও বুনানী কার্য্য ও কুটির শিল্পজাত জিনিষ পত্র প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে। মজার ব্যাপার এইযে, কোন পরিদর্শক বা কারাধ্যক্ষ স্ত্রী কয়েদীদের ব্যারাকে প্রবেশ করিতে চাহিলে প্রথমে ঘণ্টা ধ্বনি দ্বারা ভিতরে সতর্কতামূলক সঙ্কেত দিতে হয়–তারপর স্ত্রী সিপাই আসিয়া প্রবেশাধিকার দিয়া থাকে।

রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে রাজ বন্দীদের আহার ও বাসের বন্দোবস্ত মোটের উপর মন্দ নয়। রাজবন্দী ও অন্যান্য বিশিষ্ট কয়েদীদের মধ্যে ১ম ও ২য় শ্রেণী বিভাগ প্রভৃতি আছে। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মান হিসাবে অথবা স্বীয় মর্যাদানুযায়ী তাহারা এখানে সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকেন। বর্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজবন্দীরা দৈনিক ৩ টাকা হারে খাওয়া খরচা পাইয়া থাকেন। অন্যান্য বিশিষ্ট প্রথম শ্রেণীর কয়েদীরা প্রায় ৩ টাকা অথবা ঐ টাকা মূল্যের আহারাদি পাইয়া থাকেন।

রাজবন্দীদের খাদ্য ও পোষাক পরিচ্ছদ

পূর্বে এই জেলে সাধারণতঃ ইংলিশ, বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী খানার ব্যবস্থা ছিল। পাকিস্তান আমলে বর্তমানে পূর্ব্ব পাকিস্তানী অর্থাৎ এক বেলা ভাত ও দুই বেলা রুটির ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজবন্দীগণকে দল হিসাবে পৃথক পৃথক ব্যারাকে রাখা হয়। তাহারা আপন আপন বিছানা-পত্র ও পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে পারেন এবং বাড়ী হইতে খাদ্যাদি আনাইয়া খাইতে পারেন কিন্তু, দোষী সাব্যস্ত হইলে রাজবন্দী ছাড়া অন্য কেহ বাহির (বা বাড়ী) হইতে কোন জিনিষ পত্র বা পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে পারেন না। তখন অপরাধের পরিমাণ হিসাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাধীনে থাকিতে হয়।

বাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে উত্তরাংশে অবস্থিত পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একতলা বিশিষ্ট কয়েকটি ব্যারাক বেশ প্রাচীন। এই ব্যারাকের গঠন ও প্রাচীনত্ব দেখিয়া মনে হয়, ইহাই এই কারাগারের সর্বপ্রাচীনত্ব দেখিয়া মনে হয়, ইহাই এই কারাগারের সর্বপ্রাচীন ইমারত। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, এই ব্যারাকটিতেই 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর' সেনারা থাকিত। পরে, তাহাদের শাসন সংস্কার সময়ে নাটোর হইতে জেলার সদর দপ্তর ঐস্থানে স্থানান্তরিত হইলে জেলা কারাগারের জন্য এই ব্যারাকটিকে কেন্দ্র করিয়া সর্বপ্রথম বুয়ালিয়াতে 'জেলাকারাগার' স্থাপিত হয়। জেলের তোরণ হইতে উত্তর ধারে অবস্থিত এক তোরণ বিশিষ্ট পৃথক চত্বরটি রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের আদি 'কারাগার' বলিয়া আমাদের ধারণা। কেননা এই ব্যারাকটির চত্বর দেখিলে মনে হয় ইহা একটি ভিন্ন ব্লক বা সম্পূর্ণ পৃথক চত্বর। এই প্রাচীন ব্যারাকের পূর্বে অবস্থিত দ্বিতল ব্যারাকটি 'দিঘাপতিয়া রাজার' অর্থে বিনির্মিত বলিয়া জনশ্রুতি আছে। কিন্তু আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও উহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ উদ্ধার করিতে পারি নাই। যাহা হউক ইং ১৯১৪ সালে দক্ষিণ পার্শ্বের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া এই কারাগারকে সেন্ট্রাল জেল বা বিভাগীয় কারাগারে উন্নীত করা হয় বলিয়া জানা যায়।

প্রাচীন ইমারত

এই কারাগারের ২০ নং সেলের নিকট মৃত্যু দন্ডাদেশ প্রাপ্তদের ফাঁসীর মঞ্চ অবস্থিত। সাধারণতঃ জেলখানার অন্যান্য কয়েদীদের অজ্ঞাতসারে শেষ রাত্রীর দিকে সুনির্দিষ্ট সময়ে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, কারাধ্যক্ষ, সিভিল সারজন ১২ জন বন্দুকধারী পুলিশ ও

ফাঁসী মঞ্চ

কয়েকজন জেল কর্মচারীদের উপস্থিতিতে মৃত্যুর দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে মঞ্চে দাঁড় করাইয়া গলদেশে ফাঁস পরাইয়া দেওয়া হয়। তারপর যথানিয়মে এই ফাঁসী কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে ফাঁসী মঞ্চে একই সঙ্গে দুইজনকে ফাঁসী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

কৃষি ক্ষেত্র

এই কারাগারের (উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম ধারে) তিনটি কৃষিক্ষেত্র আছে। ইহাতে কয়েদীদের দ্বারা নানা প্রকার তরিতরকারী শাক-সব্জীর চাষ হইয়া থাকে। এই সব কয়েদীরাই ভোগ করে। এতদব্যতীত কারাগারের নিজস্ব পুকুরে মাছ ও পুকুর পাড়ে কিছু কিছু তুতের চাষ হইয়া থাকে।

শিক্ষা, লাইব্রেরী ও কর্মচারী

নিরক্ষরদের (অল্প বয়স্ক ও বয়স্কদের) অক্ষর পরিচয়ের জন্য বাহির হইতে তিন জন বেতন ভোগী শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। নামে মাত্র একটি লাইব্রেরীও আছে। বর্তমান কারাধ্যক্ষের* অধীনে ১ জন জেলার ৫ জন ডেপুটী জেলার ও ৯ জন মুনশী আছেন।

* বর্তমান কারাধ্যক্ষ মওলানা এম, ওবায়দুল্লাহ (এম. এ) সাহেব রাজশাহী বিভাগের জেলখানাগুলির উপ-প্রধান পরিদর্শকও বটে (D I.G of Prisons)

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

# বুয়ালিয়ার ইতিহাসে হজরত শাহ মখদূমের ভূমিকা

মুসলিম বাঙলার সৌর্য্যের প্রতীক, যোদ্ধাকুল শ্রেষ্ঠ মহাম্মদ-বিন বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর বঙ্গে মুসলিম কৃষ্টি সভ্যতা বিস্তারের স্থায়ী পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তৎপূর্বে উত্তর বঙ্গে বগুড়ার মহাস্থানগড়ে তাপস প্রবর সুলতান বলখী ৪৩৯ হিজরীতে (ইং ১০৪৭ সাল) মহাস্থানের শেষ সামন্ত 'নরসিংহ'কে পর্যুদস্ত করেন এবং পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম হিন্দু সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মহাস্থানগড়ে সর্বপ্রথম ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলন করিয়া বঙ্গদেশ ইসলাম প্রচারের সূচনা করিয়াছিলেন। মোগল আমলের সরকার ঘোড়াঘাটে অবস্থানকারী মির্জা আরজমান্দ্ ও সুরজনারায়ণ কর্তৃক রচিত তারিখ-ই-বাঙলার এই সংবাদ সত্য হইলে পূর্ব্ব পাকিস্তানে ইসলাম বিস্তারের প্রাচীনতম প্রচেষ্টগুলির মধ্যে বগুড়ার মহাস্থানে ইসলাম প্রচারের প্রচেষ্টা অন্যতম।* গৌড়-বঙ্গে মুসলিম্ শাসন ও কৃষ্টি সভ্যতার ভিত্তিভূমি গৌড়। এই গৌড়ের সহিত রাজশাহীর সংযোগ থাকায় গৌড়ের মুসলিম কৃষ্টি সভ্যতার আলোকে যুগে যুগে রাজশাহী ও আলোকিত হইয়াছিল। সে কথা আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে 'সুফী সাধনা' অধ্যায়ে ধারাবাহিক আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। এখন আমরা বর্তমান অধ্যায়ে কেবলমাত্র হযরত শাহ মখদুম 'রূপোশ' সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করিব।

রাজশাহী শহরে অবস্থিত বিখ্যাত 'হজরত শাহ মখদুম্ 'রূপোশ' সম্বন্ধে লিখিত কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। দরগার প্রাচীন মূল্যবান দলিল পত্র তদানীন্তন তথাকথিত খাদেম শাহ্ দরবেশের স্থাবর ভূ-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে ইং ১৮৩৭ সালের আগেই বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে* বলিয়া অবগত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং সমসাময়িক পপাক-ভারতের অন্যান্য পীর দরবেশের এবং বাদশাহ-সুলতানদের সহিত সম্বন্ধ সূচক কোন প্রাচীন কাগজ পত্র থাকিয়া থাকিলেও তাহার বিষয়ে কোন কিছু জানিবার উপায় নাই। এখন এই দরবেশ সম্পর্কে কিছু বলিতে গেলে স্থানীয় প্রাচীন জনশ্রুতি ও উপস্থিত যৎ সামান্য প্রামাণপঞ্জির উপর নির্ভর করিতে হইবে।

আমরা স্থানীয় কালেক্টরীর মহফেজ খানার আশ্রয়ে এতদসম্পর্কে অনুসন্ধান

---

* সুলতান বলখী কর্তৃক মহাস্থানগড়ের সামন্ত রাজা 'নরসিংহ' প্রকাশ পরশুরাম বিজয় সম্পর্কে গ্রন্থকারের পরবর্তী ইতিহাসে (উত্তর বঙ্গের ইতিহাস) বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

** ইং ১৮৩৭ সালে ২৫ জানুয়ারী তারিখে তদানীন্তন বাঙলা সরকার দরগাব পীরপালের (মদদমাস) উপর কর (খাজনা) ধার্য্য করেন। কিন্তু, দরগার তদানীন্তন খাদেম সিদ্ধ নিস্করের দাবীতে সরকারকে কর না দেওয়ায় সরকার বাধ্য হইয়া ইং ১৮৩৮ সালের ২৫শে জানুয়ারীতে দরগার পীরপাল 'অসিদ্ধ নিস্কর হিসাবে সমুদয় ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। অগত্যা দরগার খাদেম পূর্বের দলিল পত্রের উপযুক্ত প্রমাণাদি দাখিল করিয়া সরকারের বিরুদ্ধে জেলা কলিকাতার খাস কমিশনার আদালতে মিঃ জেমস কারসেনের নিকট আপিল (আপিল নং ৩০) দায়ের করেন। অতঃপর ইং ১৮৪০ সালে ২৮ আগষ্ট সিদ্ধনিস্কর হিসাবে খাদেমের পক্ষে ডিগ্রী লাভ হয়। এই ডিগ্রীর রায়ে এই বলিয়া মন্তব্য হয় যে, ইং ১৮২৫ সালেব ২৪ কানুন (ধারা), ৮ প্রকরণের, ও ১৮১০ সালের ১৯ কানুনে এবং ১৭৯৩ সালের (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) ১৯ কানুনের দুই দফার মতানুসারে (জনকল্যাণমূলক কার্যাদির জন্য) এই মদদমাস বাজায়েপ্ত হইবার উপযুক্ত নহে (রাজশাহী-কালেক্টরীর মহফেজখানায় রক্ষিত দরগার পীরপাল সংক্রান্ত কাগজ পত্র দ্রষ্টব্য)।

চালাইয়া দরগাপাড়াস্থিত মদদমাস পীরপালের বিষয়ে কেবলমাত্র এতটুকু অবগত হই যে, জনৈক বাদশাহ কর্তৃক দরগার পীরপাল স্বরূপ ২৫০** বিঘা ভূমি হজরত শাহ মখদুম্ রূপোশকে বিবিধ সদানুষ্ঠানের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান রাজশাহী ভূমি সীমানার মধ্যে বিভিন্ন পরগণার (বর্তমান থানা) মহম্মদ শাহ বাদশাহ, শাহজাহান বাদশাহ, শাহ আলম বাদশাহ, আলমগীর বাদশাহ এবং রাজশাহীর রাণী ভবানী ও রাজা রামজীবন প্রভৃতি ১০/১২ জন মোঘল বাদশাহ ও রাজ জমিদারদের সমসাময়িক রাজত্বকালে ফারসী তায়েদাদ মূলে মদদমাস লাখেরাজ ও দেবোত্তর প্রভৃতি স্থানীয় সূফী দরবেশদের প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহিতার নাম এবং তারিখ প্রভৃতির উল্লেখ আছে কিন্তু, বুয়ালিয়া দরগাপাড়াস্থিত পীরপালের প্রদত্ত কোন তারিখ পাওয়া যায় নাই। কে এই সম্পত্তি দান করিয়াছেন; তাহার নামও জানা যায় না। ইং ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের মূল ফারসীর তায়েদাদে* মদদমাস দাতার কলমে লিখিত আছে عطا از اسامی আর গ্রহিতার ফলকে লিখিত আছে حضرت شاہ مخدوم روپوش এবং মদদমাস কলমে ২৫০ বিঘা ভূমির বিষয় উল্লেখ আছে। عطا —অর্থ = দান করা; অর্থ বাদশাহ কর্তৃক বা বাদশাহের। عطا از بادشاہ অর্থাৎ বাদশাহ কর্তৃক প্রদত্ত। পীরপালটি বাদশাহ হুমায়ুন কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া যে জনবব শোনা যায় তাহার স্বপক্ষে সকল রকম সম্ভাব্য চেষ্টা করিয়াও আমরা কোন প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ষোড়শ শতকে শের শাহের আদেশে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোসায়েব কর্তৃক ৯৪৪ হিজরীতে (৬ই এপ্রিল-১৫৩৮) গৌড় নগর দখল হইলে বঙ্গের স্বনামধন্য স্বাধীন সুলতান হোসেন শাহের অষ্টাদশ পুত্র 'আহত মহম্মদ শাহ' দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুনকে শের শাহের বিরুদ্ধে আহ্বান করেন।[৮৫] অতপর এই বৎসরই (জুলাই, ১৫৩৮) বাদশাহ হুমায়ুন গৌড় অধিকার করিয়া বসেন। গৌড়ে প্রবেশ করিয়া কেবল মাত্র কয়েক মাস (বর্ষাকাল) সেখানে কাটাইয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। বাদশাহ হুমায়ুনের দবির-ই-খাস (ব্যক্তিগত সচীব) স্থানীয় পীর-আউলিয়া সম্পর্কে তাঁহার 'তজকিরাৎ-উল-ওয়াকিয়াৎ' (হুমায়ুন চরিত) এ কোন কিছু লিখিয়া যান নাই। সুতরাং বাদশাহ হুমায়ুন কর্তৃক হজরত মখদূম আউলিয়াকে ভূ-সম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছে একথা বলিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। জোর করিয়া বলিলেও তাহা ইতিহাস সম্মত হইবে না। যাহা হউক, যে কোন মোঘল বাদশাহ হউক, আর পাঠান সুলতান অথবা গৌড়ের সুলতানই হউক শাহ দরবেশের মদদমাস জনৈক বাদশাহ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে একথা ঐতিহাসিক সত্য।

শিলালিপি ও আলীকুলী বেগ

এখানে আর একটি ঐতিহাসিক উপাদান বিশেষ লক্ষণীয় যে, হজরত শাহ মখদুম রূপোশের স্মৃতি রক্ষার্থে সমাধি সৌধের (مقبرہ) প্রবেশ দ্বারের উপরিভাগে জনৈক আলীকুলী বেগ কর্তৃক রচিত ১০×৩৬´´ ইঞ্চি চারি লাইন বিশিষ্ট একটি ফারসী শিলালিপি প্রথিত রহিয়াছে। এই লিপিটির সারমর্ম নিম্নরূপ:

* তায়েদাদ সংক্রান্ত ইং ১৯৭৩ সালের আগেকার সকল রকম মূল (Original) কাগজ পত্রের অনুলিপি মহফেজ থানার 'বিশেষ কক্ষে' রক্ষিত আছে।

* বাদশাহী আমলের দুই শত পঞ্চাশ বিঘা?

৮৫. Tezkerath-al-Vakiat (Memoires of Hurmayun), Eng. translation pp. 15-23; and also vide Tarik-i-Sher Shahi, Eng-translation, compos, partugese in Bengal etc

"অতি উচ্চ মর্যাদা মণ্ডিত গুণসম্পূর্ণ মহানুভব সুলতানগণের শ্রেষ্ট সুলতান, পয়গম্বর শ্রেষ্ঠের বংশধর, পুরুষানুক্রমিক সুলতান ও বাদশাহ ইউসুফ আলা খাজা সুরা সুবিচারক সুদক্ষ আব্বাস (শাসনামলের) হোসায়েনীর শ্রেষ্ঠ গোলাম; ইরাণের সৈন্যধ্যক্ষ, বার ইমামের (মজহাবের) প্রচারক অলৌকিক ক্ষমতা সম্পূর্ণ হজরত রসুলে করিম (সঃ) এর পরেই লোক শ্রেষ্ঠ আমিরুল মোমেনীন ধর্ম ভীরুগণের ইমাম আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) এর আস্তানার কুকুর ভাগ্যবান; সাহায্য প্রাপ্ত আদর্শ স্থানীয় আলীকুলী বেগ কর্তৃক আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী আমার সৈয়দ ক্ষমতাশালী (ইরানের সৈন্যধ্যক্ষের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন) মরহুম মগফুর শাহ দরবেশের কবরের উপর ১০৪৫ হিজরীতে এই গম্বুজ নির্মাণের তওফিক (সুযোগ ঘটিল।

পৃথিবীস্থিত কিছুরই অস্তিত্ব বাকী থাকিবে না বলিয়া আমাদের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে এই (শিলালিপি) নকশা অঙ্কিত হইল ১০৪৫ হিঃ (১৬৩৫ খ্রীঃ)।

উপরে উল্লিখিত ফারসী ভাষায় লিখিত শিলালিপিটির সারমর্মে এতটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে যে, দিল্লীর মোঘল বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্বকালে জনৈক আলীকুলী বেগ কর্তৃক শাহ দরবেশের জন্য একটি সমাধি সৌধ নির্মিত হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, এই লিপিটি সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে অঙ্কিত হইলেও তৎকালীন প্রথানুযায়ী ইহাতে তাঁহার নামের কোন উল্লেখ নাই। অথচ আলীকুলী বেগ উক্ত লিপিটিতে পারশ্যের শাহ আব্বাস সাফাভীর নামই কেবল মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। উপরন্তু তিনি নিজেকে আব্বাস সাফাভীর এক জন দাস ও ভক্ত অনুসায়ী বলিয়া পরিচয়ও দিয়াছেন। দিল্লীশ্বর শাহাজাহানের রাজত্বকালে পারশ্যের শাহ আব্বাসের* প্রতি একজন ভক্ত অনুসায়ীর এরূপ ভক্তি শ্রদ্ধার কারণ কিছু বোধগম্য হইতেছে না। মনে হয় আলীকুলী বেগ দ্বাদশ মতাবলম্বী গোঁড়া শিয়া মুসলিম ছিলেন। অধিকন্তু, তিনি হয়ত বাদশাহ শাহজাহানের কোন কর্মচারী ছিলেন না অথবা হয়ত বাদশাহের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। সেই জন্যই হয়ত তিনি গোঁড়া পন্থী শাহজাহানের রাজ্যের একজন নাগরিক হইয়াও এমন আপাত বিরোধী কার্য্য করিয়া থাকিবেন।

প্রাগুক্ত বিষয়টি বোধগম্য করিতে হইলে আলীকুলী বেগ সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা আবশ্যক মনে করি। রাজশাহীর বুয়ালিয়াতে এক সময় কিছু সংখ্যক শিয়া মুসলমানের বাস ছিল। কতক বর্গীর হাঙ্গামার আগেই এখানে আসিয়াছিল আর কতক হাঙ্গামার সময়ে আসিয়াছিল। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে রাজশাহীর বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার কথা আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। শিয়াদের বাস ছিল। আধিপত্যও ছিল হয়ত*। রাজশাহী শহরের ৩/৪ মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে

* শাহ আব্বাস ইং ১৫৮৭ হইতে ১৬২৯ সাল পর্য্যন্ত প্রায় ৪০ বৎসবকাল পাবশ্য শাসন করেন। তিনি একজন প্রতিভাবান শাসক ছিলেন। পাবশ্যের উন্নয়নমূলক বিবিধ কার্যের দুরদশিতার জন্য তিনি বিশ্বেব খ্যাতি অর্জন করেন এবং মহান নামে অভিহিত হন।

মাসাদ্দে-ই-মোকাদ্দস -মুসলামনের একটি তীর্থ স্থান এবং বিশেষ করিয়া শিয়া জগতের বিশিষ্ট স্থান। এই মনোভাব প্রচার করিয়া শাহ আব্বাস স্বার্থকভাবে ইরানের বিভিন্ন গোত্র ও অধিবাসীদিগকে একত্রীভূত করিয়াছিলেন। পারশ্যের রাজধানী ইসপাহানী হইতে মাসাদ্দে-ই-মোকাদ্দস (শত মাইল দূরত্ব?) পর্য্যন্ত পদ ব্রজে তীর্থ ভ্রমণ করিয়া স্বীয় ধর্ম মতবাদের সারবর্ত্তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (Vide-Tezkerath-al-Vakiat, Eng, Translation P. 111)

রেল লাইনের উত্তর ধারে জঙ্গলের মধ্যে এখনও শিয়াদের একটি কবরস্থান (গোরস্থান) বর্তমান রহিয়াছে। আর একটি কারণে এখানে শিয়াদের আগমন হইয়াছিল তাহা নিম্নের আলোচনা হইতে বেশ অনুধাবন করা যায়।

কনৌজের সন্নিকট ইং ১৫৪০ সালে বিল গ্রামের যুদ্ধে মোগল বাদশাহ হুমায়ুন বিদ্রোহী শের শাহ কর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বীয় আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের নিকট সাহায্য লাভের কোন আশা না থাকায় তিনি পারশ্যে পলায়ন করেন। তিনি সেখানে প্রায় ১৫ বৎসর অবস্থান করিয়া হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার কল্পে ইরানের শাহের সহিত বাস্তব সাহায্যের আশ্বাস পান এবং অবশেষে তিনি শিয়া মতাবলম্বী এক দল ইরানী সৈন্য ও অনুচর লইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর ইং ১৫৫৫ সালে শের শাহের বংশধর সিকেন্দর শূরকে পরাজিত করিয়া হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। শান্তিব সময়ে শিয়া মজহাবী বহু ইরানী সৈন্য ভারতে বসবাস করিতে থাকে। ক্রমশ: তাহারা এদেশের নাগরিক হিসাবে পরিগণিত হয়। উদার ধর্ম পন্থী বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে ভারতীয় শিয়াগণের বিশেষ উন্নতি লাভ হয়। তারপর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তাহারা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠে। সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের ভ্রাতা আসফ খান বাদশাহ জাহাঙ্গীরের প্রধানমন্ত্রী শিয়া ছিলেন। তাঁহার সহায়তায় শিয়াগণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে নিজেদের কৃষ্টি বৈশিষ্টের প্রসারতা লাভ করিয়া এদেশের সামাজিক মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। পরবর্তী বাদশাহ শাহজাহানের সহিত শিয়াদের নানা কারণে মতানৈক্য হওয়ায় শিয়াগণ দিল্লীর চারি পার্শ্ব হইতে ভারতের নানা স্থানে নিজেদের ভাগ্যান্বেষণে ছড়াইয়া পড়িয়া শিয়া প্রধানদের অনেকেই লক্ষ্ণৌ, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী ও ঢাকা প্রভৃতি প্রাদেশিক শহরে বসতি স্থাপন করেন। এই সময় রাজশাহীতেও শিয়া প্রধানদের আগমন হইয়াছিল। তাহারা এখানে বহুকাল যাবৎ বসবাস ও ব্যবসায় বাণিজ্য কবিয়াছিল। প্রাগুক্ত কবরের স্থান উহার একটি সুস্পস্ট প্রমাণ। আলোচ্য স্মারক লিপিটির রচয়িতা আলীকুলী বেগ বুয়ালিয়ার শিয়া প্রধানদের অন্যতম বলিয়া অনুমতি হয়। তখন হয়ত বুয়ালিয়াস্থিত শাহ মখদুম আউলিয়ার বুজর্গী সম্পর্কে সবিশেষ অবগত ছিলেন। তাই হয়ত তিনি এদেশে নবাগত হিসাবে স্থানীয় মুসলমানদের সহানুভূতি ও সদিচ্ছা লাভের আশায় শাহ দরবেশের সমাধি সৌধ নির্মাণের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

বাদশাহ হুমায়ুনেব পলায়ন ও হৃতরাজ্য পুনুরুদ্ধার

আলীকুলী বেগের অবস্থান সম্বন্ধে রাজশাহীতে জোর প্রবাদ প্রচলিত আছে। রাজশাহী সদর কাচারীর ৯ মাইল পশ্চিমে কুমারপুরে জনৈক আলীকুলী বেগ বসবাস করিতেন। এবং এই কুমারপুরে এখনও অনেকে তাঁহার কবরে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া থাকে*। কুমারপুরে শাহ মার্কারমের সমাধি সৌধের দক্ষিণ ও পশ্চিম ধারে ৪/৫টি পাকা বাঁধা কবর (তিনটি প্রস্তরাবৃত) এখনও বর্তমান আছে। এই কুমারপুরের চারিপার্শ্বে যে বর্ধিষ্ণু মুসলমান জনবসতি ছিল, কুমারপুর দর্শন করিলে তাহা বেশ অনুধাবন করা যায়। এই কুমারপুরের আলীকুলী বেগ উল্লিখিত লিপিটির আলীকুলী বেগ একই ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ-বিজয় নগর রাজবাড়ীর অঞ্চল হইতে প্রস্তরাদি সংগ্রহ করিয়া

* —রাজশাহীব পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের মহর্রম পর্বের পীঠগুলির আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য

আনিয়া মখদূম্ সাহেবের সমাধি নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া আর একটি প্রাচীন জনশ্রুতি আছে। গুলাইয়ের জমিদার রাজশাহীস্থ মৌলবী আবদুল হামিদ মিঞা প্রমুখের নিকট হইতে এই জনশ্রুতিটি শুনিয়াছি। আজ হইতে প্রায় ৪০।৪২ বৎসর আগে দরগার সমাধি ও মসজিদ মেরামত ও মিনারে প্রস্তুতকালে তাঁহারা দরগাপাড়াস্থ দরগার তত্ত্বাবধায়ক (Supdt.) ও ম্যারেজ রেজিষ্টার কাজী মুনছুর ও তদীয় ভ্রাতা মহাম্মদ হোসেনের নিকট হইতে উক্ত জনশ্রুতিটি শুনিয়াছিলেন। এই সমাধি সৌধের প্রস্তরাদিগুলি যে কোন হিন্দু মন্দির ও রাজবাড়ীর ধ্বংসস্তূপ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা শাহ মখদূমের সমাধি দ্বারের 'চৌকাট-কপাট' ও সম্মুখস্থ প্রস্তরাদি হইতে অনুমান করা যায়। কারণ, কপাট ও চৌকাটগুলির কারুকার্য্য হিন্দু কৃষ্টির পরিচায়ক। পাষাণগুলির অপর পৃষ্টে নানাবিধ মূর্ত্তি চিত্রিত আছে। অবশ্য ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, বহু সাধক-দরবেশের সমাধি ও মসজিদ নির্মাণকালে হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রস্তরাদি সংগ্রহ হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা ঐতিহাসিক মাত্রই অবগত আছেন। যাহারা এখনও ইতিহাসের এই আলোকের পশ্চাতে পড়িয়া আছেন তাহারা ইচ্ছা করিলেই এক উত্তর বঙ্গের পাঠান আমলের মাহীসন্তোষ মসজিদের মেহরাব ও বিভিন্ন আরবী, ফারসী শিলালিপিতে (রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়মে); কুশুম্বা মসজিদে এবং বগুড়া, পাবনা দিনাজপুর ও রংপুর জেলার কতকগুলি দরগাহ ও পাঠান- মোঘল আমলের মসজিদ ও সমাধি সৌধে হিন্দুর মন্দিরাদির নমুনা দেখিতে পাইবেন। অতএব ইতিহাসের এই বিস্মৃত অধ্যায়কে আজ আর ঝালাইয়া লইয়া নিজেদেব কৃতিত্বের কথা নাইবা বলিলাম। তবে শাহ্ মখদূমের সমাধি সৌধের প্রস্তর খণ্ডগুলি যে বুয়ালিয়ার অদূরে কোন হিন্দু মন্দির ও বাড়ীর ধ্বংসস্তূপ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এবং কুমারপুর নিবাসী আলীকুলী বেগই যে এই কার্য্য সম্পাদন কবিয়াছিলেন তাহা স্বীকার লইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না।

দরগার মহর্রম পর্ব লইয়া আজ নানা মতবিরোধ দেখা যায়। এই বিরোধের ফলে এখানকার প্রাচীন রীতির পরিপ্রেক্ষিত কতকগুলি জটিল প্রশ্নের কথা প্রায়শ শোনা যায়। দরগার পীরপালের আয় হইতে এখনও শতাধিক টাকা মহর্রমের অনুষ্ঠানে ব্যয় হইয়া থাকে। ইহাতে এক দল লোক বলিয়া থাকেন–শাহ মখদূমের রীতি অনুযায়ী এখানে মহর্রম হইয়া থাকে; এবং ইহার অনুষ্ঠানাদি দরগার চত্বরে হইবার জন্য দাবী জানায়। আর একদল তাহার প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এই অনুষ্ঠান এখনও দরগার সন্নিকটে উৎযাপিত হয়, বন্ধ হইয়া যায় নাই। যদিও এখানকার মহর্রমী-দ্বিতল নহবৎখানা আজ নাই, আগের মত, জৌলুসের সহিত মর্হরম পর্ব উৎযাপিত হয় না। তবুও এখানকার বিখ্যাত মহর্রম পর্বের কথা কেহ বিস্মৃত হইয়া যায় নাই। বিভাগোত্তর কালে মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে কয়েক ঘর শিয়া মজহাবী লোকের আগমনে রাজশাহীর মহর্রমের পূর্ব রীতি যেন একটু একটু করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। এখন ঢাকার পরেই রাজশাহীর মহর্রম বিখ্যাত। নওয়াবী আমলে মুর্শিদাবাদের পরেই রাজশাহীর স্থান অগ্রগণ্য ছিল। বিশেষত: দরগার এই মহর্রম পর্ব ও আলীকুলী বেগকে কেন্দ্র করিয়া কেহ কেহ এই বিখ্যাত শাহ মখদূমকে শিয়ারী দরবেশ বলিয়া অনুমান

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

করেন। জনৈক মুর্শিদাবাদী স্বীয় উদ্দেশ্যে মামলা দায়ের করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তিনি নাকি কয়েক হাজার টাকা লইয়া তাঁহার অধিকার ত্যাগ করিয়াছেন। জজ কোর্টের মামলার রায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই দরগার যতকিছু সুন্নীদের–শিয়াদের নহে। ইত্যাদি বিবিধ প্রশ্ন ও মন্তব্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে এই দরগার প্রাচীনতা একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার। যতক্ষণ না ইহার সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব আবিস্কৃত হইয়াছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহার কোনটির সমাধান বা মীমাংসা সম্ভবপর নয়। তবে বলিতে বাধা নাই। দীনি এলাহির মোঘলাই জৌলুসে একদিন শিয়ারীদের মহর্রমী তাজিয়াদি পাক-ভারতের সুন্নীদেরও ঘরে ঘরে শোভা পাইত। রাজশাহীতে ইহার প্রভাব অধিকতর ছিল। আলীকুলী বেগ কর্তৃক শাহ মখদূমের সমাধি সৌধ পুনঃনির্মাণের পর হইতেই সমাধি চত্বরে ঘটা করিয়া তাজিয়াদি উঠিত বলিয়া আমাদের ধারণা। সেই রীতিই চলিয়া আসিতেছিল।

শাহ দরবেশের জীবন আলেখ্য নাই কিন্তু, প্রবল জনশ্রুতি আছে একটি পৃথক প্রস্তর খণ্ডে মখদূম সাহেবের পরিচয়াদি লিখিত ছিল। দরগার খাদেমগণ তাহা গুম করিয়া দিয়াছে। আমরা যত দূর জানি–এখানে আর কোন পৃথক প্রস্তর খণ্ড ছিল না। সম্ভবতঃ মদদমাসের তায়েদাদই উক্ত জনশ্রুতির কেতাবাত বা প্রস্তর খণ্ড। এখানে আর একটি কথা বিশেষ স্মরণযোগ্য। এই দরগার খাদেম বংশোদ্ভুত বলিয়া দাবীদার কয়েকজন লোকের বাড়ীতে প্রমাণ্য তথ্যের সন্ধানে আমরা দীর্ঘ দিন যাতায়াত করি। শেষ পর্য্যন্ত যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি তাহার মূল কথা এই যে, তাহাদের পূর্ব পুরুষ এই দরগার কর্মচারী ছিল। তখন মখদূম সাহেবের মেকি বংশপিঠিকার দাবীতে মদদমাসের শরীকান হইয়া যে সব কাগজ পত্র জাল করিয়া লইয়াছিল আদালতের মামলার রায়ে তাহা নাকচ হইয়া তাহাদের সকল রকম ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। এই লা ওয়ারিশ মদদমাসের আয়* হইতে বর্তমানে জেলা কর্তৃপক্ষের তত্বাবধানে প্রধানত: মসজিদ ও আস্তানাদি, শিক্ষা, মাহে রমজান, মহর্রম পর্ব, দুই-ঈদ ও বারোচান্দের ব্যয়াদি হইয়া থাকে।

সমাধি নির্মাতা আলীকুলী বেগ বোধ হয় তখন মখদূম সাহেবের প্রকৃত পরিচয় সন্ধান করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। একজন বুজর্গ হিসাবেই তাঁহার সমাধি নির্মাণেব মাধ্যমে নিজেদের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি তখন তাঁহার পরিচয়াদি সংগ্রহ করিতেন। উক্ত স্মারক লিপিটিতে নিশ্চয়ই তাঁহার উল্লেখ থাকিত। তিনি কেবল 'শাহ দরবেশ' হিসাবে লিপিটিতে হজরত মখদূমকে সম্বোধন করিয়াছেন। অথচ ফারসী তায়েদাদে হজরত শাহ মখদূম 'রূপোশ' নামের উল্লেখ রহিয়াছে এবং এই নামে আজও তিনি 'শাহ মখদূম' সাহেবের দরগা, হিন্দুর মখদূম বাবা ইত্যাদি নামে অভিহিত।

হজরত শাহ মখদূম রূপোশের আভিধানিক অর্থ-মস্তকোপরি বস্ত্রাবৃত ধর্মনেতা বা ধর্মাচার্য (মখদূম অর্থে =ধর্মনেতা বা ধর্মের পৃষ্টপোষক, রূপোশ অর্থে = বস্ত্রদ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত; অন্য অর্থে-আত্মগোপন করিয়া থাকা)। আবার সূফী জগতে মখদূম বা মখদূমী নামে একটি শাখা বা সেল-সেলা আছে। এই সেলসেলার সূফীগণ সাধারণত: চিস্তিয়া তরিকাভুক্ত। বিখ্যাত ধর্মনেতা বা ধর্মের পৃষ্ঠপোষক আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবে

* স্থানীয় সরকারী কলেজ, শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ, সরকারী মাদ্রাসা, দরগাপাড়া, শেখপাড়াও সিপাইপাডা এই দরগার ভূ-সম্পত্তিব উপর অবস্থিত। ইহাব বর্তমান আয় প্রায় ছয় (৬,০০০) হাজার টাকা।

পাঠান আমলে পাক-ভারতে ইঁহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। আধ্যাত্মিক ক্ষমতানুসারে তাঁহারা উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়া বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িয়া ইস্‌লামিক তাহজীব ও তমদুনকে সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ইঁহারা অধিকাংশই জালালী ফকির নামে প্রসিদ্ধ ও সুহরাওয়ার্দী সেলসেলাভূক্ত ছিলেন। ইঁহারা সাধারণতঃ মস্তকে কাল রুমাল অথবা একপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া মুখমণ্ডল ঢাকিয়া রাখিতেন। তাঁহারা হস্তে হজরত মহাম্মদের নামাঙ্কিত এক প্রকার রক্ষা কবচ বা কবচ ধারণ করিতেন। অধিকন্তু একটি বাঁশীও ব্যবহার করিতেন। কখন কখন কাহার কাহার বাড়ীতে ফুৎকার দিয়া মঙ্গল সূচক ধ্বনী দিতেন*। দক্ষিণ ভারতে অনন্তপুর জেলার 'পিনুকুণ্ড*।' নামক স্থানে ইঁহাদের আড্ডাস্থল সেখানে তাঁহারা প্রত্যেক বৎসরে জমাদিউসসানীর প্রথম দিনে প্রদেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী ফকিরদের সহিত একত্রীভূত হইতেন এবং দুই বৎসরের জন্য ধর্ম প্রচারার্থে এক এক জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত হইতেন[৮৬]।

এই শাখার আদি গুরু বিখ্যাত মীর সৈয়দ জালাল উদ-দীন শাহ সুর্‌খপোশ বুখারী (জন্ম ইং ১১৯২- মৃত্যু ১২৯১)। ইনি ছিলেন মুলতানের বিখ্যাত হজরত বাহা উদ-দীন জাকারিয়া অন্যতম শিষ্য। হজরত জালাল উদ-দীন বুখারাতে জন্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রকাশার্থে ভারতে আগমন করিয়া 'সিন্ধু ও শতদ্রুর' মধ্যবর্তী উচ্চ[৮৭] (Uchh) নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার বংশাবলী সিন্ধু দেশে এখনও সৈয়দ বুখারী নামে প্রসিদ্ধ। সৈয়দ জালাল উদ-দীন একজন বিখ্যাত ধর্মনেতা ও আধ্যাত্মিক যোদ্ধা ছিলেন। সিন্ধুবাসীরা তাঁহাকে সিন্ধুর আমীর রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং আজও তাঁহার বংশধরেরা সিন্ধুর আমীররূপে সম্মানিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বিখ্যাত মিঃ আর্ণও (Arnld) বলিয়াছেন যে, সৈয়দ জালাল উদ-দীন ছিলেন পুরুষানুক্রমিক সূফীদের গুরু এবং ইসলাম প্রচারকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক ও একজন কামেল দরবেশ। তাঁহার দৌহিত্র অথবা পৌত্র হজরত জালাল আহমদ কবীর (মৃত্যু ইং ১৩৮৪ সাল) ছিলেন তাঁহার অন্যতম শিষ্য। তিনি সাধারণতঃ মখদূম্-ই-জাঁহানীয়া জঁহাগস্ত বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

সিন্ধু ও শতদ্রু

যাহা হউক, প্রাগুক্ত জালালী শাখার মীর সৈয়দ জালাল উদ-দীন সুর্‌খ্‌পোশ বুখারী মখদূম্ বা মখদূম-ই নামে একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার দৌহিত্রকে গদ্দিনেশীন করেন এবং তাঁহার উপর এই অছিয়ৎ করিয়া যান যে, "যিনি (শরীয়ৎ, হকিকৎ, তরিকৎ ও মারেফৎ) ধর্ম শাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতায় শীর্ষ স্থানীয় হইবেন তিনিই সূফীবাদের এই (মখদূম) সর্বোচ্চ পদের অধিকারী হইবেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে তিনি সকল শ্রেণীর সূফীদের সম্মান করিবেন এবং প্রত্যেক শাখার (চিস্তিয়া, কাদ্‌রিয়া, নক্‌শবন্দয়া ও মুজাদ্দাদিয়া) শিষ্য প্রস্তুত করিবেন। তাঁহা পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম প্রচার

৮৬. Khwaja Khan's stadies is Tasawaf. P. 155.

* বর্তমানে এই বাঁশী ব্যবহারকারী এক শ্রেণীর ফকির বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভুম প্রভৃতি জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়। রাজশাহীতে হিনপুর কালী পীঠে কোন কোন সেবায়েত মহিষের 'সিং' এর অনুরূপ বাঁশী ব্যবহার করে ও মঙ্গল ধ্বনী দেয়। মেলার মৌশুমে বগুড়ার সুলতান বলখীর মাজারে লাল রুমাল পরিহিত এক শ্রেণীর ফকিরের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

৮৭. Memoirs of Humayun P 23 and also vide Edinburgh Gazetteer

করিবেন। প্রয়োজন হইলে পুস্তকের দোকানে (Book Shops) যাইয়াও ধর্মের কথা বলিবেন যদিও সেখানে তাঁহার ভ্রমণ স্বার্থক হয়[৮৮]।"

আমাদের আলোচ্য হজরত শাহ্ মখদূম্ রূপোশ উক্ত জালালী শাখার একজন কামেল মখদূম্ ছিলেন। ইঁনি হয়ত কৃষ্ণাম্বরপরিহিতপাগড়ি বিশোভিত হইয়া মুখমণ্ডল ঢাকিয়া থাকিতেন। অথবা হয়ত বিশেষ কোন বিশোভিত হইয়া মুখমণ্ডল ঢাকিয়া থাকিতেন। অথবা হয়ত বিশেষ কোন কারণ বশতঃ তিনি এখানে আত্মগোপন করিয়া ছিলেন[৮৯]। তাঁহার তিরোভাবের পর আলীকুলী বেগ কর্তৃক সমাধি পুনঃনির্মিত হইলে তখন হইতে উহা দরগা রূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তৎপূর্বে তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ 'বাঘা' প্রভৃতি স্থানের পীর আউলিয়ার কথা বহু আগে হইতেই ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। বাঘা হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র ২৫ মাইল। ইং ১৬০৯ সালে বাঘায় আগত বিখ্যাত পর্যটক[৯০] জনৈক আবদুল লতিফের ভ্রমণ বৃত্তান্তে দরগাপাড়ার কোন উল্লেখ নাই। অথচ এই আবদুল লতিফ মাসাধিকাল 'আলাইপুর' ছাউনীতে অবস্থান করিয়া এতদঞ্চলের বহু ঘটনাবলীর ও পীর আউলিয়ার দরগা জিয়ারৎ প্রভৃতি কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পদ্মার তীরস্থ 'আলাইপুর' ছাউনী হইতে দরগাপাড়ার দূরত্ব মাত্র ১৮।২০ মাইল; আলাইপুর, বাঘা ও দরগাপাড়া দক্ষিণ পূর্বমুখী পদ্মার বাম তীরে অবস্থিত। সুতরাং এক্ষেত্রে মখদূম রূপোশ সিলেটের হজরত শাহ জালাল ও পাবনার শাহ মখদূম্ শহীদের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ইঁহারা চতুর্দ্দশ শতকের ধর্মাচার্য্য। এই যুগে জালালী শাখার বহু মখদূম্ (ধর্মনেতারা) পাক-ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচারে আগমন করিয়া আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। সমসাময়িক সূফী সাধনার ইতিহাসে উহার উল্লেখ আছে। বাঙলার বিভিন্ন জেলায় মখদূমনগর বা মখদূমপুর নামগুলি এই যুগের স্মৃতি বহন করিতেছে। বঙ্গ বিজয়ের ইঙ্গিত দাতা বিখ্যাত হজরত শাহ মখদূম্ জালাল উদ-দীন তবরেজী (মৃত্যু ইং ১২২২ সাল) ইঁহাদের অন্যতম ও অগ্রদূত ছিলেন। অধুনা কোন কোন লেখক বঙ্গে ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে জালাল উদ-দীন তবরেজীর পরিচয় দিয়া থাকেন কিন্তু, আসলে তিনি তবরেজী নহেন– হজরত শাহ জালাল মুজার্রদ-ই-য়মনী। কারণ মখদূম্ জালাল উদ্-দীন তবরেজী ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগের ধর্ম প্রচারক ছিলেন।

জালাল উদদীন তবরেজী ও ইবনে বতুতা

গৌড়বঙ্গের স্বাধীনতার প্রথম প্রয়াস চলিতেছে। তখন একদল সূফী (ফকিরেরা) গৌড় (লখনৌতি) সাঁতগাও (সোদকাওয়াঙ বা বর্তমানের সপ্তগ্রাম) ও সোনার গাঁও এই তিনটি প্রশাসনিক কেন্দ্রে স্থায়ী আস্তানা করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচার করিতেন। স্বাধীন বঙ্গের প্রথম নায়ক ফকর উদ-দীন মুবারক শাহ্ এই সব ফকিরদিগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। এমন কি তিনি 'শায়দা' নামক এক সূফীকে সাতগাঁওয়ের নায়েব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'শায়দা' সুযোগ বুঝিয়া স্বাধীন হইবার উদ্দেশ্যে ফকর উদ-দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার পুত্রকে হত্যা করেন। এই খবর শুনিয়া ফকর উদ-দীন সূকায়দা ও তাঁহার দলকে বন্দী করিয়া আনিবার আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশ

৮৮. Sufi saint and Shrines in India P 238; and also vide Dr Titus in Indian Islam

৮৯. রূপোশের অর্থ–আত্মগোপনকারীও হয়। Vide the concis Dictionary ফারসী শব্দ P. 802

৯০. Vide-J. A S B; I, No. 1, P 108, 1904

প্রতিপালিত হইয়াছিল। শায়দা ও বিদ্রোহীদের শিরচ্ছেদ হইয়া সুলতান ফকর উদ-দীনের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। ইহাতে বাঙলায় এ বিরাট সংখ্যক ফকির নিহত হইয়াছিল। ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তে উহার উল্লেখ আছে। একটি জনশ্রুতি আছে যে, রাজশাহী গোদাগাড়ী থানার 'শায়দাপুর' গ্রামটি বিখ্যাত সূফী 'শায়দার' স্মৃতি বহন করিতেছে।

যাহা হউক সুলতান ফকর উদ-দীনের আদেশে ফকিরেরা বন্দী হইতে থাকিলে তখন বহু ফকির প্রাণ ভয়ে উল্লিখিত প্রশাসনিক কেন্দ্রত্রয় হইতে বাঙলার বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করিয়া ছিলেন। আমাদের আলোচ্য শাহ হজরত মখদূম রূপোশ এই সময়ের একজন প্রভাবশালী ফকির হইলেও হইতে পারে। রূপোশের অর্থ আত্মগোপনকারী; হজরত মখদূম্ চতুর্দ্দশ শতকের একজন ধর্মাচার্য্য ছিলেন; স্থানীয় কয়েকটি দৃষ্টান্তে তাঁহার আগমন ও তিরোভাবকাল অনুমান করা যায়। আলীকুলী বেগ রচিত দরগার বর্তমান লিপিটি পাঠান আমলের শেষ অধ্যায়ের বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহার পাঠোদ্ধারকারী বিখ্যাত মৌঃ সমস উদ-দীন আহমদ তাঁহার লিপিমালা গ্রন্থে[৯১] বলিয়াছেন যে, "লিপিটির প্রকাশ ভঙ্গী মোঘল আমলের প্রাথমিক যুগের প্রকাশ বঙ্গীর অনুরূপ (The style of writing is Naste'liq which is represented in the early Mughal period)। এতদব্যতীত মখদূম্ সাহেবের সমাধি সৌধের গঠনরীতি গৌড়ের পাণ্ডুয়ার (অপভ্রংশে পাঁড়ুয়া) এক লাখী সমাধি সৌধের অনুরূপ। ইহার প্রতি কোণের পর একটি করিয়া চূড়া (Turret) ছিল। এইরূপ গঠন প্রণাল প্রাক্ মোঘল যুগে দৃষ্ট হয়। পাণ্ডুয়ার এক লাখী সমাধি সৌধ পাঠান আমলের একটি চমৎকার স্থাপত্য নিদর্শন। অধিকন্তু, দরগার হুজরাখানাও প্রাক্ মোঘল যুগের গঠন প্রণালীর একটি নিদর্শন বলিয়া অনুমিত। এইগুলি বিবেচনা করিয়া পাঠান আমলের শেষ অধ্যায়ের কোন এক সময়ে শাহ মখদূমের আবির্ভাব ও তিরোভাবকাল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

যাহা হউক, আলোচ্য শাহ্ দরবেশ মখদূম্ আউলিয়াকে চতুর্দ্দশ শতকের এতদঞ্চলের ইসলাম প্রচারক ধরিয়া লইলে এই শতকের গোড়ার দিকে কোন এক সময়ে দরবেশকে কেন্দ্র করিয়া বুয়ালিয়াতে 'ইসলামী অনুশীলনের প্রথম যে ভিত্তি পত্তন হইয়াছিল–ইংরেজ আমলের পূর্ব পর্য্যন্ত তাহার আলোকরশ্মি শনৈঃ শনৈঃ জমকাইয়া উঠিতেছিল। ইংরেজ অধিকারের পর দরগার মদদমাস রক্ষক তথাকথিত খাদেমদের অত্যাচারে উহার চারিপার্শ্বে। ধর্মচর্চ্চার আলো কিছুটা স্তিমিত হইয়া পড়িলেও যে টুকু শিখা শাহ মখদূম্ আউলিয়ার জালালী কৃপায় জ্বালিয়াছিল তাহার সামান্যতম স্ফুলিঙ্গ হইতে আজ পাকিস্তান যুগে উহার দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হইয়াছে। এই সত্য স্বীকার করিয়া লইতে কোন রকম সঙ্কোচ বোধ হয় না।

বুয়ালিয়ার মুসলিম কৃষ্টি সভ্যতার লিখিত কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। পুরুষানুক্রমিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে যতদূর অবগত হওয়া যায়, হজরত মখদূম্ আউলিয়ার আধ্যাত্মিক জ্যোতি পরবর্তীকালে এখানকার মুসলমান অধিবাসী ছাড়াও এতদঞ্চলের হিন্দু সমাজের উপরও যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল তাহার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত স্থানীয় মসজিদ, দরগা, বিবির বাংলা, মহর্রমের আখড়া প্রভৃতিতে প্রদীপ জ্বালান,

৯১. Inscriptions of Bengal Vol. IV PP. 271-74

শিন্নি মানৎ, অন্নপ্রশনে শিশুর মুখে অন্নদান, বিবাহে নববধূর সাষ্টাঙ্গে মাথা নোওয়ান, জুম্মাবারে পীড়িতদের বুকে ঝাড়ফুক দেওয়া, আপদ বিপদে ত্রাণকর্থা রূপে মখদূম্ বাবাকে সাক্ষী করা ইত্যাদি হিন্দুরীতি হইতে বোঝা যায়। এখনও এই সব রীতি স্থানীয় হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে। তৎকালে এই সব হিন্দুরীতি সাধারণ মুসলমান সমাজেও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আজ পাকিস্তানের শিক্ষিত মুসলমান সমাজে এই সংস্কারের ধারা কিছুটা ক্ষুন্ন হইলেও অশিক্ষিত মুসলমান সমাজে উহার প্রভাব অপরিবর্তিত রহিয়াছে। শাহ মখদূমের কবরে 'চিরাগী' দেওয়া, মখদূমের উদ্দেশ্যে সাদা মোরগ ছাড়িয়া দেওয়া, কালীর পাঁঠার ন্যায় এখানে ষাঁড় ও পাঁঠা দেওয়া, বন্ধ্যা মেয়েরা সন্তানাকাক্ষী হইয়া ফকিরের কবরের ফুলধূলা খাওয়া। সন্তান জন্মিলে জোড়া খাসী কাটা, হিন্দুর শিবৰঙ্গ পূজার ন্যায় এখানে কৃষ্ণ প্রস্তরে কোল দেওয়া ইত্যাদি কত কি। পাকিস্তান যুগে এই সব হিন্দু রীতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এই যা আশ্চর্য্য।

উল্লিখিত বিষয়ে আর দীর্ঘালোচনা করিয়া পাঠক সমাজের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না। শাহ মখদূম্ আউলিয়াকে কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় মুসলিম জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সাধনায় 'বুয়ালিয়া' এতদঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের কৃষ্টিগত ঐক্যের মাধ্যম হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। আজিকার রাজশাহী শহরের কয়েকটি সুসংবদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিষয়টির গুরুত্ব ও সত্য সম্বন্ধে বিন্দু মাত্র সন্দেহ থাকে না। বুয়ালিয়ার পত্তনকাল হইতে অষ্টাদশ শতকের শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত এখানে হিন্দু কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের কোন চিহ্নাবশেষ পাওয়া যায় না, যেমন মুসলমানের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের চিহ্নাবশেষ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে জনশ্রুতি মূলক কয়েকটি তন্ত্র মন্ত্র হিন্দু মঠ মন্দির স্থাপিত হওয়ার বিষয় অবগত হওয়া গেলেও তাহাতে আস্থা স্থাপন করিবার মত কোন উপাদান নাই। যদি তৎকালে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য হিন্দু প্রতিষ্ঠান থাকিত রাজশাহীর অতীত বিবরণাদিতে তাহার উল্লেখ থাকিত। বিংশ শতকের কয়েকটি বিবরণে হিন্দু জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত কেবলমাত্র মান্দা ও খেতুরের কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইং ১৮২৫ সালে রাজশাহী জেলার সদর দপ্তর বুয়ালিয়াতে স্থানান্তরিত হইলে হিন্দুকৃষ্টি সংস্কৃতির প্রচারার্থে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আগের অধ্যায়ে ইংরেজ আমলে উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষেত্রে আজ একথা এক বাক্যে স্বীকার করিতে হয় যে, ইংরেজ আমলে 'নাটোর' যেমন নাটোর-রাজের ঐশ্বর্য্যে লালিত পালিত অসংখ্য নট নটিতে বিলাসময়ী হইয়া গড়িয়া উঠিয়ছিল তেমনই পাঠান- মোঘল আমলে কম্বল পরিহিত একজন ফকিরের আস্তানাকে কেন্দ্র করিয়া 'বুয়ালিয়া বন্দর' গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্থানীয় প্রাচীন মুসলমান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি উহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ফকিরের আস্তানা আজ শহরে উন্নীত ও শ্রীসমৃদ্ধিতে মর্য্যাদা মণ্ডিত।

যাহা হউক, অষ্টাদশ শতক হইতে উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত রামপুর-বুয়ালিয়াতে মুসলিম প্রাধান্য অক্ষুণ্ন ছিল। তারপর উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইতে বিংশ শতকের আরম্ভকাল পর্য্যন্ত মুসলমানরা নানাভাবে পর্য্যদুস্ত হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে বুয়ালিয়াতে আগত বিত্তশালী শিক্ষিত হিন্দুদের সহিত অশিক্ষিত অর্দ্ধ-শিক্ষিত ও অর্থনৈতিক-বিপর্য্যস্ত মুসলমানগণ আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া স্বাধিকার হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কোন অবস্থায়ই তাহারা বিত্তশালী হিন্দু ও জমিদারদের নাগপাশ ছিন্ন

করিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই। এমন কি মুসলমানরা তাহাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও অর্থনৈতিক কারণে ঠিক ভাবে পরিচালিত করিতে পারে নাই। ফলে সেই সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী সুচতুর এক শ্রেণীর গোঁড়াপন্থী হিন্দুগোষ্ঠি সুকৌশলে তাহার শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু, তখন একদল মুসলমান মনের বলে বলীয়ান ছিল বলিয়াই ইং ১৮৭৪ সালে কতিপয় মুজাহেদ ও আলেম ঐক্যবদ্ধ হইয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়া পুনরায় নিজেদের কৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের বৈজয়ন্তি দাঁড় করাইবার প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন। এই ভাবে কিছুকাল স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুদের সহিত মুসলমানদের প্রবল প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ চলিয়াছিল। তারপর বিংশ শতকের শুরু হইতেই মুসলমানরা ধীরে ধীরে নিজেদের পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। উনবিংশ-বিংশ শতকে বুয়ালিয়াতে বিত্তশালী হিন্দুদের আগমন ও প্রভাব বিস্তারের ফলে মুসলমানদের যে তিনটি ধর্মানুষ্ঠান কেন্দ্র (মসজিদ) ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। কিছু সংখ্যক মোজাহেদ মুসলমান সেই ধ্বংসস্তূপের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া ছিল বলিয়াই তো আজ কাদিরগঞ্জের 'শাহী মসজিদ' ও সাহেব বাজারের 'বড় মসজিদ' উদ্ধার ও পুনঃস্থাপন সম্ভবপর হইয়াছে। দরগার মসজিদের ইতিহাস স্বতন্ত্র। প্রথম হইতেই শাহ দরবেশের কিরামৎ স্থানীয় হিন্দুদের মনে রেখাপাত করিয়াছিল। সেই জন্য স্থানীয় হিন্দুরা পুরুষানুক্রমিক দরগা বাড়ীর 'মসজিদ' ও 'হুজরাখানার' প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইয়া আসিতেছিল। যদিও সেখানে তাহাদের কোন প্রতিপত্তি ছিল না। আমরা এখানে সেই সব প্রাচীন মুসলিম ঐতিহ্যবাহী কয়েকটি কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করিব। যদিও তাহার বিস্তৃত তথ্য নানা কারণে উদ্ধার করা সম্ভব পর হয় নাই তবুও যাহা উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে ইতিহাস গঠনের পক্ষে সেই সব প্রমাণ পঞ্জী একেবারে নগন্য নয়।

হজরত রূপোশ শাহ মখদূম্ আউলিয়ার আস্তানায় অবস্থিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ সম্বন্ধে সন তারিখ সম্বলিত কোন কাগজ পত্র বা শিলালিপি পাওয়া যায় না। ইতিপূর্বে কোন লেখক এই মসজিদ সম্পর্কে কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। 'দরগার মসজিদ হিসাবে ইহা কথিত হয়। বর্তমানে প্রাচীর বেষ্টিত সমাধি প্রাঙ্গনের পশ্চিম পার্শ্বে

দরগার হুজরখানা ও মসজিদের পরিচয়

অবস্থিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ আছে। আমরা উহাকে শাহ মখদূমের 'হুজুরখানা' বা সাধন পীঠ বলিয়া অনুমান করিয়াছি। ইহার গঠন প্রণালীর দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই শ্রেণীর প্রাচীনতম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রাজশাহীর জন্য কোথাও আর দ্বিতীয়টি পরিলক্ষিত হয় না। এই যা ইহার বৈশিষ্ট্য। এই হুজরখানা রাজশাহীর মুসলিম কৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের একটি প্রাচীনতম নিদর্শন। সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। আমরা আরও অনুমান করিয়াছি যে, দরগার এই হুজরাখানাই বুয়ালিয়ার প্রথম মসজিদ। পরবর্তী কালে মুছল্লীদের সংখ্যানুপাতে যথাক্রমে 'বড় মসজিদ' (সাহেব বাজার মসজিদ) 'শাহী মসজিদ' দরগার মসজিদ' ও মেহেদীপুর (লক্ষীপুর মসজিদ) প্রভৃতি মসজিদ বিনির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

এক গম্বুজ বিশিষ্ট হুজরাখানাটির পশ্চিম দেওয়ালে একটি ক্ষুদ্র মেহরাব ও পূর্ব দেওয়ালে একটি ক্ষুদ্র প্রবেশ পথ ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের জানালা দরওয়াজা প্রভৃতি

নাই। ভিতরে দুই সারিতে ৮।১০ জন লোক নামাজ পড়িতে পারে এইরূপ পরিসর স্থান রহিয়াছে। ইহার উত্তর দক্ষিণ দৈর্ঘ্য প্রস্থ '১৪ ফুট; পূর্ব পশ্চিম প্রস্থ ১৩ ফুট ৭ ইঞ্চি; প্রবেশ পথের দৈর্ঘ্য ৪ ফুট ৩১/২ ইঞ্চি, উচ্চতা ১১ ফুট ৫ ইঞ্চি; গুম্বুজের উপরের পরিসর ১৫ ফুট ৯ ইঞ্চি।

দরগার তিন গুম্বুজ মসজিদের দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট; প্রস্থ ১৬ ফুট। ভিতরের পরিসরে দৈর্ঘ্য ৩৪ ফুট ৫ ১/২ ইঞ্চি; প্রস্থ ১০ ফুট ১০ ইঞ্চি। তিনটি মেহরাব। মধ্যবতীটি অপেক্ষাকৃত বড়। উত্তর দক্ষিণ দেওয়ালে দুইটি করিয়া চার চারিটি তাক ও একটি করিয়া দুইটি জানালা আছে। পূর্ব দেওয়ালে সমমাপের তিনটি প্রবেশ পথ এবং প্রবেশ পথের কপাটগুলি পরবর্তীকালে নির্মিত। দরগার এই মসজিদ প্রসঙ্গে একটি জনশ্রুতি এইরূপ জনৈক মুসলমান সওদাগর নদী পথে বিপদাপন্ন হইয়া হজরত মখদূমকে স্মরণ করেন।

তিন গম্বুজ মসজিদ

তিনি সেই বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়া এই তিন গুম্বজ মসজিদ নির্মান করিয়া দিয়াছেন। ইহা নওয়াবী আমলে নির্মিত, বলিয়া জনরব আছে। আজ হইতে ৪০/৫০ বৎসর পূর্বে পর পর দুইটি বারান্দা ও মিনারটি নির্মিত হয়। এক বিঘা পরিমাণ ভূমির উপর চারি কোণে চারিটি ইষ্টক নির্মিত স্তূপ ব্যতীত অপর তিনটি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। রাজশাহীর স্বনামধন্য ডেপুটী কমিশনার জনাব পি, এ, নাজিরের (C S. P) দৃঢ় হস্তে দরগার পুনঃসংস্কার ও সদর তোরণটি নির্মিত হইয়াছে।

সমাধি সৌধের ভিতরের দৈর্ঘ্য ১৭ ফুট ৩ ১/২ ইঞ্চ; প্রস্থ ১৭ ফুট ৩ ১/২ ইঞ্চি। সমাধির দৈর্ঘ্য ৯ ফুট ৭ ইঞ্চি ' প্রস্থ ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি। সমাধির পশ্চিম ধারে জনৈক ভক্ত

সমাধির মাপ

শিষ্যের সমাধি বলিয়া জনশ্রুতি আছে। বাং ১৩০৫ সালে মসজিদের সম্মুখস্থ দরগার তোরণটি নির্মিত হয়। ইহাতে আয়েতে কোরআন খোদিত একটি প্রাচীন লিপি আছে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বর্গীর হাঙ্গামার সময় মুর্শিদাবাদ হইতে আগত এক দল মোহাজের এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাহাদের প্রয়োজনের তাগিদে একটি তিন গুম্বজ মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। তাহাদের বসতি বিস্তারের পর এই স্থান মেহেদীপুর নামে খ্যাতি লাভ করে। প্রাচীন কাগজ পত্রের উহাব স্বাক্ষর রহিয়াছে। পরবর্তী কালে এই স্থান হিন্দু প্রাধান্য হওয়ার মেহেদীপুরের স্থলে লক্ষীপুর নাম করণ হইয়া থাকিবে।

মেহেদীপুর মসজিদ (লক্ষীপুব)

এই নামেই ইহা বর্তমানে পরিচিত। সম্প্রতিকালে পুনরায় আর একদল মুর্শিদাবাদী মোহাজের আসিয়া এখানে বসতি স্থাপন করিয়াছে। বন বাদাড় কাটিয়া তাহারা তাহারা প্রাচীন মসজিদটির পুনসংস্কার করিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৩৭ /১২ ফুট ' প্রস্থ ১৫ ফুট; উচ্চতা ১৫ ফুট। চারি কোণে চারিটি চূড়া, তিনটি প্রবেশ পথ ও তিনটি মেহরাব প্রভৃতি আছে। মধ্যবর্তী প্রবেশ পথের উপরি ভাগে এক খন্ড কৃষ্ণ প্রস্তরে উৎকীর্ণ আশীষ বাণী স্বরূপ একটি দোওয়া হজরত আলীর (রা:) শানে বর্ণিত আছে। ভিতরে দুই সারিতে প্রায় ৪০ জন লোক নামাজ পড়িতে পারে। মুছল্লীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার বর্তমান কালে বারান্দা সংযোজিত করা হইয়াছে। প্রথম বারান্দার দুই পার্শ্বে দুইটি পাকা বাঁধা কবরের চিহ্ন বিশেষ দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি এই মসজিদের জন্য একটি মিনার নির্মিত হইয়াছে।

এই জুম্মা মসজিদ সাধারণত : 'বড় মসজিদ বা 'সাহেব বাজার মসজিদ' নামে খ্যাত। অষ্টাদশ শতকের প্রথমের দিকে এই মসজিদ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। বিগত একটি ভূমি জরিপ নকশাতে এই মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায়। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্থে বুয়ালিয়া টাউন হিন্দু প্রধান হইয়া উঠিলে এই মসজিদটি একেবারে নিশিহ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইং ১৯১০/১২ সালের দিক জনৈক সাধকের প্রাণপণ চেষ্টায় উহার শেষ স্মৃতিটুকু জাগিয়া থাকে। তারপর কালের বিবর্তনে পুনরায় উহার পূর্ব গৌরব ফিরিয়া আসিয়াছে। মাত্র একটি মেহরাব হইতে বর্তমান মসজিদের রূপায়ন সম্ভবপর হইয়াছে।

জুম্মা মসজিদ (সাহেব বাজাব)

বর্তমানে রাজশাহী জেলার পাকা মসজিদগুলির মধ্যে ইহা একটি বিশিষ্ট মসজিদ। ইহা মোঘলাই প্যাটার্ণে নির্মিত হইলেও কারুকার্য্যের রীতি সম্পূর্ণ আধুনিক। এই প্যাটার্ণের মসজিদ আধুনিক যুগে উত্তর বঙ্গে ইহাই প্রথম। মরহুম আবদুল হাকিম কোরায়েশী (পূর্বতন কোষাধ্যক্ষ রাজশাহী বিশ্ব বিদ্যালয়) ও জনাব আমীর আলী প্রমুখ মধ্য প্রাদেশের (ভারতের) কোন একটি মসজিদের নকশার অনুকরণে ইহার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা এই মসজিদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বহু ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

উত্তব বঙ্গে আধুনিক প্যাটার্ণের মসজিদ

অধুনা এই মসজিদের কিছু অভিনব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্তমানে মেহরাব ব্যতীত সেখানে আর কোন চিহ্নাবশেষ ছিল না। তখন উক্ত মেহরাবকে কেহ কেহ রেশম কুঠিয়ালদের শাস্ত্রী গৃহ (Tower) বলিয়া মনে করিত কেহবা একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া দাবী করিত। আর প্রবীন ব্যক্তিরা বলিতেন যে, সেখানে তিনটি বট বৃক্ষ ছিল– সেই বৃক্ষের পাদদেশে 'পেরেক' বিশিষ্ট দোলনায় কতিপয় সন্ন্যাসী উলঙ্গাবস্থার কখন বা কৌপীণ পরিহিত অবস্থায় শয়ন করিয়া থাকিত। ইত্যাদি নানা কথা ও কাহিনী শোনা যাইত। কিন্তু ইং ১৯২১ সালে জনৈক সাধক সদাই ফকিরের শিষ্য মরহুম খোঁয়াজ আহমদ* উক্ত মেহরাবকে কেন্দ্র করিয়া সেখানে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিলে স্থানীয় কতিপয় হিন্দু এবং মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ড কর্তৃপক্ষ আপত্তি করেন। কিছুদিন যাবৎ ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বহু বাদ প্রতিবাদ চলিতে থাকে। এমন কি খোঁয়াজ শেখকে ৩.৪ নম্বর ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় পড়িতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত খোঁয়াজ শেখ দুই মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অবশেষে ইং ১৯২৩ সালে রাজশাহীর সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্ সরেজমিনে তদন্ত করিয়া সেখানে মসজিদ পুনঃনির্মাণের জন্য খোঁয়াজ শেখের পক্ষে রায় দান করেন+।

আবিষ্কার কাহিনী

রাজশাহী কালেক্টারীর মহফুজখানায় (রেকর্ড রুম) রক্ষিত ইং ১৮৪৯ সালের একটি সার্ভে নকশাতে এখানে তিন গুম্বজ বিশিষ্ট একটি মসজিদের নকশা অঙ্কিত আছে। উক্ত নকশার দাগ নম্বর ১৫১। ১৬ শত গজের ৮ বিঘা ভূমির উপর এই মসজিদের চৌহদ্দী নির্দিষ্ট ছিল। উক্ত দাগ নম্বর অঙ্কিত তিন গম্বজ মসজিদ সত্য হইলে বর্তমানের

* ইনি রামচন্দ্রপুর নিবাসী জনাব মোঃ দানেশ আহম্মদের পিতা ছিলেন।
+ খোঁয়াজ আহম্মদের মামলার যাবতীয় কাগজপত্র তদীয় পুত্রের নিকট রক্ষিত আছে।

মসজিদের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশের বাড়ীগুলি এই মসজিদের ভূমির অন্তর্গত বলিয়া নির্দিষ্ট করা যায়। পূর্ব ধারে বারাহী নদীর গতিপথ বর্তমানে শহরের পয়ঃপ্রাণীল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইং ১৯১৮–১৯ সালের নকশাতে এই মসজিদের উল্লেখ নাই। "স্থানীয় হিন্দু রঞ্জিকা' পত্রিকায় এই মসজিদের আলোচনা ও স্বীকৃতির উল্লেখ আছে ৯২।

ইং ১৯২৭ সালে এই মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। রাজশাহী জেলার দানশীল ব্যক্তিদের মুক্ত হস্ত দানে ইং এই মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। রাজশাহী জেলার দানশীল ব্যক্তিদের মুক্ত হস্ত দানে ইং ১৯৫৪ সালে উহার নির্মাণ কার্য্য সুসম্পূর্ণ হয়। ইহা একটি দ্বিতল মসজিদ। চারিটি মিনার এক গুম্বজ বিশিষ্ট নাটোর রাস্তার পার্শ্বে শহরের নাভিস্থলে ইহা অবস্থিত*।

ভিত্তি

কাদিরগঞ্জে অবস্থিত এই দ্বিতল জুম্মা মসজিদ 'শাহী মসজিদ' নামে পরিচিত। পূর্বে সেখানে একটি তিন গুম্বজ বিশিষ্ট জুম্মা মসজিদ ছিল, উহা বাদশাহী যুগের মসজিদ বলিয়া দাবী করা হইত। আজও সেই প্রাচীন নামে অর্থাৎ 'শাহী মসজিদ' নামে খ্যাত। এই নামের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ইহা একটি প্রাচীন মসজিদ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বুয়ালিয়াতের মুসলমানের অবনতির সুযোগ লইয়া স্থানীয় কতিপয় অমুসলমান উহার শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু, আজাদী আন্দোলনে স্থানীয় মুসলমানগণ সচেতন হইয়া উঠিলে সৌভাগ্যক্রমে মসজিদটির চিহ্নবিশেষ বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা পায়। রাজশাহী জেলার তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আবদুল মজিদ (সি, এস, পি,) সেই বিস্তৃত অবশেষ হইতে বর্তমান মসজিদটির প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে সাহায্য করেন।

শাহী মসজিদ
(কাদিরগঞ্জ)

পাকিস্তান লাভের কয়েক বৎসর পূর্বে এখানে আড়াই বিঘা ভূমির মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত চারিটি দেওয়াল বিশিষ্ট এই মসজিদের অস্তিত্ব আবিস্কৃত হয়। বর্তমানে ১৯ কাঠা ভূমির উপর এই মসজিদটি অবস্থিত।

মহফুজখানায় রক্ষিত এই মসজিদের চারিপার্শ্বের নিজস্ব ভূমির দাগ নম্বর ও খতিয়ান নিম্নে প্রদত্ত হইল।

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | – | দাগ | ৩০৭৫ | ১ | – | খতিয়ান | ১১২৪ |
| ২ | – | – | ৩০৮৪ | ২ | – | – | ১৯০৯ |
| ৩ | – | – | ৩০৮৫ | ৩ | – | – | ১২২৪ |
| ৪ | – | – | ৩০৮৬ | ৪ | – | – | ১৪১০ |
| ৫ | – | – | ৩০৮৭ | ৫ | – | – | ১৪০৪ |
| ৬ | – | – | ৩০৮৮ | ৬ | – | – | ১১২৩ |
| ৭ | – | – | ৩০৭০ | ৭ | – | – | ১১২৩ |

স্থানীয় মৌলবী ইশারতুল্লাহ মণ্ডল ও মৌঃ গোলাম কাদের প্রমুখ অগ্রণী হইয়া এই মসজিদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ইহার উদ্ধার কাহিনীর বহু ঘটনা আমাদের জানা

৯২–' হিন্দু রঞ্জিকা' ১২ই চৈত্র বাং ১৩২৩ সাল।

* এই মসজিদ পরিচালনা সমিতির বর্তমান সম্পাদক মোঃ হাজী আহমদ আলী নিকট মসজিদের একপ্রস্ত কাগজপত্র রক্ষিত আছে।

থাকিলেও বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার উল্লেখ নিস্প্রেয়োজন। তবে এতটুকু না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। সেই জন্য বলিতে হয়, স্থানীয় জনৈক খগেন্দ্র নারায়ণ প্রমুখ হিন্দু প্রকারান্তে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে নানাভাবে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন[৯৩]। কলিকাতার আনন্দ বাজারে' বহু অতি রঞ্জিত খবর ছাপা হইয়াছিল[৯৪]। আজাদে উহার প্রতিবাদ করা হইয়াছিল[৯৫]।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত এই মসজিদ স্থানীয় মুসলমানদের জুম্মা মসজিদ হিসাবে ব্যবহার হইয়া আসিতেছিল। পরবর্তী কালে এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হাতেম খাঁ পল্লীতে দুইটি মসজিদ স্থাপিত হয়। স্বাধীনতা লাভের কিছুকাল পূর্ব হইতে অত্র টাউনের মুসলমানদিগের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে। ক্রমশ: জন সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া আজ পাকিস্তান যুগে প্রায় ৪০টি জুম্মা মসজিদ এই শহরে দৃষ্ট হইতেছে। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত উপরে উল্লিখিত দরগাপাড়া, সাহেব বাজার, লক্ষীপুর ও বুয়ালিয়া* এই চারিটি মসজিদ তখনকার মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র ছিল। সভা-সমিতি-শালিস-দরবার দণ্ড-জরিমানা যতকিছু আবশ্যকীয় কর্তব্য সেখানে সমাধা হইত। তারপর বিত্তশালী জমিদার ও বর্ধিষ্ণু হিন্দুদের আগমন ও প্রভাব বিস্তারের ফলে মধ্যে কয়েক যুগ ধরিয়া এখানকার মুসলমানগণ নির্বিচারে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছিল। বাঙলার মুসলমানদের আত্মজাগরণের যুগে এক দল আলেম সম্প্রদায়ের আর্বিভাব হইল। তাঁহারা মুসলমানকে মনে প্রাণে কথায় কাজে খাঁটি করিয়া তুলিবার জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারা লৌকিক ইসলামকে তাড়াইয়া সেখানে শরীয়তে ইসলাম বা শাস্ত্রীয় ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করিলেন। স্বল্পকালের মধ্যে এই আত্মজাগরণের শিখা বঙ্গ আসামের প্রতিটি জেলায় ছড়াইয়া পড়িল[৯৬]। এই আন্দোলনের প্রভাব রাজশাহীতেও পড়িয়াছিল। তখন নগন্য সংখ্যক আলেম রামপুর-বুয়ালিয়া তথা মফঃস্বলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই আমরা দেখিতেছি উচ্চ-ইংরেজী শিক্ষা নিমিত্তে হিন্দু জমিদারদের হস্ত প্রসারিত হইয়া ইং ১৮৭৩ সালে রাজশাহী কলেজের সূচনা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই কলেজের পার্শ্বেই ইসলামিক উচ্চ-শিক্ষার নিমিত্তে ইং ১৮৭৪ সালে সিনিয়ার মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়া প্রমাণিত হয় যে, তখন বিত্তশালী মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য হইলেও ধর্ম বিশ্বাস আত্মত্যাগ ঐক্য ও সততায় তাঁহারা ছিলেন দুর্নিবার। তাই আমরা আজ দেখিতেছি একটি ভিত্তি মূল হইতে শত শত শিকড় গজাইয়াছে। নানা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। আজ যদিও তাহার সবগুলির সঠিক ও সুনির্দ্দিষ্ট ইতিহাস আমরা উদ্ধার করিতে পারি নাই। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে পর্য্যুদুস্ত মুসলমানগণ স্থানীয় হিন্দুয়ানী প্রভাবকে ছিন্ন করিয়া যাহা কিছু সম্পাদিত করিয়াছিলেন তখনকার দিনে তাহার মূল্য একেবারে নগণ্য ছিল না। আমরা আরও লক্ষ্য করিয়াছি যে, তাঁহারা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় সমাজ ব্যবস্থার আমূল উন্নতির জন্য নানা সভা সমিতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের কথা প্রচার করিয়াছেন। আবেদন নিবেদন জানাইয়াছেন। তাঁহারা স্বাধীকার

৯৩. 'হিন্দু রঞ্জিকা' প্রথম পাতা। ৪ঠা ভাদ্র, শুক্রবার ১৩৫৫।

৯৪. আনন্দ বাজার, রবিবার, আগষ্ট ২২। ১৩৫৫

৯৫. আজাদ–২১শে ভাদ্র, ১৩৩৫৫।

* বুয়ালিয়ার মসজিদটি এখন বিলুপ্ত প্রায়।

৯৬. 'বগুড়ার ইতিকাহিনী' পৃঃ ৪৩০।

অর্জন করিয়া তবে ছাড়িয়াছেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে 'রামপুর-বুয়ালিয়া' শহরের বিখ্যাত মৌলবী ইউসুফ আলী মির্জ্জা প্রমুখ সমাজ সংস্কারক ব্যক্তি কর্তৃক স্থাপিত (ইং ১৮৯১ সাল) 'আঞ্জুমান হেমায়েতে ইসলাম' নামক একটি সামাজিক সংগঠনের পক্ষ হইতে আবেদন মূলক একটি ছাপার অনুষ্ঠান পত্রে আমরা পূর্বোল্লিখিত মনোভাবের পরিচয় পাই। উক্ত সালের ১১ই ও ১২ই পৌষ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার রামপুর বুয়ালিয়া টাউনে হাতেম খাঁ মসজিদে একটি মহতী সভার অধিবেশনে রাজশাহী মুর্শিদাবাদ ও মালদহ প্রভৃতি জেলার বহু কর্মী সমবেত হন। এবং ন্যায় সঙ্গত উপায়ে মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ ও সেবামূলক কার্য্যের নানাবিধ পন্থা নির্দ্ধারণ ও অনুসরণ করাই ছিল এই সভার উদ্দেশ্য।

উক্ত সম্মেলনের স্বল্পকাল পরে বঙ্গীয় ওলামায়ে কেরাম ও কতিপয় উৎসাহী কর্মীর সমন্বয়ে 'নূরউল ইমান' নামক একটি সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির মুখপত্র স্বরূপ একটি মাসিক পত্র মির্জ্জা ইউসুফ* আলী প্রমুখ কর্তৃক সম্পাদিত হইত। মুসলমানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ও ইসলাম সম্মত জীবন ব্যবস্থার প্রচারই ছিল এই পত্রের মূখ্যতম লক্ষ্য।

ঊনবিংশ শতকের শেষ অর্দ্ধে পাক-ভারতে ইংরেজী উচ্চ শিক্ষা প্রচারের অগ্রদূত হিসাবে স্যার সৈয়দ আহমদ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাঁহার দুইটি প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। একটি 'আলীগড় কলেজ' অপরটি 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম শিক্ষা সমিতি' (All India Mahammadan Education Association)

হেমায়েতে ইসলাম

ইং ১৮৯৯ সালে কলিকাতায় সমগ্র ভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সমিতির এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সমগ্র বাঙলা দেশ হইতে প্রায় সহস্রাধিক প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন**। উত্তরবঙ্গের তদানীন্তন ইসলাম সেবীদের মধ্যে রাজশাহীর মৌঃ ইউসুফ আলী মির্জ্জা (সবরেজিষ্টার), মৌঃ চয়েন উদ-দীন আহমদ (নাটোর); পাবনার মৌঃ আজিজ মিছের, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বগুড়ার সৈয়দ নওয়াব-বাহাদুর নওয়াব আলী, মৌঃ সলিম উদ-দীন প্রধান (শিবগঞ্জ) প্রমুখ শিক্ষাবিদ যোগদান করিয়াছিলেন। তদানীন্তন বাঙলায় লাট বাহাদুর স্যার এনড্রুয়াজার (?) উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি (All Bengal Mahammadan Education Association) নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির পক্ষ হইতে বাং ১৩১০ সালের ২০শে চৈত্র শনিবার ও ২১শে চৈত্র রবিবার রাজশাহীর রামপুর বুয়ালিয়া শহরের কলেজ প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত মণ্ডপে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির এক বিরাট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়***। এই অধিবেশনে ১৫টি

কলিকাতায় অল ইণ্ডিয়া মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন

* এই পত্রিকা সংক্রান্ত কাগজপত্র তদীয় পুত্রদ্বয়েব নিকট রক্ষিত আছে।

** এই সম্মেলনের এক প্রস্ত ছাপান কাগজ পত্র হুগলী মোল্লাশিমলাব মরহুম মওলানা আবুল বায়ান আব্দুল ওয়াহেদ ফারুকী সাহেবেব বাড়ীতে রক্ষিত আছে। এতদব্যতীত মির্জা ইউসুফ আলীর (রাজশাহীতে) বাড়ীতে কিছু কিছু ছাপান অনুষ্ঠান পত্র দৃষ্ট হয়।

*** রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত এই প্রাদেশিক শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন ভারতের তদানীন্তন পারস্যের কনস্যাল মুর্শিদাবাদের বেগম ফেরদৌসী মেহেল গদ্দিনেশীন 'এর জামাতা মাননীয়–নিজাম-উল-মুলক খান বাহাদুর মির্জা সুজাত আলী বেগ। দ্বিতীয় অধিবেশনের দিনে এক জরুরী টেলিগ্রাম পাইয়া তিনি মুর্শিদাবাদ গমন করিলে সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন মুর্শিদাবাদের নওয়াব শামসুল হোদা।

গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের শিক্ষা বিস্তার তরান্বিত করিবার জন্য প্রত্যেক জেলাতে একটি করিয়া 'শিক্ষা তহবিল (District Education Fund) নামে একটি 'তহবিল' খোলার প্রস্তাবও অনুমোদিত হইয়াছিল[৯৭]।

রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলন মণ্ডপে ২৩শে চৈত্র সোমবার আর একটি সমিতি গঠন করিয়া উহার নাম দেয়া হয় 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি'। এই মিশনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, "অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মানব সমাজের মধ্যে পবিত্রতম

ইসলাম মিশন

সত্য সনাতন ইসলাম ধর্ম-ভাস্করের অত্যুজ্জ্বল স্বর্গীয় রশ্মির বিকীর্ণতা সাধন, ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিধর্মীদিগের অযথা আক্রমণ হইতে ইসলাম ধর্ম ও মোসলেম সমাজের রক্ষা বিধান এবং আবশ্যক মত আক্রমণগুলির প্রতি উত্তর প্রদান' ইত্যাদি হত চেতন মোসলেম সমাজের মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধি ও ধর্ম বিস্তৃতি এবং ইসলাম ধর্ম্মের সর্ব্ব প্রকারের উন্নতির চেষ্টা প্রভৃতি ... ... ... উদ্দেশ্যে বঙ্গ ভাষায় পুস্তিকা এবং পত্রিকা প্রকাশ করা[৯৮]।"

ঊনবিংশ শতকের বিপর্য্যস্ত মুসলমান সমাজকে সজাগ ও সংগঠিত করিবার জন্য ইং ১৮৮৪ সালে 'মোহামেডান এসোসিয়েশন'[৯৯] স্থাপনের মাধ্যমে যে প্রচেষ্টা চলিয়াছিল তাহাই ক্রমশ: ব্যাপক ও বিস্তৃত হইয়া ঊনবিংশ শতকে সমগ্র জেলাতে নানাবিধ শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। মুসলমানগণ এই আন্দোলনে শরীক হইয়া প্রাণবন্ত হইয়াছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়াছিল। তাহার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উপরে উদ্ধৃত ঘটনাবলী হইতে অবগত হওয়া যায়। বাঙ্গালী মুসলমানের আত্ম জাগরণের সূচনা হইতেই রাজশাহীব মুসলমানরা স্বকীয় প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টার পরিণতি স্বরূপ ইং ১৯০৭ সালে 'রাজশাহী আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম,' ইং ১৯১৮ সালে 'রাজশাহী মুসলমান শিক্ষা সমিতি', ১৩৩২ সালে 'খাদেমুল ইসলাম,' ইং ১৯২৯ সালে 'রাজশাহী মুসলিম ক্লাব', (Muslim Institute) প্রভৃতি জনকল্যাণ মূলক সামাজিক সংগঠনের জন্ম লাভ হয়। এই সব সামাজিক সংগঠনের জন্ম লাভ হয়। এই সব সামাজিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ আইনজীবী, ওলামায়ে কেরাম জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা আসিয়া জমায়েত হইয়াছেন, যুক্তি পরামর্শ করিয়াছেন। আত্ম জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের স্বাধীকার সম্পর্কে সচেতন হইয়াছেন। আন্দোলন, বিপ্লব দাবী দাওয়ার মাধ্যমে এক খণ্ড পৃথক ভূমির জন্য আওয়াজ তুলিয়াছিলেন। আজ পাকিস্তান সৃষ্টি হইয়া তাহাদের সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। তাই আমরা আজ দেখিতে পাই পাকিস্তান হাসিলের পর সেই সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি গঠনমূলক কার্য্যে বৃহত্তর গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য অধিকতর সজাগ ও সক্রীয় হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় সরকার ও জনগণের ঐক্য সাধনায় বহু নূতন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সমানে সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে।

বিংশ শতকের গোড়ার দিক হইতে পাকিস্তান সৃষ্টি পর্য্যন্ত আমরা এখানে 'রামপুর বুয়ালিয়ার' কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্ম কথা বলিব।

৯৭. ইসলাম প্রচারক পত্রিকা। ইং ১৯০৪ সাল। মে ও জুন সংখ্যা (বাণীকুঞ্জে 'সিরাজী লাইব্রেরীতে রক্ষিত)।

৯৮. ঐ ঐ ঐ

৯৯. Bengal District Gazetterr, Rajshahi P. 66

ইংরেজী ১৯০৬ সালে 'রাজশাহী মোহামেডান এসোসিয়েশনের' জন্ম লাভ হয়। প্রথম সভাপতি নাটোরের খান বাহাদুর এরসাদ আলী চৌধুরী ও সম্পাদক খান বাহাদুর ইমাদুদ্দীন। 'রাজশাহী সভার' অনুকরণে ইহা স্থাপিত হইলেও তখনকার দিনে মুসলমান সমাজের আমূল উন্নতি কল্পে ইহার ভূমিকা প্রশংসনীয় ছিল। জেলার গণ্যমান্য দুই শতাধিক লোক ইহার সদস্য ছিলেন[১০০]। এই সমিতির জন্য একটি পাকা বাড়ী নির্মিত হইয়াছিল। উহা পরে 'রাজশাহী বালিকা বিদ্যালয়কে দান করিয়া দেওয়া হয়*।

রাজশাহী মোহামেডান এসোসিয়েশন (১৯০৬ খ্রী:)

'রাজশাহী আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম' একটি শক্তিশালী জনসেবা সমিতি ছিল[১]। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি সরদার হাজী লাল মোহাম্মদ এবং সম্পাদক মৌলবী কফিল উদ-দীন আহমদ।

আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম (১৯১৪?)

রাজশাহী 'মুসলিম ক্লাব' প্রতিষ্ঠার আগে 'মোহামেডান সমিতি' ও 'আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম' এই দুইটি সমিতি রাজশাহীর গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানে ছাত্র ও যুবকবৃন্দের প্রবেশ নিষেধ ছিল না বটে কিন্তু শিষ্টাচারের খাতিরে তাহারা প্রায়শ: ভিড়িত না। তাহারা পৃথক একটি সমিতির প্রতিষ্ঠানের বিষয় বিবেচনা করিয়া কোন এক শুভ মুহূর্তের প্রতিক্ষা করিতেছিলেন।

মুসলিম ইনস্টিটিউট বা মুসলিম ক্লাব (ইং ১৯২৯ সালে)

ইং ১৯২৯ সালের ২০শে জুন কবি নজরুল ইসলামের আগমনে বাগধানীর কাচারী প্রাঙ্গণে আহুত সুসজ্জিত সভামঞ্চে রাজশাহীর তদানীন্তন জেলা জজ চৌধুরী টি, আই, এম, নুরুন্নবীর সভাপতিত্বে এক বিরাট সভার অধিবেশনে স্থানীয় ছাত্র ও যুবকবৃন্দের প্রস্তাব ক্রমে আনুষ্ঠানিক ভাবে 'রাজশাহী মুসলিম ক্লাব' নামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্ম লাভ হয়। উহাই আজিকার রাজশাহীবাসীর প্রিয় 'জিন্না ইসলামিক্ ইনষ্টিটিউট' নামে খ্যাত। 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির' যাদু ঘরের দক্ষিণ দিকে যেখানে টিবি ক্লিনিক সেণ্টার বর্তমান রহিয়াছে, সেখানে এক খণ্ড জমির উপর এই ক্লাবের একটি গৃহ নির্মিত হয় এবং 'মুসলিম ক্লাব' সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়।

দুই শতাধিক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইয়া তদানীন্তন রাজশাহীর মুনসেফ জনাব ওবায়দুল সোভানকে সভাপতি, জনৈক আবদুল হাকিম মরহুমকে সম্পাদক ও চৌধুরী নুরুন্নবী সাহেবকে পৃষ্ঠপোষক মনোনীত করিয়া সমিতির যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীকালে এ, ডি, পি, এচ জনাব আবদুল জাব্বার সাহেব প্রমুখের উদ্যোগে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আবদুল মজিদ সাহেবের চেষ্টায় রাজশাহীতে একটি 'মেডিক্যাল স্কুল' স্থাপনের প্রয়োজনে ইং ১৯৪৯ সালে ২৯শে জুন 'মুসলিম ক্লাব' বর্তমান স্থানে অফিসার্স ক্লাবে স্থানান্তরিত হইলে সেই মুসলিম ক্লাবে 'মেডিক্যাল স্কুল' স্থাপিত হয়।

জনাব আঃ মজিদ সাহেব এই ক্লাবকে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রূপায়িত করিবার মানসে 'অফিসার্স ও মুসলিম ক্লাবকে' একত্র করিয়া 'জিন্না ইসলামিক ইনষ্টিটিউটের'

---

১০০. Bengal District Gazetteer, Rajshahı P 66.

* অত্র গ্রন্থের ১৩৩ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১. Rajshahi Gazetteer P. 66.

প্রতিষ্ঠা করেন। তখন একটি ছাপান গঠনতন্ত্রে ইনষ্টিটিউটের লক্ষ্য সম্পর্কে ঘোষণা করা হয় যে ইসলামিক জীবন ব্যবস্থার মাধ্যম হিসাবে এখানে ধর্মীয় বিধানানুসারে শিক্ষা সংস্কৃতি জাতীয় কৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের উন্নতি বিধান এবং মহান নেতা কায়েদ ই-আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নার শিক্ষা ও আদর্শকে বাস্তবায়িত করাই হইবে এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। অতঃপর জনাব মজিদ সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় ব্যবসায়ী ও কতিপয় দানশীল লোকের অর্থ সাহায্য স্বল্পকালের মধ্যে ইনষ্টিটিউটের বৃহত্তর কলেবরটি গড়িয়া উঠে। এখন (১) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, (২) প্রায় পাঁচ শতাধিক দর্শকের সুদৃশ্য সভা গৃহ জিন্না হল, (৩) সাত কামরার এমদাদুল উলুম মাদ্রাসা, (৪) কোরাণ ও হাদিস ক্লাসের একটি কামরা ও (৫) খেলাধূলার জন্য দুই কামরার প্যাভেলিয়ান। এই পাঁচটি ইমারত বিশিষ্ট বর্তমান 'জিন্না ইসলামিক ইনষ্টিটিউট' শহরের কর্মকোলাহল হইতে দূরে রাজশাহী গভঃ মাদ্রাসা প্রাঙ্গণের দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তীর্ণ ময়দানে পদ্মার উত্তর তীরে ছয় বিঘা জমির উপর এক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত।

জিন্নাহ ইসলামিক ইনষ্টিটিউট নামকরণ

বর্তমানে এই ইনষ্টিটিউটের গ্রন্থাগারে নানা প্রকারের আধুনিক বই পুস্তক ও পত্র পত্রিকা পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। দৈনিক বহু সংখ্যক পাঠক পাঠিকার আনাগোনায় স্থানটি সব সময় মুখরিত থাকে।

উপযুক্ত গ্রন্থগারিক দ্বারা ইহা পরিচালিত হইতেছে। বর্তমানে গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকার সংখ্যা নিম্নরূপ (ইং ১৯৬৩ সাল)।

| সাময়িকী– | | গ্রন্থ– | |
|---|---|---|---|
| ১। দৈনিক | ৭ খানা | বাংলা- | ২৩৯৯ |
| ২। সাপ্তাহিক | ৬ খানা | উর্দ্দু- | আরবী ৪৬০ |
| ৩। পাক্ষিক | ৮ খানা | ইংরেজি- | ১৩২৫ |
| ৪। মাসিক | ৮ খানা | শিশুদের | |
| ৫। ত্রৈমাসিক | ৩ খানা | উপযোগী | ৩২৫ |

বিগত ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে স্বনাম ধন্য ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের নেতৃত্বে একটি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইং ১৯৫১ সালে ইনষ্টিটিউটের পক্ষ হইতে একটি বার্ষিকী ও বাং ১৩৬৬ সালে 'সাহিত্য পত্র' নামে আর একটী বার্ষিকী প্রকাশিত হইয়াছে। রাজশাহী জেলার ডেপুটী কমিশনার পদাধিকার বলে ইহার সভাপতি আছেন।

ইসলাম মিশন (ইং ১৯৩৮ সাল)

ইংরেজী ১৯৩৮ সালে রাজশাহী মাদ্রাসার মওলানা জিয়াউল হকের নেতৃত্বে রাজশাহীতে 'ইসলাম মিশন' নামে একটি জামাত গঠিত হইয়াছিল। ৩/৪ বৎসর পর মওলানা সাহেব স্থানান্তরে বদলী হইয়া গেলে এই মিশন লুপ্ত হইয়া যায়।

রাজশাহীর কাদিরগঞ্জে অবস্থিত এই 'ইয়াং মেনস এসোসিয়েশন' সমিতি সংগঠনের উদ্যোগে বিবিধ জনকল্যাণমূলক কার্য্য সাধিত হইয়াছে। এই সমিতির নিজস্ব বাড়ীতে

একটি লাইব্রেরী ও একটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় রহিয়াছে। সমিতির নৈশ বিদ্যালয়টি ইসলাম জীবন ব্যবস্থার একটি দৃষ্টান্ত এখানে হাদিস কোরাণ ফেকা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। পাকিস্তানের আদর্শে ইহার গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। ইহার বদৌলতে কাদিরগঞ্জের বহু মুসলমান শুদ্ধভাবে পবিত্র কোরাণ ও তফসির বয়ান করিতে পারেন। এক সময় 'ইয়াং মেনস এসোসিয়েশন' সমিতি বিরাটকারে তাঁত বিদ্যালয় খুলিয়াছিল। দেশী সূতা দ্বারা এই তাঁতে কাপড়, গালিছা প্রভৃতি বুনানীর কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইত। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্থানীয় মিঞা পরিবার ইহার পরিচালনা করিয়া থাকেন।

ইয়াং মেনস এসোসিয়েশন (ইং ১৩৩৬ সাল)

রাণীনগরে অবস্থিত ইহা একটি বিখ্যাত 'মানব সেবাসঙ্ঘ'। বাঙলা ১৩৩২ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত। এই অনুষ্ঠান কর্তৃক একটি জুম্মা মসজিদ স্থাপিত এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইয়া পরিচালিত হইতেছে। এককালে ইহার খ্যাতি ছিল।

খাদেমুল ইসলাম (ইং ১৯২০ সাল)

রাজশাহী শহরে গোরস্থান সমিতি গঠিত হইবার পূর্বে এখানকার হাসপাতালের মৃত দেহ ও লাওয়ারেশ লাশগুলিকে পদ্মার স্রোতে ভাসাইয়া দেওয়া হইত। ইং ১৯২০ সালে রাজশাহী গোরস্থান সমিতি গঠিত হইবার পর 'লাওয়ারেশ মৃতদেহগুলিকে ইসলামী রীতিনীতি অনুসারে দাফন কাফন করা হইয়া থাকে। কাদিরগঞ্জ, টিকাপাড়া ও গোরহাঙ্গা গোরস্থান বর্তমানে উল্লেখযোগ্য। কাদিরগঞ্জ গোরস্থান শহরের মধ্যস্থলে একটি সমৃদ্ধ গোরস্থান। ইহা সরাসরি ভাবে মুসলিম গোরস্থান সমিতি কর্তৃক পরিচালিত। জেলার ডেপুটী কমিশনার পদাধিকার বলে গোরস্থান সমিতির সভাপতি ও জনাব আবুল হোসেন সম্পাদক আছেন। জনৈক আবদুল খালেক মরহুম এই সমিতির প্রথম সভাপতি ও শেখ ওমেদ আলী সম্পাদক ছিলেন।

মুসলিম গোরস্থান সমিতি (ইং ১৯২০ সাল)

সাগরপাড়ার দক্ষিণে পদ্মার তীরে হিন্দদের একটি প্রাচীন শ্মশানঘাট আছে। হিন্দুরা উহার নাম রাখিয়াছে 'পঞ্চবটি'। বর্তমানে উহার মূল অংশ পদ্মা গর্ভে রাজশাহী ঈদগাহগুলির মধ্যে সদরে অবস্থিত 'জিন্না হলের সন্নিকটে ঈদগাহটি প্রসিদ্ধ। মফঃস্বলে মহকুমা টাউনে নাটোর, নওগাঁ ও নওয়াবগঞ্জের প্রধান ইদগাহত্রয় আয়তনের দিক দিয়া সদরের ঈদগাহের প্রায় সমান এবং কোন কোন বিষয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

শ্মশান ঘাট

ঈদগাহ

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

# পাকিস্তান আমল

[ ১৯৪৭ ]

পাকিস্তান আমলে রাজশাহী শহরের আয়তন ও গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। জাতি কল্যাণ মূলক বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় নানাবিধ সমস্যার সমাধান হইতেছে। এই অধ্যায়ে আমরা সেই সব প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কয়েকটির উল্লেখ করিব। প্রথমেই বলিব এখানকার মোহাজের সমস্যার কথা। দেশ বিভাগের পর ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু পরিবার পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও আসিয়া বসবাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গীয় মোহাজেরদের সংখ্যাই বেশী। যাহারা হিজরত করিয়া এখানে আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আনুমানিক শতকরা ১০ জন বিভিন্ন শ্রেণীর চাকুরীজীবী। বাড়ী ঘর, বিষয় সম্পত্তি বিনিময় করিয়া যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ১১/২ জন। অবশিষ্ট সকলেই বিষয় সম্পত্তি হীন দুস্থ মোহাজের। পাকিস্তানের 'এতিম' রূপে এক সময়ে ইহাদের সমস্ত ব্যয়ভার সরকারকে বহন করিতে হইত।

ইংরেজী ১৯৫০ হইতে ৬২ সাল পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে যে সমস্ত নির্য্যাতিত মুসলমান পাকিস্তানে হিজরত করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে রাজশাহী শহরে যাহারা অবস্থান করিতেছে তাহাদের সংখ্যা নগন্য নহে। নিম্নে তাহাদের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল—

| ইং সাল | যে যে স্থানে বসবাস করিতেছে | যে যে প্রদেশ হইতে আসিয়াছে |
|---|---|---|
| ১৯৫০-৫২ | পুরাতন জাহাজ ঘাট | বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি |
| | কাদিরগঞ্জে | বিহাব প্রভৃতি |
| | মাষ্টারপাড়া. নূতনপাড়া টিকাপাড়া | বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ |
| ১৯৫১ | বেলদারপাড়া ও সিরইল | (সুলতানাবাদ) পশ্চিম বঙ্গ ও বিহার |
| ১৯৬২ | বখতিয়ারাবাদ | মালদহ ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি |

ইং ১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে যে সমস্ত গরীব নিঃস্ব মুসলমান রাজশাহীতে হিজরত করিয়াছে তাহাদেব বসবাসের জন্য একটি নয়া উপনিবেশ (Coloney) স্থাপিত হইয়াছে*।

দেশ বিভাগের পর পূর্ব্ব পাক সরকার রাজশাহী শহরকে বিভাগীয় সদররূপে

---

* উক্ত নয়া উপনিবেশের নাম করণের জন্য যথাক্রমে বঙ্গবিজয়ী বীর বখতিয়ার খিলিজি, বঙ্গ বিজয়ের পরোক্ষ ইঙ্গিত দাতা তাপসকুল শ্রেষ্ঠ জালাল উদ-দীন তবরেজী ও রাজশাহী শহরে সমাহিত প্রসিদ্ধ শাহ মখদুম্ আউলিয়া এই তিন জন যোদ্ধা পুরুষের নাম যাচাই কবিয়া অবশেষে গৌড়ের অধিবাসী মোহাজেরদের জন্য গৌ-বঙ্গ বিজয়ী বীর খিলিজির স্মৃতি স্বরনার্থে স্বনামধন্য ডেপুটি কমিশনার জনাব পি, এ, নাজির এই উপনিবেশের নাম 'বর্খাতিয়ারাবাদ' রাখিয়াছেন।

নির্বাচিত করেন এবং ইং ১৯৪৭ সালে রাজশাহী বিভাগের সদর কার্য্যালয় জলপাইগুড়ি টাউন হইতে এখানে স্থানান্তরিত করিয়া এই শহরকে বিভাগীয় মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। তারপর পূর্ব্ব পাক তথা পাকিস্তান সরকারের আঞ্চলিক সরকারী ও উপসরকারী কার্য্যালয়গুলি এক এক করিয়া এখানে স্থানান্তরিত ও সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন 'ডেপুটী ডাইরেক্টরেট অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন', 'বোর্ড অফ ইন্টারমেডিয়েট এণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশন', 'সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার সি এণ্ড বি, এ্যাসিসট্যান্ট ডাইরেক্টর, রেডিও পাকিস্তান রাজশাহী', এ্যাসিসট্যান্ট ডাইরেক্টর অফ এন্টি- কোরাপশন', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এতদব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের পোষ্টার ট্রেণিং ইন্সটিটিউট, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অফ পোষ্টাফিসেজ এণ্ড টেলীগ্রাফ,' এ্যাসিসট্যান্ট ডাইরেক্টর অফ পাসপোর্ট এণ্ড ইমিগ্রেশন, প্রভৃতি স্থাপিত আছে। উপরন্তু জেলার শাসন বিষয়ক দপ্তর ও জেলা কাউন্সিল তো আছেই।

রাজশাহী শহরকে বিভাগীয় শহরের মর্যাদা দান

বিদেশী মিশনের মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট হাই কমিশনের ভিসা প্রভৃতি দপ্তর' মার্কিন তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র' বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী প্রভৃতি স্থাপিত আছে। পাকিস্তান বিরোধী কার্য্যকলাপের দরুণ ইং ১৯৬৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ইণ্ডিয়ান হাই কমিশন দপ্তরাদি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইং ১৯৫২ সালে উহা এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বিদেশী মিশন

উত্তর বঙ্গ বাসীর (রাজশাহী বিভাগের) বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন সফল হইয়াছে। আজ এই চরম আনন্দের দিনে প্রশ্ন জাগিতেছে এই আনন্দ কাহার? ইহার সদুত্তর এই; এই স্বপ্ন উত্তর বঙ্গবাসীর। উত্তর বঙ্গবাসীই তাহা সফল করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের এই অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ কোন দিনই নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকে নাই। তাহারা খরস্রোতা করতোয়ার কল কল নিনাদে আত্মভোলা হইয়া পড়ে নাই. যমুনার উত্তাল তরঙ্গে তাহার ভীত-বিহ্বল হয় নাই। পদ্মার ভৈরবী মূর্তি তাহাদিগকে বাস্তু ত্যাগী করিতে পারে নাই অথবা ত্রিস্রোতা পুণ্যতোয়ার মনোরম দৃশ্যে তাহারা বিভোর হইয়া থাকে নাই। চরম সত্য তাহাদিগকে কোন দিনই উপেক্ষা করিতে পারে নাই। যুগে যুগে তাহারা স্বপ্ন দেখিয়াছে, নব নব রূপায়ণে তাহা বাস্তবায়িত করিয়া তুলিয়াছে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তাহার স্বাক্ষর আছে। অলি-গলি পথে প্রান্তরে তাহার পদচিহ্ন রহিয়াছে। মহাস্থান, ভাসোবিহার, জগদল-মহাবিহার, রামাবতী, পাহাড়পুর, হলুদবিহার, বাঘা, ঘোড়াঘাট, শেরপুর, শিবগঞ্জ, তালশন, দর্সবাড়ী, সোন্দাবাড়ী, ও বৈদ্যবেরঘরিয়া প্রভৃতি তদানীন্তন যুগের জন জীবনের ধারাবাহিক কর্মকীর্তি ও উচ্চ শিক্ষার অনুশীলনের স্মারক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তো আজিকার কীর্তি। কোম্পানীর যুগে উচ্চ শিক্ষা নিমিত্তে বুয়ালিয়া ইংলিশ স্কুলে (স্থাপিত ইং ১৮২৮ সাল), যে দিন রাজশাহী কলেজ স্থাপিত (ইং ১৮৭৩) হইয়াছিল সেই দিনই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজ বহন করিয়া আনা হইয়াছিল। ইহার লিখিত কোন প্রামাণ্য তথ্য উদ্ধার করা সম্ভবপর না হইলেও এই কলেজে ইং ১৮৮৯ সালে 'ল' ক্লাস, ইং ১৮৯২ সালে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস খোলা হইয়াছিল। যদিও ইং ১৯০৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন কারিকুলাম অনুযায়ী

উত্তর বঙ্গের উচ্চ শিক্ষার পূর্বাভাস

তাহা উঠাইয়া লওয়া হয়[২]। তথাপি একথা সত্য জানিতে হইবে যে,

রাজশাহী তথা উত্তর বঙ্গের রাজা জমিদার ও জনসাধারণের প্রয়াসেই ইং ১৯১৭ সালের সুযোগ্য 'স্যাড্লার কমিশন' উত্তর বঙ্গের অধিবাসীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য রাজশাহীতে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন[৩];

বলা বাহুল্য উত্তর বঙ্গবাসীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে রাজশাহীকে উপযুক্ত স্থান হিসাবে কমিশন পছন্দ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে এই বিশ্ববিদ্যালয় কখন কখন কাহার কাহার মস্তিষ্কে উঁকি ঝুঁকি দিলেও তখন তাহা সম্ভবপর হয় নাই কিন্তু যুগের পরিবর্তনে এক কালের মিয়াদ ফুরাইয়া গেলে আর এক কালের প্রয়াসকে দাবিয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই। ইং ১৯৫৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অটোনোয়াস পাশ হইয়া সেই সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আজিকার এই আনন্দের দিনে সেই রাজা জমিদার, সেই স্যাড্লার কমিশনকে আমরা পরম শ্রদ্ধার সহিত বার বার স্মরণ করিতেছি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স আজও বার (১২) বৎসর। কয়েকটি বিবরণে ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে[৪]। কিন্তু যদিও তাহা ইতিহাস নয় তথাপি এই গুলিকেই আমরা ইতিহাস রচনার প্রাথমিক ইঙ্গিত হিসাবে ধরিয়া লইতে পারি। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের বিস্তৃত ও অভিনব ইতিহাস আছে। স্থানাভাবে তাহার দীর্ঘালোচনা এখানে সম্ভবপর হইল না। কেবল মাত্র ইহার প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবে।

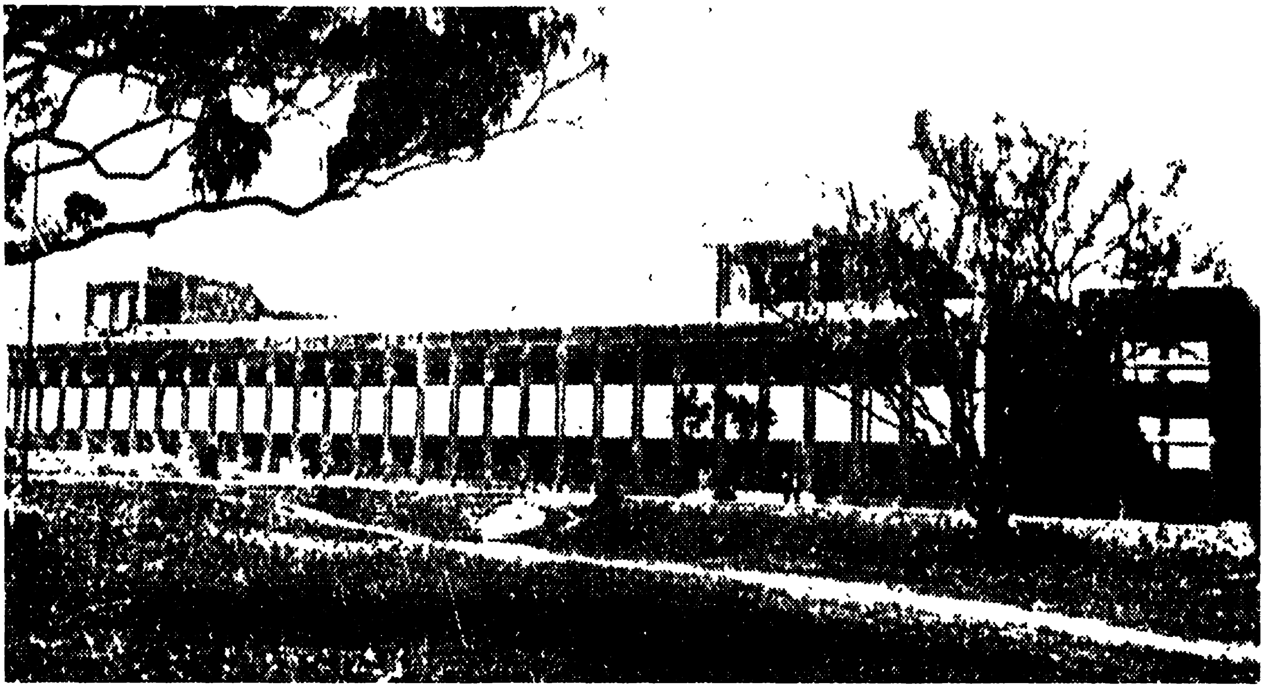
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ইং ১৯৫৩ সাল)

আজাদী লাভের বহু পূর্ব হইতে রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে এতদঞ্চলের প্রতিভাবান মনীষীবৃন্দের মস্তিষ্কে ভিড় জমাইতেছিল। কালে ভদ্রে তাহা নানা রূপ পরিগ্রহ করে। নানা প্রকার আন্দোলন বিপ্লবের মধ্যে এই প্রসঙ্গ কিছুদিন চাপা পড়িয়া থাকে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর উত্তর বঙ্গের হৃদয় কেন্দ্র কলিকাতা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে পূর্ব্ব পাকিস্তানের এই অঞ্চলের কতকগুলি নূতন সমস্যা প্রকটভাবে ফুটিয়া উঠে। উচ্চ শিক্ষা, শিল্প বাণিজ্য, চিকিৎসা, পথ ঘাট প্রভৃতি ব্যাপারে উত্তরবঙ্গের পক্ষে রাজধানী ঢাকায় যাতায়াতের অসুবিধা; বিশেষত: এই অঞ্চলের উচ্চাভিলাষী শিক্ষার্থীদের ঢাকায় গমনাগমন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্ত্তির ব্যাপারে নানা অসুবিধা, আবাস

২. Vide-short History of the College in 1936 and also vide Five year plan 1954

৩. Rajshahi is named more often than any other places (Except of course Dacca) as possible site for a University. In Rajshahi it was refreshing to find evidence of the existence of genince intellectual interest quite independent of the business of Examination coaching. We seem to percieve in much of the teaching not only in history but in several other subjects, a vitality which was lacking elsewhere, there is in Rajshahi something of the genuine University spirit though its needs to be fostered and strengthened in many ways It is no doubt a sense of this which has led so many of our correspondents to advocare the institution of a seperate University at Rajshahi for Northern Bengal, and this reinforced by the fact that the Rajshahi College has been supported by benefaction by local patriots to an exact without paralell in other parts of Bengal

৪. Vide Rajshahi University scheme 1950. University Calendar; Five year plan 1954 and etc



রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমারতের একাংশ



বগুড়ার মহাস্থানগড়ে সুলতান বলখীর মাজার এবং মুকাররম শাহের সমাধিসৌধ

স্থলের অভাব প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। এতদাতিরিক্ত তদানীন্তন পূর্ব্ব পাক সরকারের রাজশাহী বিভাগের প্রতি চরম উদাসীনতার পরিপ্রেক্ষিতে রাজশাহীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব নিদারুন রূপে প্রকট হইয়া উঠে। যদিও তাহা প্রকাশ্য আন্দোলনের মাধ্যমে রূপায়িত হয় নাই।

ইং ১৯৫০ সাল। রাজশাহী মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র ভর্ত্তির ব্যাপারে ১৮ই অক্টোবর বর্তমান শিশু কল্যাণ মাতৃ-সদন প্রতিষ্ঠানটির পশ্চিম পার্শ্বে (এখন যে ইমারতটিতে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী নিবাস হইয়াছে) মেডিক্যাল স্কুলের বিল্ডিং এ, সিলেকশন কমিটির এক সভা আহূত হয়। তদানিন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব এমদাদ আলী, ডি: বি: চেয়ারম্যান মনির উদ্দীন আকন্দ, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান জনাব মাদার বখ্‌শ এম, এল, এ; ও রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ ড: আই, এইচ, জুবেরী প্রমুখ উক্ত সিলেকশন সমিতির বিশিষ্ট সদস্যরূপে যোগদান করেন। এই সভায় চা-চক্র চলা কালে প্রসঙ্গক্রমে ড: জুবেরী এইরূপ ইঙ্গিত করেন যে, "রাজশাহী কলেজে গভর্ণমেণ্ট যে গ্রাণ্ট দিয়া থাকেন, তদুপরি সরকার হইতে যদি আরও দেড় লক্ষ বা দুই লক্ষ টাকা গ্রাণ্টের ব্যবস্থা করা হয়, তবে অনায়াসে রাজশাহীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যায়।" ড: জুবেরীর এই ইঙ্গিত উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণের অনেকের মনে এক নয়া উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। অতঃপর জনাব আকন্দ এতদ্বিষয়ে জনাব মাদার বখশকে অগ্রনী হইতে অনুরোধ করেন। তারপর জনাব মাদার বখ্‌শ ও ড: জুবেরী কর্তৃক রচিত বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনার একটি খসড়া লইয়া, জনাব মাদার বখশ উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের

নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সরকারী উচ্চ কর্মচারীদের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইতে থাকেন। অতঃপর এতদ্বিষয়ে ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ ও পরামর্শ করিবার জন্য রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার জনাব খোরশেদ সাহেবের সভাপতিত্বে ইং ১৫।১১।৫০ তারিখে 'রাজশাহী কলেজ কমনরূমে' স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়' পরিকল্পনা প্রস্তাব উত্থাপন করা হইলে দীর্ঘ আলোচনার পর সর্ব সম্মতিক্রমে উহা সমর্থিত ও গৃহীত হয়। তারপর বিভাগীয় কমিশনার জনাব খোরশেদকে পৃষ্ঠপোষক ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতি এবং জনাব মাদার বখশ ও ডঃ জুবেরীকে যুগ্ম সম্পাদক, ট্রেজারী অফিসারকে কোষাধ্যক্ষ, এম এল, এ, ও ইউনিয়ন বোর্ড সদস্য সমন্বয়ে সর্বমোট ৬৪ জন সভ্য লইয়া একটি শক্তিশালী সমিতি গঠিত হয়[৫]। অতঃপর ইং ১৯৫১ সালে সাবেক মুখ্য মন্ত্রী জনাব নূরুল আমীন স্বাস্থ্য মন্ত্রী জনাব হাবিবুল্লাহ বাহারের সমভিব্যবহারে রাজশাহী শহরে আগমন করেন এবং এখানে তিন দিন অবস্থান করিয়া এতদঞ্চলের নেতৃবৃন্দের সহিত বিভিন্ন সমস্যার পর্য্যালোচনা করেন এবং রাজশাহীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে প্রতিশ্রুত হন। এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিল প্রনয়ণের জন্য স্পেশাল অফিসারের পদ সৃষ্টি করিয়া ডঃ জুবেরীকে ঢাকায় সেক্রেটারিয়েটে লইয়া যান। বলা বাহুল্য এই বিল প্রণয়ন কালে রাজশাহী বিভাগের (বর্তমান খুলনা বিভাগেও) বিভিন্ন জেলার (এম, এল, এ,) পরিষদ সদস্যদের মধ্যে নানা মতভেদ সৃষ্টি হয়। রংপুর ও দৌলতপুরেও এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার দাবী দাওয়া হইতে থাকে। রাজশাহী বিভাগের এম, এল, এ দের মধ্যে এইরূপ মতভেদের সুযোগ লইয়া সিলেট ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে থাকে। ইত্যাদি কোন্দলের চাপে পড়িয়া সরকার শিথিলতার নীতি অবলম্বন করেন। এদিকে সরকারের এইরূপ গড়িমসি দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি ইং ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজশাহী ঈদগাহ ময়দানে সাবেক নিখিল বঙ্গ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জনাব আবুল কাশিমের সভাপতিত্বে উত্তর বঙ্গের মুসলিম লীগ সদস্য ও এম, এল, এ-দের এক কনভেনশন অধিবেশন আহ্বান করা হয়। পরবর্তীকালে পূর্ব্ব পাক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী স্বনাম খ্যাত শাহ আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে রাজশাহীতে মুসলিম লীগ সদস্যদের 'বিষয় নির্ধারণ সমিতির' অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই দুই অধিবেশনের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের অন্যান্য দাবী দাওয়ার সহিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব আশাতীতভাবে সমর্থিত হয়। পরে স্থান নির্বাচন লইয়া কতিপয় সদস্যদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি হইলে ডি, পি, আই ডঃ জুবেরী প্রমুখকে লইয়া স্থান নির্বাচন (Site Selection) কমিটি গঠিত হয়। অতঃপর এই কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে রাজশাহীতেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা স্থিরীকৃত হয়। ডঃ জুবেরী কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় বিল প্রণয়ন সমাপ্ত ও আইন সভায় উত্থাপনের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইং ১৯৫২ সালের ১লা নভেম্বর আইন পরিষদের স্পীকার জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী কর্তৃক রাজশাহী

জনাব নূরুল আমিনের প্রতিশ্রুতি

৫. Vide-Rajshahi University scheme 1950

৬ Assembly proceedings official report, E. B. L. A. ninth Session. Vol IX-No 2 p 348.

বিশ্ববিদ্যালয় বিল উত্থাপিত হইলে সেক্রেটারী তখন উহা পাঠ করিয়া শুনান"। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিল পঠিত হইবার পর ইহার সংশোধন ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে মৃত খ্যাতনামা বাগ্মী সুরেশদাস গুপ্ত এম, এল, এ প্রমুখের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৭] অতঃপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিলের চূড়ান্ত আলোচনার জন্য ইং ১৯৫৩ সালের ২১শে (?) মার্চ্চ উজিরে আলা জনাব নূরুল আমিন পার্টি মিটিং এ সর্বসম্মতিক্রমে এই বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে না পাঠাইয়া সরাসরি আইন পরিষদে পাশ করাইবার ব্যবস্থা করেন। ইং ১৯৫৩ সালের বাজেট অধিবেশনের ৩১শে মার্চ্চ (The thirty first March, 1953) এই বিল পাশ হয়।[৮] এবং ১লা জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট (Rajshahi University Act) কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এই বৎসরেই ড: ইএাত হোসেন জুবেরীকে প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার নিয়োগ করা হয়। তিনি এই বৎসরে (ইং ১৯৫৩ সালে) ৬ই জুলাই হইতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদে কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

দুঃখের বিষয় তিনি দীর্ঘদিন এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহাকে লালন পালন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি থাকিলে হয়ত এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় পরিকল্পনা সুসম্পন্ন হইয়া যাইত। যাহা হউক জনাব মাদার বখশ সাহেবকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ লইয়া অনেক ক্ষয়ক্ষতি ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাশ হইবার পর জনাব মাদার বখসকে অনেক উপহাস বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য বিরুদ্ধ দলের বন্ধুরা বলিয়াছিলেন যে, "রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইলেকশন "বেতরণী' 'মাকাল ফল' 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' 'দুষ্ট এঁড়ের চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল ইত্যাদি। কিন্তু সকল বিদ্রুপ অস্বীকার করিয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আজ বাস্তবায়িত হইয়া মিথ্যার উপর সত্যের বিজয় ঘোষণা করিতেছে।

**কার্যক্রম** সর্ব প্রথমে সার্কিট হাউস ও অধুনা লুপ্ত বসন্ত কুমার কৃষি ইনষ্টিটিটিউট এ অস্থায়ীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হয়। পরে স্থানীয় বড় কুঠি হুকুম দখল করিয়া তাহার নীচের তলায় বিশ্ববিদ্যালয় অফিসাদি স্থানান্তরিত হয় এবং উপর তলায় চ্যান্সেলারেব বাস গৃহে রূপান্তরিত করা হয়।

অবসর প্রাপ্ত উচ্চ শিক্ষাবিদ মৌলবী ওসমানগণি, বর্তমান ডেপুটি রেজিষ্ট্রার মুসলিম উদ-দীন থাকে যথাক্রমে রেজিষ্ট্রার ও অফিস অধ্যক্ষ এবং অধ্যক্ষ মরহুম আবদুল করিম মণ্ডলকে কন্ট্রোলার নিযুক্ত করা হয়। রাজশাহীর সরকারী কলেজে ও ইং ১৯৫৪ সাল হইতে রাজশাহী বিভাগের প্রায় (খুলনা বিভাগ সহ) বিশটি কলেজের শিক্ষার ভার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করেন। এতদব্যতীত এই সময় একটি কমার্স এবং একটি মহিলা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী পায়। এই বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসন শাখা যথা–'শিক্ষা সংস্থা (Acadamic Council), প্রতিনিধি পরিষদ (Syndicate), অর্থ

---

৭. Assembly Proceedings official report, E B. L.A. Tenth Seassion, Vol. X-No. 2 PP. 24-44, 52-78. 111-129, 139-156, 216-237, 241-296.

8. Assembly Proceedings official report, E B. L.A. Tenth Seassion, Vol. X-No. 2 PP 241-296 and Rajshahi University Calendar

9 Assembly Proceedings report, . .... Ist April, 1953 pp. 298 and 230.

সংস্থা (Finance Committee) ও ব্যবস্থাপক সভা (Senate) গঠিত হয়[১০]। এতদব্যতীত আইন শিক্ষার ট্রেনিং ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস সমূহ আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয়[১১]।

স্বল্পকাল মধ্যে এতদঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিপুল সাড়া পাওয়া যাইতে থাকে। তারপর ইহার স্থায়ী মোকামের জন্য রাজশাহী শহরের পূর্ব পার্শ্বে পদ্মার তীরে এক মনোরম পরিবেশে মতিহার কুঠিকে কেন্দ্র করিয়া ছয় বর্গ মাইল ব্যাপী ভূমি চূড়ান্তরূপে নির্দিষ্ট হয়[১২]। পাকিস্তান সরকারের সাহায্য কল্পে কলম্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অষ্ট্রেলিয়া গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার Lt,Col.G.Swayne Thomas, R.E (R),M.A (Cantab), F.R.I.B.A,F.I.I.A, F.R.V.I.A, F.R.S.A কর্তৃক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও বিস্তৃত প্ল্যান, নকশা ও এতদসহ একটি উপশহরের পরিকল্পনা রচিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী জায়গা ও পরিকল্পনা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইয়া গেলে উহার বাস্তব রূপায়নের জন্য নূরুল আমীন সরকার প্রচুর টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। বর্তমানে মতিহারেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ফ্যাকাল্টির কার্য্য হইয়া থাকে।

গাঁয়ের ধারে সুবিস্তীর্ণ ময়দানে আম্র কানন পরিবেষ্টিত উত্তর-বঙ্গবাসীর প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান এতই মনোরম যে, ইহার চত্বর পরিদর্শন না করিলে বিশ্বাস করা যায় না। ইহা উত্তর বঙ্গের এক সীমান্তে অবস্থিত হইলেও রাজশাহী বিভাগ তথা পাকিস্তানের উচ্চাভিলাষী ছাত্রবৃন্দ এখানে অধ্যায়ন করিয়া থাকেন*।

**রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (১৯৪৯-৫৮)**

রাজশাহীর চিকিৎসা ব্যবস্থা ও ইহার সম্প্রসারণ, এতদসহ সদর প্রভিন্সিয়াল হাসপাতালের কথা ইংরেজ আমলে বর্ণিত হইয়াছে। এখন আমরা রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ প্রসঙ্গে কিছু বলিব।

বিভাগ পূর্বকালে পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে বগুড়া শহরে বগুড়াবাসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দুইটি প্রাইভেট মেডিক্যাল স্কুলের কথা সুবিদিত। সেখানে শিক্ষা প্রাপ্ত ডাক্তারগণকে কলিকাতা ক্যাম্বেল হাসপাতাল ও স্কুলের (বর্তমান নীলরতন ম্যাডিক্যাল কলেজ) কারিকুলাম অনুযায়ী এল,এম, এস ডিপ্লোমা দেওয়া হইত। চাহিদার তুলনায় যদিও সংখ্যায় তাহারা নগন্য ছিল। তথাপি উহারাই ছিল তখন উত্তরাঞ্চলের চিকিৎসক। উত্তর বঙ্গে বড় ডাক্তার বা উচ্চ শিক্ষিত ডাক্তারদের সংখ্যা খুবই

১০. (a) Intermediate in Arts, Science, Commerce and Islamic Studies
(b) B.A.B com and B Sc

১১. (1) Law (2) M Ed, Diploma in Education. (3) English (4) Econmics, Political Science (5) Philosophy, Paychology, (6) History, Islamic History, (7) Mathematics, (8) Geography.

১২. Vide-Five year plan 1954

* রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েব বর্তমান উন্নয়ন ও অন্যান্য বিষয় গ্রন্থকারেব 'উত্তর বঙ্গের ইতিহাসে' সংযোজিত করা হইবে। এখানে একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েব গঠন ও উন্নযন কল্পে সাময়িক ভাবে শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবকে বাংলা বিভাগেব অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ করা হইয়াছিল। সেই সময়ে গ্রন্থকারের নিকট হইতে তিনি দুই শতাধিক প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

নগন্য ছিল। শহর অঞ্চলে যা ২/১ জন এম,বি ও ইংরেজি শিক্ষিত ডাক্তার ছিলেন-নানা অসুবিধার দরুণ প্রায়শ: তাহারা মফঃস্বলে পোঁছিতে পারিতেন না। কলিকাতা হইতে উচ্চ শিক্ষিত ডাক্তার আনিয়া জটিল রোগীর চিকিৎসাদি অনেকের পক্ষে কষ্টকর ছিল। সুতরাং উচ্চ শিক্ষিত ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসার ব্যাপারে উত্তর বঙ্গবাসীদের অধিকাংশ সময় নিরাশ থাকিতে হইত। ঢাকায় যাতায়াত ও নানা অসুবিধার দরুন অনেকে পোঁছিতে পারিতেন না। সুতরাং দেশ বিভাগের পর কলিকাতা হইতে উত্তর বঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে অন্যান্য অসুবিধার মধ্যে এতদঞ্চলের চিকিৎসার অব্যবস্থার কথাও প্রকটভাবে ফুটিয়া উঠে। এবং বড় ডাক্তার বা চিকিৎসকদের অভাব উপলব্ধ হয়। বলা বাহুল্য এম,এল,এ জনাব মাদার বখশ সাহেবের প্রস্তাবক্রমে[১৩] রাজশাহীর তদানীন্তন এ্যাসিসট্যান্ট ডাইরেক্টর অব পাবলিক হেলথ্ জনাব আব্দুল জোব্বার সাহেবের প্রাণপণ চেষ্টায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আব্দুল মজিদ সাহেবের সহযোগিতায় ইং ১৯৪৯ সালে জন সাধারণের প্রদত্ত চাঁদা তিন লক্ষাধিক টাকায় বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির দক্ষিণে অবস্থিত মুসলিম ক্লাবে (বর্তমান টি,বি সেন্টার) একটি প্রাইভেট মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। তারপর ইহাকে বর্তমান 'শিশু ও মাতৃ মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের' পশ্চিম ধারে একটি দ্বিতল গৃহে সম্প্রসারিত করা হয়। রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়ামের উত্তরে অবস্থিত অতিথিশালাটিকে ঈষৎ রূপান্তরিত করিয়া স্কুলের এ্যানাটমি সেকসনের ক্লাস লওয়া হইত।

ইং ১৯৫৫ সালে পূর্ব্বে পাকিস্তান সরকার উক্ত স্কুল স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এবং উহাই ইং ১৯৫৮ সালে 'রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে পরিণত হইয়া ছাত্র ভর্তি করিতে থাকে। বর্তমানে (ইং ১৯৬২-৬৩ সাল) ১৩ জন ছাত্রীসহ মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২৩৯ জন। শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ৮০ জন।

দুই কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ভবন বিনির্মিত হইতেছে। ১৯৬৫ সালে ইহার যাবতীয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। বর্তমানে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের চত্বর পরিদর্শন করিলে ইহাকে যুক্তরাজ্য বা আমেরিকার কোন কলেজ বলিয়া ভ্রম হইবে। উপযুক্ত ডাক্তার দ্বারা কার্য্যাদি পুরাদমে চলিতে থাকিলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ অপেক্ষাও ইহা যে বহুলাংশে উন্নত হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এত বড় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া পাকিস্তানের আর দ্বিতীয় কোন মেডিক্যাল কলেজের কলেবর বোধ হয় নাই। চিকিৎসা সংক্রান্ত মোট* ১২টি বিভাগ লইয়া রাজশাহীর এই মেডিক্যাল কলেজ। শহরের উত্তর পশ্চিম পার্শ্বে পল্লী সংলগ্ন এক মনোরম পরিবেশে ইহা অবস্থিত। চিকিৎসাদি সংক্রান্ত এই মেডিক্যাল কলেজে বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য

১৩. Vide-E,B L.A. Vol.III.No 2 PP, 274-276, E,B.L A.Forth Session 1949-50, Vol. IV.-No 7 PP 140-41.

* (1) Rajshahi Medical College Building (2) Rajshahi Medical College Hospital building (3) Lady Health visitor's training centre with attached Hostel (4) Nursing training centre (5) Sub Depot.of Medical Stores (6) Technical Personal training Institute. (7) Staff quarters for categories of staff (8) Boys Hostel (9) Girls Hostel (10) Play Grounds (11) T.B Hospital (12) Inspections Disease Hospital,

সরঞ্জাদি+ (Equipments) সংগৃহীত হইয়াছে।

রাজশাহীর এই মেডিক্যাল কলেজের গঠন প্রসঙ্গে আমরা একজন অক্লান্ত কর্মীর কথা স্মরণ না করিয়া পারিতেছি না। যাঁহার কর্মকুশলতা ও অধ্যবসায় না থাকিলে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের বর্তমান রূপায়ন ও দুস্প্রাপ্য উপকরণাদি সংগ্রহ হইত না এবং মেডিক্যাল কলেজের চত্বর এত সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া আজ ভরিয়া উঠিত না। আজ সেই কর্মবীর, 'কলেজের তদানীন্তন প্রশাসক লেপ্টন্যান্ট কর্ণেল বুরহান উদ্দীনের নাম গৌরবের সহিত স্মরণ করিতেছি। সত্যি কথা বলিতে কি তাঁহার কর্মদক্ষতার জন্যই রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের নির্মাণ ত্বরান্বিত হইয়াছে। লেপ্টন্যান্ট কর্ণেল গিয়াস উদ্দীন আহম্মদ রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ।

আদর্শ শিক্ষক প্রস্তুত ও শিক্ষামূলক গবেষণা উদ্দেশ্যে রাজশাহীতে ইং ১৯৫৩ সালে ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। এখানে শিক্ষা প্রাপ্ত উত্তীর্ণ শিক্ষক ও শিক্ষিকাদিগকে বি, এড্ ও এম,ইড ডিগ্রী দেওয়া হয়।

শিক্ষক শিক্ষন কলেজ (ইং ১৯৫৩ সাল)

শিক্ষা বর্ষ শুরু হইবার ১ম বর্ষে (ই ১৯৫৬-৫৭ সালে) তিনজন শিক্ষিকা সহ ৬৩ জন শিক্ষক ভর্তি হন। শিক্ষা সিলেবাস সমাপনান্তে শেষ পরীক্ষায় উক্ত ৬৩ জন শিক্ষক শিক্ষিকাই কৃতকার্য্য হন।

রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের উত্তর ধারে ইহা অবস্থিত। বর্তমানে এই কলেজের (ইং ১৯৬২-৬৩ সাল) শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ২১৭ জন। অধ্যাপক মণ্ডলীর সংখ্যা ১৪ জন। এই কলেজের ১ম অধ্যক্ষ ছিলেন পূর্ব্ব পাকিস্তান শিক্ষা বিভাগের বর্তমান ডিরেক্টর (D.P.I.) জনাব এম, এফ, রহমান।

অল্প খরচে স্থানীয় গরীব দুঃখী জনসাধারণের ছেলে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার কল্পে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আলী তৈয়ব সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় কতিপয় সমাজকর্মীদের উদ্যোগে অল্প সংখ্যক ছাত্র লইয়া ইং ১৯৪৭ সালের ১লা জানুয়ারীতে রাজশাহীর মুসলিম হাই স্কুলের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমান ছাত্র সংখ্যা ছয় শতাধিক। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই স্কুলের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। মুসলিম হাই স্কুল নামে ইহা খ্যাত।

রাজশাহী শহরে আগত উর্দ্দু ভাষাভাষী মোহাজের ছাত্রদের জন্য ইং ১৯৪৯ সাল হইতে এখানে উর্দ্দু ভাষা শিক্ষাদানের নিমিত্তে একটি পৃথক বিভাগ খোলা হইয়াছে।

রাজশাহী সদর প্রভিন্সিয়াল হাসপাতালের দক্ষিণে হাতে খাঁ পল্লীর মধ্যস্থলে ইহা অবস্থিত। জন সাধারণের অল্প বিস্তর জমি ও আর্থিক সাহায্যে এই স্কুলের ইমারতাদি বিনির্মিত। সম্প্রতি এই স্কুলের সম্প্রসারণের জন্য প্রাদেশিক সরকার ৭,১২৯ টাকা

+ — 1. Electronic blood cound apparatus

২, Electro Coagulator with conocial Microscope.

3 Automatic Tissue Staining Machine

4. Electronic Rymograph.

5. Close circuit Television asied.

সাহায্য করিয়াছেন। স্কুল সংলগ্ন একটি লাইব্রেরী ও হোষ্টেল আছে।

স্থানীয় জনসাধারণ ও আগত মোহাজেরদের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় একটি প্রাইমারী স্কুল হিসাবে ৩০/৩২ জন ছাত্র লইয়া হরগ্রামে একটি ভাড়াটিয়া ঘরে ইং ৯১৫২ সালে এই স্কুলের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আব্দুস সোভান সাহেবের

মিউনিসিপ্যাল উচ্চ বিদ্যালয় (ইং ১৯৫২ সাল)

হস্তক্ষেপে ইং ১৯৫৪ সালে উহা উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নতি হইলে এই বিদ্যালয় 'সোভানিয়া হাই স্কুল' নামে অভিহিত হয়। কিন্তু, পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্টের নির্দ্দেশানুসারে কোন জীবিত ব্যক্তির বিশেষত: কোন সরকারী কর্মচারীর নামানুসারে প্রতিষ্ঠানের নাম করণ হইবে না বিধায় স্কুলটির সরকারী নাম পরিবর্তিত করিয়া "মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল" রাখা হয়। রাজশাহীর পূর্বতন ডি সি, জনাব নাজিরের সময় বহুতর সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইলে স্কুলটির নাম করণ তৃতীয় বারের জন্য "কোর্ট এ্যাকাডেমী" হয়।

এই স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীরাধা বিনোদ সরকার। সোভানিয়া হাই স্কুল নাম করণের পূর্বে কিছুকালের জন্য ইহা হরগ্রাম হাই স্কুল নামেও পরিচিত ছিল। ৬ষ্ঠ মান হইতে দশম পর্য্যন্ত বর্তমান ছাত্র সংখ্যা শতাধিক। শিক্ষক সংখ্যা ৯ জন।

ইং ১৯৫৯ সালে জনাব আব্দুল হাদী ও রহমত আলী শাহ যুব কর্মীর উদ্যোগে এই বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়। এই বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা তদানীন্তন জেলা

কায়েদে আজম উচ্চ বিদ্যালয় (ইং ১৯৫৯ সাল)

ম্যাজিষ্ট্রেট খান মুহাম্মদ শামসুর রহমান ইহার নামকরণ করেন 'কায়েদ-ই-আজম হাই স্কুর'। বর্তমান ছাত্র সংখ্যা প্রায় দুই শতাধিক। শিক্ষক সংখ্যা ৭ জন। প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন জনাব আব্দুল আজি মির্জ্জা।

আজাদী লাভের পর আমাদের জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অনেকেই উপলব্ধ করিতে পারিয়াছেন। রাজশাহী সিটি কলেজ এই শিক্ষা প্রীতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাজশাহী সিটি কলেজ রাজশাহী কালেক্টারীর মসিজীবীদের কর্ম প্রচেষ্টার একটি প্রত্যক্ষ পুরষ্কার। একদিন এই মসিজীবীরা উচ্চ শিক্ষার নিমিত্তে ত্যাগ ও ধৈর্য্য ধারণ

রাজশাহী সিটি কলেজ (ইং ১৯৫৮ সাল)

করিয়াছিলেন বলিয়াই তো আজ তাহারা তাহার বিনিময়ে অনেকেই আইন ব্যবসা ও অধ্যাপনা করিতেছেন। ডিগ্রীধারী হওয়ায় কাহারো কাহারো পদোন্নতি ঘটিয়াছে। জাতীয় শিক্ষার মান অবশ্যই উন্নীত হইয়াছে।

পূর্ব কথা

ইং ১৯৫২ সালে রাজশাহী গভর্ণমেন্ট কলেজে নৈশ ইন্টারমিডিয়েট কমার্স ক্লাস খোলা হইলে এই আই, এম ক্লাসের কতিপয় উত্তীর্ণ ছাত্র অত্র কলেজেই নৈশ বিভাগে বি, কম পড়িতে চাহিয়া বিফল মনোরথ হন। কলেজ বি, কম ক্লাস না খুলিলে ছাত্র এবং জনসাধারণ সকলেই রাজশাহীতে একটি নৈশ কলেজের স্বপ্ন দেখিতে থাকেন।

ইং ১৯৫৬ সালে রাজশাহী পৌর সভার তদানীন্তন চেয়ারম্যান মরহুম জনাব শাম্‌শ্‌-উল সাহেবের আহ্বানে জুন মাসে তৎকালীন ডি, এম, কেরামত আলী সাহেবের সভাপতিত্বে 'মিউনিসিপ্যাল হলে' রাজশাহীর উল্লেখযোগ্য নাগরিকদের এক সভায় "নৈশ মহাবিদ্যালয়" স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং অত্র সভায় শাম্‌শ্‌-উল-হক্‌

সাহেবের উপর সর্বব্যবস্থাপনার ভার অর্পিত হয়। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্য শাম্‌শ্‌-উল-হক্‌ সাহেবের পক্ষে এ ব্যাপারে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই এবং রাজশাহীবাসী কলেজের কথা বিস্মৃত প্রায় হইয়া গেল।

দ্বিতীয় দফায় রাজশাহী "মিনিসটোরিয়াল এ্যাসোসিয়েশন" এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং ডি, এম, জনাব ওসমানের পৃষ্ঠপোষণায় ইং ১৯৫৭ সালের শেষাশেষি শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক সভায় (কালেক্টরের এজলাসে) নৈশ মহাবিদ্যালয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ওসমান সাহেবকে সভাপতি করিয়া জেলা বোর্ডের সভাপতি, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান; সদর এস, ডি, ও; প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট কাজী আজিজুল ইসলাম জনাব কসির উদ্দীন মৃধা, লোকনাথ স্কুলের সম্পাদক জনাব রহমত আলী (উকিল) এবং আব্দুর মৌঈজ প্রমুখ ব্যক্তিদের লইয়া একটি এ্যাড হক্‌ গভর্ণিং বডি গঠিত হয়। ইহা স্থির হয় যে, প্রাথমিক অবস্থায় কলেজের কাজ স্থানীয় লোকনাথ স্কুল ভাগেই সম্পাদিত হইবে। এই মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট মাসিক ভাড়ায় স্কুল গৃহে রাত্রিতে কলেজের ক্লাস ইত্যাদি করিবার অনুমতি লওয়া হয়।

কলেজের প্রথম অধ্যক্ষরূপে বিখ্যাত গাণিতিক মরহুম জনাব আব্দুল করিমকে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়। তিনিই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

অল্প কিছুকাল পরেই জনাব ওসমানের স্থানীয় কতিপয় নাগরিকের চক্রান্তে বদলি হইয়া গেলে কলেজের ভবিষ্যত সর্ম্পকে প্রতিষ্ঠাতাদের মনে দুর্ভাবনার উদয় হয়। কিন্তু জনাব ওসমানের স্থলাভিষিক্ত জনাব কে, এম শামশু-উর-রহমান সে দুর্ভাবনার নিরসন করেন। এই উদ্যোগী এবং পন্ডিত রাজপুরুষটি নিজ হস্তে কলেজের কতৃত্বভার গ্রহণ না করিলে কলেজটির বর্তমান শ্রী সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। কলেজের উন্নতি কল্পে তদানীন্তন সদর মহকুমা হাকিম জনাব রুহুল আমিন মজুমদারও যথেষ্ট করিয়াছেন। কমীদের মধ্যে আর সকলের সহিত 'রাজশাহী মিনিসট্রিয়াল এ্যাসোসিয়েশনের' সম্পাদক জনাব আব্দুল কাদেরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

সকলের আপ্রাণ চেষ্টায় ও অতন্দ্র পরিচর্য্যায় প্রতিষ্ঠানটি মাত্র ৪০/৪৫ জন ছাত্র লইয়া আই,এ কলেজরূপে যাত্রা শুরু করিয়া আজ বিপুলাকৃতি ডিগ্রী কলেজে পরিণত হইয়া দিবা ও রাত্রি দুই ভাগে জ্ঞানের আলো বিতরণ করিতেছে। সত্যিই রাজশাহীবাসীর জ্ঞান তৃষ্ণার ইহা অপর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। জনাব এস, এম, আব্দুল লতিফ বর্তমান ভাবপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ।

কলেজের নিজস্ব ডিগ্রী বিভাগের গৃহটি নির্মাণে রাজশাহীর পূর্বতন ডি,সি, দুর্দ্ধর্ষ কর্মী পি,এ, নাজিরের প্রচেষ্টা সর্বাগ্রগণ্য।

রাজশাহী মহিলা কলেজ (ইং ১৯৬২ সাল)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেজিষ্ট্রারার মৌলবী ওসমান গণি প্রমুখ কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি অগ্রগামী হইয়া রাজশাহী পি,এন,বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতল গৃহে ইং ১৯৫৭ সালে "রাজশাহী মহিলা কলেজ" নামে একটি কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইংরেজী ১৯৬০ সালে ছাত্রীর অভাবে তাহা বন্ধ হইয়া যায়।

ইংরেজী ১৯৬২ সালে জনাব আয়েন উদ্দীন ও শাহ আব্দুল গোফুর চৌধুরী প্রমুখ কর্মী অগ্রগামী হইলে এই সালের নভেম্বর মাসে স্থানীয় সরকারী কলেজ হইতে ১২ জন

ছাত্রী লইয়া (মোট ২০/২২ জন সহ) জনাব পি,এ, নাজিরের ঐকান্তিক চেষ্টায় প্রাদেশিক সরকার এই পুনর্জীবিত কলেজের কার্য্য ত্বরান্বিত করিবার জন্য প্রথম পর্য্যায় পাঁচলক্ষাধিক টাকা সাহায্য করেন। তারপর ইহার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তদানীন্তন বিভাগীয় কমিশনার জনাব কাজী মখলেসুর রহমান চেষ্টা করিতে থাকেন। অতঃপর সুষ্ঠুভাবে ইহার কার্য্য চলিতে থাকে। বর্তমানে একটি ১ম শ্রেণীর আবাসিক কলেজের পরিকল্পনা অনুযায়ী ইহার গঠন কার্য্য চলিতেছে। বর্তমানে উত্তর বঙ্গের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র স্থলে রাজশাহীতে এই মহিলা কলেজের পূর্ণ রূপায়ণ হইলে অত্র বিভাগে এই কলেজ একটি উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

লক্ষ্মীপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (ইং ১৯৬০ সাল)

রাজশাহীর প্রবীন কর্মী জনাব মাদার বখশ ও জনাব আব্দুল গোফুর প্রমুখ কর্মীর উদ্যোগে লক্ষীপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়। ইং ১৯৬০ সালে ইহাতে নবম মান পর্য্যন্ত খোলা হয়। কিন্তু তখন উপর শ্রেণীতে আশানুরূপ ভাবে ছাত্রী না পাওয়ায় ইং ১৯৬১ সালে উহা জুনিয়র হাই স্কুলে পরিণত হয়। ইং ১৯৬২ সালে পুনরায় উহাকে হাই স্কুলে উন্নীত করা হইয়াছে। শতাধিক ছাত্রী লইয়া ইহার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। এখন ইহার ছাত্রী সংখ্যা চারি শতাধিক। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী ১২ জন।

প্রিপেটারী স্কুল (ইং ১৯৫৮ সাল) ও সরকারী এতিমখানা (ইং ১৯৫৮ সাল)

তদানীন্তন স্বনামধন্য ডেপুটী কমিশনার খান মোহম্মদ শামসুর রহমান সাহেবের চেষ্টায় ইং ১৯৫৮ সালে এই স্কুল স্থাপিত হয়। সাধারণত: সরকারী কর্মচারী ও বিত্তশালী লোকদের ছেলে মেয়েরা এখানে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। ইংরেজীর মাধ্যমে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা ৫০ জনের কিছু অধিক।

ইংরেজী ১৯৫৮ সালে এখানে একটি সরকারী এতিমখানা স্থাপিত হয়। বর্তমানে এতিমের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। ইহাদিগকে লালন-পালন করিয়া উপযুক্ত শিক্ষা দানে স্বয়ং সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষক ও পরিচালক মণ্ডলীর আবশ্যক। স্থানাভাব ইহার প্রধান সমস্যা।

আদিবাসী ছাত্রাবাস (ইং ১৯৫৭ সাল)

ইংবেজী ১৯৫৭ সালে ১লা জানুয়ারী সাগরপাড়াতে একটি ভাড়াটে বাড়ীতে ১৯ জন ছাত্র লইয়া এই ছাত্রাবাসের সূত্রপাত হয়। এই ছাত্রাবাসে পায় ৩০ জন ছাত্র থাকিয়া স্থানীয় কলেজ ও বিভিন্ন স্কুলে পড়াশুনা করিতেছে। বর্তমানে এই ছাত্রাবাসে প্রায় ৫০ জন ছাত্র থাকিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

রাজশাহীর আদিবাসী প্রধান শ্রীসাগরাম মাঝি (প্রাক্তন এম, পি, এ) তাঁহার সম্প্রদায়ের শিক্ষার উন্নতি ও ব্যাপক প্রসার কল্পে এই ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করেন। আদিবাসীর ছেলে মেয়ে উচ্চ শিক্ষা পাইয়া পাকিস্তানের আর আর জনের মত সুযোগ সুবিধা লাভ করিবে এই উদ্দেশ্যে সাগরাম মাঝি বহু ত্যাগ স্বীকার পূর্বক ইহার গঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

মুকুল ফৌজ ও উত্তরায়ণ কচিকাঁচা

পাকিস্তান সরকারও ইহাদিগের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছেন। এখানে 'মুকুল ফৌজ' (পুনঃগঠিত ইং

১৯৫৬ সাল) ও উত্তরায়ণ (ইং ১৯৬০ সাল) 'কচিকাঁচা' নামক পৃথক দুইটি সমিতি আছে। শহরের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা অধিকাংশই ইহার সভ্য। পাকিস্তানের জাতীয় দিবস ও অন্যান্য তিথি পরবে ইহারা নানা প্রকার কুচ-কাওয়াজ দেখাইয়া থাকে।

রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হইলে উত্তর বঙ্গের আর একটি সমস্যার সমাধান হইবে। ইং ১৯৬০ সালে উত্তর বঙ্গে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইং ১৯৬১-৬২ সালে রাজশাহী শহর ও মতিহার

**রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (ইং ১৯৬৪ সাল)**

ইউনিভারসিটির মধ্যস্থলে ইহার স্থান নির্বাচন করিয়া ১৪৪ একর জমি হুকুম-ক্রয় করা হয়। মোট ৮৪,৩৩,০০০ টাকা ব্যয়ে এই ইঞ্জিনিয়িারিং কলেজের প্রাথমিক কার্য্যাদি সুসম্পন্ন করা হইবে। আপাততঃ প্রায় ৩১,১০,০০০ টাকা ব্যয়ে অফিস গৃহ, ১৫০ জন থাকিবার জ্য ছাত্রাবাস ও ওয়ার্কস্ সপ, ক্লাস রুম, লাইব্রেরী, ক্যান্টিন, মসজিদ, খেলার ময়দান এবং ল্যাবোরেটরী প্রভৃতি নির্মাণের কার্য্য প্রায় সমাপ্তির পথে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এই তিনটি ল্যাবোরেটরী লইয়া আপাততঃ এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রাথসিক কলেবর। ইং ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর হইতে এই কলেজে ছাত্র ভর্তি শুরু হইবে। প্রথমতঃ ১২০ জন ছাত্র ইহাতে ভর্তি হইতে পারিবেন। পরবর্তী কালে তিন শতাধিক ছাত্র ভর্তি করা সম্ভবপর হইবে। এই হইল রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রথম পর্য্যায়ের সার কথা।

রাজশাহী সার্ভে ইনষ্টিটিউটের ন্যায় আর একটি টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট রাজশাহী ষ্টেডিয়ামের সন্নিকটে সরকার কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। ইহাও একটি উল্লেখযোগ্য

**রাজশাহী টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট (ইং ১৯৬৩ সাল)**

প্রতিষ্ঠান। প্রধানতঃ ওভারসিয়ার, সাব-ওভারসিয়ার প্রস্তুতই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্যে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দপ্তর, ক্লাস রুম, শিক্ষকদের বাসগৃহ, ৮০ জন ছাত্র থাকিবার জন্য ছাত্রাবাস, ওয়ার্কসসপ ও খেলিবার ময়দান ইত্যাদি নির্মাণ করিতে ১৬ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে।

দেশের উন্নয়ন কার্য্যক্রমে ইঞ্জিনিয়ারদের ভূমিকা আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বাপারে আমাদের জাতীয় সরকার প্রশংসনীয় চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন। ইহা সাধারণের পক্ষে আশা ও আনন্দের কথা। এই প্রসঙ্গে উত্তর বঙ্গের নতুন-পুরাতন নদী-নালা-খালবিল ও পথঘাট প্রভৃতি সংস্কারের কথা বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য।

ইং ২৯৬২ সালে সরকার কর্তৃক রাজশাহীতে একটি অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপিত

**রাজশাহী সরকারী অন্ধ বিদ্যালয় (ইং ১৯৬২ সাল)**

হইয়াছে। একানে ৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক অন্ধ ছেলে মেয়েদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে হাতে কলমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের নিজস্ব ছাত্রাবাসে গরীব ছেলেমেয়ে বিনা ব্যয়ে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারে। এখানে বিকলাঙ্গদেরও কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৩০ জন। উপযুক্ত শিক্ষক মণ্ডলীর দ্বারা ইহা পরিচালিত হইলে আমাদের সমাজের প্রভূত উপকার হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

রাজশাহীতে দারসে নিজামিয়া বা খারিজি) উচ্চ আরবী শিক্ষার নিমিত্তে রাজশাহী সদর কাছারীর উত্তর ধারে 'দারুস্ সালাম মাদ্রাসা' নামে একটি মাদ্রাসা গড়িয়া উঠিতেছে। ইহাতে বর্তমানে মাদ্রাসা আলিয়ার নেছাবে আলেমের দ্বিতীয় মান পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। এখানে টাইটেল শ্রেণী সমূহ খোলার জন্য স্থানীয় কর্মীবৃন্দ প্রশংসনীয় চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন। ইং ১৯৫৭ সালে এই মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। প্রকাশ থাকে যে, ইং ১৮৭৪ সালে এই রাজশাহী শহরের বুকে প্রথম বর্ষেই ছিনিয়র মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছিল। ইং ১৯৩০ সালের দিকে আসিয়া উহাই নিউস্কীম মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হয়। ইহাই বর্তমানে 'রাজশাহী সরকারী মাদ্রাসা।

বাজশাহী দারুস সালাম মাদ্রাসা (ইং ১৯৫৭ সাল)

রাজশাহীর যানবাহন ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত। পাকিস্তান আমলে ইহার চরম উন্নতি হইয়াছে। শহরের রাস্তা পথে প্রাচীন গো-শকট, পাল্কী, ফিটন, ডুলি প্রভৃতির পরিবর্তে বর্তমানে মটর, টমটম, রিকশো, স্কুটার, সাইকেল ও নদী পথে ষ্টিমারের পরিবর্তে মটরলঞ্চ, নৌকা প্রভৃতি বাহনের ব্যবস্থা আছে। এতদব্যতীত রেল ও উড়ো জাহাজের বন্দোবস্ত তো আছেই। রাজশাহী জেলায় দুইটি মটর বাস ইউনিয়ন রহিয়াছে। সদরে রাজশাহী মোটর ইউনিয়ন অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। বর্তমানে মটর বাসে ভ্রমণ অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ইং ১৯২৬ সালে 'রাজশাহী মোটর ইউনিয়ন' স্থাপিত হয়। নাটোর ও শহরের মোটরবাসগুলি এই ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রাধীন। এতদব্যতীত নওগাঁতে একটি মটর ইউনিয়ন আছে।

যানবাহন সমিতি (ইং ১৯২৬ সাল)

রাজশাহীর আইনজীবী উকিল ও মোক্তারদের পৃথক পৃথক দুইটি বার আছে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান বেশ প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। এই বারদ্বয়ে খ্যাতনামা প্রাচীন আইনজীবীদের আলোক চিত্র, এতদসহ–উকিল বারে সহস্রাধিক দুষ্প্রাপ্য আইন গ্রন্থ আছে।

উকিল ও মোক্তাব বাব

রাজশাহী "চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ (পুনর্গঠিত ১৯৫১) ও "মুসলিম চেম্বার্স অব কমার্স" নামক দুইটি পৃথব সমিতি আছে। এতদব্যতীত মহাজনী ব্যবসায়ীদের (ইং ১৯৪৮ সাল) এবং 'পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক' প্রভৃতি সমিতি রহিয়াছে।

অন্যান্য সমিতি

অতি প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গের রেশম, কার্পাস ও পট্টবস্ত্রের কথা অবগত হওয়া যায়। জাতির প্রয়োজনের তাগিদে এই বঙ্গ ভূমিতেই যুগে যুগে এই সম্পদের চাষ হইয়াছে এবং ব্যবসায় বাণিজ্য চলিয়াছে। কখনও ইহার চরম উন্নতি হইয়াছে, আবার কখনও ইহার চরম অবনতিও ঘটিয়াছে। এই ভাবে এই সম্পদ বাঙ্গালীদের সঙ্গে সঙ্গী হইয়া চলিয়াছে।

বেশম ও লাক্ষ্যা গবেষণাগার

প্রকৃত পক্ষে পাক-ভারতে বাঙলা দেশেই রেশম চাষ ও ইহার ভাণ্ডার ছিল। মোঘল যুগে সমগ্র বঙ্গের রেশম কেনা- বেচার কেন্দ্র ছিল রামপুর বুয়ালিয়া (রাজশাহী) কাশিম বাজার ও কুমারখালী বন্দর।

কাশিম বাজারে মুর্শিদাবাদ তথা পশ্চিম বঙ্গের উৎপন্ন রেশম আমদানী হইত। আর

* বর্তমান কুষ্টিয়া জেলা।

পূর্ব্ব বঙ্গের উৎপন্ন রেশম আমদানী হইত রামপুর বুয়ালিয়া ও কুমারখালীতে*। বিশেষত: ইংরেজ আমলের সমগ্র রাজশাহী বিভাগের রেশমাদি "রামপুর বুয়ালিয়া বন্দরের একচেটিয়া ছিল এবং এখান হইতেই দেশ- দেশান্তরে উহা চালান যাইত। তখন এখানকার রেশম যেমন উৎকৃষ্ট ছিল–ফলন হইত তেমনি প্রচুর। সেই জন্য বুয়ালিয়াতে কলকারখানা ও ব্যবসায়ীর সংখ্যাও ছিল অনেক বেশী। এই রেশম ব্যবসাই বুয়ালিয়ার ভাগ্য পরিবর্তন করিয়া আজ রাজশাহী বিভাগীয় শহরের মর্য্যাদা আনিয়া দিয়াছে। তখন বেঙ্গল সিল্ক বা বাঙ্লার রেশম বলিতে 'রামপুর বুয়ালিয়ার রেশমই বুঝাইত।

বলা বাহুল্য বাঙ্গালীর এই রেশম সমৃদ্ধিই সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে ইংরেজদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। তাহারা দীর্ঘ দিন ধরিয়া বাঙ্লার ভূমিতে রেশম ও নীল উৎপাদন করিত এবং নিজেদের দেশে চালান করিয়া রাশি রাশি অর্থ মুনাফা করিয়াছিল। তারপর সমগ্র ইউরোপ জার্ম্মান, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ বাঙলার ভূমির সহিত ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত হইবার পূর্বেই সুচতুর ইংরেজ তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া শাসন দণ্ড কবলিয়াত করিয়াছিল। তখন পাশ্চাত্য রেশম ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধীরে ধীরে বাঙ্লার রেশম ব্যবসায়ে অবনতি ঘটে। অতপর ১৯০ বৎসর ধরিয়া তাহারা এদেশে শাসন- শোষণের এক শেষ করিয়া ইউরোপ ভূ-খণ্ডকে জগত বরেণ্য করিয়া তুলিয়া তারপর তাহারা বাঙলা ত্যাগ করিয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালীরা কোন দিনই নীরব দর্শকেব ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। ইংরেজ আমলে তাহারা নির্য্যাতিত হইয়াছে, কোণঠাসা হইয়া থাকিয়াছে–তথাপি তাহারা তাহাদের ইতিহাস ও সাহিত্যে সেই সম্পদ, সেই সমৃদ্ধির কথা যুগে যুগে রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। তাই আজাদী লাভের পর পূর্ব্ব পাকিস্তানীরা নিজেদের প্রাচীন সম্পদ ও সমৃদ্ধির কথা মনে করিয়াই আজ বিভিন্ন ও বাণিজ্যের সূত্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে নয়া সামগ্রীকেও অভিনন্দন জানাইতেছে। আজিকার রাজশাহীর 'রেশম ও লাক্ষ্যা গবেষণাগার' পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের সুচিন্তিত ঐতিহ্য প্রীতিব পরিচায়ক।

ইংরেজী ১৯৫৯-৬- সালে পূর্ব্ব পাকিস্তান সকরার প্রায় ৯৩ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে জাপান, জার্মান, মার্কিন ও যুক্তরাজ্য হইতে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি আনিয়া রাজশাহীর 'সেরিকালচার ও লাক্ষ্যা গবেষণাগার' স্থাপন করিয়াছেন। বর্তমানে এই কারখানাব বিভিন্ন শাখায় প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক কার্য্য করিতেছে।

**রাজশাহীব বিভিন্ন শিল্প ও শিল্পাঞ্চল**

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ষ্টেটে বিভিন্ন শ্রেণীর ছোট ও মাঝারী ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। কতকগুলি ইতিমধ্যেই চালু হইয়া গিয়াছে। আর কতকগুলি চালু হইবার সম্মুখীন হইয়াছে। ষ্টেডিয়ামের পশ্চিম ও উত্তর ধারে এই ষ্টেট স্থাপিত হইয়াছে। ইহার পশ্চিম ধারে একটি উপশহর গড়িয়া উঠিতেছে।

শিল্পাঞ্চল ছাড়াও শহরের বিভিন্ন স্থানে তৈল মিল, ধান ভানা মিল, বিড়ি, ম্যাচ, জর্দা, ফাউণ্টেন পেন, চুড়ি, সাবান, মেটাল, সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি শিল্প কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই সব কারখানার স্বত্বাধিকারী অধিকাংশই মোহাজের। স্থানীয় লোকের সংখ্যা অতি নগণ্য।

শহরের অন্যান্য উন্নয়ন কার্য্যগুলির মধ্যে 'সাহেব বাজার'–হরগ্রাম বাজার প্রভৃতির উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তালাইমারীতে একটি নতুন বাজার গড়িয়া উঠিতেছে। উপশহরে জন বসতি গড়িয়া উঠিলে আর একটি বাজারের প্রয়োজন হইবে বিবেচনা করিয়াই পূর্ব্ব পাক সরকার রাজশাহীর পৌর সভা কর্তৃক ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজশাহী "গোরহাঙ্গায়" একটি 'নয়া বাজার' নির্মাণ করাইয়াছেন। টাকাটি পৌরসভাকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দান করা হইয়াছে।

পথ ঘাট ও নতুন পাবকল্পনা

আগেই বলিয়াছি বাজার বন্দরের মাধ্যমে রাজশাহী শহরের উৎপত্তি। কোন পরিকল্পনা প্রস্তুতির উপর ইহা স্থাপিত হয় নাই। সেই জন্য দেশ বিভাগের পর যখন ইহা বিভাগীয় সদব কার্য্যালয় রূপে মর্য্যাদা লাভ করে তখন হইতেই ইহার ব্যাপক উন্নয়ন কার্য্যের পর্ব শুরু হইয়া গিয়াছে।

সামরিক শাসন আমলে পূর্ব্ব পাকিস্তানেব স্বনাম খ্যাত কর্মবীর গভর্ণর লেপ্টন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ আজম খান ইং ১৯৬১ সালে ১৩ই সেপ্টেম্বর রাজশাহী শহরে আগমন করিয়া এই শহরের ব্যাপক উন্নয়নেব জন্য একটি মাষ্টাব প্ল্যান রচনা কবিতে অনুরোধ করেন। বর্তমানে এই মাষ্টার প্ল্যানের নকশা অনুযায়ী শহবের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্য্য অব্যাহত আছে। ষ্টেডিযাম, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট স্থাপিত হইয়াছে। নব্বই ফুট চওড়া বাস্তার কার্য্য ত্বরান্বিত হইতেছে। সরকারী কর্মচারীদের আবাসিক কুঠির কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। নতুন পুলিশ হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে।

রেডিও পাকিস্তানের নব নির্মিত ব্রড কাষ্টিং কার্য্যালয় হইতে স্থানীয় কর্মসূচী দশ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ শক্তি সম্পন্ন ট্রান্সমিটারের সাহায্যে ইং ১৯৬৩ সালে প্রচার

বেডিও সেন্টাব

কার্য্য শুরু করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে ইং ১৯৬২ সাল হইতে রেডিও স্থানীয় শিল্পীবৃন্দের সাহায্যে দৈনিক দুই ঘণ্টা করিয়া কর্মসূচী প্রচার করিত।

ওয়াপদার পরিকল্পনানুযায়ী রাজশাহী শহরের পর্ব প্রান্তে ৩৬ একর জমির উপর

ওয়াপদা

তিনটি চৌদ্দ শত (১৪০০) কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ইং ১৯৬৪ সালে স্থাপিত হইয়াছে।

আধুনিক খেলাধূলার বৃহত্তম ক্রীড়া কেন্দ্র 'রাজশাহীর ষ্টেডিয়াম' রাজশাহী বাসীর একটি গৌরবের স্থল।। ইহাতে ২০ হাজারের অধিক দর্শকের স্থান সংকুলান ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইতিপূর্বে এই স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও মিউনিসিপ্যালিটির আদি 'ভাগাড়' ছিল।

রাজশাহী স্টেডিয়াম (ইং ১৯৬২ সাল)

খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান ডেপুটি কমিশনার, রাজশাহীর এই ষ্টেডিয়ামের সূচনা করিয়া যান। আর পি, এ, নাজির ডেপুটি কমিশনার, রাজশাহী ইহাব পূর্ণ রূপায়ন করিয়া ক্রীড়ামোদীদের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতা ভাজন হন।

রাজশাহী শহরে চারি শতাধিক ফোঁকড় বিশিষ্ট স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন ব্যবস্থা চালু

টেলিফোন (ইং ১৯৬৪ সাল)

হইয়াছে। রাজশাহীতে উন্নত ধরনের একটি আধুনিক রুচি সম্মত বাজার প্রতিষ্ঠাকল্পে রাজশাহী মিউনিসিপ্যালিটির উদ্যোগে ১১ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে (ইং ১৯৬৩ সালের ২৩শে মার্চ) একটি বাজার স্থাপিত হইয়াছে।

মিউনিসিপাল মার্কেট (ইং ১৯৬৩ সাল)

এই বাজার প্রতিষ্ঠাকল্পে জনাব পি, এ, নাজিরের বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপের কথা চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। অগ্রবর্তী ডেপুটি কমিশনার জনাব খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান ইহার বীজ বপন করিয়াছিলেন।

সরকারী পরিকল্পনায় পূর্ব্ব পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদির কার্য্যক্রম সহজতর ও দ্রুত উন্নতির জন্য ইং ১৯৬২ সালে রাজশাহী 'বোর্ড অব ইণ্টারমিডিয়েট এ্যাণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশন' স্থাপিত হইয়াছে। এই বোর্ডের প্রথম

ইণ্টারমিডিয়েট মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড

চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব এফ রহমান (ফজলুর রহমান)। বর্তমানে তিনি ই, পি, টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান। রাজশাহী শহরের অদূরে হরিয়ান রেল ষ্টেশনের সন্নিকট পি, আই, ডি, সি, 'এর পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি চিনির কল স্থাপিত হইতেছে।

রাজশাহী প্রেস ক্লাব, রাজশাহীর শিক্ষানবিশ, সংবাদদাতাদের-একটি প্রিয়

প্রেসক্লাব (ইং ১৯৫৬ সাল)

প্রতিষ্ঠান। দেশ বিবাগের পর বিভিন্ন সভা সমিতির মাধ্যমে স্থানীয় যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইয়া আসিতেছিল। এ্যাডভোকেট বীরেন্দ্র নাথ সরকার ও জনাব মোসাদ্দোরোল হক প্রমুখ কর্মী ইহাব নেতৃত্ব করিতেছিলেন। অবশেষে ইং ১৯৫৬ সালে ইহার একটি জোরদার সমিতি গঠিত হয়। ডেপুটি কমিমনার জনবা পি, এ, নাজিরের প্রশংসনীয় চেষ্টায় রাজশাহী জেলা কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ এই ক্লাবের ইমরাত নির্মাণের জন্য দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। ইনকমট্যাক্স আইনজীবী জনাব আব্দুস সালাম ইহার বর্তমান সভাপতি আছেন।

দিকে দিকে রাজশাহীর দুর্বার বিস্তৃতি আগামী শতাব্দীতে শহরের ব্যাপ্তি কত দূরে লইয়া যাইবে সে কথা চিন্তা করিলে স্বভাবতঃই শহরে উপকণ্ঠে অবস্থিত পূর্বাঞ্চলে কাঁটাখালী, পশ্চিমে সোনাইকান্দী এবং উত্তরে নওহাটার কথা মনে করাইয়া দেয়। সর্বগ্রাসী পদ্মার দুহিতার ন্যায়ই নিজ চলার পথ রাজশাহীর এই গ্রাম্য অঞ্চলগুলিকে যে গ্রাস করিলে যে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতের রাজশাহীর সেই বিপুল ও বৈভবময় রাজশাহীর কর্মচঞ্চলরূপের ধ্যান করিতে করিতে আপাততঃ রাজশাহীর ইতিহাস প্রথম খণ্ডের এখানে পরিসমাপ্তি টানিলাম।

— · —

# রাজশাহীর ইতিহাস

[২য় খণ্ড]

কাজী মোহাম্মদ মিছের

# রাজশাহীর ইতিহাস : ২য় খণ্ড

## বিষয়সূচি

## চিত্রসূচি

# রাজশাহীর ইতিহাস : দ্বিতীয় খণ্ড

## ॥ প্রথম পরিচ্ছদ ॥

## জেলা পরিচিতি

পূর্ব্ব-পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত রাজশাহী বিভাগের 'রাজশাহী' একটি বিস্তৃত জেলা। ইহার বর্তমান আয়তন ৩,৬৫৪ বর্গমাইল এবং লোক-সংখ্যা ২৮,১০,৯৬৪ জন (১৯৬১ সালের আদম শুমারী)। এই জেলার বিভিন্ন অংশের আকৃতি প্রকৃতি ও জলবায়ু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। শস্যক্ষেত্র নিম্ন। গ্রাম-পল্লী বৃক্ষশোভিত। মাঠ প্রান্তর শস্যশ্যামল।

এই জেলার পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর; উত্তরে দিনাজপুর, পূর্বে বগুড়া ও পাবনা জেলা; দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত ঘেষিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ পদ্মার প্রাণলীলা। জেলার সদর দপ্তর এই পদ্মার উত্তর তীরে অবস্থিত। বান-বন্যায় পদ্মার যৌবন তরঙ্গ বেশ উপভোগ্য। জেলার পশ্চিমাঞ্চল প্রাচীন কর্মকীতিতে নানা বৈচিত্রপূর্ণ। উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে বিল হাওড় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন বাদাড়ের দৃশ্যাবলী মনোরম। আবহাওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ। শীত বসন্ত ও গ্রীষ্ম বর্ষা খুবই আমোদকর।

বান বন্যায় নদী ও খাল বিলের তীরে অবস্থিত গ্রামগুলি দ্বীপের ন্যায় দেখায়। গ্রীষ্মের সময় প্রখর রৌদ্রে বরিন্দ ও নদী তীরবর্তী গ্রামগুলি দূর হইতে পাহাড়ের চুড়ায় অবস্থিত বলিয়া ভ্রম হয়। দিয়াড় অথবা নিম্নভূমির ঘনবসতি গুলি দূর হইতে বেশ মেঘাচ্ছন্ন অথবা অরন্যময় বলিয়া বোধ হয়।

প্রাচীন দীঘি পুষ্করিণীর উঁচু উঁচু পাহাড়ে অবস্থিত জঙ্গলাদির অভ্যন্তরে (অন্ত্যজদের) সাঁওতাল, শবর, কোল, ভীল, কুমী, মুণ্ডা, পাহারিয়া, উরাও, বুনা,বাগদি,কোচ, নূনে, জেলে, ডোম-হাড়ি, কাপালী ভূমিজ, চামার, চন্ডাল প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা বাস করে। জঙ্গলাবৃত ইহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরের দৃশ্যাবলী মনোরম। সূর্যাস্তের সোনালী কিরণ যখন এই জঙ্গলময় ক্ষুদ্র কুটীরের উপর আলোকরশ্মি বিস্তার করে তখন নানারকম শোভা বর্দ্ধন করিয়া পল্লীপ্রাণে এক অপূর্ব সৌন্দর্য্যের দোলা জাগায়। গ্রাম-পল্লীর তিথি পরবে অন্ত্যজ বধূ বালারা বনের ফুল পাতা খোপায় গুজিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে বেশ ধারণ করে, তাহা আমাদের কৃত্রিম প্রসাধনীর সাজ সজ্জাকেও হার মানাইয়া দেয়। নদী অথবা পুষ্করিণীর ঘাটে সকাল বিকালে পল্লীর বধূদের বাসন মাজা, কাপড়কাঁচা ও কলসী কাঁকে জল আনার দৃশ্য আরও অপূর্ব।

ভরাবর্ষাতে গাং, খাল বিলের মোহনা অথবা ছোট নদীর বাঁকে বাঁকে নানা প্রকারের অসংখ্য নৌকা আসিয়া ভীড় জমায়। নিম্নভূমির স্থায়ী জলপথ গুলোর পরিবর্তে তখন সওদাগরী নৌকাগুলি নূতন জলস্রোতের অনুসরণ করিয়া চলে। মৎস্য শিকারিরা ডোঙ্গা, দুনী, দোনা বাহিয়া বিভিন্ন স্থানে মৎস্য শিকার করিয়া বেড়ায়। চাষীরা সালতি ডিঙ্গি

প্রভৃতি বাহিয়া ক্ষেত খামারে যাতায়াত করে। বাজার বন্দরে সাম্পান ও গয়না নৌকাগুলো ভীড় করিয়া থাকে। নিম্নশায়ী গ্রাম পল্লীতে, বাজার বন্দরে তখন-গমনা-গমনের জন্য একমাত্র নৌকার বাহনই দৃষ্ট হয়। উৎসব আনন্দে আবার এইসব নৌকা নানা রঙ্গ-বেরঙ্গে সজ্জিত করা হয়। এখানকার নৌকাবাইচের উৎসব অপূর্ব। সওদাগরী নৌকাগুলি ছাড়া বিশিষ্ট নৌকাগুলির অভ্যন্তরে গৃহের ন্যায় সপরিবারে বসবাস করা যায়। জেলার বিত্তশালী লোক ও সরকারী কর্মচারীগণ কখন কখন এইসব নৌকা-বিহারে জেলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে, কখনও বা জেলান্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। নৌকা ভ্রমণের বেলায় কেবল রাজশাহী জেলাতে নয়, পূর্ব-পাকিস্তানেব সকল জেলাগুলিতেই নৌকা ভ্রমণ খুবই আনন্দদায়ক।

এখানকার নদী ও দীঘি পুষ্করিণীগুলি নানাভাবে মানুষের জীবন জীবিকার সহায়ক। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অধিকাংশই নদী অথবা দীঘি পুষ্করণীর জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। জেলার পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের গরীব গ্রামবাসীরা গ্রীষ্মের সময় দুই তিন মাইল দূর হইতে আসিয়া গরু অথবা মহিষেব গাড়ীর সাহায্যে মটকী (জালা), ডোল প্রভৃতি দ্বারা নদী হইতে জল বহন কবিয়া লইয়া যায়। স্থান বিশেষে নলকূপ ইন্দারা থাকা সত্ত্বেও তাহারা নদীর জলই ব্যবহার কবে। গ্রামীণ প্রাচীন পন্থী বৃদ্ধরা অনেক সময় স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী মনে করিয়া নদী অথবা পুষ্করিণীর জলকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র জ্ঞান করে। এই অর্থে দেখা যায় গ্রীষ্মের সময় অনেক স্থানে নদী প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে তবুও তাহারা নদীতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অন্বেষণে বালি সরাইয়া কূপ খনন করত: তথা হইতে জল উঠাইয়া লইয়া যায়। পদ্মা, মহানন্দা ও আত্রাই হিন্দুর পুরাণ প্রসিদ্ধ নদী। সেই জন্য তীর্থ উপলক্ষে তাহারা এই নদীত্রয়ে স্নান তর্পণ করিয়া থাকে।

নাটোর অঞ্চলে নদীকূলবতী কাপালিক সম্প্রদায়ের আচরণ যেন একটু ভিন্ন প্রকৃতির। নিকটবতী নদীতে জল থাকিতে, তন্নিকটবর্তী দীঘি পুষ্করিণীর জল স্বচ্ছ হইলেও তাহারা তাহা ব্যবহার করে না। তাহারা প্রকৃতির স্রোতকে পবিত্র জ্ঞান করে। যেহেতু নদীর কূল তাহাদেব একমাত্র আশা ভরসা। সেই হেতু নদী কূলেই তাহাদের বাসের চিবাচরিত বীতি। এই জন্য তাহারা নদীকে এতখানি পবিত্র জ্ঞান করে । নদী ও বিল অঞ্চলের নারী পুরুষেরা সাধারণত: দুঃসাহসিক। সন্তরণ ও নৌকা চালনায় তাহারা বেশ পটু। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীরা (বিশেষত: শিঙ্গরা অঞ্চলে) নৌকা চালাইয়া এপারে ওপারে যাতায়াত করে। ঝড়, তুফান বন্যাপ্লাবিত খাল বিলে বালক বালিকারাও নৌকা বাহিয়া দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেয়। অনেক সময় বান বন্যার জলোচ্ছ্বাসে তাহাদের বাড়ীঘর ভাসিয়া যায় তবুও তাহারা নদীকূল ত্যাগ করে না। মরিয়া হইয়াও সেই নদীর কূল অথবা বিলের পাড়ে বাস করে। এইখানেই-নদীও মানুষের সম্বন্ধ কত গভীর তাহা উপলব্ধি করা যায়।

নদী তীরবতী গ্রামগুলির জলবায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকাবী কিন্তু বিল অঞ্চলের জলবায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে ততখানি উপকারী নয় বলিয়া বিল অঞ্চলের লোকের স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়। প্রায়শঃ তাহারা নানা প্রকার কঠিন পীড়া অথবা সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। বিশেষত: যে বিলের জল নিকাশের কোন ব্যবস্থা নাই সেই সব বিলের জল-বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। কারণ. এই সব বিলে বিস্তর মাছ থাকে, জলজ উদ্ভিদ

গুল্মাদি জন্মে, অসংখ্য পশু-পক্ষীর বাস। এই জন্য বিলের জলবায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে। বিল-ভাতিয়া এই শ্রেণীর একটি বিল।

আবার বিল হাওড়ে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়। তাহাতে আয়ও হয় যথেষ্ট। এই সব মাছ ধরিবার নানা প্রকার যন্ত্রপাতি রহিয়াছে। মৎস্য শিকারিরা সেইসব যন্ত্রপাতি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া থাকে। হাটে বাজারে কতক ক্রয় বিক্রয়ও হয়। রাজশাহীর হাটে বাজারে প্রচুর পরিমাণে নানা প্রকারের মৎস্য আমদানী হইয়া থাকে। পদ্মায় ইলিশ বিখ্যাত। মাছের ন্যায় মাংসও এই জেলার বিশিষ্ট খাদ্য। পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের হাট গুলিতে বকরীর মাংসের আধিক্য দেখা যায়। উত্তর অঞ্চলের বড় বড় হাট গুলিতে মহিষের মাংস প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়। অন্তজরা নিজ নিজ পল্লীতে শূকর বধ করিয়া উহার মাংস ভক্ষণ করে।

এই জেলার ভূমি সমতল নহে। উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব দিকে ঢালু। মৃত্তিকা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কাঁকরময়, বরিন্দ ও উর্বরা-কিন্তু সাধারণত: ইহা 'বরিন্দ' বা 'বরিন্দ' ও দিয়াড়া এই দুই নামে পরিচিত। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল সমতল ও ঈষৎ উন্নত। নদীর কূলবর্তী স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চ। অঞ্চল হিসাবে থানা পত্নীতলা, ধামৈর হাট,গোদাগাড়ী, গোমস্তাপুরের বহুলাংশ বরিন্দা অঞ্চল; নাচোল, মান্দা, তানোর, পোরশা ও নিয়ামতপুর, পত্নীতলা ধামৈরহাট এই কয়েকটি থানার ভূমি ঈষৎ রক্তাক্ত। গোমস্তাপুরের পশ্চিম হইতে শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, বদলগাছির আংশিক ও নওগাঁ থানার ভূমি বালুময়; মেটেল ও ঈষৎ কৃষ্ণ। এই অঞ্চলের ভূমির উর্বর শক্তি খুব বেশী। রবিশস্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জেলার সদর হইতে কিছুদূরে পশ্চিম দিকে গোমস্তাপুর থানার পূর্বাঞ্চল, গোদাগাড়ী থানার উত্তর-পূর্বাঞ্চল বক্রভাবে খানিকটা দক্ষিণ অঞ্চল ও নাচোল, পোরশা, নিয়ামতপুর, মান্দা,তানোর, পত্নীতলা, ধামৈরহাট এই কয়েকটি থানার অধিকাংশ ভূমি কাঁকরময়। কোথাও কোথাও স্তূপের ন্যায় ও বরিন্দ।

জেলার মধ্যভাগে পশ্চিম দিক হইতে পূর্বদিকে চলন পর্যন্ত বিল অঞ্চল ধরা যায়। আষাঢ় মাস হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান জলে পূর্ণ থাকে। জেলার পশ্চিম প্রান্ত বিল ভাতিয়ার বিল, কুমারী দহের বিল, খিরির বিল, প্রভৃতি বিল। মধ্যভাগে বিলকুমারীর বিল, ঘুকশীর বিল, মাদার বিল ও উত্তর পূর্ব দিকে চ্যাংগার বিল এবং পূর্বদিকে বিস্তৃত চলন, বিল বিখ্যাত। নদীর মধ্যে দক্ষিণ সীমান্তে পদ্মা, পশ্চিমে মহানন্দা মধ্যভাগে আত্রাই প্রধান।

এই জেলার বরিন্দ অঞ্চল ব্যতীত অধিকাংশ ভূমি উর্বরা ও নানা প্রকার ফসলের উপযোগী। বরিন্দ অঞ্চলে সাধারণত: আমন ধানের চাষ হইয়া থাকে। নিম্নভূমিতে ও বড় বড় নদীর বেলা ভূমিতে বুনা, আশু (আউষ) ও জলাভূমিতে আমনের চাস হয়। নিম্ন জলাভূমি সব সময় জলমগ্ন থাকে। সেইজন্য কেবলমাত্র একটি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়। নদীকুলবর্তী ভূমিতে ও দিয়াড় অঞ্চলে নানা প্রকার রবিশস্যের চাষ হয়। মরিচ, করলা, আলু, পটল, শাক-সবজি,কফি তরমুজ, বাঙ্গী, (লালিম) ও ফুটি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

রাজশাহী জেলা মুসলমান প্রধান হইলেও আরও নানা শ্রেণীর জাতির বসবাস আছে। ইহারা প্রধাণত: নমশূদ্র, অন্ত্যজ ও বর্ণ হিন্দু। এখানকার বর্ণ হিন্দুগণ সংখ্যায়

নগণ্য হইলেও বিষয় বুদ্ধিতে সুচতুর। কিছু সংখ্যাক নবদীক্ষিত খ্রীষ্টান রহিয়াছে। তাহারা অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীভূক্ত। আজাদী লাভের পর বহু সংখ্যক মোহাজের এ জেলার বিভিন্ন স্থানে আগমন করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। এতদব্যতীত ত্রিপুরা, নোয়াখালী, পাবনা প্রভৃতি জেলা হইতেও কয়েক সহস্র লোক সপরিবারে আসিয়া অত্র জেলার পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছে।

মফঃস্বলের কৃষি-জীবিদের অধিকাংশই বাড়ীঘর মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত। জোতদার শ্রেণীর ধনাঢ্য ব্যক্তিরা দ্বিতল মৃত্তিকা গৃহে বাস করেন। উর্বরা বা দিয়াড়া অঞ্চলে সাধারণত: বাঁশের চাটাই দ্বারা বা বেড়ার ঘরবাড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইসব বাড়ী ঘরে সাধারণতঃ খড়ের চাল দেওয়া হয়। টীনের চাল কদাচিত দেখা যায়। শহর বন্দর অঞ্চলের অধিকাংশ বাড়ীঘর পাকা।

জেলার কোন কোন পল্লীতে একাধিক দলীয় লোকের বাস বর্তমান। বর্তমান যুগের ফিরিঙ্গি কালচারের ব্যাপকতা পল্লীর কুটীরে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করিতেছে। দেশী খেলাধূলার আখড়া অধুনা আর তেমন পরিলক্ষিত হয় না। পাশ্চাত্যের ইংরেজী মার্কা তাসের আড্ডা ও ফুটবল খেলার আখড়া বড় বড় পল্লীতে স্থায়ী আসন পাইয়া বসিয়াছে। অথচ এই শতকের গোড়ার দিকেও রাজশাহীর পল্লী-প্রান্তরে একাধিক ব্যায়ামগার ছিল। সেই সব ব্যায়মাগারে যুবকেরা নানাপ্রকার দেশী খেলাধূলা ও ব্যায়াম চচ্চা করিত। তাহাদের স্বাস্থ্যও ছিল তেমনি সবল ও দর্শনধারী।

ধর্ম কর্ম বলিতে যত্র তত্র মসজিদ আর মন্দিরের ছড়াছড়ি; অথচ পরস্পরের সদ্ভাব খুব কম। চুরি ডাকাতি খুন-খারাবী হইতে দেশ আজও সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। আধুনিক কালে আর একটি বিষয় বিশেষ লক্ষনীয়। তাহা হইল মুসলমানের 'উরস' আর হিন্দুর 'হরিবাসর'। মানুষের ধর্মীয় বিপর্য্যয়ের যুগের ইহা এক নূতন অবলম্বন বটে। এতদসত্ত্বেও খ্রীষ্টান মিশনারীদের সংখ্যা শতগুণে বাড়িয়া চলিয়াছে!

আজ হইতে বিশ বৎসর পূর্বেও রাজশাহী জেলার পল্লী প্রান্তরে একাধিক গো-মহিষের বাথান দেখা যাইত। সেখানে দুগ্ধবতী স্বাস্থ্যবতী গাভীর দল থাকিত। গোয়ালারা সেই সব বাথান হইতে দুগ্ধ ক্রয় করিয়া আনিয়া বাড়ী বাড়ী ফেরী করিত। এখন কেবলমাত্র জেলার সদর ও মফঃস্বল টাউনের সন্নিকট কদাচিৎ ২/১টি বাথান দৃষ্ট হইয়া থাকে। গো-মহিষের বাথান ছাড়াও কোথাও কোথাও ছাগল ও ভেড়ার বাথানও দেখা যাইত। রাজশাহীর বিখ্যাত টাটু ঘোড়ার কথা এখনও অনেকেই বিস্মৃত হয় নাই। পল্লীর দীঘি পুষ্করিণীতে অসংখ্য হাঁস ও মরাল মরালীর ক্রিয়া সঞ্চালন শোভা মনমুগ্ধ করিত। গৃহস্থ লোকের বাড়ীতে প্রচুর পরিমাণে মুরগী দেখা যাইত। এখন সে শোভা সৌন্দর্য্য তো দুরেব কথা বর্তমানে মুরগী সের দরে বিক্রয় হইতেছে। শীত মৌসুমে রাজশাহীর নদীও বিল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাখীর শিকার হইয়া থাকে।

এক সময় রাজশাহীতে আয়ুর্ব্বেবদীয় চিকিৎসার খুব নাম ছিল। করিবাজী চিকিৎসা এখন পল্লী অঞ্চলে নাই বলিলেই চলে। দেশী ওষধি দেশ হইতে উজার হইয়া যাইতেছে।

শিক্ষিত লোকদের সংখ্যা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক গুণে বাড়িয়াছে। সে অনুপাতে স্কুল কলেজের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অতি নগণ্য। সহ শিক্ষার

কুফলে মুসলমান সমাজে নানা কুপ্রথা শিকড় বিস্তার করিতেছে; শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরিত্র গঠনে নানা শিথিলতা ঢুকিয়াছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে গৌণ-জ্ঞান করিয়া বহুসংখ্যক ছাত্র চুরি বিদ্যার আশ্রয়ে উদ্দেশ্য সফল করিতেছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশেষ কোন শৃঙ্খলার ফল লক্ষিত হয় না। ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ মেলা মেশা ভবিষ্যতে আরও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবে, আশংকা রহিয়াছে। দেশের আজাদীও পাকিস্তান অর্জনে রাজশাহীবাসীর ভূমিকা বলিষ্ঠ। দান খয়রাতে রাজশাহীর রাজা জমিদারের অনবদ্য ভূমিকার কথা ভুলিবার নহে। পাকিস্তান আমলে সদানুষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেলার উর্দ্ধতন সরকারী কর্মচারীদের মহানুভবতার কথা অবিস্মরণীয়।

জেলার প্রাচীন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমানে স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক ফ্যাসানে কতকগুলি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান শহর বন্দরে কেবলমাত্র গড়িয়া উঠিতেছে - এই যা।

পল্লী অঞ্চলে গরীব, বিধবা, এতিম, মূক ও বধিরের সংখ্যা নগণ্য নয়। ভিক্ষুক ও কাঙ্গালদের সংখ্যা কেবল শহরেই নয়-মফঃস্বলের পল্লীগুলিতেও ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহারা অধিকাংশ মুসলমান ও বহিরাগত। এইসব কাঙ্গালদের মধ্যে বেশীর ভাগ বৃদ্ধা ও বৃদ্ধ। ইহারা পথে প্রান্তরে হাটে-বাজারে যত্রতত্র রাত্রি যাপন করিয়া থাকে। আরও লক্ষণীয় যে, এক শ্রেণীর মুসলমান বিধবা নারীরা মাথায় পসরা লইয়া হিন্দু ভূমিজ নারীদের মত গ্রামে গ্রামে ফেরী করিয়া বেড়ায়। এবং হাটে বাজারে কুলির কাজ করে।

জেলার সর্বপ্রকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা অধিক। ইহারা অধিকাংশ বহিরাগত। মৎস্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইহারা সাধারণতঃ মাহীফারাস নামে পরিচিত। নিকারী ও জিয়ানী ইহাদের অর্ন্তভূক্ত। মালো বা হলদার সাধারণতঃ জেলে নামে পরিচিত। ইহারা জাতিতে নমশূদ্র হিন্দু।

কৃষি বলিতে এ জেলার প্রধান চাষ ধান্য। গাঁজা, আখ ও পাট চাষের পরিমাণ পরিমিত। রবিশস্য তো উর্বরা অঞ্চলের প্রধান কৃষি। অধুনা বিড়ি পাতা ও চিনাবাদাম প্রভৃতির চাষ আমদানী হইয়াছে। বন বাদাড় বর্তমানে নাই বলিলেই চলে। ধামৈর হাট ও পত্নীতলা প্রভৃতি থানায় শালবন স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।

ফলমূলের মধ্যে এ জেলার আম,তাল তেঁতুল ও কুল বিখ্যাত। নারিকেল কাঁঠালের চাষও হইয়া থাকে। শিল্প সম্পদের মধ্যে এ জেলার খয়ের, লাক্ষা, খেজুর গুড় ও রেশম প্রধান। চিনি, পান মশলা, জর্দ্দা প্রভৃতি শিল্প উল্লেখ যোগ্য। কংস শিল্প ও মৃৎশিল্প প্রভৃতি রাজশাহীর বিখ্যাত প্রাচীন শিল্প।

রাজশাহীর পথঘাট বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা উন্নত। নাটোর পথ বিখ্যাত। এ জেলার প্রাচীনকালে ৩/৪টি রাজপথ ছিল। পথঘাটের বর্তমান যান বাহনের মধ্যে গো-যান, টমটম, পাল্কী, ডুলী, রেল, মটর, সাইকেল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জেলার পশ্চিমাঞ্চলে ২/১ টি হাতীর বাহন রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সাধারণের বাহন হিসাবে ব্যবহার হয় না।

পোষাক-পরিচ্ছদে রাজশাহীর নিজস্ব কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। গ্রাম পল্লীর লোকেরা সাধারণতঃ তহবণ, সার্ট, পাঞ্জাবী পরিধান করিয়া থাকে। শহর বন্দরের হালের ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরা শ্বেতাঙ্গদের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। বয়স্ক নারী পুরুষেরা অধিকাংশই ধর্মভীরু এবং বিনয়ী।

রাজশাহী জেলা জোতদার ও জমিদার প্রধান স্থান হিসাবে প্রসিদ্ধপোরশা, পত্নীতলা, ধামৈরহাট ও বদলগাছি থানা বর্তমানে জোতদার প্রধান। নাটোর, নওগাঁ ও পুঁঠিয়া থানা এক সময় জমিদার প্রধান ছিল। কোম্পানীর রাজত্বকালে দানশীল জমিদার ও বিশিষ্ট কর্মীগণ রাজা ও রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর, খান সাহেব প্রভৃতি সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত হইতেন। জোতদার অধিকাংশই মণ্ডল প্রভৃতি পরিবারভূক্ত কিন্তু তাহারা অধুনা অনেকেই মণ্ডল কাটিয়া চৌধুরী লিখিয়া থাকেন। খন্দকার, মীর, মিঞা, কাজী ও খান প্রভৃতি পরিবারে নামের কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। ইহারা বর্তমানে গরীব হইলেও শিক্ষিত। নওগাঁ, নাটোর, বড়াইগ্রাম, চারঘাট ও লালপুর এই শ্রেণীর লোকের আধিক্য দেখা যায়।

পাকিস্তান লাভের পর বিশেষত: রাজশাহী সদর ও নওয়াবগঞ্জ টাউনে কয়েক সহস্র বহিরাগত লোক আসিয়া বাড়ীঘর নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছে। কতক পরম আত্নীয় বনিয়া গিয়াছে। ইহারা অধিকাংশই মুসলমান। দিয়াড় ও চর অঞ্চলের লোকেরা নির্ভীক।

রাজশাহী জেলার বহু স্থানে জ্ঞাত অজ্ঞাত বহু সূফী-দরবেশের সমাধি আছে। চারঘাট গোদাগাড়ী ও শিবগঞ্জ থানায় ইহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। শাহ মখদূম, শাহদৌল্লা, শাহ নিয়ামতুল্লাহ ও শাহ মকার্রম প্রমুখ বিখ্যাত।

নামকরা পরিবারের মধ্যে বাঘার রইস পরিবার, পোরশার সাহু পরিবার, নাটোর ও নওগাঁর কাজী পরিবার, তারোটিয়ার শেখ পরিবার, মধইল, নাটোর ও ফারসীপাড়ার চৌধুরী পরিবার, আত্রায়ের মোল্লা ও শহরের হামিদ মিয়া প্রভৃতি পরিবার বর্তমানে নানা কারণে উল্লেখযোগ্য।

বিবিধ জনকল্যাণমূলক কর্মের সহিত পরিচিত প্রাচীন কর্মীদের মধ্যে মরহুম আস্তান মোল্লা, মরহুম কিশোরী মোহন চৌধুরী, খানবাহাদুর ইমাদুদ্দীন, সরদার হাজি লাল মহাম্মদ, মৌলবী ইদরিস আলী আহমদ, মৌঃ মাদার বখশ প্রমুখ বিখ্যাত।

রাজশাহীর স্থাপত্য ও প্রাচীন কীর্তির মধ্যে পাহাড়পুর, ছোট সোনা মসজিদ, খানিয়া দীঘি মসজিদ, ভোলাহাট মসজিদ, কুশুম্বা ও বাঘা প্রভৃতি মসজিদ এবং গরুড়স্তম্ভ, দিব্যস্মৃতি প্রভৃতি বিখ্যাত। নওদার, বুরুজ, হলুদ বিহার দ্বীপ, আগ্রাদ্বিগুণ, জগদ্দল-মহাবিহার, মাহীসন্তোষ, রামাবতী, যোগীঘোপা, ধানোরা, হোসেন শাহীগড প্রাচীন কীর্তির অন্তর্ভুক্ত। অঞ্চল হিসাবে হিন্দুযুগে নওগাঁ ও মুসলমান আমলে নওয়াবগঞ্জ মহকুমার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিহাররৈল ও কুমারপুর, প্রভৃতি প্রাচীনতম প্রসিদ্ধ ধ্বংস স্তূপে এখনও জগতের আলো প্রবেশ করে নাই। রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির যাদুঘর এই পর্যায়ের একটি স্মরণীয় কীর্তিগৃহ। চাপিলা ও গোদাগাড়ী নওয়াবী আমলের স্মৃতি! বড়কুঠি, কাজলা-মতিহার, সিরাইল রেশম-নীল ব্যবসায়ীদের কীর্তি।

তাহিরপুর, পুঁটিয়া, নাটোর, দিঘাপতিয়া, দুবলহাটি, দয়ারামপুর প্রভৃতি প্রাচীন জমিদার বাটী ও সরকারী কলেজ ভবন ঊনবিংশ শতকের কীর্তিগুলির অন্তর্ভুক্ত। সরদহ'র পুলিশ (ট্রেনিং) কলেজ বর্তমান যুগের একটি কীর্তি।

পাকিস্তান আমলের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সেরিকালচার প্রভৃতি অন্যতম। এই যুগের আর কয়েকটি কীর্তি; যাহার সহিত রাজশাহীবাসীর অন্তরের সম্বন্ধ যুগে যুগে প্রেরণা দান করিবে– তাহা

হইল 'বাহাদুরশাহ স্মৃতি,' 'কায়েদে আজম স্মৃতি (স্তম্ভ)', 'রাজশাহীর ইতিহাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রাজশাহীর বিদগ্ধ সমাজে কবি সাহিত্যিকদের ভূমিকা বিশিষ্ট। এখানকার ঐতিহাসিকদ্বয় দেশ বিখ্যাত। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা এ জেলায় পাঠাগারের সংখ্যা অনেক বেশী। এখানে প্রাচীন লাইব্রেরীগুলিতে বহু দুষ্প্রাপ্য বই পুস্তক রক্ষিত আছে। রাজশাহীর প্রাচীন পত্র পত্রিকার অনবদ্য ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজশাহীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য বর্তমানে নানাবিধ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি চলিতেছে। ইতিমধ্যেই বহু জনহিতকর কার্য সম্পাদিত হইয়া সমগ্র জেলার অধিবাসীদের মধ্যে এক নয়া প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। নানা স্তরে সমাজ কর্মীর আবির্ভাব হওয়াতে বিবিধ রকমের গঠনমূলক সংস্থা সংহতি গড়িয়া উঠিতেছে। এমতাবস্থায় আমরা আশা করিতে পারি আগামী দিনের ইতিহাসে রাজশাহীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা সমগ্র দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

আসুন এখন আমরা রাজশাহীর কর্মকীর্তির গৌরবোজ্জল অধ্যায়ে প্রবেশ করি। কতখানি করিয়াছি কতখানি করিবার আছে এবং কতখানি করিতে হইবে তাহা অনুধাবন করিয়া দেখুন।

**নদীনালা :**

রাজশাহী জেলার ভাগ্য নির্ভর করে অনেকটা এখানকার নদীনালা খাল-বিলের উপর। এখনকার নদীগুলি এজেলার অধিবাসীদের জীবন জীবিকার বিরাট দায় দায়িত্ব বহন করিতেছে। যত প্রকার সুখ সমৃদ্ধি আশা-ভরসা সবই এই নদীগুলির দান। শরৎকালে এই নদীগুলি বিল-পাথারে জল আনিয়া দেয়– আর মাঠ-প্রান্তর শস্য-শ্যামল হইয়া উঠে।

প্রখর গ্রীষ্মে পল্লী-প্রান্তর পুড়িয়া খাক্ হইয়া যায়। কৃষক-কুল তখন নদীগুলির দিকে দিনের পর দিন তাকাইয়া থাকে। আষাঢ় মাস হইতে একের পর এক করিয়া যখন বিল-পাথার ভরিতে থাকে তখন শুরু হইয়া যায় ক্ষেত-খামারে কৃষকদের বিরামহীন সংগ্রাম। শরতে তাহারা চাষবাস মাতিয়া উঠে। তারপর হেমন্তকালে ফসল পাকিলে তাহাদের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। বুকে বল আসে। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র এই তিন মাস কাল ধরিয়া নদীগুলি যেমন বিরামহীনভাবে বিল-পাথারে অঢেল জল আনিয়া দেয় তেমনি সারা আশ্বিন ও কার্তিক মাস ধরিয়া এই নদীগুলিই আবার সেই বদ্ধ জল নামাইয়া লইয়া যায়। এই দীর্ঘ পাঁচ মাস কাল ধরিয়া জল আনা নেওয়া করিতে, উঁচু ভিঁটা জমিতে যে আর্দ্রতা (সর্দি) থাকিয়া যায় তাহা রবিশস্যের জন্য বিশেষ উপকারী। তারপর মধ্যে সাতমাস কাল ধরিয়া নদীগুলি আবার বিশ্রাম করিয়া চলিয়া যায়। এই নদীর সহিত মানুষের যে সম্পর্ক, তাহা পরম সম্পর্ক। এইসব মানুষের কীর্তি বহির্ভূত– প্রকৃতির দায় দায়িত্ব।

এখানে আমরা এই জেলার প্রধান প্রধান নদীগুলির পরিচয় পেশ করিতে প্রয়াস পাইব। রাজশাহী জেলার ভূমি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঢালু। সেই হেতু নদীনালা, খালবিল-ঝিলগুলির গতি প্রবাহ দক্ষিণ-পূর্বগামী। জেলার উত্তর-পশ্চিম অপেক্ষা পূর্ব-দক্ষিণ দিকে নদীনালার সংখ্যা বেশী। রেনেলের নকশায় নাটোর হইতে বিল চলন, বিল বকরী, বিল

গাজনা প্রভৃতি বিল পদ্মা হইয়া মানিকগঞ্জের (ঢাকার) জাফরগঞ্জগামী যত প্রকার নদীর গতি প্রবাহ উল্লিখিত হইয়াছে সেই সব স্রোতধারা করতোয়া, আত্রাই, মহানন্দা ও পদ্মার সৃষ্টি। এখন এই সব নিম্নগামী নদীর গতি পরিবর্তিত হইয়া কতক হারাইয়া গিয়াছে, কতক নূতন নামের সৃষ্টি করিয়াছে, আর কতক পুরাতন স্মৃতি বহন করিতেছে মাত্র। রাজশাহী জেলার হৃদয় কেন্দ্রে এখনও যে সব নদী জীবিত থাকিয়া মানুষের জীবন জীবিকায় সাহায্য করিতেছে মহানন্দা, পুনর্ভবা, আত্রাই, কাটাযমুনা, বড়ল, নন্দকুজা গুমানী, মুসাখান, বারানই তন্মধ্যে উল্লেখ্য। ইহারা সকল ঋতুতে সমানভাবে প্রবাহিত হয় না। কতক স্বল্পতোয়া, কতক ক্ষীণস্রোতা। নারদের মৃত্যু বহুদিন আগেই হইয়াছে। বাপমারা বা লোকনাথ মৈত্রের দাড়ার কথা আর শোনা যায় না। নূর ও তুলসীগঙ্গায় আবাদ চলিতেছে। পদ্মা সে তো বিশাল নদী।

**মহানন্দা**

প্রথমেই আমরা মহানন্দার কথা দিয়া আরম্ভ করিব। এ নদী প্রাচীন। ইহার তলদেশ বেশ সুগভীর। রাজশাহী জেলার মধ্যে নিম্ন দিকে সুবিস্তৃত। দুইপার্শ্বে কোথাও কোথাও ঢালু। বান বন্যার সময় ইহার তরঙ্গ খুবই ভয়াবহ হইয়া থাকে। অনেক সময় নৌকাডুবি ঘটাইয়া মানুষের প্রাণ নাশ করে। বর্ষার সময় যে কোন রকমের মাল বোঝাই ও যাত্রীবাহী নৌকা-গমনাগমন করিতে পারে। গ্রীষ্মের সময় (বিশেষত: বৈশাখ- জৈষ্ঠ্য) মকরমপুর ঘাটের উত্তরে সাধারণত: দুই তিন হাত জল থাকে- সেই জন্য বোঝাই ও বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারেনা। নিম্নাংশে কোথাও কোথাও শুশুক ও বড় বড় কচ্ছপ প্রভৃতি জলজ জন্তু ভাসিয়া উঠে। ইহার জল খুবই স্বচ্ছ। মহানন্দার দুই তীরের জন বসতির দৃশ্যাবলী অতি মনোরম। এই নদী হিমালয়ের পাদদেশে মহলড্রিম নামক পর্বত হইতে প্রবাহিত হইয়া পুর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়া মালদহ-তারপর রাজশাহীর পশ্চিম সীমান্তে নিম্নভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। বর্তমানে নিম্নদিকে গোদাগাড়ীর সন্নিকট আসিয়া মাটিকাটা গ্রামের নীচে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। রাজশাহীর পশ্চিম সীমান্তে ইহার তীরে ভোলাহাট রেশম উৎপাদন কেন্দ্র অবস্থিত। ইহা মকরমপুর ঘাট, গোমস্তাপুর (পুলিশ) থানা, চাঁপাই (গঞ্জ), নওয়াবগঞ্জ টাউন, বারঘড়িয়া বন্দর, রাজারামপুর, সুলতানগঞ্জ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া গোদাগাড়ী থানার নীচে দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

**আত্রাই**

আত্রাই উত্তরবঙ্গের একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নদী। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্তবর্তী শিভক (?) নামক স্থানে ত্রিস্রোতা (তিস্তা) হইতে উৎপন্ন হইয়া দিনাজপুরের মধ্য দিয়া ভারতের বালুঘাট অতিক্রম করিয়া রাজশাহীতে চৌঘাট মৌজার অদূরে প্রবেশ করিয়াছে। এখান হইতে নওগাঁ ও নাটোর মহকুমা অতিক্রম করিয়া বর্তমানে চলন বিলের পশ্চিম পাশ দিয়া কাচিকাটা বন্দরের সন্নিকট গুমানী নাম ধাবণ করিয়া পাবনা জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। তথা হইতে বের হইয়া ব্রহ্মপুত্রের নূতন প্রবাহ যমুনার স্রোতে মিলিত হইতেছে। পাবনা জেলায় আত্রাই নদী ঊনবিংশ শতক হইতে গুমানী ও বড়ল নামে কথিত হইতে শোনা যাইতেছে। ইহার আসল খাত কোথাও কোথাও মরা আত্রাই অথবা বুড়ী আত্রাই নামে পরিচিত। হিন্দুর পুরাণ প্রসিদ্ধ পবিত্র সলিল বহনকারী নদীরূপে অষ্টমনীষা. মিজ্জাপুর প্রভৃতি স্থানে ইহার মরা স্রোতে এখনও বারুনী স্নানাদি হইয়া থাকে। হিন্দুর দেবীপুরাণে

আত্রাইয়ের প্রাচীনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

"আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
সরযু গন্ডকী পুণ্যাশ্বেত গঙ্গা চ কৌশিকী।"

ত্রিস্রোতার যে ধারাটী আত্রাই নামে বালুরঘাটের মধ্য দিয়া চৌঘাট মৌজার সন্নিকট রাজশাহীতে প্রবেশ করিয়া বিল চলনের দক্ষিণে গুমানী ও বড়ল নাম ধারণ করিয়া পাবনা জেলায় প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই আমাদের আলোচ্য আত্রাই নদী[১]। মিঃ হান্টারের কিছুদিন আগে বিল চলনের মধ্য দিয়া আত্রাই পাবনা জেলায় প্রবেশ করিয়া আবার বহিগমন কালে বিল গণ্ডহস্তী দিয়া পদ্মায় পতিত হইত। কিন্তু এখন যমুনা নদীতে, আত্রাই বড়ল নামে প্রবাহিত হইতেছে। এবং গুমানী নুন-নগরে বড়লের সহিত মিলিত হইয়াছে। মধ্যযুগে রাজশাহীর হৃদয় কেন্দ্রে আত্রাই নামের কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিনা জানিবার উপায় নাই। তবে রাজশাহীর মধ্যভাগের ভূমি সমতলহেতু বহুবার খাত পরিবর্তন করিয়াছে। সেই খাতগুলি কালে ভিন্ন ভিন্ন বিলে পরিণত হইয়া আত্রাই ও পুর্ণভবার স্মৃতি বহন করিতেছে। সমসাময়িক ইতিহাসে উহার উল্লেখ আছে। মিঃ হান্টারের বিবরণে চলন বিলের জলরাশি নন্দকুজা দিয়া কাঁচিকাটা হইতে দক্ষিণ দিকে বাহির হইয়া নুন নগরের সন্নিকট বড়লের সহিত মিলিত হইয়াছে। রাজশাহীর জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নরম্যান সাহেবের মতে আত্রাই ও নন্দকুজার মিলিত জলস্রোতই গুমানী নামে পরিচিত। বড়লের উত্তরাংশের নামই নন্দকুজা। উহাই আত্রাই নদীর সহিত মিলিত হইয়া গুমানী নামে পুনরায় বড়লে পতিত। বড়ল এখন পাবনার হুরা সাগর দিয়া যমুনাতে তাহার জলরাশি ঢালিয়া দিতেছে[২]।

রাজশাহীর হৃদয় কেন্দ্রে নওগাঁর দক্ষিণে ভবানীপুর-সুটকিগাছার সন্নিকট-বগুড়া হইতে আগত কাটা যমুনা আত্রায়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। আর একটি নদী নাগর নাম লইয়া বগুড়ার শিবগঞ্জের প্রাচীন বন্দরের নীচে করতোয়ার ত্রি-মোহনী হইতে উৎসারিত হইয়া বিহার (বৌদ্ধ বিহার-ভাসুবিহার), বুড়ীগঞ্জ, তালোরা, কড়ই-ঝাকর-চাপাপুর, কালিগঞ্জ, পতিসর, প্রভৃতি বন্দর হইয়া সিংরা থানার নিকট আত্রায়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। এ-নদী এখন ক্ষীণতোয়া। বর্ষার সময় ইহা প্রবলতর হইয়া থাকে। কাটা যমুনার তীরে বদলগাছি থানা, বালুভবা, নওগাঁ টাউন ও কাশিমপুর জমিদার বাটী প্রভৃতি ইংরেজ আমলের কীর্তি। আর নাগরের (কবির ভাষায় "ও'হে রসিক নাগর") তীরে পতিসর রবিঠাকুরের স্মৃতি বহন করিতেছে। এ-নদী ক্ষীণতোয়া। বর্ষার সময় মাঝারী ধরণের নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। কিন্তু যমুনা নদীতে বর্ষার সময় সহস্রাধিক মণের বোঝাই নৌকা, মটরলঞ্চ গমনাগমন করিয়া থাকে। মাঝারী ধারণের মালবাহী নৌকাগুলি নওগাঁ টাউন পর্যন্ত সারা বৎসরই যাতায়াত করে। এ-নদী নওগাঁবাসীর বিরাট দায় দায়িত্ব বহন করিয়া থাকে।

নওগাঁ টাউনের ১ মাইল পূর্বে তুলশীগঙ্গা নদীর মরাখাত এখনও অতীতের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। বগুড়া হইতে আগত তুলশীগঙ্গা তাজপুরের সন্নিকট কাটা যমুনার

১. The Atrai, one of the chanels of the Trisrota or Tista
Hunter's statistical account of Rajshahi P. 23
২. Hunter's statistical account of Rajshahi P 24

সহিত মিলিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতকে এ-নদী বেশ প্রসিদ্ধ নদী। ইহার উৎপত্তি স্থল করতোয়া। করতোয়া ক্ষীণস্রোতা হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে এই নদীও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়াছে। নওগাঁ অঞ্চলে তুলশীগঙ্গার কোন কোন স্থানে ফসলাদি লাগানো হইয়া থাকে। বান-বন্যার সময় কখনও কখনও তাহা ভাসাইয়া লইয়া যায়।

মোগল আমলে তুলশীগঙ্গা ও নূরনদী ঘোড়াঘাটের সহিত সংযোগ রক্ষা করিত। নওগাঁ টাউনের উত্তরে ১৬০৯ সালে ৬ই মার্চ এই নদীদ্বয়ের কোন একটি বাহিয়া বঙ্গের সুবাদার ইসলাম খাঁ গড়ফতেপুর (?) ছাউনিতে অবতরণ করিয়াছিলেন। গড়ফতেপুর নওগাঁ টাউনের পাঁচ-ছয় মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত। খ্রী: সপ্তম-অষ্টম শতকে পাহাড়-পুর-হলুদ বিহারের নীচে যে নদী প্রবহমান ছিল আজিকার বিস্মৃত নূর নদীর আত্ম কাহিনীতে তাহার সন্ধান মিলিতে পারে। বদলগাছির 'চ্যাংগার বিল' সেই সপ্তম অষ্টম শতকের খাত কিনা তাহাও অনসন্ধান যোগ্য। তবে এখানে একটি কথা বলিয়া রাখিতে চাই; আজিকার কাটা যমুনার স্রোত ঊনবিংশ শতকে ভাণ্ডারপুরের নীচে দিয়া প্রবাহিত হইত। ভাণ্ডারপুরের নদী ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়েও প্রবহমান ছিল। হলুদবিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমে (হাজিপুরের নিকট?) ইংরেজ সাহেবদের রেশম কুঠি ছিল। তাহারা এই অঞ্চলে নীল ও রেশমের চাষ করিত। নূর নদীর জল প্লাবনে কখন কখন সেই কুঠিও অত্র অঞ্চলের ফসলাদির সমূহ ক্ষতি করিতেছিল। সেই জন্য ১৮০৭ সালে প্যাটল সাহেব (দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট) মলায়পুরের দক্ষিণে বাঁধ বাঁধিয়া এই নূর নদীর উত্তর প্রবাহ যমুনা খালে ফিরাইয়া দেন। তখন হইতে নূর নদীর স্রোতশুষ্ক হইয়া যায় এবং যমুনা খাল বেগবান হইয়া উঠে। তখন হইতেই যমুনা খাল 'কাটা যমুনা' নামে কথিত হইতে থাকে। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বদল-গাছির 'চ্যাংগার বিল' নূর নদীর খাত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। উল্লিখিত নূর নদীর, ইংরেজ আমলের বাঁধ প্রভৃতির কথা জনশ্রুতি নয় - সেদিনের কথা। এখনও বর্ষার সময় এই নদীর ক্ষীনস্রোত ভাণ্ডারপুর ও সেনপাড়ার মধ্যে ক্ষেত-খামার অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। আজিকার প্রসিদ্ধ ভাণ্ডারপুরের মত সেনপাড়াও এককালে নূর নদীর পশ্চিম তীরে একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। এই সেন পাড়াতে ৩৬ জাতির বাস থাকার প্রমাণ আজও সুস্পষ্ট। সেনপাড়া এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ; বহু দালান কোঠার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। বর্ষা গ্রীষ্মের সময় ৩/৪ মণ পর্যন্ত ওজনের বড় বড় সর্প এখনও মারা পড়ে। এই পাড়ার দুই হইতে তিন মাইল পূর্বে পার-আক্কেলপুরের নীচে হলুদ-বিহার মৌজায় কয়েক বৎসর আগে জমি হইতে মাটি উঠাইবার সময় বিরাট আকারের একটি নৌকা পাওয়া গিয়াছিল। এই নৌকাতে কাপড়ের গাঁইট ও বস্তা জাতীয় পচা জিনিষ-পত্র পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া কান্দা-আক্কেলপুর বা প্রাচীন লোকেরা আজিও গল্প করিয়া থাকে। বিখ্যাত হলুদ-বিহার মৌজার বুড়ীদহ, হলুদবিহার দহ প্রভৃতির জনশ্রুতি প্রবল। হলুদ-বিহারের দ্বীপগঞ্জের নীচে যে এক কালে একটি বিরাট নদী ছিল তাহা এই স্থানটি পর্যটন করিলে সহজেই অনুমিত হইবে। আজ হইতে ৮০/৯০ বৎসর পূর্বে ভাণ্ডারপুরের নীচে বর্ষার সময় দক্ষিণ হইতে বহু সওদাগরী নৌকা আসিয়া জমা হইত, কেনা বেচা করিয়া আবার চলিয়া যাইত। এই অঞ্চলে এক কালে যে বিশালকায় নদী ছিল বদলগাছি ও ভাণ্ডারপুর গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানের নবভূমিই তাহার সুস্পষ্ট

কাটা যমুনা

প্রমাণ। সেকালেও নদনদীর তীরে শহর বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ঐতিহাসিক সত্য। পাহাড়পুর ও হলুদ বিহারের মন্দিরদ্বয় তো পাল যুগের কীতি। এবং ইহার চারিপার্শ্বে যে নগর বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।একথা বাদ দিলেও এই সেদিনের কেশাল. বালুভরার, আড়াইলকাণ্ডার মৃৎশিল্পের প্রসিদ্ধির কথা আজও লোকে বিস্মৃত হয় নাই। এই সব নূর নদী ও কাটা যমুনার বদৌলতে সৃষ্টি হইয়াছিল।

আত্রেয়ী বা আত্রাই রাজশাহীর হৃদয়ে কত খেলাই না খেলিয়াছে। কতবার যে খাত পরিবর্তন করিয়াছে, কত শহর বন্দর ধ্বংস করিয়াছে, কত রাজা উজির বাদশাহ সুলতানদের স্বীয় বক্ষে টানিয়া আনিয়াছে, কত সওদাগরকে যে সময়ে অসময়ে হাসাইয়াছে, কাঁদাইয়াছে, প্রবল জল-তরঙ্গে নৌকাডুবি ঘটাইয়া কত লোকের যে প্রাণ নাশ করিয়াছে, কত লক্ষ লক্ষ মানুষের যে পাপমুক্তি করিয়াছে ইতিহাস কালে কালে তাহার হিসাব রাখিতে সমর্থ হয় নাই।

মোঘল আমলে -রাজশাহীতে অত্রায়ের কোন পরিবর্তন দেখিতেছিনা। ১৬০৮-৯ সালে বুয়ালিয়ার নিকট 'বারাহী' বাহিয়া আত্রায়ের যে খাত দিয়া বঙ্গের সুবাদার ইসলাম খাঁ নাজিরপুর (নজিপুর) ও শাহপুর পৌছিয়াছিলেন বর্তমানেও সেই আত্রায়ের তীরে শাহপুর ও নাজিরপুর অতীতের শ্রীসমৃদ্ধির প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। মোগল আমলের আগে বহুবার আত্রাই তাহার গতি পরিবর্তন করিয়াছে।স্থানীয় প্রাচীন কীর্তিগুলি তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ। এক সময় রাজশাহীর আগ্রাদ্বিগুণের (পত্নীতলা থানা) নীচ দিয়া আত্রাই প্রবাহিত হইত। তারপর হইতে আত্রাই পূর্ব-উত্তরদিকে কোল কাটিয়া সরিয়া যাইতে থাকে। অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত যেহেতু আগ্রাদ্বিগুণ, জগদ্দল-মহবিহার যোগীঘোপা. রামাবতী (আম্বাজ শহর বা আমৈয়ের) আরানগর প্রভৃতি পুরা কীতিগুলি এই অঞ্চলের পাল পর্বের* কীর্তে হিসাবে নির্দ্দেশ করা যায়। সেই হেতু আত্রায়ের গতি পরিবর্তনের কাল কিছুটা এখানে ধরা যাইতে পারে। বর্তমানে আগ্রাদ্বিগুন হইতে প্রায় ৭ মাইল পূর্বদিকে আত্রাই প্রবাহিত হইতেছে। এখানকার ঘুকশীর বিল আত্রায়ের প্রাচীন খাত। এই বিলের পশ্চিম তীরে প্রাচীন কীর্তিগুলির মধ্যে রাজা রামপালের-'রামাবতী' জৈন দিগম্বরদের যোগীঘোপা অবাস্থত। পূর্বতীরে জগদ্দল-মহাবিহ-ার, চান্দরা প্রভৃতি বৌদ্ধ মন্দির নির্দ্দেশ করা যায়। এই সময় আত্রাই যে এখানে একটি বিশালকায় নদী ছিল আজিকার বিরাট ঘূকশীর বিল তাহার একটি প্রমাণ। আত্রাই ক্রমশ: পূর্ব-উত্তর দিকে পাশ কাটিয়া যাইতেছে। ছাত্রার বিল, বিলমান্দা, বিল উথরিল, বিলকুমারীর বিল প্রভৃতি আত্রায়ের সৃষ্টি। এক সময়ে মান্দা-কুশুম্বার শাহী মসজিদের সন্নিকট দিয়া আত্রাই প্রবাহিত হইত। আজ আত্রাই কুশুম্বা মসজিদের পূর্বে প্রায় ৪ মাইল দূরে প্রবাহিত হইতেছে। এই আত্রাই; তারপর বোধ হয় নুরনদী বাহিয়া যুবরাজ খুররম (পরে বাদশাহশাহজাহান) ঘোড়াঘাটে গিয়াছিলেন। তিস্তা প্রবলতর হইলে আত্রায়ের গতিবেগ মন্থর হয়। আত্রায়ের ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস এই অঞ্চলের প্রাচীন কীর্তিগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন।

বর্তমান আত্রায়ের তীরে রাঙ্গামাটি, পত্নীতলা, নাজিরপুর, মহাদেবপুর, মান্দা পুলিশ ষ্টেশন, প্রসাদপুর, বাঁন্দাইখাড়া, আত্রাই রেল ষ্টেশন, পাঁচুপুর, সাহেবগঞ্জ, খাজুরিয়া, ডাঙ্গাপাড়া, আতাইকুলা, লালোর-কলম, চাঁচখোর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বাজার-বন্দর।

* অত্রগ্রন্থের পালপর্ব দ্রষ্টব্য।

এ নদী সুপ্রাচীন। উৎপত্তিস্থল করতোয়া। দাজ্জিলিং এর নিম্নদেশ হইতে দক্ষিণ বাহিনী হইয়া জলপাইগুড়ি অতিক্রম করিয়া দিনাজপুর শহরের উত্তরে অন্য একটি ছোট নদী সমভিব্যাহারে বর্তমান শিরিশঘাটের সন্নিকট রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করিয়া তথা হইতে প্রায় ৭ মাইল নিম্নদিকে রহনপুরের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া মকরমপুর ত্রিমোনীতে মহানন্দার সহিত মিলিত। মহানন্দা তাহার নিজের এবং পুর্ণভবার জল বহন করিয়া পদ্মায় নামাইয়া দিতেছে।রহনপুরের উত্তর ধারে নওদার স্তূপ* একটি প্রাচীন কীর্তি চিহ্ন। ইহার তীরে আজিকার রহনপুর বন্দর ইংরেজ আমলের কীর্তি। হিন্দুর তীর্থ মহিমায় নীৎপুরের নীচে বারুণীস্নানাদি হইয়া থাকে। এখন আমরা মধ্য যুগের ইতিহাস ও নক্শাতে (map) মহানন্দা, পুর্ণভবা ও আত্রাই প্রভৃতির গতি প্রবাহ খুঁজিব। পূর্ব্ব পাকিস্তানে প্রবাহিত অসংখ্যা নদীনালা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সৃষ্টি। যখন ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার মধ্যে পরস্পর দূরত্ব ১৫০ মাইল[৩], তখন উক্ত নদীদ্বয় হইতে প্রবাহিত কতকগুলি নদী একত্র হইয়া একটি বড় নদীর সৃষ্টি হয়। এবং সেই নদী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণ বাহিনী হইয়া বরেন্দ্রভূমির পূর্ব সীমা দিয়া সমুদ্রে পতিত হইত। উত্তর বঙ্গের নদীর ইতিহাসে তাহাই করতোয়া নামে প্রসিদ্ধ ও প্রাচীনতম নদী। এই করতোয়া এখন সমূদ্রোপকুলে হরিণঘাটা নদী নামে খ্যাত[৪]। করতোয়ার স্বতন্ত্র ইতিহাসে আমারা তাহার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিব। প্রাগুক্ত বড় নদীর আর একটি স্রোত বহুদিন পরে নিম্নগামী হইয়া বরেন্দ্রভূমির পশ্চিম সীমান্তে প্রবাহিত হইত। পরবতীকালে উহাই যে মহানন্দা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মুশিদাবাদের ভৈরবকেই -মহানন্দার প্রাচীনতম খাত বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করিতেছেন। পরবতীকালে নওয়াব সিরাজ-উদ-দৌলার সময়ে এই খাত দিয়াই পদ্মা তাহার বিপুল জলরাশি বাহিয়া লইয়া যাইত। মাথাভাঙ্গা ও জলঙ্গীতেও প্রাচীন মহানন্দার কলধ্বনি শোনা যাইতেছে। করতোয়া সৃষ্টির বহু শতাব্দী পরে ত্রিস্রোতার জন্ম। ত্রিস্রোতা এখন উত্তর বঙ্গের বড় নদী। করতোয়া মৃতপ্রায়।

পুর্ণভবা অথবা পুণ্যভবা

মহানন্দা পুর্ণভবা আত্রাই

অষ্টাদশ শতকের শেষার্দ্ধ হইতে উনবিংশ শতকে আয়িয়রগঞ্জের নিকটে তিস্তা (ত্রিস্রোতা) মহানন্দার সহিত মিলিত ছিল এবং মহানন্দা রামপুর বুয়ালিয়ার সন্নিকট পদ্মার সহিত মিলিত হইত। তাহার আগে এক সময় মহানন্দা লাখনৌতি-গৌড়ের ভিতর দিয়া আসিয়া করতোয়ায় পুর্ণভবা এবং নিজ প্রবাহের জল নিষ্কাশিত করিত। রেনেলের নকশায় (map) তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু, ফানডেন ব্রোকের (১৬৬০) সময়ে মহানন্দার গতি আরও পশ্চিমে ছিল। তখন রামপুর বুয়ালিয়ার দক্ষিণে মহানন্দা প্রবলতর নদী; অনেকে মুশিদাবাদের ভৈরবকেই মহানন্দা বলিতেছেন। পদ্মা তখন উহার আরও দক্ষিণে প্রবাহিত। এই দুই নদী চারঘাটের নীচে মিলিত হইত[৫]। পদ্মা রাক্ষসী তাই ধীরে

* অত্রগ্রন্থে নওদার স্তূপ দ্রষ্টব্য।

৩. When the Ganges and the Brahmaputra were still 150 miles apart ..Bengal P.7 and 8

৪. Watters, yuan chwang, vol II, P 186 - 187; Baharistan-i-Ghaybi, Borah's translation, PP 46,51,53;D.R Bhandarkar Vol. P 360, Imperial Gazetteer of India, Eastern Bengal and Assam P. 174

৫. Rajshahi Gazetteer PP 9-14.

ধীরে মহানন্দাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। স্থানীয় লোক স্মৃতিতেও উহার উল্লেখ আছে[৬]। আত্রাই (তঙ্গন-আত্রাই) তিস্তা হইতে নির্গত হইয়া সোজা দক্ষিণ বাহিনী হইয়া চলন বিলে করতোয়ার সহিত মিলিত। ফানডেন ব্রোক, ইজাক থিরিয়ন, থর্ণটন প্রভৃতি সকলের নকশাতেই করতোয়া-আত্রাই সঙ্গম সুস্পষ্ট। কোন কোন ঐতিহাসিক ঢাকার জাফরগঞ্জে করতোয়া আত্রায়ের সঙ্গমের কথা বলিতেছেন। রেনেলের নকশায় অষ্টাদশ শতকে চলন বিলের খানিকটা পূর্বে করতোয়ার গতি দেখা যাইতেছে। চলন বিল, চৌমন বিল, বিরকুশা বিল, পিপরুল বিল, বিগ গাজনা প্রভৃতি আত্রাই-করতোয়ার সৃষ্টি। উল্লিখিত নকশাগুলিতে দুইটি নদী আত্রায়ের শাখানদীরূপে পশ্চিমমুখী হইয়া উত্তরবঙ্গে কয়েকবার খাত পরিবর্তন করিয়া-পুনরায় সোজা পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে একটি বড় নদীতে অর্থাৎ পদ্মায় পড়িয়াছে। ইহাই তো মহানন্দা নদী। অপরটি মহানন্দায় মিলিত হইয়াছে। সম্ভবত: তাহাই পুর্ণভবা। এই নকশাগুলিতে আর দুইটি স্রোত উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ঘরিয়া তাহাদের জলরাশি পূর্বদিকে যে তৃতীয় স্রোতটিতে ঢালিয়া দিত, উহাই করতোয়া। তাহা ছাড়া সে নিজের এবং উত্তরতম প্রবাহ তিস্তার সমস্ত জল তো বহন করিতই। সে জন্য ষোড়শ শতকের শেষাশেষী পর্য্যন্ত করতোয়া ছিল অতি প্রশস্ত ও বেগবতী নদী। করতোয়ার স্বতন্ত্র আলোচনায় আমরা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আত্রাই পুর্ণভবা আজ মৃতপ্রায়। অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত আত্রাই-পুর্ণভবার গতি প্রশস্ত ও বেগবান ছিল। ষোড়শ শতকেও আত্রাই বেগবতী ছিল। জাও-ডিবারোস এবং ক্যাস্তেলী-দ্য-ভিনোলা (Cantelli da Vignolla) এই দুই জনের নকশা আলোচনা করিলে আরও কয়েকটি স্রোত দেখা যায়। উহার মধ্যে একটা বেশ প্রশস্ত স্রোত আত্রাই হইতে-সোজা দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া একটি বিশাল নদীতে পড়িত। এই স্রোতটি আজিকার মান্দার বিলে নির্দ্দেশ করা যায়। আগেই বলিয়াছি এক সময় মান্দার বিল দিয়া আত্রাই প্রবাহিত হইত। অষ্টাদশ শতকে রেনেলের নকশাতে রামপুর-বুয়ালিয়াতে উত্তরা গত একটি নদী বড়কুঠীর পূর্বে দেখান হইয়াছে। উনবিংশ শতকে উহাকেই আমরা 'বারাহী' বলিয়া জানি। 'বারাহী' এখন রাজশাহী শহরের ১নং-ড্রেন। বায়া পর্য্যন্ত ইহা মরানদী কিন্তু নওহাটাতে উহা বারাহী বলিয়া এখনও খ্যাত। নওহাটা নদী এখনও বহমান। এক সময় আত্রায়ের একটি (মান্দার বিল) স্রোত বিল কুমারীর বিল হইয়া রামপুর-বুয়ালিয়ার উত্তরে তের-খাদিয়ার বিল দিয়া প্রথমে মহান্দা তারপর পদ্মায় পতিত হইত। ব্রোকের নকশাতে ইহার যেন একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উহাই যে বারাহী তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রেনেলের নকশায় জামদোহা (শীতলায়ের নদী) নদীর একটু উল্লেখ আছে। তাহা ছাড়া ফানডেন ব্রোক হইতে রেনেল পর্য্যন্ত একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্রোত রামপুর-বুয়ালিয়ার (আজিকার রাজশাহী শহর) ভূমিভাগে প্রবাহিত ছিল। আত্রায়ের গতিবেগ কমিয়া গেলে এই সব নদীর মৃত্যু ঘটে। উনবিংশ শতকের ভূমি নকশাতে ও স্থানীয় বিভিন্ন বিবরণে পদ্মা-মহানন্দা-বারাহী-জামদোহা প্রভৃতি নদীনালার চর অধ্যুষিত অঞ্চল ইত্যাদির কথাতো আছেই। কতকগুলি নদীর মোহনায় রাজশাহী শহরের উৎপত্তি সে কথাও আমরা প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করিয়াছি। রাজশাহী শহরের ভূমি অত্যাধুনিক না হইলেও নব ভূমি তো বটেই। সেই জন্য বলিতে

৬. পুঁঠিয়া রাজবংশ পৃঃ ৩; মহারাণী শরৎ সুন্দরী জীবন চরিত দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৬; রাজশাহীর ইতিহাস প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

হয় এক সময় এখানে একাধিক নদী প্রবাহিত ছিল। সপ্তদশ শতকেও করতোয়া আত্রায়ের সমৃদ্ধি ছিল।

১৭৮৭ সালে হিমালয়ের পাদদেশে বিরাট বন্যায়[৭] আত্রাই-করতোয়ার সমৃদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। উত্তর প্রবাহে যে তিস্তা, আত্রাই ও করতোয়ার সমৃদ্ধির মূলে সেই তিস্তা এই বিরাট বন্যার বিপুল জলরাশি বহন করিতে না পারিয়া পূর্ব-দক্ষিণ দিকে একটি প্রায় অবলুপ্ত প্রাচীন সংকীর্ণ নদীর খাত ভাঙ্গিয়া সবেগে ফুলছড়ির দিকে ব্রহ্মপুত্রের নূতন স্রোতে (যমুনাতে) গিয়া বিপুল জলরাশি নামাইয়া দেয়। সেই সময় হইতে তিস্তা ব্রহ্মপুত্রমুখী। সে আর পূর্ণভবা-আত্রাই -করতোয়ায় হিমালীয় নদীমালার জল প্রেরণ করে না। তখন হইতেই করতোয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে চলিয়াছে। আত্রাই-পুর্ণভবার প্রায় একই দশা হইয়াছে। এই সময় হইতে রাজশাহী জেলায় আত্রায়ের দুই পার্শ্বের বিল-হাওড়গুলি বিশেষত: নওগাঁর পশ্চিম ও দক্ষিণে দিগলী প্রভৃতি বিল কৃষিক্ষেত্রের উপযোগী হইয়া উঠিতেছে। চলন বিলের আয়ুষ্কাল ক্ষীণতর হইয়াছে। এখন তাহার মৃত্যু প্রায়। পূর্ণভবার সৃষ্টি জোবায়ের বিল (পোরশাথানা), বড়বিল এবং ছোটবিলও আজ কৃষি ক্ষেত্রের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। বিল বাকিলাতে (রহনপুরের নওদার নীচে) পুরাদমে কৃষি চলিতেছে। বিল ভাতিয়া, খিরির বিল ও নওয়াবগঞ্জ টাউনের উত্তরে মহাডাঙ্গার বিল তো মহানন্দার সৃষ্টি; রেনেলের নকশায় তাহা সুস্পষ্ট। নওয়াবগঞ্জ টাউন পদ্মা-মহানন্দার দান।

উত্তর বঙ্গের আর একটি নদীর কথা এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন মনে করি। কৌশিকী (কোশী) একটি সুপ্রাচীন নদী। এই কোশী এখন বিহারের পুর্ণিয়া জেলার ভিতর দিয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া গঙ্গায় প্রবাহিত হয়। অথচ এই কোশী একদিন পূর্ববাহী ব্রহ্মপুত্রমুখী ছিল। বহুযুগ ধরিয়া উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহু-খাত পরিবর্তন করিতে করিতে কোশী পশ্চিম মুখী হইয়াছে। মধ্যযুগের নদীর ইতিহাসে কোশী এক বিরাট বিস্ময়। কোশী ও মহানন্দার বিস্ময়কর খাত পরিবর্তনের ফলেই গৌড়, লাখনৌতি ও পাণ্ডুয়া অঞ্চল নিম্ন জলাভূমিতে পরিণত হইয়া অস্বাস্থ্যকর; বন্যার প্রকোপে বিধ্বস্ত ও বসবাসের অযোগ্য হইয়া অবশেষে পরিত্যাক্ত হয়। কোচবিহার হইতে রাল্‌ফ ফিচ (১৫৮৩-৯১ খ্রীঃ) গৌড়ের ভিতর দিয়া হুগলী গিয়াছিলেন। গৌড় জুড়িয়া–

"We found but few villages but allmost all wilderness, and saw many buffes (buffellos?) swine, and deere (decr) grasse (grass) longer than a man, and very many tigers" মালদহের উত্তরে ও পূর্বে যে সব বিল ঝিল ইত্যাদি এখনও দেখা যায় সেগুলি কোশী ও মহানন্দার মৃতখাত বলিতে কোন সংকোচ বোধ হয় না।[৭]

এখন আমরা যে জলপ্রবাহের কথা আলোচনা করিতে যাইতেছি তাহা পাক-ভারতের উত্তরা পথের প্রধানতম নদী। এ-নদী বাঙ্গালীর জীবন জীবিকার আশা ভরসার স্থল। এ-নদী মরিয়া গেলে বাঙ্গালী মরিয়া যাইবে। এ-নদী বাঁচিয়া থাকিলে বাঙ্গালীও বাঁচিয়া থাকিবে। ইহার উত্তর প্রবাহ গঙ্গা ও নিম্ন প্রবাহ পদ্মা নামে বিখ্যাত।

হিমালয়ের পাদমূলে গাড়ওয়াল দেশে ইহার উৎপত্তি এবং বঙ্গোপসাগরে ইহার বিলয়। হিমালয়ের একটি তুষার গুহা হইতে ৮ মাইল প্রবাহিত হইয়া 'গঙ্গোত্রী' নামক

৭. Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, P 175.

৭-১. Martin, Eastern India, III, P 15, J A.S B. 1896. P I

স্থানে উপনীত। এই গঙ্গোত্রী হইতে ইহা নিম্ন দিকে তাহার গতিপথ নির্ণয় করিয়া পূর্ব-যুক্তপ্রদেশ বিহারের মধ্যে দিয়া রাজমহলের প্রান্তদেশ দিয়া সোজা উত্তর-পশ্চিমে মালদহ জেলার পশ্চিমাংশে বাঙলার সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। তারপর পুরাতন গৌড়ের অদূরে কালিন্দীর সন্নিকট দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। ছাপঘাটির সন্নিকট সুতি হইতে এই গঙ্গার দক্ষিণ বাহী একটি সরু শাখা মুর্শিদাবাদ হুগলী হাওড়া অতিক্রম করিয়া গঙ্গাসাগরে পতিত। আর ইহার মূল শাখাটি পূর্ব-দক্ষিণ মুখী হইয়া মেঘনা নদী সমভিব্যাহারে সাগরে যাত্রা করিয়াছে। ইহার উত্তরতম প্রবাহে শোন, ঘর্ঘরা,

পদ্মা

যমুনা, গণ্ডক, কোশী, মহানন্দা প্রভৃতি মিলিত। নিম্ন প্রবাহে ব্রহ্মপুত্রের নূতন প্রবাহ যমুনা গোয়ালন্দে মিলিত এবং চাঁদপুর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত ইহা মেঘনা নামে খ্যাত। কালিন্দী হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত পদ্মা নামে বিখ্যাত। রাজমহলের উত্তর-পশ্চিমে এই গঙ্গার তীর ঘেষিয়া তেলীগড় ও সিক্রিগলির সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম বাঙলার প্রবেশ পথ। এই পথের মুখের সন্নিকট লক্ষ্মণাবতী লাক্ষ্ণৌতি, গৌড়, পাণ্ডুয়া-হজরত পাণ্ডুয়া ও রাজমহলের মধ্যযুগে বহুদিন ধরিয়া একের পর এক বাঙলার রাজধানী স্থাপিত ছিল। নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে সামরিক ও রাষ্ট্রীয় কারণেই এ রাজধানী পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

ফানডেন ব্রোকের নকশায় (১৬৬০) দেখিতেছি, রাজমহলের কিছু দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজারের একটু উত্তর হইতে এই গঙ্গার তিনটি দক্ষিণবাহী শাখার জল একত্র হইয়া সোজা দক্ষিণ মুখী হইয়া সমুদ্রে যাত্রা করিয়াছে। কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী পর রেনেলের নকশায় রাজমহলের দক্ষিণ-পূর্ব তিনটি শাখা একটি মাত্র শাখায় রূপান্তরিত এবং তাহাই (সুতি হইতে গঙ্গা সাগর) দক্ষিণবাহী গঙ্গা। রেনেল কিন্তু এই দক্ষিণ মুখী নদীটিকে গঙ্গা বলিতেছেন না। তিনি গঙ্গা বলিতেছেন আর একটি জলধারাকে, যে প্রবাহটি অধিকতর প্রশস্ত, জীবন্ত এবং দুর্দ্দাম; যেটি পূর্ব-দক্ষিণ মুখী হইয়া বর্তমান পূর্ব্ব-পাকিস্তানের মধ্য দিয়া তাহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে অবতরণ করিয়াছে: আমরা যাহাকে বলি পদ্মা। ফানডেন ব্রোক ও রেনেল দুই জনের নকশাতেই দেখা যায় গঙ্গার বিপুল জলধারা পদ্মা একাই বহন করিতেছে। দক্ষিণ বাহী নদীটি ক্ষীণতর। ফানডেন ব্রোকের প্রায় আড়াই শত বৎসর আগে কবি কৃত্তিবাসের কাল (১৩২০ শক্ ১৪১৫-১৬ খ্রীঃ)। কৃত্তিবাসের পিতৃভূমি ছিল বঙ্গে (বর্তমানে পূর্ব্ব পাকিস্তানে)। তাঁহার পূর্ব পুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ব বঙ্গ ছাড়িয়া গঙ্গা তীরে ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। যে ফুলিয়ার "দক্ষিণ পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী[৮]।" পূর্বোক্ত দক্ষিণমুখী নদী, আমরা যাহাকে বলি—হুগলী* নদী (ভাগীরথী);

---

৮. সুকুমার সেন, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৮০-৮৭।

* বগুড়া কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ বিখ্যাত শ্রী বি, এল, শিরোমনি (বর্তমানে কলিকাতায়) একটি ইংরেজী পত্রিকা দেখিয়া আমাকে জানাইছেন যে, "প্রাচীনকালে পদ্মার পাখরা স্রোতের গতিকে শিথিল করিবার জন্য মুর্শিদাবাদের উত্তরাঞ্চলে পদ্মা হইতে একটি খাল খনন করিয়া লালবাগের সন্নিকট অন্য একটি মরাখালের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ফলে হুগলী নদীর গতি প্রবলতর হয়। আদি গঙ্গার (কলিকাতার টালির নালা) পশ্চিমে বেতণ্ডা হইতে নওয়াব আলীবর্দ্দীর কল্যাণে হুগলী নদী হইতে একটি নালা কাটিয়া সোজা দক্ষিণে দামোদরের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। আলোচ্য হুগলী নদীর উত্তরতম প্রবাহে যে খালটি খনন করার সংবাদ পাওয়া যায় তাহাও কি নওয়াব আলীবর্দ্দীর কীর্ত্তি?

এই হুগলীর কথাই কৃত্তিবাস বলিতেছেন। কিন্তু এই গঙ্গা ছোট গঙ্গা। কারণ ১১ পার হইয়া যখন কৃত্তিবাস ১২ বৎসরে প্রবেশ করিলেন তখন "পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গা পার।" এখানে এ কথা নিশ্চিতভাবে বোঝা যাইতেছে যে, এই বড় গঙ্গাকেই তিনি পদ্মা বলিয়াছেন। এই কথার আরও সমর্থন পাওয়া যায়–কৃত্তিবাসের রামায়ণের অন্যতম একটি পুঁথিতে।

কৃত্তিবাস নিজে বাল্য জীবনের কথা প্রসঙ্গে বলিতেছেন,

"পিতা বনমালী মাতা মাণিক (মেনকা) উদরে।
জনম লভিল ও'ঝা ছয় সহোদরে॥
ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিন্দা (বরেন্দ্রভূমি) পার।
যথাতথা কর্‌্যা বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার॥
রাঢ়া মধৈ (রাঢ় মধ্যে) বন্দিনু আচার্য্য চুড়ামণি।
যার ঠাঁই কৃত্তিবাস পড়িল আপনি॥[৯]

এখানে সুস্পষ্ট যে, গঙ্গার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব মুখী দুইটি প্রবাহকেই কৃত্তিবাস যথাক্রমে ছোট গঙ্গা (হুগলী নদী) ও বড় গঙ্গা (পদ্মা) বলিতেছেন' এবং বড় গঙ্গা পার হইয়াই যে বড় বলিন্দা বা বরেন্দ্র দেশ তাহারও ইঙ্গিত করিতেছেন। পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে বিপ্রদাস পিপলাই তাহার মনসা মঙ্গলে ভাগীরথীকেই গঙ্গা বলিতেছেন। এবং তদানীন্তন ভাগীরথীর পথের সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন ইত্যাদি। সে যাহা হউক, সে আমরা হুগলী নদী প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

এখন আপাততঃ এতটুকু পাওয়া গেল যে, গঙ্গার দুইটি প্রবাহ। ছোট গঙ্গা ও বড় গঙ্গা। পঞ্চদশ শতকের গোড়াতেই বড় গঙ্গা অর্থাৎ পদ্মা বৃহত্তর নদী।

এখন আমরা এই বড় গঙ্গা অর্থাৎ পদ্মার গতি প্রবাহের কথা কিছু আলোচনা করিব। পদ্মা অর্বাচীন নদী। এ-নদী অশান্ত। বান বন্যায় ক্ষিপ্রগতি ধারণ করে। বন্যা বিপ্লবের জলোচ্ছ্বাসে রাতারাতি খাত পরিবর্তনের ফলে পদ্মা যুগে যুগে মানুষের বহু কীর্তি নাশ করিয়াছে। কত জনবসতি শস্য-শ্যামল প্রান্তর সবেগে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। ভাওয়ালের রাজা রাজবল্লভের বহু কীর্তি নাশ করিয়াছে। ঢাকা, রাজশাহীর বহুকীর্তি এবং মালদহের গৌড় প্রভৃতি ধ্বংস করিয়াছে। এইজন্য ঢাকা, মোমেনশাহী, পাবনা, রাজশাহী ও মালদহের কোন কোন স্থানে ইহা কীর্তিনাশা বলিয়া অভিহিত। মানুষ অনেক সময় ক্রোধভরে, পদ্মাকে গালমন্দ দিয়াছে। পদ্মা কীর্তিনাশা, পদ্মা ভীষণা, ভয়ঙ্করী; পদ্মা উন্মত্তা, পদ্মা রাক্ষসী। কোন কোন সময় পদ্মার দুর্দমনীয় প্রলয়ঙ্করী গতিবেগের বিপরীত দিকে স্বার্থবাহরা তাহাদের বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়া জীবন সর্বস্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। এখনও বন্যা বিপ্লবে এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। পদ্মা প্রসিদ্ধ হইবার পর হইতে বোধ হয় উত্তর দিকে সরিয়া আসিতেছে। নওয়াবী আমলে যে পদ্মা মুর্শিদাবাদ-ভগবানগোলার মরিচায়-কাতলামারীর নিচে দিয়া প্রবাহিত হইত, আজ সেই পদ্মাই রাজশাহী শহরকে কোলে লইয়া খেলা করিতেছে। রেনেলের নকশায় দেখিতেছি রাজমহলের পরেই সোজা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নওয়াবগঞ্জ, তাহার পর গোদাগাড়ী, কুমারপুর ও বুয়ালিয়া। সরদহ হাজরাহাটি চারঘাট প্রভৃতি পদ্মার বামতীরে অবস্থিত

৯. সুকুমার সেনের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৮৩।

হইলেও বেশ যেন একটু দূরে মনে হইতেছে। বোধ হয় তখন প্রসিদ্ধ জায়গা হিসাবে রেনেলের নকশায় এই স্থানগুলি নির্দ্দেশিত হইয়াছিল। আজ এইসব প্রাচীন স্থান পদ্মার খেলার পুতুল হইয়াছে। কোন সময় টানিয়া লইয়া যাইবে তাহার এক মুহূর্ত ভরসা নাই। রাজমহল হইতে পদ্মা আজ বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। নওয়াবগঞ্জ হইতে পদ্মা একেবারে প্রায় লালগোলার নীচে। নওয়াবগঞ্জ এখন মহানন্দার তীরে। মরিচা কাতলামারী আর আগের স্থানে নাই। আখেরীগঞ্জ হইতে পদ্মা এখন বহুদূরে উত্তর দিকে সরিয়া আসিয়াছে। নওয়াবগঞ্জের দক্ষিণে দেবীনগর, চর কালীনগর, সূর্য্যনারায়ণপুর, সুন্দরপুর, বাগডাঙ্গা, জন্দীপুর, সাহেব নগর, বাবুপুর-চর, আলাতলী চর প্রভৃতি গ্রাম, জনবসতিগুলি পদ্মা মহানন্দার ভাঙ্গা-গড়ার পাল্টাপাল্টি ইতিহাস স্মরণ করিয়া চলিয়াছে। আজ পদ্মার দক্ষিণ পার হইতে উত্তর পা পর্য্যন্ত দূরত্ব (রাজশাহী জেলার দক্ষিণ সীমান্তে) কোথাও কোথাও ১২।১৩ মাইল, ৮।১০ মাইল। এই জন্যই তো বাঙ্গলার স্বভাব কবি বলিয়াছেন, "পদ্মার একুল ভাঙ্গে ওকুল গড়ে এইতো নদীর খেলা, ফকির সন্ধ্যাবেলা।" আজ আমাদের চোখের সামনে যাহা ঘটিতেছে তাহা দেখিলে পদ্মার অতীত কীর্তি কলাপের কথা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। এক সময় রাজমহলের নীচে দিয়া ছোট সোনা মসজিদ (গৌড়- তাহ্খানা) ও মহদীপুরকে বামপার্শ্বে রাখিয়া খিরির বিল, কুমীব দহের বিল হইয়া কানষাটের প্রান্তদেশ দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হইত। এই পদ্মার পূর্ব তীরে তক্তিপুরের (তরতীপুর) ঘাট শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলের পথ[১০]। সেই জন্যই বোধহয় শিবগঞ্জ থানার অদূরে তরতীপুর ও কানষাটে হিন্দুর অষ্টমীর স্নান তর্পন হইয়া থাকে। এই প্রাচীন খাত আজ "পাগলা" নদী নামে খ্যাত। পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে? এই তরতীপুর পর্য্যন্ত গঙ্গার পূর্ব দিক হইতে দক্ষিণ দিকে যাত্রা[১১]। এই জন্যই এই "পাগলা" গঙ্গার আদিখাত হিসাবে হিন্দুর ঐতিহ্য বহন করিতেছে। খিরির বিল, কুমির দহের বিল পদ্মার পুরাতন প্রবাহের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। কৃষ্ণগোবিন্দপুর, মহারাজপুর, রামজীবনপুর, পুরাতন কালীনগর, পুরাতন লা-ভাঙ্গা, বালিয়াডাঙ্গা, শিবগঞ্জ, কানষাট প্রভৃতি গ্রাম পদ্মার পুরাতন গতিপথের স্মৃতি। নওয়াবী আমলে এই অঞ্চলের বহু চর জনসাধারণের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত হয়। এই সব চর বন্দোবস্তের কিছু প্রাচীন কাগজপত্র এখনও কৃষ্ণগোবিন্দপুরের জনৈক সৈয়দউদ্দীন মিঞার (বি, এ) বাড়ীতে রক্ষিত আছে। নওয়াবগঞ্জের পশ্চিমে বাঁশবাড়িয়ার বিল পদ্মা-মহানন্দার সৃষ্টি। তরতীপুরের নীচে পদ্মা কয়েকবার ভাঙ্গা-গড়া করিয়া বর্তমানে ৮ মাইল দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছে। ষোড়শ-শতকে সরদার নীচে মহানন্দার সহিত পদ্মার মিলন হয়; স্থানীয় লোক স্মৃতি ও বিভিন্ন বিবরণে উহার উল্লেখ আছে[১২]। এখন অবশ্য পদ্মা ও মহানন্দার সঙ্গমস্থল গোদাবাড়ীর সন্নিকট মাটিকাটা গ্রামের নীচে। পদ্মার ভাঙ্গা-গড়ার পর্ব বহুদিন আগে হইতেই রাজশাহী শহরের দক্ষিণে পরিদৃষ্ট হইতেছে। পদ্মা এখন এইখানে মাতম করিতেছে। এই সেদিনের কথা; আজ হইতে প্রায় ৯০ বৎসর পূর্বে বর্তমান পদ্মা রাজশাহী শহর হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে প্রবাহিত হইত। তখন শাহ মুখদুম আওলিয়ার সমাধির কয়েক

---

১০. স্বরূপ চরিত ও চৈতন্য ভাগবৎ দ্রষ্টব্য।

১১. কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিখণ্ড, সগর-বংশোদ্ধার ও গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী দ্রষ্টব্য।

১২. পুঁঠিয়ার রাজবংশ পৃ ঃ ৩০৩, মহারাণী শরৎ সুন্দরীর জীবন চরিত পৃষ্ঠা ১৭; Vides-Statistical account of Rajshahi and Rajshahi District Gazetteer.

রশি দক্ষিণে নুনগোলা ইমামবাড়ীর গগণচুম্বী নহবতখানা ও কারবালা ছিল। ইহার সমসাময়িক লোক খুঁজিলে এখনও পাওয়া যাইতে পারে। স্থানীয় রেশম পট্টীর শ্রী রজনী কান্ত মৈত্র তাঁহাদের অন্যতম। তিনি প্রায় শত বৎসর কাল আয়ু ভোগ করিয়া গত বৎসরে মারা গিয়াছেন। এতদব্যতীত দরগাপাড়ার প্রাচীন নকশাতেও এইসব কীর্তির উল্লেখ আছে। বাঙলা ১৩০৪ সালের ভূ-কম্পনের পর হইতেই নবীনগর, হাবাসপুর প্রভৃতি গ্রাম ভাঙ্গিতে শুরু করে। অথচ এইসব গ্রাম তখন রাজশাহী কোর্ট হইতে দেড়/দুই মাইল দক্ষিণে পদ্মার তীরে অবস্থিত ছিল। তাহাছাড়া রাজশাহী পুরাতন শহরের ধ্বংসের কথা তো সুবিদিত। আজ আবার পদ্মার দক্ষিণ তীরে নবীনগর প্রভৃতি গ্রাম পুনরায় ভাসিয়া উঠিয়াছে। এই গ্রামগুলি এখন পদ্মার চরে নূতন গ্রামের পত্তন করিয়াছে। এইভাবে পদ্মার ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে। রাজশাহী শহর এখন মহাকালের সম্মুখীন। এই জন্য বলিয়া রাখা ভাল এই শহর সংস্কারের ভূমিকায় আমাদের ইঞ্জিনিয়ারগণ আজ যদি কালিদাসের ভূমিকা গ্রহণ করেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে অনুতপ্ত হইতে হইবে।

পদ্মা অর্বাচীন নদী সে কথা একটু আগেই বলিয়াছি। রেনেল, ব্রোকের নকশায় পদ্মা প্রশস্ত নদী। সিহাব-উদ্দীন তালিশ[১৩] (১৬৬৬) ও মির্জ্জা নাথনের[১৪] (১৬২৪) বিবরণীতে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমের উল্লেখ, ইছামতীর সঙ্গমে, ইছামতীর তীরে যাত্রাপুর এবং ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ডাকচর এবং ঢাকার দক্ষিণে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সম্মিলিত প্রবাহের সমুদ্র যাত্রা। যাত্রাপুর হইতে ইছামতী বাহিয়া পথই ছিল তখন ঢাকায় যাতায়াতের সহজতম পথ। এই পথেই টেভারনিয়ার (১৬৬৬) এবং হেজেস (১৬৮২) যাত্রাপুর হইয়া ডাকা গমন করিয়াছিলেন[১৫]। কিন্তু তখনও গঙ্গার এই প্রবাহের সর্বত্র পদ্মা নাম পাওয়া যায় না। পদ্মা নামের প্রসিদ্ধি দেখিতেছি আইন-ই-আকবরী[১৬] বহারিস্থান-ই ঘায়বি[১৭] ও চৈতন্যদেবের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ প্রসঙ্গে[১৮]। আইন-ই-আকবরীর আবুল ফজলের মতে কাজীহাটার সন্নিকট গঙ্গা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একটি শাখা পূর্বমুখী হইয়া 'পদ্মা' নাম লইয়া চট্টগ্রামের কাছে গিয়া পড়িতেছে। কিন্তু মির্জা নাথন বলিতেছেন–করতোয়া বালিয়ার কাছে (ঢাকা মানিকগঞ্জের সন্নিকট?) একটি বড় নদীতে পড়িতেছে। এই বড় নদীটির নাম অন্যত্র বলা হইয়াছে পদ্মা[১৯]। ত্রিপুরার রাজ বিজয় মাণিক্য ১৫৫৯ সালে ত্রিপুরা হইতে রওয়ানা হইয়া ইছামতী বাহিয়া যাত্রাপুরে পদ্মাতে স্নান করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবও (জন্ম ১৪৮৪-৮৫ সাল) ২২ বৎসর বয়সে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে আসিয়া পদ্মায় স্নান করিয়াছিলেন[২০]। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যায় যে, ষোড়শ শতকেও পদ্মা বেগবান নদী। ষোড়শ শতকের জাওডি-বারোসের ও সপ্তদশ শতকের ফানডেন ব্রোকের নকশায় এই তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে কৃত্তিবাস এই পদ্মাকেই

১৩. Baharistan-i-ghaybi Trs.Borah (Govt. of Assam) 2.Vols, VII,55P.
১৪ Bhattasali N.K, some facts about old Dacca, Bengal past and present, January-March,1936
১৫ Ain-i-Akbari, Trsjarrett.Vol II P 120 S
১৬ ত্রিপুরা রাজমালা পৃঃ৪৯।
১৭. গোবিন্দ দাসের কড়চা-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ।
১৮. সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ৫৭৭-৭৮।
১৯. Baharistan-i-Ghaybi,PP 45,54,56-64
২০. স্বরূপ চরিত দ্রষ্টব্য (প্রাচীন পুঁথি)

বড় গঙ্গা বলিয়াছেন- সে কথাও আগে উল্লেখ করিয়াছি। চতুর্দ্দশ শতকে ইবনে বতুতা (১৩৪৫-৪৬) চীনদেশে যাইবার পথে সমুদ্র তীরবর্তী চট্টগ্রামে (Chhadkawan) অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনি চট্টগ্রামকে হিন্দু তীর্থ গঙ্গা 'জোন' নামে একটি নদীর সঙ্গমস্থল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হয়ত তিনি ব্রহ্মপুত্রকেই জোন (Jaun) বলিয়া থাকিবেন[২১]। যাহা হউক, এখন দেখা যাইতেছে যে, চতুর্দ্দশ শতকে গঙ্গার প্রবাহ চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ছিল। ইবনে বতুতার চট্টগ্রাম এখন আরও দক্ষিণে প্রসারিত হইয়াছে। ঢাকা এখন গঙ্গা-পদ্মার খাত অর্থাৎ বুড়ীগঙ্গার উপর অবস্থিত। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম এখন গোয়ালন্দের সন্নিকট। এই সম্মিলিত প্রবাহ আরও পূর্ব-দক্ষিণে গিয়া চাঁদপুরের সন্নিকট মেঘনার সঙ্গে সন্দ্বীপের নিকট দিয়া সমুদ্রে যাত্রা করিয়াছে। সমুদ্রপোকুলে খুলনা ও বরিশাল জেলার নিম্নে ভাঙ্গা-গড়ার যে মাতম চলিতেছে তাহা গঙ্গা-পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের কীর্তি। জাও-ডি-বারোস হইতে প্রাচীন নকশাগুলি আলোচনা করিলে সহজেই তাহা অনুমিত হইবে।

রেনেলের নকশায় পদ্মাবক্ষে কোথাও কোথাও ইংরাজী S এবং কোথাও বা চৌবাচ্চার ন্যায় কোথাও বা ত্রিকোণ ইত্যাদি পরিদৃষ্ট হয়। এইসব পদ্মার খাত ইত্যাদি মানুষের স্মৃতি চিহ্ন। পদ্মার এইসব বিল, ঝিল দহ, ঘোন, মর্চ্চ ইত্যাদি মানুষের জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এই সমস্ত বিল হাওড়ে বিস্তর মৎস্য আসিয়া বাস করে। গ্রীষ্মে ইহাতে জাল বন্দী হইয়া গাড়ী গাড়ী মৎস্য ধৃত হয় এবং তাহা দেশ দেশান্তরের হাটে বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। এই হিসাবে পদ্মা মানুষের কেবল ক্ষতিই করেনা প্রভূত উপকারও করিতেছে। পদ্মার ইলিশ কেবল প্রচুরই নয় বিখ্যাতও বটে। বিভাগ পূর্বকাল হইতে পদ্মার প্রবাহ মন্থর গতি ধারণ করিয়াছে। কেবল বান বন্যার সময় ইহা প্রবলতর হইয়া থাকে। আগে সারা বৎসর পদ্মার গতি একই অবস্থায় থাকিত। উত্তর পশ্চিম ভারতে কৃষিকার্য্যের সাহায্যের জন্য গঙ্গা-পদ্মার উত্তরতম প্রবাহে দুইটি খাল খননের দরুণ এই গতিবেগ মন্থর হইয়াছে। ইহার প্রথম খালটি (মেজর ক্যাটলীর ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পজ্ঞানের প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বরূপ) ১৮৪৮ সালে পাক-ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি কর্তৃক উদ্বোধিত হয়। দ্বিতীয়টি, প্রথমটির বিস্তার স্বরূপে ১৮৭৮ সালে খোলা হয়। আজ যদি আবার পশ্চিমবঙ্গে ফরাক্কা বাধটির পরিকল্পনা কার্য্যকরী হয়, পদ্মার মৃত্যু অনিবার্য। এই পদ্মার মৃত্যু হইলে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের শ্রীসমৃদ্ধির আশা-ভরসা স্বপ্ন সাধন সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

একদিন বঙ্গের বাহিরে এই পদ্মাই ছিল বাঙলা ও বাঙ্গালীর পরিচয় বহনকারী। বাঙলার মানুষের সৃষ্টি সভ্যতার বিজয় যাত্রার হাট বাজার নগর বন্দর, কলকারখানা সম্পদ সমৃদ্ধি, শিল্প বাণিজ্য, ধর্ম কর্ম, সব কিছুরই বিকাশের মূলে এই পদ্মা।

এই পদ্মা পৃথিবীর নানা স্থান হইতে সওদাগর-স্বার্থবাহর দলকে ডাকিয়া আনিয়াছিল; তাহারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাঙলার ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারে ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাষ-বাস ও শাসন শোষন চালাইয়াছে। আবার তাহারা একের পর এক এই

২১. "The first town of Bengal, which we entered, was Chhadkawan (Chittagonj?) situated on the shore of the vast ocean, the river Ganga, to which the Hindus go in pilgrimage and the river Jaun hear united near it before follwing into the sea."

দেশ ছাড়িয়া সাগর পাড়ি দিয়াছে। বিভাগ পূর্বকালেও পদ্মার মূল প্রবাহ দিয়া বড় বড় মালবাহী জাহাজ পাটনা গমনাগমন করিত। বাঙলা দেশে রেলগাড়ীর প্রবর্তন হইবার আগে গঙ্গা-পদ্মা পথে বিহার, যুক্ত প্রদেশ, দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ, কানপুর, লাখনৌ প্রভৃতি স্থানের সহিত বাঙলার নিবিড় যোগাযোগ ছিল। তখন পণ্য-দ্রব্য, মালামাল, যুদ্ধের রসদ, সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি যাতায়াতের ইহাই প্রধানতম পথ। ধর্ম যাজকদের পথও ছিল ইহাই। মধ্যযুগ হইতে ইংরেজ আমল এবং এখনও যে সব কর্ম-কীতি এই পদ্মার তটে কয়েকটির নাম উল্লেখ করিব। গৌড়ের তাহখানা, কানষাট, শিবগঞ্জ, রামচন্দ্রপুর হাট, বারঘরিয়া, নওয়াবগঞ্জ, সুলতানগঞ্জ গোদাগাড়ী, বটগাছি, প্রেমতালী,কুমারপুর, রাজবাড়ী, খরচ্চাকা, বেলোরা. বুয়ালিয়া, কাজলা, মতিহার, খোজাপুর, শাহপুর, (মূল অংশ পদ্মা-গর্ভে) সরদহ, হাজরাহাটি, মিরগঞ্জ,বাঘা, মখদূমপুর, বিলমাড়িয়া প্রভৃতি কুঠি, দরগাহ, রাজবাটী ও বাজার-বন্দর উল্লেখযোগ্য। বিভাগ উত্তর কাল হইতে দুই দেশের সীমান্ত অঞ্চলে পদ্মা প্রবাহিত হওয়ার দরুন হইতে দুই দেশের সীমান্ত অঞ্চলে পদ্মা প্রবাহিত হওয়ার দরুন ইহার পূর্ব গৌরব ও নাব্যতা ব্যাহত হইতে চলিয়াছে।

গঙ্গা-পদ্মা হিন্দু পুরান প্রসিদ্ধ অতি প্রাচীন নদী। রামায়ণে[২২] ও মহাভারতের কর্ণপর্বে তীর্থ যাত্রা অধ্যায়ে পাণ্ডবগণের নন্দা ও কোশী নদীদ্বয়ে স্নান ও সাগর সঙ্গমে উপনীত হওয়া প্রসঙ্গে এই গঙ্গা পদ্মার প্রাচীনত্বের যেন একটু উল্লেখ আছে[২৩]। ঐতিহাসিকযুগে দশম-দ্বাদশ শতকে পদ্মা সুস্পষ্ট। ইদিলপুর, পট্টোলীর প্রায় সমসাময়িক একটি সাহিত্য গ্রন্থের গুহ্য রূপকছলে পদ্মা নদীর উল্লেখ দ্রষ্টব্য।

বাজনাব পাড়া(১) পুঁউআ(২) খালে বাহিউ।
অদঅ দঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ॥
আজি ভূসুকু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চন্ডালে লেলী[২৪] ॥

উদ্ধৃত চারিটি লাইনের সার মর্ম এই:- পদ্মা খালে বজ্র নৌকা পাড়ি বাহিতেছে। নির্দয় দস্যু ক্লেশ লুট করিয়া লইল। ভূসুকু আজ তুমি বাঙ্গালী হইলে। চন্ডালীকে তুমি নিজ ঘরণী (গৃহিণী) করিয়া লইয়াছ। এখানে পদ্মাখাল; দ্বঙ্গাল-বঙ্গাল, বাঙ্গালী প্রভৃতি শব্দের এবং সমস্ত পদটির সহজিয়া মতানুগত গুহ্য অর্থ আছে। যাহাহউক, এই পদ্মা ও এতদসহ বঙ্গালদেশে (পূর্ববঙ্গ) পদ্মার গতিপথ সমন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল। তখন পদ্মা এতখানি বেগবান ও বড় নদী ছিলনা হয়ত। চতুর্দ্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে পদ্মা বিশাল নদী তাহা উল্লেখিত আলোচনা হইতে এতটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বান বন্যার জলোচ্ছাসে পদ্মা-পদ্মাবতীর যৌবনোচ্ছ্বাস স্বচক্ষে অবলোকন করিলে ইহার অতীতও বর্তমান সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা জন্মাইবে।

---

২২. পদ্মার প্রাচীন নাম 'নলিনী' মুশিদাবাদের ইতিহাস, পৃঃ ৫৭।

২৩. মহাভারত, ১১৪ অধ্যায়, ১-৩ শ্লোক, গাঙ্গেয় শব্দ দ্রষ্টব্য।

১. পাড়া =পাড়ি।

২. পঁউআ খালে =পদ্মাখালে।

২৪. হরপ্রসাদ; ১৯ নং পদ এবং অনুবাদ, ভূমিকা এবং ৪৯ নং পদের টীকা ও অর্দ্ধ দ্রষ্টব্য, ১৯ নং পদ এবং অনুবাদ, ভুমিকা দ্রষ্টব্য; অতীন্দ্র মজুমদারের চর্যাপদ -১৬২ পৃঃ দষ্টব্য।

নারোদ একটি প্রাচীন নদী। এই নদী তাহার পূর্বকীতির জন্য এখনও সুবিদিত। বঙ্গে নওয়াবী ও কোম্পানী আমলে ইহার দুই তীর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল রাজশাহী প্রদেশের (নওয়াবী আমলে রাজশাহীকে রাজ্য বা প্রদেশ বলা হইত) রাজা-জমিদার আমলাদের যত সব দালান কোঠা ফল-মুলের বাগান আরও কত কি। এই নদীর তীর হইতেই এই প্রদেশ শাসিত হইয়াছিল। পুঁঠিয়া, নাটোর তাহার গৌরব কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। এই নদী দিয়াই মুর্শিদাবাদে নওয়াব কোষাগারে রাশি রাশি অর্থ, নওয়াবী ফৌজ, হাল হাতিয়ার যাতায়াত করিত। এই নদীতেই এক সময় ভেলা ভাসাইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে কত নওয়াব কর্মচারী, রাজা-মহারাজা, আমীর ওমরাহ্- পুঁঠিয়া, চাপিলা, সাঁতুল হইয়া ঢাকা যাতায়াত করিতেন। একদিন এই নারোদের কল্যাণে নীলকর ও রেশম ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আজ নারোদ মরিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে চাপিলা, সাঁতুলের কথা আর শোনা যায় না। পুঁঠিয়া, নাটোরের রাজ রাজত্বের সে হর্ম্যরাশির জৌলুস আর নাই। পহরে পহরে সাঁখ-ঢোল-করতাল আর বাজে না। কামানের গর্জ্জনে প্রহর ঘোষণা আর শোনা যায় না। পাইক-পেয়াদা-বরকন্দাজকে (মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধিয়া) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে আর দেখা যায় না। আতুর-অতিথি-কাঙ্গালরা আর এইসব রাজবাড়ীর অলিতে গলিতে মন্দিরে মন্দিরে খয়রাতের আশায় ফিরিয়া বেড়ায় না। নাটোর রাজের গগনস্পর্শী 'বঙ্গোজ্জ্বল' তোরণের কথা মানুষ আজ ভুলিয়া গিয়াছে। নারোদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এখানকার মানুষের কর্ম কীর্তিরও মৃত্যু ঘটিয়াছে। এই জন্যই তো বলিতে হয়– নদী মানুষের জীবন জীবিকার আকর। এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষণে নারোদের কল্যাণে তাহার পটভূমি ভরিয়া উঠিয়াছিল, আর এক যুগের অভিশাপে তাহা কাল গর্ভে লীন হইয়া গেল। সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যকার যে সম্বন্ধ তাহার উপলব্ধি এখানেই সত্য।

নারোদ, মুছাখান, বারাহী, গদাই, বড়ল

একদিন নারোদ মহানন্দা হইতে অর্থাৎ মহানন্দার প্রবাহ নারোদ দিয়াই পুঁঠিয়া, নাটোর, চাপিলা হইয়া ঢাকা; তারপর সাগরে পড়িত। পবে পদ্মার প্রবাহ এই পথেই সাগবে গিয়া নামিত। ফানডেন ব্রোকের নকশায় পদ্মাকে ফরিদপুর বরিশালের ভিতর দিয়া দক্ষিণে সাহবাজপুরের দিক যাইতে দেখিতেছি– আবার সেই নকশাতেই উত্তর প্রবাহের ইঙ্গিত দিতেছে। পদ্মা রাজশাহীর বুয়ালিয়ার দক্ষিণ দিয়া চলন বিলের ভেতর– তারপর ধলেশ্বরী হইয়া ঢাকার বক্ষ ভেদ করিয়া মেঘনা খাড়িতে গিয়া পড়িতেছে। ঢাকার সেই খাতই তো আজিকার বুড়ীগঙ্গা। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে এই মহানন্দা ও পদ্মার মিল কেন্দ্র ছিল– সরদার নীচে এবং সেখান হইতে মহানন্দা– পদ্মার সম্মিলিত মিলন কেন্দ্র ছিল। সরদার নীচে এবং সেখান হইতে মহানন্দা– পদ্মার সম্মিলিত প্রবাহ বর্তমান চারঘাটের মধ্যে দিয়া পুঁঠিয়া-নাটোর-ছাইভাঙ্গার বিল; তারপর চাপিলা, চলন বিল, বিল কুরুলিয়া, বিল বকরী, বিল দিকসি, বড় বিল, কালিয়া কৈয়র প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া ঢাকার জাফরগঞ্জের দিকে ধাবিত ছিল। পরবর্তীকালে রেনেল সাহেবের বিবরণে পদ্মা-মহানন্দার এই সাম্মলিত প্রবাহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রায় ৫০ বৎসর আগে রাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ওমেলী বলিতেছেন– গঙ্গা-পদ্মার পূর্বতন স্রোত রামপুর-বুয়ালিয়ার ৭ মাইল পূর্বে সরদহের নীচে নারোদে নির্গত এবং তারপর পাবনা জেলার মধে বড়ল নামক নদী দিয়া প্রবাহিত হইত[২৫]। তখন পদ্মা-মহানন্দার সম্মিলিত প্রবাহ নারোদ হইয়া চলন

বিলের মধ্যে দিয়া বড়ল বাহিয়া হুরা সাগর; তারপর ঢাকার জাফরগঞ্জের দিকে প্রবাহিত হইত। বড়াই গ্রামের নন্দকুজা বড়লের একটি শাখা। এই বড়ল এখন বাজার-চারঘাট হইতে প্রবাহিত হইয়া হুরা সাগরে পতিত হইতেছে।

পুঁঠিয়ার পূর্বদিকে পাইকপাড়া হইতে একটি নালা বড়ল ও হোজাকে সংযুক্ত করিয়াছিল; ঐ নালার পূর্বভাগকে মুছাখান বলা হয়। ১৮৩৮ সালের বর্ষায় মুছাখান বিস্তৃত হইয়া রাজশাহীর দক্ষিণ-পূর্বভাগে পদ্মায় ভীষণ-জল বিপ্লব হয়। সেই হইতে মুছাখান ও হোজা একত্র হইয়া গদাই নাম ধারণ করিয়াছে[২৬]।

আজিকার রাজশাহী শহরের বড় কুঠির কয়েক রশি পূর্বদিকে প্রায় পাঁচ শতাধিক বৎসর আগে (?) মহানন্দা নদী হইতে 'বারাহী' নদী নামক একটি নদী তাহিরপুরের নিকট দিয়া 'তেমুক গ্রামের' নিম্নে আত্রাই নদীতে মিলিত ছিল। বারাহী এখন বারানই নামে খ্যাত। এক সময় বারাহী প্রবহমান নদী ছিল। এই বারাহী নদীর তীরে 'রামরামা' গ্রামে তাহিরপুরের বিখ্যাত রাজা গণেশের রাজধানী ছিল[২৭]।

বারাহী এখন ক্ষীণতর। উক্ত রামরামার পশ্চিমে বারাহীর অপর পারে তাহিরপুরের পরবর্তী জমিদার বাটীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান।

যাহা হউক সরদহ চারঘাট হইতে নির্গত বড়ল নদীই ব্রোকের সরদহের সন্নিকটস্থ বেগবান প্রশস্ত পদ্মা। পুঁঠিয়ার সন্নিকট বিড়ালদহ পদ্মার সেই প্রাচীন খাতের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। নারোদ বহুদিন আগে মজিয়া গিয়াছে। বড়ল এখন সংকীর্ণ নদী। মিঃ হান্টারের আমলে বড়লের মুখে স্তূপীকৃত বালিরাশি জমিয়া ভরাট হইয়া গিয়াছে। এখন বান বন্যা ব্যতীত অন্য সময় বিশেষত: বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়। মুছাখানও মৃত্যুর কবলে পতিত। বারাহী (বা বারানই) এখন সংকীর্ণ। এ নদী একটু গভীর থাকার দরুণ বর্ষার সময় মালবাহী ও যাত্রীবাহী নৌকা ও লঞ্চ নিম্নাংশে যাতায়াত করিতে পারে। পদ্মা ও আত্রায়ের গতি পরিবর্তনের ফলে এই নদীগুলির পূর্ব অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে আজ এই নদী নালা ও খালবিলের সংস্কার সাধন হইলে এতদাঞ্চলের পূর্বশ্রী পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে।

বিড়ালদহ খাত

সুন্দর নদীটি বেশ প্রাচীন। নারোদেব পদ্মা প্রবাহ বর্তমান থাকা কালে এই নদীর গতিবেগ প্রবলতর ছিল। নারোদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরেরও মৃত্যু হইয়াছে। উক্ত সুন্দর ও আর একটি নদী কালীদহের সহিত সওদাগর ধনপতির বহু কাহিনী বিজড়িত। এই নদীর তীরে পুঁঠিয়ার-(বিড়ালদহের) উত্তরে সুন্দরপুর গ্রামে ধনপতি সওদাগর ও তদীয় সহধর্মিনীদ্বয়ের বসতবাড়ী থাকার জনশ্রুতি আছে। কালীদহ (সাগর) পশ্চিমে 'কলের বিল' ও খরসতীর বিল হইয়া মালদহ জেলায় যোগাযোগ রক্ষা করিত। আলোচ্য

২৫. Rajshahi Gazetteer-p 15

* এতদঞ্চলের প্রাচীন ব্যক্তিরা এখনও এই জল বিপলবের ভয়াবহতা সম্বন্ধে গল্প করিয়া থাকেন। একরাত্রির মধ্যে মুছাখান বিস্তৃত হইয়া এই অঞ্চলের আশ্চর্য পরিবর্তন করিয়াছে। চলন, চন্দ্রবতী, হালতি, বামসর প্রভৃতি দুস্তর (জলাময়) বিল সমূহ আজ হইতে প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে বহুস্থানে মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

২৬. মহাবাণী শরৎসুন্দরী জীবন চরিত– পৃ ঃ ১৬; পুঁঠিয়া বাজবংশ পৃ ঃ ৩০৩, ৩।

২৭ মহারাণী শরৎসুন্দবী জীবন চরিত-১৭।

'সুন্দর' ও 'কালীদহ' অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। প্রাগুক্ত আলোচ্য কোশী নদীর ইহাই আদি খাত বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এই নদী মালদহ গৌড় হইয়া এক সময় করতোয়ায় পড়িত। সে কথা একটু আগেই বলিয়াছি। এইরূপ একটি জনশ্রুতি আছে যে, 'ধনপতি সওদাগর* কালীদহ-সুন্দর বাহিয়া গৌড়ে যাতায়াত করিত। এক সময় গৌড়ের রাজা? ধনপতিকে বলিলেন, "আপনি কেমন সওদাগর যদি আমার 'বিলভাতিয়ার' বিলে আপনার দেশ হইতে মাটি আনিয়া বাড়ী বানাতে পারেন। সওদাগর নাকি তাই করিয়াছিলেন।" এখন বিলভাতিয়ার বিলে যে মনসাতলা বা ভিঁটা আছে তাহা ধনপতির বাড়ী বলিয়া অনেকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই মনসাতলা বা ভিঁটার অদূরে খালিমপুর গ্রামে গুপ্ত-যুগের তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছে। যদিও ধনপতি সওদাগরের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। তবে খালিমপুর এক সময় যে একটি নদীর তীরে বৰ্দ্ধিষ্ণু জনপদ ছিল তাহা বিলভাতিয়ার অবস্থান, সপ্রমান করিতেছে। কালীদহের সঙ্গে 'পাবলই' নামক একটি নদীর সংযোগ থাকার প্রমান পাওয়া যাইতেছে। কালীদহ নদী পূর্বদিকে গিয়া ঝলমনিয়া নদীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। নদীটির মুখ মজিয়া গিয়া এখন কৃষি হইতেছে। কিন্তু, নদীর প্রাচীন প্রবাহ পথে এখনও স্থানে স্থানে 'দহ' 'মৰ্চ্চ' আছে। তাহাতে প্রচুর মৎস্য বাস করে। সুন্দর নদীর কোন কোন স্থানে এখনও সারা বৎসর জল থাকে। নদীটির সংস্কার হইলে এতদাঞ্চলের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে নিঃসন্দেহ। শোনা যাইতেছে যে, ইহার সংস্কারের জন্যে একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই অঞ্চলে কালুপাড়া গ্রামের পূর্বে আর একটি মরা নদীর নাম পাওয়া যায়। তহা 'আয়চাঁদ' বলিয়া খ্যাত। মান্দার বিল হইতে উৎপন্ন শিবু নদী কামারগাঁ ও তানোর হইয়া কালীগঞ্জের সন্নিকট বারানই নদীর (নওহাটা নদীর) উত্তরতম প্রবাহে মিলিত। তানোরেব সন্নিকট এই নদীর পশ্চিমতীরে প্রাচীন তালন্দ জমিদার বাটী বিখ্যাত।

সুন্দর নদী, কালীদহ, কোশী পাবলই বা ভাবলই

শিবু ও ফকিরণী নদী

শ্রীনগরের অদূরে আত্রাই হইতে ফকিরণী নদীর সূত্রপাত; কালিকাপুর, চককুশুম্বা, দেলুয়াবাড়ী, দামনাশ হইয়া গোয়াল মান্দাকে স্পর্শ করিয়া পুনরায় আত্রায়ে পতিত। শিবু মান্দার বিলের খাত। আর 'ফকিরণী' একটি নালা বটে। আলোচ্য নদীনালাগুলি বহিয়া একদিন এ জেলার ব্যবসায় বাণিজ্য চলিত; দুই তীরে রেশম ও নীলকরদের কল কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছিল; মানুষ সুখে শান্তিতে কাল কাটাইত; দেশদেশান্তবে যাতায়াত করিত; সংস্কৃতি সভ্যতার বিনিময় হইত। নদীগুলির গতি পরিবর্তনের ফলে মানুষেরও পূর্ব অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রেশম ও নীলকর সাহেবরা এখন আর নাই। কেবল পদ্মা, মহানন্দা, আত্রাই, পুনর্ভবা বারানই, বড়ল, নারোদ ও সুন্দর ইত্যাদি নদীনালাগুলি তাহাদের কর্ম কীর্তির স্বাক্ষর বহন করিতেছে। এজেলার অর্থনীতির বিষয় বিবেচনা করিলে আলোচ্য মৃতপ্রায় নদীগুলির পুনঃসংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করিতে হয়। আলোচ্য নদীগুলির তীর ধরিয়া যে সব বাজার বন্দর এককালে গড়িয়া উঠিয়াছিল, এখনও তাহার কতক বর্তমান আছে। এই সব বাজার বন্দরের চারিপার্শে দেশ দেশান্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীদিগের বসতি বিস্তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

* অত্রগ্রন্থের প্রথম খণ্ডে রেশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

**বিল ও খাড়ি :**

রাজশাহী জেলার নদীগুলির খাত পরিবর্তনের ফলে যুগে যুগে যে সব খাল-বিল-ঝিল ও হাওড় প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সংখ্যা একেবারে নগন্য নয়। প্রাচীনকাল হইতে ১৯১৬ সালের নকশা পর্য্যন্ত যে সব খাল বিল পাওয়া যায় তাহার সংখ্যা শতাধিক। ইহার মধ্যে বিল গৌরী, ছাতড়া, মান্দা, উৎরীল, হিলনা, বিলকুমারী, পাতিখোলা, অঙ্গরা, চ্যংঙ্গা, ছোনি, মালসী, সতী, পারুল, দিকসি, মিরাট, পিপরুল, বাঘনাদি, সিদ্ধেশ্বরী, তাজপুর হালতি, রক্তদহ, হাইল্যা, মাঝগাঁও, চৌমোহন, ছাতরাল, দাঁড়িকুশি, খড়দহ, শিবপুর, চৌগ্রাম, আরজী ও চলন প্রভৃতি বিল উল্লেখযোগ্য। ইহাদেয় মধ্যে চলন বিল অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর। দেশ বিভাগেব পর রাজশাহী জেলার আয়তন বর্দ্ধিত হওয়ায মালদহ ও দিনাজপুর জেলা হইতে আরও পনরটিরও বেশী বিল এই জেলার অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিলভাতিয়া, খিরির-বিল, কুমারদিহ, ঘুকশী, জবায়ের, কুছরার ও বাঁশবাড়িয়া প্রভৃতি বিল উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে জেলার প্রধান প্রধান বিলগুলির মধ্যে বিল ভাতিয়া, বিলজবায়ের, বিল ঘুকশী, বিল মান্দা, বিল ছাতড়া, বিল উৎরিল ও সিদ্ধেশ্বরী, বিল সতী, বিল আরাজী, বিল পিপরুল, বিল চৌমহন, বিল পারুল ও বিল চলন বিখ্যাত। জেলাব পশ্চিমে বাঁশবাড়িয়ার বিল, বিল ভাতিয়া ও জবায়ের; মধ্যে মান্দা ও দিকসী এবং পূর্বপ্রান্তে বিল চলন অবস্থিত। আলোচ্য বিলগুলি এখন গ্রীষ্মের সময় শুকাইয়া যায়। কোন কোনটিতে দুই তিন হাত পর্য্যন্ত জল থাকে। বান বন্যায় এই সব বিল সমুদ্রবৎ হইয়া উঠে। তখন কোন কোন বিলে ৮।১০ হাত পর্য্যন্ত জল হয়। প্রবল বন্যার সময় বিল অঞ্চলের জন বসতিগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্বীপের ন্যায় দেখায়। তখন নৌকা প্রভৃতি যানবাহনের সাহায্যে স্থানান্তরে গমনাগমন করিতে হয়। স্থানাভাবে আমরা প্রত্যেকটি বিলের হিসাব নিকাশের উল্লেখ দিতে পারিলাম না। কেবলমাত্র বিল চলনের কথা কিছু বলিব।

স্থানীয় ভাবে বিখ্যাত 'চলন বিল' সাধারণ্যের 'চললের বিল' নামে কথিত। চলন বিল ইংরেজ আমলের ইংরেজী চ্যানেল (channel) শব্দ হইতে উৎপন্ন। তৎপূর্বে চৌমোহন বা চৌমোহনী অথবা চলন নামে কথিত হইতে। এক সময় এই বিল চলন, বড়াইগ্রামের দক্ষিণে বড়ল নদীর সন্নিকট চৌমোহন বিল পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। তখন প্রধানত: পদ্মা, আত্রাই, করতোয়া ও আর একটি ছোট নদী নাগর এই চারিটি নদীর সঙ্গমস্থল ছিল বিল চৌমোহন। তারপর পদ্মা (পদ্মার খাত নারোদ মজিয়া গেলে) ও করতোয়ার গতি পরিবর্তন হইলে নদীমুখ ভরাট হইয়া যায়। অতঃপর ক্রমশ: এই বিলের মূলকেন্দ্র 'চৌমোহন' ছাড়িয়া আসিয়া উত্তর পূর্ব দিকে দাঁড়ায়; যেখানে পশ্চিম উত্তরাগত আত্রায়ের বিপুল জলধারা আসিয়া নির্গত হইত। আত্রায়ের মুখই ইংরেজ আমলের চ্যানেল বা চলন যাহাকে আজ আমরা চলন বলিতেছি। আসলে ইহা ঐতিহাসিক যুগে প্রধানত: চারিটি নদীর মোহনা (Four channels) হইতে চৌমোহন অপভ্রংশে চলন বিল নামে বিখ্যাত ও কথিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বড়াইগ্রাম অঞ্চলের লোকেরা বলিতেছেন, এই বিলে নওয়াবী আমলের রাজস্বের 'চালান' জলদস্যু কর্তৃক অপহৃত হইত বলিয়া অপভ্রংশে 'চলনবিল' নামকরণ হইয়াছে। ইংরেজ আমলে এই বিলের মূলকেন্দ্র সিংড়া, গুরুদাসপুর

চলন বিল

থানার মধ্যস্থলে গুমাণীর তীর ঘেসিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এক সময় রাজশাহীর পূর্বপ্রান্তে নাটোর মহকুমার থানা বড়াইগ্রাম, গুরুদাসপুর ও সিংড়া এবং পাবনা জেলার চাটমোহর, তারাশ ও রায়পুর এই ছয়টি থানার মধ্যভাগে চলন বিলের আয়তন বিবেচনা করা হইত। বান বন্যায় যখন এই বিলটি বিস্তৃত হইত, তখন উহার আয়তন দাড়াইত চারি শত একুশ (৪২১) বর্গমাইল। উল্লিখিত প্রাচীন নকশা গুলির আলোচনা হইতে ইহার তথ্য মিলে। পদ্মার গতি পরিবর্তন এবং আত্রাই ও করতোয়ার দুর্দ্দিনের সঙ্গে সঙ্গে প্রসিদ্ধ বিল চলনেরও গর্ব খর্ব হইয়াছে। হয়ত এমন একদিন আসিবে সেদিন চলন বিল খুজিয়া বাহির করা দুষ্কর হইবে।

এখনও বান বন্যার সময় আত্রাই ও নাগরের জলধরা চলন বিলের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হয়। ইংরেজ আমলের মধ্যভাগে চলন বিল যখন ভরিয়া উঠিত তখন ইহার সম্মুখভাগ ফাপিয়া ৪ হইতে ৬ মাইল প্রসারিত হইত। সেই সময় স্থানীয় লোকেরা ইহাকে 'ছয়লাভ' বা ফাইলাম বলিত[২৮]। ডিসেম্বর হইতে জুন পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গেলেও তখন এখানে ফসলাদি বুনা হইতনা। চলন বিল কতকটা চৌবাচ্চার মত। গুমানী ইহার জলধারা লইয়া গিয়া ঢালিয়া দিত বড়লে–তারপর সেই বিপুল জলরাশি হুরা সাগর হইয়া যমুনাতে যাইয়া পড়িত। এখনও সেখানেই পড়িতেছে। ব্রহ্মপুত্র প্লাবিত হইলে চলন ফাপিয়া উঠিত। যতক্ষণ না নামিয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিল অঞ্চলের জন সাধারণের দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। গ্রীষ্মের সময় চারি পার্শ্বের জল নামিয়া যখন চৌবাচ্চার মত একটি খাতে জমা হয় তখন উত্তরে তাজপুর হইতে খুবজিপুর পর্য্যন্ত পূর্ব-পশ্চিম ১৫ বর্গমাইল আয়তনে আসিয়া দাঁড়াইত। এই সময় বালসা হইতে ৩।৪ মাইল পর্য্যন্ত প্রস্থ হইত। এই ভাগেই বিল চলনের হৃদয়কেন্দ্র। তখন ছোট ছোট ২।৪টি নালা কাটিয়া বিলের চারি পার্শ্বের চর ও উঁচু জমিতে চাষ বাস করিবার জন্য স্থানীয় কৃষকগণ বার বার ব্যর্থ চেষ্টা চালাইতে থাকে। কিছুদিন যাবৎ বহু ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার করিয়া বিংশ শতকের গোড়ার দিক হইতে কিছুটা কৃতকার্য্য হইতে থাকিলে জন সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলনের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয় সরকার উপলব্ধি করিতে থাকেন। তারপর ১৯০৯ সালে চলনের সংস্কার উদ্দেশ্যে সরকার প্রাথমিক পরীক্ষা কার্য্য শুরু করেন। ১৯০৯ সাল হইতে ১৩ সাল পর্য্যন্ত পরীক্ষা কার্য চালাইবার পর যে সব তথ্য পাওয়া যায় তাহার মূল বক্তব্য নিম্নরূপ "In 1909 a temporary Subdivision of the public works department (called the chalan Bill Subdivision) was created for the investigation of the question of its drainage. An enquiry was held extending form the middle of February to the end of September, and it was found that its area had been reduced to 142 Square miles, the remainder having been reclaimed. Even in this reduced area only 33 miles were under water all the year round. The rest was under water for past of the year, but was rising in level every with the deposition of Silt; 49 Square miles were low land which could only be cultivated during February, March and April, while 22 Square miles were raised land which was cultivable for dry crops from January and February and 38

২৮. Rajshahi Gazetteer P. 7-8

Square miles were cultivable from November. It was than calculated that 222.25 million cubic feet of Silt a year were brought in by the feeder rivers, while 53 million cubic feet were couried off by the rivers draining the Bil. The balance of 169 milion cubic feet was deposited annually; this deposit, if distributed equally over the whole 142 Square miles, means a raising of the level at the rate of half an inch a year.

In May 1910 a further enquiry was held in order to ascertain the condition of the bil during the dry weather. It was found that the area of the bil proper had been further reduced and that it evtended from Bairabari on the north west to mid way between kalinagar and Ekanna bigha on the south and to kubjipur on the south-east. The portion to the west of Bairabari was dry and under cultivation, while the depth of water in the lit it self was only 9 foot. In 1913 a further inspection was made with the result that it was ascertained that only 12 to 15 square miles remained under water throughout the year (compared with 33 square miles in 1909), the banks all round Being high and under cultivation, while the depth of water in the bil in the mouth of April varied from 9 inches to 18 inches, It is thus apparent that the chalan Bil is sitting up repidly land is being reclaimed new villages are springing up along its sides and the watery waste is yeilding place to settledtilth29 অতঃপর কিছুদিন যাবৎ এ-বিষয়ে চাপা পড়িয়া থাকে। তারপর দেশ বিভাগের পূর্ব পর্য্যন্ত ইহার উন্নয়নের যে পরিমান অর্থ ব্যয় হইয়াছে সে তুলনায় কিছুই আয় হয় নাই। কিন্তু পাকিস্তান আমলে আসিয়া আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে পড়িয়া চলন কাবু হইয়া গিয়াছে। চলন এখন সম্পূর্ণ বশীভূত। চলনের আর সে রাক্ষসী মূর্তি নাই। যৌবর্নাদ্দমে সে আর মানুষকে গ্রাস করে না। পানসী ডুবাইয়া মানুষের অমঙ্গল ঘটায় না। দস্যু তস্করদের গর্বতো বহুদিন আগেই চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মের সময় এখন চলনে এপার হইতে ওপারে হাঁটিয়া যাতায়াত করা যায়। পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের ওয়াপদা পরিকল্পনার কল্যাণে এখন আনুমানিক ১০৬ বর্গমাইল অর্থাৎ ৬৭,৭৮২ একর জমিতে বাৎসরিক ৭,২৩,৭৮৪ মণ অতিরিক্ত শস্য পাওয়া যাইতেছে। চলন বিল উন্নয়ন পরিকল্পনার বৃহত্তর কার্য্যক্রম শেষ হইলে–বর্তমানের (১৯৬৪ সালের) তুলনায় বৎসরে কি পরিমাণ শস্যাদি পাওয়া যাইতে পারে তাহা উল্লিখিত শস্যাদির পরিমাণ হইতে সহজেই অনুমান করা যাইবে।

বিল চলনের আত্মকাহিনীতে নানা কথা ও কাহিনী আছে। আগের লিখিত ধারাবাহিক কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতক হইতে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্য্যন্ত কতকগুলি সরকারী চিঠিপত্র ও স্থানীয় চাক্ষুষ প্রমানাদির পরিপ্রেক্ষিতে যতটুকু অবগত হওয়া যায় আমরা এখানে তাহার বিষয়ে মোটামুটি আলোকপাত করিব। জনৈক সুপারভাইজার নাটোর হইতে মুর্শিদাবাদ দরবারে লিখিতেছেন, "চলন বিল

২৯. Bengal District Gazetteer, Rajshahi P P 8-9

অতীব দুর্গম স্থান। সেখানে অপরাজেয় দুর্দ্ধর্ষ্য দস্যু-তস্করের আড্ডা তো ছিলই–উপরন্ত নানাপ্রকার হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের লীলা ক্ষেত্র্ কার সাধ্য যে দিনে দুপুরে ২।৪ খানা পানসী বাহিয়া যায়। মানুষ মানুষকে কেবল নির্দ্দয়ভাবে হত্যাই করে না। হিংস্র জন্তু জানোয়ারও মানুষের রক্ত চুষিয়া খায়[৩০]।" তখন বড়াই গ্রামের অদুরে চাপিলাতে নওয়াবী রাজস্ব আদায়ের কাচারীতে রাজস্ব আদায় হইত না। নাটোর হইতে রাজস্ব মুর্শিদাবাদ রাজকোষে ইংরেজের হাতে যাইয়া পৌছিত। ১৯১৭ সালে বিল চলনের দস্যুবৃত্তি নিবারণকল্পে গুরুদাসপুর থানা স্থাপিত হয়। প্রকৃত পক্ষে এই থানা স্থাপিত হইবার পর হইতে এতদাঞ্চলের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে।

জ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার আদি বাসিন্দারা ধীরে ধীরে তাহাদের কীর্তিকলাপের কথা ভুলিয়া যাইতেছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, অতিথি পরায়নতা প্রভৃতি সকল বিষয়ে চলন বিল অঞ্চল আজ অনেকখানি উন্নত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

মিঃ হাণ্টারের আমলে বিল চলন সম্পর্কে রাজশাহীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নরম্যান সাহেবের বিবরণে নানা তথ্য অবগত হওয়া যায়। এই সময় রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলার কেন্দ্রস্থলে বিল চলন অবস্থিত: আয়তন ১৫০ বর্গমাইল[৩১]। তখন চলনে নানা জাতীয় ঘাস-উড়ি, কাশ, পাতি, তারাট প্রভৃতির মধ্যে বিরাট বিরাট বিষধর সর্প বাস করিত। এক প্রকার মশা মাছির উপদ্রবও ছিল। অজগর সর্পগুলি ৩ হইতে ৪।৫ মণ পর্য্যন্ত ওজন হইত। ঢাকা ও সিংড়া থানার বাদিয়ারা এই সব নানা জাতীয় সর্প ধরিয়া বিদেশে চালান করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিত। বিল চলনে এক প্রকার জোঁক থাকিত তাহা সর্পের মতই গৃহপালিত জীব জন্তুর ক্ষতি করিত। মানুষকে বাগে পাইলে ছাড়িত না। এখনও এখানকার 'জোঁকার খাল' 'সাপগাড়ী'–সর্প ও জোঁকের ভয়াবহতা স্মরণ করাইয়া দেয়। বন্য পশুদের মধ্যে এক প্রকার গাভী ও মহিষের কথা শোনা যায়। সেই জন্যেই বোধ হয় বিল চলনের 'মহিষাগাড়ী' ও 'মহিষাহালট' আজ তাহারই স্মৃতি বহন করিতেছে। কিন্তু, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে বণ্য শূকর, ব্যাঘ্র ও ভল্লুক প্রভৃতির চাক্ষুষ প্রমাণের কথা স্থানীয় প্রাচীন লোকেরা এখনও গল্প করিয়া থাকে। এই সব হিংস্র জানোয়ারেরা দল-দামের উপর বাস করিত। এই বিলে নানা জাতীয় ঘাস পঁচিয়া জলের উপর যে ছাউনি পড়িত তাহা দেড় হাত দুই হাত পর্য্যন্ত পুরু ছিল; গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি অবাধে চরিয়া বেড়াইতে পারিত।

এখানকার লোভনীয় সম্পদ মৎস্য ও পাখীর কথা স্থানীয় লোকেরা এখনও ভুলিয়া যাইতে পারে নাই। এক সময় এখানকার মৎস্য ও পাখী বিক্রয় করিয়া প্রায় একলক্ষ লোক জীবিকা নির্বাহ করিত। চলনের মৎস্য ও পাখী বাঙলার বিভিন্ন স্থানে চালান যাইত। কলিকাতায় ইহার খুব বেশী চাহিদা ছিল। জিউল মাছের মধ্যে চলনের কই বিখ্যাত; উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইত। বিহার ও অন্যান্য স্থান হইতে শীতকালে এক শ্রেণীর লোক আসিয়া এখানে ফাঁদ ও এক প্রকারের জাল প্রভৃতি দ্বারা পাখী ধরিয়া কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে চালান করিত। লোভনীয় পাখীর মধ্যে বাঙ্গাল, মুরগী, হাঁস, নারুলী, ত্রিশূল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছিল। 'বাঙ্গাল

মৎস্য ও পাখী সম্পদ

৩০. Vide-Circular letter to all districts except purnea -30 Dec, 1771 From Nator).

৩১. Hunter's Statistical account of Bengal Vol VIII P 25.

পাখী' আড়াই সের তিন সের পর্য্যন্ত ওজন হইত। এই পাখী সহজে ধরা পড়িত না। ইহারা বিলের মধ্যস্থলে বাস করিত। চলনের বাগাড়ী তো সুবিদিত। এখন নাটোরের বাগাড়ী বিখ্যাত। তবে পূর্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। বাগাড়ী খুব সুস্বাদু পাখী। এখনও রাজশাহীর বিভিন্ন হাটে বাজারে ফাল্গুন চৈত্র মাসে প্রচুর পরিমানে আমদানী হইয়া থাকে। চলনের মাছ ও পাখী কেনা- বেচার মাধ্যমে স্থানীয় 'কলম বাজারের' পত্তন হইয়াছিল। এই কারণেই 'কলম গ্রাম' চলনের মতই বিখ্যাত। বিভিন্ন দেশের দালালেরা আসিয়া কলমবাজারের মৎস্য পাখী খরিদ করিয়া নিজ নিজ দেশে চালান করিত। ইহাতে এ- জেলার একটা বিরাট আয় হইত। ১৯১৬-১৭ সালের দিকে বাৎসরিক ৬০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত আয় হইয়াছিল[৩২]। চলনের মৎস্য ও পাখী সম্পদ নষ্ট হওয়ার দরুণ আনুমানিক এখানকার প্রায় ৩০ হাজার লোক বর্তমানে বেকার হইয়া পড়িয়াছে।

এখানে আর একটি জলজ সম্পদ প্রচুর পরিমানে জন্মিত। তাহা চলনের মাক্‌না, সিঙ্গুট (সিঙ্গার) ও পদ্ম প্রভৃতি অনেক সময় স্থানীয় গরীব লোকেরা খাদ্যরূপে ব্যবহার করিত। দুর্ভিক্ষের সময় ৫।৬ দিন, কোন কোন সময় ১৫।১৫ দিন পর্য্যন্ত এখানকার জলজ ফল খাইয়া গরীব লোকেরা জীবন ধারণ করিত। এখানকার সিঙ্গুট ও মাক্‌না ফল হইতে একপ্রকার আটা প্রস্তুত হইত। এই আটার রুটি খুবই সুস্বাদু ও সুগন্ধি হইত। দিয়াড় অঞ্চলের কলায়ের রুটির মত পুষ্টিকরও ছিল।

বিল চলনের আর একটি কাহিনী যাহার পূর্বাভাস একটু আগেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহা হইল একানকার দস্যু-তস্করের উপদ্রবের কথা। ইংরেজ কোম্পানী আমলে বিল চলন দুরধিগম্য ছিল। আগেই উল্লেখ করিয়াছি যে, করতোয়া, আত্রাই ও পদ্মা এই তিনটি বড় নদীর সঙ্গম স্থলে বিল চলনের উৎপত্তি। মুসলমান যুগে (মোগল আমলে) এই সব পথ দিয়া উত্তর বঙ্গের বাণিজ্য সম্পদ ও রাজস্ব ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিত। ইংরেজ কোম্পানীর আমলে রেলপথ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব পর্য্যন্ত এই পথ দিয়াই শিবগঞ্জ সুলতানগঞ্জ, বুড়িগঞ্জ, শেরপুর, উল্লাগাড়া, হাণ্ডিয়াল, ঢাকা, কুমারখালি, মুর্শিদাবাদ, রামপুর-বুয়ালিয়া প্রভৃতি বন্দরে সওদাগরী নৌকা ও রাজস্ব-পানসী গমনাগমন করিত। ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে (রাজস্ব আদায় সময়ে) বাংলা দেশে নানা কাবণে দেশের শাসনকার্য্য শিথিল হইয়া পড়ে। ফলে, দেশের নানা স্থানে চুরি ডাকাইতির উপদ্রব ব্যাপক আকার ধারণ করে। রাজশাহী ও পাবনার এক শ্রেণীর ভদ্র হিন্দু চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া অঢেল ধন-সম্পত্তির মালিক হইয়া উঠিয়াছিল। এমনকি শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের অনেকেই জমিদারী ক্রয় করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পরে তাহারা কুলীন ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজেদের মহিমা প্রচার করিত। পাবনার সলপের সান্ন্যাল পরিবার, হরিপুর চৌধুরী পরিবার প্রভৃতি ও রাজশাহীর চামারীর বাগচী ও জোয়ারীর চৌধুরী পরিবার খুজয়ার খাঁ, মধুখালির ঠাকুর, পিপলার নিয়োগী প্রভৃতি এই শ্রেণীর জমিদার[৩৩]। ইহাদের আড্ডা ছিল বিল চলনে। তাহারা চলনে আড্ডা করিয়া করতোয়া, যমুনা, পদ্মা, আত্রাই, নাগর প্রভৃতি নদীতে লুঠতরাজ খুন-খারাবি করিয়া বেড়াইত। নওয়াবী আমলে চাপিলা নওয়াব কাচারীতে রাজস্ব আদায় ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং শাসন নিমিত্তে যে

---

৩২. Rajshahi Gazetteer, P 7

৩৩. রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পৃঃ ১৮৬-১৮৯; পাবনা জেলার ইতিহাস পৃঃ ১১৯-১১৪।

মুষ্টিমেয় পুলিশ থাকিত ডাকাত দলের সহিত কোন রকমেই তাহারা পারিয়া উঠিতনা। ইংরেজ আমলের প্রথম শতক পর্য্যন্ত বিল চলনে দস্যুবৃত্তি পুরাদমে চলিত*। স্থানীয় বই পুস্তকে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তখন বিল চলনের পূর্ব দিকে করতোয়ার তীরে হাণ্ডিয়ালে (পাবনা জেলা) ইংরেজ আমলে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার রেশম নীল ও ধান্য প্রভৃতি কাঁচামাল আমদানী রফতানী হইত। দক্ষিণ-পশ্চিম চাপিলাতে নওয়াব কাচারী তো ছিলই। সুতরাং চুরি ডাকাইতির সুযোগ সুবিধা ছিল। চলন বিল অঞ্চলে উৎকৃষ্ট ধরণের রেশম ও নীল পর্য্যাপ্ত পরিমানে জন্মাইত। তাড়াশ, বড়াইগ্রাম, সিংড়া, গুরুদাসপুর প্রভৃতি থানায় এখনও নীলকরদের কিছু কিছু স্মৃতি জাগিয়া আছে। বিল চলনের কথা আপাততঃ এইখানে শেষ করিলাম। গুরুদাসপুর শিক্ষা সঙ্ঘ প্রসঙ্গে বিল চলনের আরও কিছু স্বতন্ত্র সংবাদ পরিবেশন করিবার চেষ্টা করিব।

খাড়ি ও টিলা

রাজশাহী জেলার নিম্নভূমিতে যে সমস্ত জোল জোলা, দাড়-দাড়া, সরুনালা, ডোবা খাড়ি দৃষ্ট হয়–তাহা গঙ্গা–পদ্মা–মহানন্দা–আত্রাই ও করতোয়ার সৃষ্টি। এ জেলার অসংখ্য খাল-বিলের সহিত ইহারা পরস্পর সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছে। ইহাদের স্বতন্ত্র কোন উৎস নাই। খাল বিলেই ইহাদের উৎপত্তি–খাল-বিলেই ইহাদের পতন। ইহারা প্রাচীন নদী নালার স্মৃতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এ- জেলার নদীগুলির ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাসে সে তথ্য পাওয়া যায়।

জেলার পশ্চিম-উত্তরাঞ্চলে কয়েকটি খাঁড়ি আছে। বরিন্দ বা খিয়ার অঞ্চলে ক্ষেত-খামারে জলের অভাব দূর করিবার জন্য সেচ পরিকল্পনা বিবেচিত হওয়ায় নদী হইতে সে সব খনন করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। গোদাগাড়ী, পোরশা প্রভৃতি থানায় খিয়ার মহলে এই শ্রেণীর খাড়ি দৃষ্ট হয়। ইহাদের পাড় সমতল ভূমি হইতে বেশ উচ্চ। যে সবের পাড় উচ্চ নয় তাহা প্রাচীন নদীর গতিপথ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। গোদাগাড়ী ও পোরশা প্রভৃতি থানার ভূমি অসমতল। প্রায় উচু নীচু দৃষ্ট হয়। এগুলিও কোন সময়ের গঙ্গা, পদ্মা ও মহানন্দার খাত পরিবর্তনের চরভূমি বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ এই অসমতল ভূমির মধ্যে দিয়া যে সব খাড়ি প্রবাহিত তহা প্রায়ই পরস্পর বিলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছে। কোন কোনটি নিম্নদিকে নদীর সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেছেন।

উত্তর বঙ্গে দুই প্রকারের মৃৎপ্রাকার দৃষ্ট হয়। ইহার কতক প্রাচীন নদীর তীরে আর কতক নদীনালা ছাড়িয়া বহুদূরে অবস্থিত। এই সব বৃহৎ প্রাকারের কারণ কি? এক্ষেত্রে আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি–ইহার কতক বন্যা প্রতিরোধ কল্পে, আর কতক

প্রাচীন বাঁধ বা জাঙ্গাল

রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নির্মিত হইয়াছিল[৩৪]। রাজশাহীর গোদাগাড়ী থানা হইতে যে পুলটি নওয়াবগঞ্জ রেলষ্টেশনের সন্নিকট দিয়া নির্দ্দেশ করা হয়–যাহা সাধারণ্যে 'হীরানটির পুল' বলিয়া পরিচিত ও কথিত। উহা প্রাচীন গঙ্গা পদ্মায় বন্যা প্লাবন প্রতিরোধ কল্পে কোন এক সময়ে নির্মিত

* এ ব্যাপারে অত্র ইতিহাসে স্বতন্ত্র আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৩৪. বগুড়ার ইতিকাহিনী-পৃঃ ১৫২-১৫৬।

হইয়াছিল। নওয়াবগঞ্জের সন্নিকট মহাডাঙ্গার বিল পদ্মা–মহানন্দার সৃষ্টি। সে কথা আমরা নদীর ইতিহাসে আলোচনা করিয়াছি। এই মহাডাঙ্গার তীরে যে মৃৎ প্রাকার দৃষ্ট হয়। উহা নওয়াবী আমলের কীর্তি বলিয়া অনুমিত্ নওয়াব আলীবর্দ্দীর সময় গোদাগাড়ীর সন্নিকট কেল্লায়ে 'বারুই পাড়াকে' অস্থায়ীভাবে মুর্শিদাবাদ হইতে নওয়াবী রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। তখন এই রাজধানী রক্ষা কল্পে অদূরে সুলতানগঞ্জে সৈন্যদের জন্য গড় নির্মিত হয়। তাহাই আজ 'সুলতানগঞ্জের গড়' নামে পরিচিত। কানষাটের সন্নিকট প্রাচীন পদ্মার তীরে যে সব উচু প্রাচীর বা মৃৎপ্রাকার দৃষ্ট হয়– সেগুলি বন্যা প্রতিরোধ কল্পে কোন এক সময়ে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া আজও জনশ্রুতি আছে। খিরির বিলের পার্শ্বদিয়া কামালপুর মৌজায় সুউচ্চ (আটিয়ার ধাপ) মৃৎ প্রাকারটিও এই অর্থে ব্যবহার হইত। চৌডালার জাঙ্গালটিরও একই কার্য ছিল। আদমপুর ছোট জামবারিয়ার উত্তরে শাহপুর যে বিরাট বিরাট চতুষ্কোণ ও ত্রিকোণ সু-উচ্চ মৃৎ প্রাচীর দৃষ্ট হয় সাধারণ্যে ইহা এক ডালিয়া বা 'হোসেনশাহীগড়' বলিয়া কথিত। এখনও ইহার উচ্চতা প্রায় গৌড়ের বেষ্টনী মৃৎ প্রাচীরের মতই। শাহপুর গৌড়ের সন্নিহত স্থান। ইহা হোসেনশাহী গড় হওয়া অসম্ভব নয়। মহাদেবপুর থানার শ্রীনগরের বাঁধটি আত্রায়ের জল প্লাবন প্রতিরোধ কল্পে নির্মিত। ইহা কি বলিহার রাজার কীর্তি? ইহার অদূরে সতীদাহের সন্নিকট বাঁধটিও অনুরূপ একটি বাঁধ বলিয়া মনে হয়। নওগাঁর ফতেপুর মোগলযুগে একটি গড় ছিল। ইংরেজ আমলে উহাতে গাজার কৃষি হইত। রাজশাহী জেলাতে কয়েকটি 'এক ডালা' নামীয় স্থান আছে। বাগমারা নদীর তীরে, গোদাগাড়ী থানার চব্বিশনগর, কান্দর প্রভৃতি স্থানে এই শ্রেণীর কাল্পনিক 'একডালা' সুলতানী আমলের কীর্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গোমস্তাপুর থানার রহনপুর রেলষ্টেশনে সন্নিকট 'নুনের ধাপ' প্রাচীন যুগের একটি গড় বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

**দীঘি-পুষ্করিণী ঃ**

রাজশাহী জেলায় খালবিলগুলি ছাড়াও অসংখ্য প্রাচীন দীঘি পুষ্করিণী আছে। এই দীঘি পুষ্করিণীগুলি হিন্দু ও মুসলমান যুগের পুণ্যকীর্তির নিদর্শন। কতক সেচ পরিকল্পনানুযায়ী আর কতক জলাভাব দূরীকরণার্থে খনন করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই সমস্ত দীঘি পুষ্করিণী গুলির যে সকল উত্তর-দক্ষিণ লম্বা এবং ইহার পাড়ে মন্দিরাদি স্থাপিত; তাহা হিন্দু শাসন আমলের কীতির্ত। যেগুলি দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রায় সমান; অথবা কিঞ্চিত অসমান তাহা মুসলমান আমলের কীর্তি। শিবগঞ্জ থানায় গৌড়ের তাহ্খানা, চারঘাট থানায়–বাঘা ও মান্দা থানায় কুশুম্বা প্রভৃতি দীঘি এই শ্রেণীর। এতদব্যতীত ইংরেজ আমলে মুসলমান জমিদারগণ যে সকল দীঘি পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন–তাহা অধিকাংশই উত্তর-দক্ষিণ লম্বা। এই শ্রেণীর দীঘি পোরশা, স্বর্ণনগর, ফারসীপাড়া, মধৈইল প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। এইগুলি প্রাচীন রীতির বাহক।

হিন্দু শাসনামলের যে সকল দীঘি পুষ্করিণী আছে তন্মধ্যে পোরশা থানায় ধীবর ও ঘাটনগর, মান্দা থানায় নিমদীঘি, ধামৈর থানায় তক্কেমারীর দীঘি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এইসব পাল পর্বের কীর্তি বলিযা বিভিন্ন সূত্রে অবগত হওয়া যায়। কারণ এই সকল দীঘির তীরে যে সব মন্দিরাদি হিন্দু দেব দেবীর পূজা-অর্চ্চনদির মূর্তি পাওয়া

গিয়াছে–তাহা অধিকাংশই অষ্টম হইতে নবম-দশম শতকের বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। গোদাগাড়ী থানায় দেওপাড়া দীঘি সেন আমলের কীর্তি। সেন আমলের দেওপাড়া প্রশস্তিতে উহার উল্লেখ দ্রষ্টব্য। এতদব্যতীত হিন্দু শাসনামলের বহু দীঘি পুষ্করিণী রাজশাহীর বরিন্দ অঞ্চলে রহিয়াছে। এগুলির বেশীরভাগ পাল পর্বের কীর্তি বলিয়া জানা যায়। রাজশাহী ভাগের শাসন প্রসঙ্গে আমরা তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

**শিল্প সম্পদ ও ব্যবসায় বাণিজ্য :**

শিল্প সম্পদ ও ব্যবসায় বাণিজ্যের দিক দিয়া প্রাচীনকাল হইতে রাজশাহীর প্রসিদ্ধি আছে। প্রথম খণ্ডে আমরা এখানকার রেশম ও নীল শিল্পের মোটামুটি আলোচনা করিয়াছি। এখন আমরা অন্যান্য শিল্পের কথা কিছু বলিব। বর্তমানে রাজশাহীতে রেশম, লাক্ষা, খয়ের, গুড়, চিনি, গাঁজা, কংস, মৃৎ, মেটাল, ম্যাচ, পান-মশলা, সাবান, কালী, ধান্য, পাট, কাষ্ঠ প্রভৃতি এবং ফলমূলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, বোর, কলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। এবং এই সমস্ত এই জেলায়–ব্যবসায়-বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য। জেলার চাহিদা মিটাইবার পর যাহা উৎবৃত্ত থাকে তাহা প্রধানত: নদী ও রেলপথে জেলান্তরে রফতানি হইয়া জেলার অতিরিক্ত আয় হয়। এ সমস্ত শিল্প সম্পদ ও ব্যবসায় বাণিজ্যের মধ্যে যে আয় হয় তাহা দ্বারা জেলার জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। এই সকল শিল্পের কোন কোনটির উন্নতির জন্য বর্তমানে জাতীয় সরকার ঋণমূলে অল্প বিস্তর আর্থিক সাহায্য করিয়া আসিতেছেন।

ইংরেজ আমলেও রাজশাহী হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধান্য, রেশম, নীল, পাট ও গাঁজা বিদেশে চালান যাইত। তাহার বিনিময়ে এখানে আসিত ভাল ভাল কাপড়, তুলার জিনিষপত্র, চিনি, ঘি, কাষ্ঠ, নুন, তেল, মশলাপতি, বিভিন্ন প্রকারের শস্যবীজ প্রভৃতি। এই সমস্ত জিনিষপত্র জেলার নির্দিষ্ট হাট-বাজার ও বড় বড় পল্লী ছাড়াও বিভিন্ন ঋতুতে হিন্দু মুসলিম তিথি-পরব উপলক্ষে–আশ্বিন মাসে প্রেমতলী, চৈত্র মাসে মান্দা ও রমজানের ঈদের দ্বিতীয় দিন হইতে বাঘা ও জৈষ্ঠ্য মাসে তক্তিপুর, মাঘ মাসে সুলতানগঞ্জ প্রভৃতি ধর্মীয় মেলাতে ক্রয় বিক্রয় হইত। এই সব মেলা মাসাধিককাল স্থায়ী থাকিত। বিবিধ রকমের দেশী জিনিষপত্র আমদানী রপ্তানী হইত। উল্লিখিত চারিটি মেলা ছাড়াও চৈত্র মাসে– খেতুর, বাগ্‌শারা, পীরগাছি, প্রাণনগর; আষাঢ় মাসে তাহিরপুর, লালোর, কুরল; বৈশাখ মাসে মাঝিপুর, কানষাট, শিবগঞ্জ চন্দ্রপুর; শ্রাবণ মাসে–কুজাইল প্রভৃতি অস্থায়ী মেলাগুলিতেও কেনা-কাটা হইত[৩৫]। এই সমস্ত মেলার পুর্ব গৌরব এখন আর নাই। যে সকল মেলা মাসাধিক কাল স্থায়ী থাকিত এখন সে সকল ২।৩ দিনের বেশী স্থায়ী হয় না। আর অস্থায়ী মেলাগুলির কতক বসে কতক বসে না। সস্তা মূল্যে শহর বন্দরে বর্তমানে বিদেশী জিনিষপত্রের অঢেল আমদানী হওয়াতে দেশী সম্পদের আদর কমিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দেশী সম্পদ কেনা কাটার 'পল্লী কেন্দ্রীক' এই বাজার ও মেলাগুলিরও পতন হইয়াছে। অথচ বাঙ্গালী তিথি পরবে এইসব মেলাগুলিই ছিল একদিন বাঙ্গালীর মিলন কেন্দ্র। তখন এই সমস্ত 'পল্লী কেন্দ্রীক' হাট-বাজার ও মেলাগুলির মৌশুমে ব্যবসায়

মেলা

৩৫. Statistical account of Bengal Vol VIII P. 88

বাণিজ্যের জন্য প্রচুর ধার করজ পাওয়া যাইত। সুদে লেনদেন হইত। এই সময় রামপুর বুয়ালিয়াতে চারিটি প্রাইভেট ব্যাঙ্ক ছিল। এতদব্যতীত জেলার বিভিন্ন স্থানে আরও ছোট ছোট বিশটিরও অধিক ব্যাঙ্ক ছিল। ব্যাঙ্কের মালিকগণ অধিকাংশই ছিলেন বাঙলা-বিহারের লোক। কতিপয় দেশী-পান চাষী এই জাতীয় লগ্নী (বা সুদের) কারবার করিত। তাহারা অল্পদিনের মধ্যে অঢেল টাকা পয়সার মালিক হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা তামিলী নামে পরিচিত ছিল[৩৬]। তাহা ছাড়া কয়েকজন মাড়োয়ারীও এই ব্যবসায় প্রচুর আয় করিয়াছিল।

ব্যাঙ্ক

এক সময় বাঙলা দেশে রাজশাহীর কংস শিল্প খুবই বিখ্যাত ছিল। রাজশাহীর কলম, নওয়াবগঞ্জ ও বুদপাড়াতে এই কংস শিল্পের কারখানা ছিল, এখনও আছে। ১৯০৭-৮ সালের একটি সরকারী বিবরণে অবগত হওয়া যায় যে, নওয়াবগঞ্জে ২৭০টি পরিবার কংস শিল্পের উপর জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহার অর্দ্ধেক মুসলমান ছিল। তাহারা বাৎসরিক ১০,০০০ মণ কংসের মধ্যে গড়ে–কাঁসা সাড়ে পাঁচ (=১০) আনা, পিতল দশ আনা (=) ও মিশ্রিত ধাতু দুই আনা (=) পরিমান নানা প্রকারের জিনিষপত্র প্রস্তুত করিত। এই সমস্ত কাঁসা পিতল ও মিশ্রিত প্রভৃতি ধাতুশিল্প বাঙালার বিভিন্ন বাজার বন্দরে চালান যাইত।

কংস শিল্প

নাটোরের কলমে তখন ১০০টি পরিবার ও বুদপাড়ায় ৬০টি পরিবার কেবল পিতল, কাঁসা ও ভবনের কার্য্য করিত। এখানেও হিন্দু-মুসলমান সমান সংখ্যক ছিল। কলমের কংস শিল্পের অবস্থা তখন মন্দা গতিতে, বুদপাড়া সাধারণ ভাবে এবং নওয়াবগঞ্জের শিল্পের বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছিল[৩৭]। নানা শ্রেণীর জিনিষপত্রের মধ্যে-জলপাত্র, পানপাত্র, হাঁড়ি, বাসন, গেলাস, কাঁশি, বেল ও হিন্দু যাগ-যজ্ঞীয় তৈজস প্রভৃতি নির্মিত হইত। এতদব্যতীত নানা প্রকারের যৌতুকীয় জিনিষ পত্রও প্রস্তুত হইত।

বর্তমানে বাসন, ঘটি, বাটি, পানপাত্র, চামচ, কড়াই পানবাটা, জগ, কাঁশি, বেল, ফুলের টব, বালতি, চিলমচী প্রভৃতি এখানে তৈয়ারী হয়। এই জাতীয় শিল্পের ৩৬০ প্রকারের পর্য্যন্ত জিনিষ পত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখন নওয়াবগঞ্জে (শঙ্করবাটি, আজাইপুর ও নওয়াবগঞ্জ টাউন) আনুমানিক সহস্রাধিক পরিবার কংস শিল্পের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কলম ও বুদ-পাড়াতে বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নাই। এই সকল কারখানাতে প্রধানত: কাঁসা, পিতল, তামা ও ভরণের জিনিষপত্র প্রস্তুত হয়। বর্তমানে (১৯৬৪ সাল, আষাঢ়) কাঁসার সের যথাক্রমে ১০৷৷০, ১১৷৷০, ১২৷৷০; তামার সের ১২; পিতলের সের যথাক্রমে ১০৷৷০, ৫৷৷০, ৮: ভরণের সের যথাক্রমে ৫, ৬, ৭; নকশী জিনিষপত্রের দিক দিয়া নওয়াবগঞ্জের জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা কারিগর হিসাবে বেশ নাম করা। নওয়াবগঞ্জে মোঃ তিনকড়ি মণ্ডল, তুফানী মণ্ডল ও শ্রীগবর্ধন প্রমুখ ব্যক্তি লক্ষাধিক টাকার কংস শিল্পের কারবার করেন।

আদিতে বর্গীর হাঙ্গামার সময় মুর্শিদাবাদ হইতে আগত এক শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায় কংস শিল্পের কারবার মানসে রাজশাহী জেলার উল্লিখিত তিনটি গ্রামে বসতি স্থাপন করে। তাহাদের কারখানাতে যে সকল স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান শ্রমিকেরা কার্য্য করিত

৩৬. Statistical account of Bengal Vol VIII P 89

৩৭. The industries and resourees of Eastern Bengal and Assam PP. 39-40.

বর্তমান কংস শিল্পের মালিকগণ তাহাদের অধঃস্তন বংশধর বলিয়া অবগত হওয়া যায়[৩৮]।

রাজশাহীতে লৌহশিল্পের কারখানাগুলির অবস্থা এখন পতনের দিকে। ভাল ভাল কর্মকার স্থানান্তরে গমন করায় এই শিল্পের চরম দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে। আগে প্রায় বড় বড় পল্লীতে ও হাটে বাজারে কর্মকার শালা ছিল। এখন প্রায়ই দেখা যায় না। এই সমস্ত কর্মশালায় কৃষিক্ষেত্রের যাবতীয় জিনিষপত্র প্রস্তুত হইত। পূর্বের তুলনায় এখন তাহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। ১৯০৭ সালে রাজশাহীতে ৬৫০টি কর্মকার শালায় ৩,৫০০ জন শ্রমিক ছিল[৩৯]। ইহার কোন কোন কর্মশালাতে নানা প্রকারের আগ্নেয় অস্ত্রপাতি প্রস্তুত হইত। এখন দক্ষ কারিগর নাই বললেই চলে। তখন লোহার বাক্স, ক্যাশ বাক্স, ট্রাঙ্ক, সুটকেশ প্রভৃতি প্রস্তুত হইত।

লৌহ শিল্প

বর্তমান রাজশাহী শহরে উন্নত ধরনের দুইটি লৌহ শিল্প কারখানা স্থাপিত হইয়াছে; নর্থ বেঙ্গল মেটাল ইণ্ডস্ট্রীজ ও রাজশাহী মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ। এখানে কৃষি কার্য্যোপোযোগী কোন জিনিষ প্রস্তুত হয় না। জানলা, দর-ওয়াজা, নাট, বলটু, ট্রাঙ্ক দাঁড়ি পাল্লা, বালতি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

রাজশাহীর বালুভরাতে, (নওগাঁ) এক সময় উন্নত ধরনের মৃৎশিল্পের নকশী, মৃৎপাত্র, হাঁড়ি পাতিল, পুতুল প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। এখনও হয়। তবে ততখানি উন্নত নয়। অতীতের সরকারী বিবরণে ইহার কোন উল্লেখ নাই। মৃৎশিল্পের জন্যে এখনকার মাটি খুবই উপযুক্ত। রাজশাহীর মথুরাপুরে (বদলগাছি থানা) বাঁশ বেত শিল্পের কারখানা ছিল। এখানে সোনারুপার উন্নত ধরনের অলঙ্কারাদিও প্রস্তুত হইত।

মৃৎ শিল্প

রাজশাহীব নওগাঁ মাদুর শিল্পের জন্য অতীতেও বিখ্যাত ছিল, এখনও আছে। নওগাঁর মাদুর আগে সমগ্র বাঙলাদেশে চালান যাইত। এখনও পূর্ব্ব-পাকিস্তানের নানা স্থানে রফতানী হইয়া থাকে। মাদুর কেনা বেচার জন্যে নওগাঁ হাট ও হুলহুলিয়া প্রভৃতি হাট প্রসিদ্ধ।

মাদুর

রাজশাহীর স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প বিখ্যাত। এই শিল্প সাধারণতঃ আগে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থধের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন মুসলমানরাও এই শিল্পের কদরদানী করিতে শিখিয়াছে। আনুমানিক নাটোরের শতাধিক, নওগাঁয় প্রায় ৫০টি, সদরে ৫০টি, নওয়াবগঞ্জে ৬০টি পরিবার এই শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। হার, রুলী, চূড়ি, দুল, আংটি প্রভৃতি প্রধানতঃ এখানকার স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প।

স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প

আগের যুগের নংফুল, ঝোমকা, ব্যাশর, নথ, সিথিপাটি, নূপর বা ঝূমুর, বিছা, মল, বাঁক, খারু, বাজু, হাঁসুলী প্রভৃতি এখন আর তেমন চলে না।

চিনি শিল্প বাংলা দেশের প্রাচীন শিল্প। আগে এদেশে এক প্রকার দেশী চিনি প্রস্তুত হইত। লালটে রঙের পেটি চিনি নামে কথিত হইত। আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিনি প্রস্তুতের কল কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। নর্থ

চিনি শিল্প

৩৮. A Survey of the Industries and resources of Eastern Bengal and Assam, P. 40
৩৯. A Survey of the Industries and resources of Eastern Bengal and Assam, P. 40

বেঙ্গল সুগার মিল ছাড়াও রাজশাহীর হরিয়াণে সম্প্রতি আর একটি চিনির কল স্থাপিত

ফলমূলের মধ্যে রাজশাহীর আম বিখ্যাত। আগে সমগ্র বাংলা দেশে কেবল মাত্র আমের জন্য মালদহ জেলা প্রসিদ্ধ ছিল। বিভাগোত্তর কালে মালদহের আংশিক আম্র কানন রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইতিপূর্বে ও রাজশাহীতে আমের চাষ কিছু কিছু ছিল। এখানে (বিবিধ) কলম ও গুটি এই দুই রকম আমেরই চাষ হয়। নওয়াবগঞ্জ ও সদর মহকুমায় প্রধানত: কলম আমের চাষ হইয়া থাকে। নওয়াবগঞ্জ মহকুমার আনুমানিক শতকরা ২০ ঘর লোক কলম আমের চাষ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের বর্তমান শ্রেষ্ঠ ফলের মধ্যে রাজশাহীর আম, সিলেটের কমলা লেবুর মতই বিখ্যাত। কলমের নানা প্রকার আমের মধ্যে ফজলী, গোপালভোগ; বৃন্দাবনী, খিরশাপাতি, লামবাদুরী, মোহনভোগ, মধুচুষকী, সোটাবাধা, নারিকেলফুরি, ল্যাংড়া, কুয়াপাহাড়ী, প্রভৃতি এখানকার প্রসিদ্ধ ও সুস্বাধু আম। শতাধিক প্রকারের আমের চাষ হয়। ভাল সময় হইলে প্রচুর পরিমাণে আমের ফলন হইয়া থাকে। এক বৎসরেই ৩।৪ বৎসরের আয় হয়। জৈষ্ঠ্য মাস হইতে শ্রাবন মাসের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত এই অঞ্চলের ধনী গরীব প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আমের ব্যবসায় নিয়োজিত হয়। এই শতকের গোড়ার দিকে ঢাকা ও কলিকাতার বাজারে গড়ে প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ টাকার আম রফতানী হইত[৪০]। ১৯০৭ সালে মালদহ জেলায় ৫০,০০০ একর জমিতে আমের চাষ হইত। মালদহ সদর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মহানন্দার নদীর তীর আমের চাষের জন্য উপযুক্ত ভূমি। বর্তমানে মালদহ জেলার মহানন্দা নদীর তীরের সেই দক্ষিণ-পূর্ব ভূমিভাগের আংশিক রাজশাহীর নওয়াবগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পদ্মা মহানন্দার এই অঞ্চলের মধ্যযুগীয় চর-ভূমি আমের চাষের জন্য উৎকৃষ্ট।

ফলমূল

গড়ে প্রতিটি পরিণত ফলবান গাছ হইতে বৎসরে আনুমানিক ৮০ হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত আয় হইয়া থাকে। এক একর জমিতে ৭০ হইতে ৮০টি পর্য্যন্ত কলম গাছ লাগানো যায়। কলমের গাছ একবার লাগিয়া উঠিলে ৮।১০ বৎসরের মধ্যে কোন তদারক করিতে হয় না। একরূপ বিনা পরিশ্রমে প্রতি বৎসরে ফসল পাওয়া যায়। আমের চাষ লাভজনক কৃষি। কিন্তু, ঝড় তুফানে বিস্তর ক্ষতিও করে।

এখন প্রতি বৎসরে গড়ে ২৬ সহস্রাধিক একর জমিতে আমের কৃষি হইতেছে। গড় পড়তায় প্রতি বৎসরে প্রায় সাড়ে ৪৮ (আট চল্লিশ) লক্ষ টাকা আমের ফল হইতে আয় হইয়া থাকে। প্রধানত: রেলপথে এখানকার আম সমগ্র পূর্ব্ব পাকিস্তানে চালান হয়। এতদব্যতীত পশ্চিম পাকিস্তানের বাজারেও রাজশাহীর আম রফতানী হয়।

অতীতে বহুকাল ধরিয়া মালদহের আম বিখ্যাত। ঐতিহাসিক বুকানন হ্যামিলটন বলিয়াছেন, "মালদহের আম পৃথিবীর যাবতীয় ফলের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ফল।' নওয়াব মুর্শিদ কুলী খান তাঁহার সেনাবাহিনীর জন্য মালদহের আম মজুত রাখিতেন। এজন্য আমের মৌসুমে সেনাবাহিনী দ্বারা আমের বাগান পাহারা দিতে হইত[৪১]। বুকানন

৪০. A survey of the Industries and resources of Eastern Bengal and Assam

৪১ Bengal District Gazetteers. Malda PP 44-45.

বলিয়াছেন, "উৎকৃষ্ট জাতের আম কেবল ইংরেজ বাজারের বিপরীত দিকে মহানন্দার তীরে পুরাতন মালদহে জন্মে। মিঃ বুকাননের আমলে মালদহে প্রতি বৎসরে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার আম বিক্রী হইত। গড়ে প্রতি বৎসরে ৩০ হাজার টাকার কেবল চারাগাছ বিক্রী হইত। মিঃ বুকাননের সময়ে উৎকৃষ্ট আমের মধ্যে বৃন্দাবনী গোপালভোগ, খিরশাপাতি ও ফজলী আম উৎকৃষ্ট। এই সময় ভাল জাতের ফজলী আম কেবল নিমাসরাই ও ইংরেজ বাজার থানায় জন্মিত। পরে হয়ত এই উৎকৃষ্ট জাতের আম নওয়াবগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। মিঃ বুকাননের সময় মালদহ জেলার কলম ছাড়াও প্রায় ১৫ হাজার বিঘা গুটি আমের কৃষি ছিল। ১৯০৭ সালের একটি বিবরণে প্রকাশ প্রত্যেক বৎসরে মালদহ হইতে ৩০ হাজার টাকার কলমগাছ বাহিরে বিক্রী হইত[৪৪]।

এখানকার আম কেবল উৎকৃষ্ট ফল হিসাবেই ব্যবহার হয় না। আমের নানা প্রকার আচার সিরকাদিও প্রস্তুত হয়। ইংরেজগণ আম চাষীদের একটি সমিতির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে "মালদহী" আম ইউরোপে রফতানী করিবার জন্য অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়াছিলেন।

পরবর্তীকালে কোন কোন সময় অল্প বিস্তর মালদহী আম ইউরোপেও পৌঁছিয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়[৪৫]।

মালদহ জেলায় এই আম জন্মিত বলিয়া এখনও ইহার 'মালদহী' সুখ্যাতি অক্ষুন্ন আছে। রাজশাহীতে আমের বাগানগুলি আমের মৌসুমে প্রধানত: ৩।৪ বার বিক্রী হয়। (ক) মুকুল ধরিবার সময় (খ) আম ধরা শেষ হইলে (গ) আম পাকিলে (ঘ) আম ভাঙ্গিবার সময়। বর্তমানে বিদেশে মালদহী আমের আগেকার মত স্বাদ পাওয়া যায় না। আমের মৌসুমে প্রায়শ: নানা প্রকারের অভিযোগ শোনা যায়। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, টুকরী করিয়া ট্রেনপথে কাঁচা আম রফতানী করার দরুন এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। আগে এখানকার আম মহানন্দা ও পদ্মা বাহিয়া নৌকার সাহায্যে চালান যাইত। এখনও যদি এই রীতি অবলম্বন করা যায় ইহার স্বাদ পূর্ব্বে মতই থাকিবে বলিয়া স্থানীয় আম চাষীদের অভিমত।

রাজশাহীর শিবগঞ্জ ও নওয়াবগঞ্জ থানার অর্দ্ধাংশে প্রধানত: আমের কৃষি হইয়া থাকে। গ্রাম হিসাবে 'প্রধানত: বারোঘরিয়া, মহারাজপুর, চক-আলমপুর, কৃষ্ণগোবিন্দপুর, নয়ালাভাঙ্গা, ঘোড়াপাকিয়া, কমলাকান্তপুর, শিবগঞ্জ, রাণীহাটি, কানষাট, ফিরোজপুর, চককীর্তি, চাতরা সাহাবাজপুর, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, চৌডালা, বামনগাঁ, বলিয়াডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে আমের রীতিমত চাষ হয়।

১৯৬২-৬৩ সালে নওয়াবগঞ্জ মহকুমায ২৬,৬৯,৩০০ একর জমিতে আমের চাষ ছিল। ক্রমশঃ ইহার চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। রাজশাহী সদর, নাটোর ও নওগাঁ মহকুমাতেও কোন কোন স্থানে অল্প বিস্তর আমের চাষ আছে। সদর মহকুমার বাঘার আম ও লিচু খুবই সুস্বাদু।

রাজশাহীর নারকোলি বোর বিখ্যাত। রাজশাহীর বোর পূর্ব্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন

---

৪৪. Survey of Industries and resources of Eastern Bengal and Assam, P 77

৪৫. A survey of the Industries and resources of Eastern Bengal and Assam. P 78.

বোর ও পান চাষ

স্থানে রফতানী হয়। মোহনপুর, তানোর ও মান্দা প্রভৃতি থানায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এই বোর (বা কুল) জন্মিয়া থাকে। মোহনপুর ও বাঘমারা প্রভৃতি থানায় প্রচুর পরিমাণে পানের চাষ হয়। এখানকার পান ঢাকা, করাচীতেও চালান যায়।

রাজশাহীর চারঘাট থানা প্রধানতঃ খয়ের চাষের জন্য বিখ্যাত। খয়ের শিল্প আমের মতই লাভজনক শিল্প। সাধারণত: শীত মৌসুমে এই শিল্পের শ্রমিকরা রাতদিন পরিশ্রম করিয়া নানা প্রকারের খয়ের প্রস্তুত করিয়া থাকে। বিদেশী দালালেরা আসিয়া চাষীদের কারখানা হইতে খয়ের ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। খয়ের গাছ দেখিতে কতকটা বাবলা গাছের মত। খয়ের গাছের ফুল আবছা হলুদ রঙ্গের একটু লম্বা, আর বাবলার ফুল হলুদ কিন্তু গোল সাইজের। পাতারও কিছুটা পার্থক্য আছে। যাহা হউক, খয়ের গাছ উপযুক্ত হইলে ভিতরের সার অংশটুকু টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া এক প্রকার কড়ায়ে সিদ্ধ করিয়া উহার কাথ হইতে খয়ের উৎপাদন হয়। এই গাছ সাধারণত: দো-আঁশ জমিতে ভাল জন্মে। রাজশাহীর দিয়াড় অঞ্চলে খয়ের গাছ জন্মিয়া থাকে। খয়ের ব্যতীত ইহার দ্বারা ভাল খুঁটি ও কড়ির কাজ হয়। এখানকার বাবলা গাছ হইতে নানা প্রকারের খড়ম গো মহিষাদির গাড়ীর চাকা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। দিয়াড় অঞ্চলে বাবলাগাছ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিরা থাকে। এই অঞ্চলের প্রায় বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীতে চাকা প্রস্তুতের কারখানা আছে। রাজশাহীর চাকা বিক্রয়ার্থে দেশ- দেশান্তরে রফতানী হয়।

খয়েব ও চাকা শিল্প

বাঁশ

প্রধানত: নওয়াবগঞ্জ, নওগাঁ ও নাটোর মহকুমার কোন কোন স্থানে প্রচুর পরিমাণে বাঁশের চাষ হয়। ভরাট জমিতে ইহার চাষ খুবই ভাল হয়। প্রতি বৎসর চলন বিল অঞ্চল হইতে গড়ে প্রায় ৫০ হাজার টাকারও বেশী বাঁশ চন্দ্রঘোনা কাগজের মিলে রফতানী হইয়া থাকে।

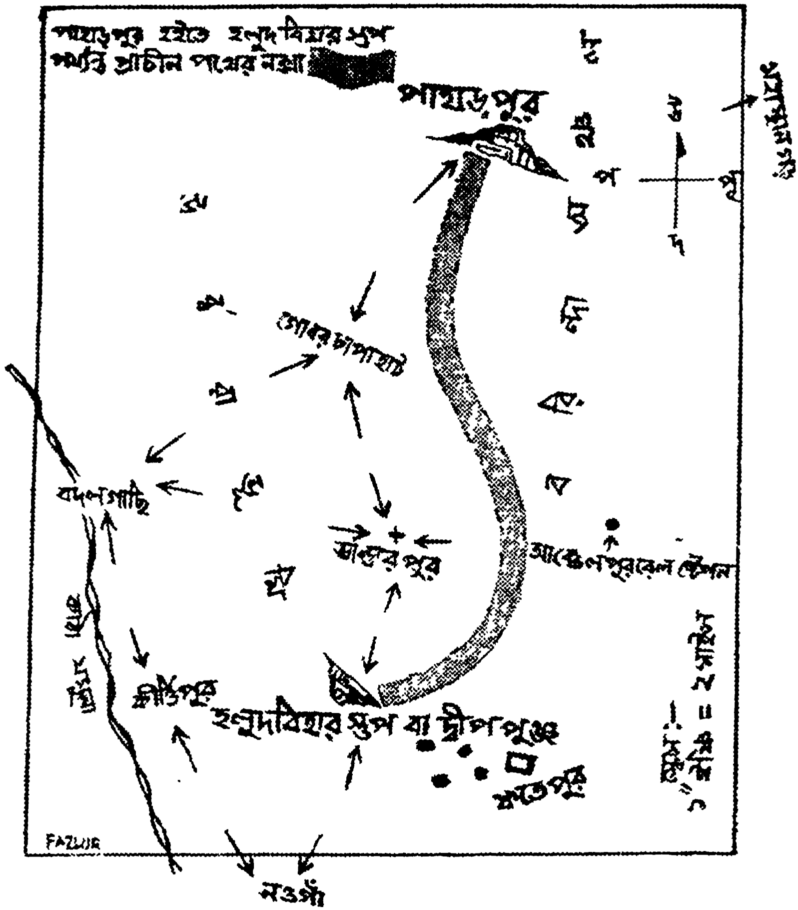
পাবমার মত তাঁত ও তাঁতের কাপড়ের জন্য রাজশাহী জেলা বিখ্যাত নয় বটে-তবে রাজশাহীর খাদি শিল্প একদিক দিয়া একদিন সে সুনাম রক্ষা করিয়াছিল। স্বদেশী যুগে বগুড়ার তালোড়া ও রাজশাহীর খাদি পরিধান করে নাই এমন দেশসেবক উত্তর বঙ্গে খুব কমই ছিল। হাতে সূতা পাকাইয়া এই কাপড় বয়ন করা হইত। পাকিস্তান আমলে খাদির ব্যবহার কমিয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি স্কুল কলেজের ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে ইহার চাহিদা কিছুটা লক্ষ্য করা যাইতেছে। দেশেব মিলগুলি যতদিন না স্বাবলম্বী হইতে ততদিন এই খাদিই দেশের আদি সম্পদ হিসাবে সভ্রম রক্ষা করিবে। রাজশাহীর আত্রাই খাদি সম্পদের আদি স্থান। বর্তমানে এখানকার কারখানা স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। ফেণী কুমিল্লা হইতে খাদি বস্ত্র আমদানী করিয়া রাজশাহীর চাহিদা মিটান হইতেছে। চরকা আমাদের দেশে এক সময় প্রতি ঘরে ঘরে ছিল। এই চরকার বদৌলতে লজ্জা নিবারণ হইত।

খেজুর গুড়

আখের গুড় অল্প বিস্তর উত্তর বঙ্গের প্রায় জেলাতেই প্রস্তুত হয়। খেজুর গুড় সকল জেলাতে হয় না। রাজশাহীর খেজুর গুড় খুব বিখ্যাত না হইলেও পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন হইয়া থাকে। জেলায় চাহিদা মিটাইবার পরও জেলান্ত য়ে রফতানী হয়। উত্তর বঙ্গের নানা স্থানে রাজশাহীর খেজুর গুড়ের



খয়ের গাছ




হলুদ বিহার ও পাহাড়পুরেব ব্যবধান

চাহিদা খুব বেশী। এ জেলার চারঘাট থানা খেজুর গুড়ের চাহিদা খুব বেশী। এ জেলার চারঘাট থানা খেজুর গুড় উৎপাদনের আদি কেন্দ্র।

হলুদ

রাজশাহীর চরঘাট থানায় পর্যাপ্ত পরিমাণে হলুদের চাষ হয়। এখানকার হলুদ বিভাগ পূর্বকালে কলিকাতায় চালান যাইত। এখন পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন বাজার-বন্দরে রাজশাহীর হলুদ রফতানী হইয়া থাকে।

গাঁজার চাষ সংক্ষিপ্ত

গাঁজা এক প্রকারের গাছ। পূর্ব পাকিস্তানে কেবলমাত্র রাজশাহীর নওগাঁতে ইহার চাষ হয়। ইহা খুবই লাভজনক কৃষি। তবে ব্যয় বহুল। সরকারী মাদক দ্রব্যাদির নিয়ন্ত্রণাধীনে ইহার চাষ করিতে হয়। খোলা আলো বাতাস অথচ আদ্র দো-আঁশ উঁচু জমিতে এই চাষ উপযুক্ত। এই হিসাবে নওগাঁর বদলগাছি, মহাদেবপুর ও নগাঁ সদর থানার কতকগুলি গ্রামে ইহার চাষ ভাল হয়। অন্যত্র ইহার চাষ হইতে পারে যদি এমন উপযুক্ত ভূমি পাওয়া যায়।

পুল ফেলা বা বিজ বপন

গাঁজা চাষের ক্ষেতের সন্নিকট অথবা অন্যত্র, শ্রাবণ মাসের শেষ হইতে ভাদ্র মাসের ১৩ই তারিখের মধ্যে গাঁজার বীজ বা পুল ফেলিতে হয়।

গাঁজা চাষের নির্দিষ্ট জমি কেবল মাত্র গাঁজা চাষের জন্য ফেলিয়া রাখিতে হয়। প্রতি বৎসরের চৈত্রমাস হইতে এই জমির চাষ আরম্ভ করিতে হয়।

চাষ আরম্ভ করিবার আগে জমিতে প্রচুর পরিমাণে সারিমাটি ও সার দিতে হয়। জমিতে পাল্টাপাল্টি একাধিকবার (সপ্তাহে কমপক্ষে একবার) চাষ করিবার সময় গোবব ও খইল দিতে হয়। এক বিঘা জমিতে সাধারণত: ৫ হইতে ১০ মন খইল দেওয়া হয়।

জমি তৈয়াবী

তারপর পুনরায় তিন স্তরে খইল দেওয়া হয়। যেমন-চারটানা; শুলি বাঁধার পর গাঁজার গাছের গোড়ায় অনেক ঘাস জন্মে, কোদাল চাঁচ দিয়া সেই ঘাসগুলি পরিষ্কার করিবার সময় একবার খইল দিতে হয়। কাটার পূর্বে চার টানিয়া দিবার সময়ও আর একবার খইল দেওয়া হয়। এইভাবে সাধারণত: তিনবার খইল দিতে হয়।

বীজ বপন ও চাষ

জমি তৈয়ারী হইলে গাঁজার বীজ বা পুলগুলি তুলিয়া আনিয়া শুলি করিয়া লাগাইতে হয়। লাগাইবার ১৫/২০ দিন পর চার টানিতে হয়। চার টানিবার পর গাঁজা গাছের নীচের পাতাগুলি ঝুরিয়া ফেলিতে হয়। ঝুরিয়া ফেলিবার পর গাছগুলি বেশ সরস হইয়া ওঠে। তখন হালবান্দা দিতে হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই আবার গাঁজা গাছের নীচের পাতাগুলি ঝরিয়া ফেলিতে হয়। তারপর ফুল দেখা আরম্ভ হয়।

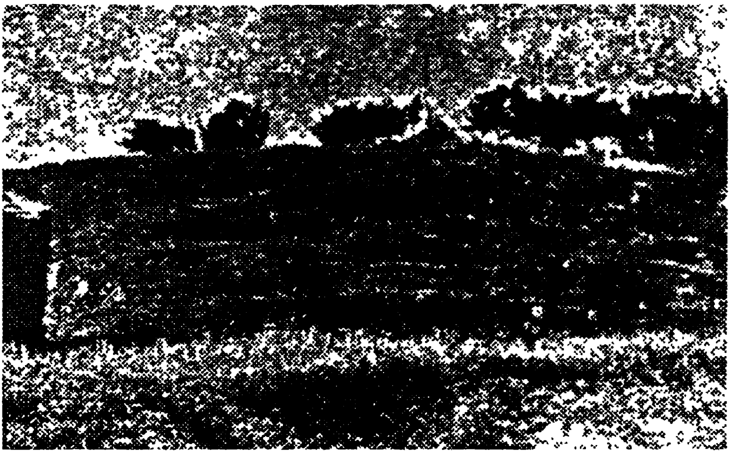
ফুল দেখা বা মাদিভাঙ্গা ও আলভাঙ্গা

(১) হাল বান্দার পর গাঁজার ভিঁটাতে বেড়াইলে গাঁজার শুলি ভিতর কতকগুলি গাঁজা গাছে সরিষা ফুলের মত ফুল দেখা যায়। এই গাছগুলি গাঁজা ক্ষেতের প্রধান শত্রু। এই ফুলধারী গাছগুলি ভাঙ্গিয়া না ফেলিলে পার্শ্ববর্তী গাছগুলিতে উক্ত ফুলের গন্ধে গাঁজার বীজ প্রচুর পরিমাণে হয়। যে গাছে ফুল হয় সে গাছে কেবল গাঁজাব বীজ হয়।

(২) আঁল ভাঙ্গা : গাঁজার গাছগুলির মধ্যে কতকগুলিতে গোলাপ ফুলের গাছের কাঁটার মত এক প্রকার আঁল জন্মে। যদিও তাহা ততখানি তীব্র নয় তবুও এইগুলি গাঁজা



গাঁজার গাছ



হলুদ বিহার স্তুপ



হলুদ বিহার স্তুপে আবিস্কৃত পোড়া মাটির রাজহংস

ক্ষেত্রের পরম শত্রু। এই আঁলওয়ালা গাছগুলিই পরে ফুলওয়ালা বা মাদি গাছে পরিণত হয়। এই আঁলওয়ালা গাছ গাঁজার ডাক্তার বা (Expart of Ganja) গদ্দার ভাঙ্গিয়া ফেলে।

গাঁজা লাগাইবার পর হইতে ও কাটিবার পূর্ব পর্যন্ত প্রয়োজনবোধে তিনবার সেঁচ দিতে হয়। কার্তিক মাসের শেষের দিকে গাঁজা গাছগুলিতে ভূয়া আসিতে আরম্ভ করে। এই ভূয়াগুলি দেখিতে জটের মত। এই জটগুলিতে আঠা জন্মে। উহাই পরবর্তীকালে গাঁজার কলিতে পরিণত হয়। পৌষ মাসের মধ্যেভাগ হইতে গাঁজা গাছগুলি পাকিতে আরম্ভ করে। যখন ক্ষেতের গাছগুলি পাকিয়া যায়, তখন উহাকে কাটিয়া লইতে হয়। সাধারণত: গাঁজা গাছগুলি মাঘ মাসের শেষ হইতে ফাগুন মাসের ৮/৯ তারিখের মধ্যে পাকিয়া যায়।

সেঁচ ও ভূয়া

গাঁজা গাছগুলিতে ভূয়া আসিবার পর হইতে কড়া পাহারায় ব্যবস্থাদি করিতে হয়। প্রতিটি গাঁজা ভিঁটার এক পার্শ্বে উঁচু করিয়া টঙ্ বাঁধিয়া সেখান হইতে পাহারা দিতে হয়। গাঁজা ক্ষেতে রাত্রিতে আলোর ব্যবস্থাদি থাকে। এই সময় (সরকারী) আবগারী কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে উক্ত পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। ক্ষেতের মালিকও পাহারা দিয়া থাকে। তখন গাঁজা মহলে সরকার তরফ হইতে কয়েকটি ছাউনী (Camp) করা হয়। সেই ছাউনীতে একজন অধিনস্থ কর্মচারীর (Petty officer) কয়েকজন পিয়ন থাকে। রাত্রিতে তাহারা পহরে পহরে গাঁজা মহলে পাহারা দিয়া বেড়ায়। এই ছাউনীগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য শুল্ক বিভাগীয় একজন অধিনস্থ পরিদর্শক (Exeise Sub-Inspector) থাকেন। তাহাকে বিভাগীয় কর্মচারী বলা হয়। গাঁজা মহলে এই ছাউনীগুলির নম্বর হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত থাকে।

পাহারা ও আলোর ব্যবস্থা

গাঁজা গাছগুলি পাকিয়া গেলে আবগারী বিভাগের উর্দ্ধতন কর্মচারীর নিকট কাটিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয়। তারপর জনৈক কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে কাটা হয়। কাটিবার পর গাঁজা গাছগুলি চাতরে আনিয়া পরিমাণ মত রোদ্রে শুকাইয়া পা দিয়া চাপিয়া কলি বা জটা তৈয়ারী করিবার চাপা দিয়া রাখিতে হয়। জটা তৈয়ারী করিবার সময় গাঁজা মহলে চাষীদের মনে খুবই আনন্দ হয় এবং পা দিয়া খোঁচার তালে তালে নাচের ভঙ্গীতে আনন্দে তাহারা নিম্নরূপ গান গাহিয়া থাকে।

কিয়া চিজ বানাইয়া খোদা বাঙলা
দেশ-কা গাঁজা।
এক চিলেম্ মে যেয়ছা তেঁয়ছা
দো,– চিলেম্ মে মজা।
তিন চিলেম্ মে উজির নাজির
চার চিলেম মে রাজা,
কিয়া চিজ বানায়া খোদা
বাঙলা দেশ-কা গাঁজা*।

গাঁজা প্রস্তুত করিবার সময় সাধারণত: কতকগুলি গাছ লুড়াতে (গোল) পরিণত করা হয়। চেপ্টা গাঁজার চাহিদা বেশী হওয়ায় এখানে চেপ্টা গাঁজাই উৎপাদন হয়।

* নওগাঁ গাঁজা মহলের একরতারা গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

অতঃপর ইহার পাতি ঝাড়া আরম্ভ হয়। পাতি ঝাড়িবার পর গাঁজার কলিগুলি ভাঙ্গিয়া লওয়া হয়। ভাঙ্গিবার পর আবগারীর চাতরে কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে গাজাগুলি ওজন করিয়া প্রতিটি বস্তায় সিলমোহর করিতে হয়। তারপর ক্ষেতালকে একটা পাশ দেওয়া হয়। উক্ত পাশ সহ ক্ষেতাল গুদাম জাতের জন্য গাঁজা লইয়া নওগাঁর গুদামে উপস্থিত হয়। তখন পুনরায় গাঁজার বস্তাগুলি ওজন করিয়া শ্রেণী হিসাবে নম্বর দিয়া গুদামজাত করা হয়।

এই সময় গাঁজা চাষীকে অগ্রিম আংশিক টাকা দেওয়া হয়। তারপর মাসাধিক কাল পরে গাঁজার মূল্য নির্দ্ধারিত হইলে অবশিষ্ট মূল্য দেওয়া হয়। বৎসরের শেষে গাঁজার মুনাফার অনুপাতে গাঁজা সোসাইটি ক্ষেতালকে একটি বোনাস দিয়া থাকেন।

কোথা হইতে কতদিন পূর্বে নওগাঁতে গাঁজার চাষ আমদানী হয়, তাহার সঠিক কোন ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই। একটি জনশ্রুতি মূলে অবগত হওয়া যায় যে,

গাঁজার আদি দেশ

পূর্বে যশোহর জেলা হইতে রাজশাহীতে গাঁজার চাষ আমদানী হইয়া নওগাঁ ও পাঁচুপুর থানায় (আত্রাই থানা) ৮৬ বর্গমাইল অঞ্চল জুড়িয়া গাঁজার চাষ আরম্ভ হয়[৪৬]। ইং ১৮৫৩-৫৪ সালে নওগাঁর গাঁজা বিদেশে রফতানী হয়। বোধহয় ইহার কিছুদিন আগে হইতে নওগাঁ ও পাঁচুপুর থানায় পরীক্ষামূলক গাঁজার চাষ হইতেছিল। পরবর্তীকালে রাজশাহীর গাঁজার কথা কলিকাতা গেজেটে ১লা এপ্রিল' প্রকাশিত হয়[৪৭]। এক সময় 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ কোম্পানীর' মাধ্যমে লণ্ডনেও অল্পবিস্তর নওগাঁর গাঁজা রফতানী হইয়াছে[৪৮]।

ইংরেজী ১৮৭২-৭৩ সালে নওগাঁতে ১২০০ শত বিঘা বা ৪০০ একর জমিতে ৯,০০০ হইতে ১০,০০০ মণ গাঁজা উৎপাদন হয়। ১৮৫৩-৫৪ সালে প্রথম বর্ষে গাঁজা উৎপাদন হয় ১৯,০০০ মণ। ১৮৫৮-৫৯ সালে ২২,০০০ মণে পৌঁছে। কিন্তু ১৮৭১-৭২ সালে উৎপাদন কমিয়া ১২,০০০ মণে দাঁড়ায়[৪৯]। ১৮৯৭-৯৮ ২১০৮ বিঘা জমিতে ৫৭৯৩ মণ গাঁজা উৎপাদন হয়। ১৮৯৮-৯৯ সালে ১৫৩১ বিঘা জমিতে ৫,৪১৭ মণ গাঁজা উৎপাদন হইয়াছে। বিভাগ পূর্বকাল পর্য্যন্ত এইভাবে গাঁজার চাষের অনুপাতে উৎপাদন কমবেশী হইয়াছে। তখন বাঙলা দেশ ছাড়াও নওগাঁর গাঁজা ভারতবর্ষের নানা স্থানে রফতানী হইত। ১৮৯৮-৯৯ সালে ৫,৮৬৭ মণ গাঁজা নওগাঁ হইতে ভারতের নানা স্থানে প্রেরিত হয়[৫০]। তন্মধ্যে বাঙলা দেশেই সবচেয়ে বেশী। বাঙলায়–৪৬৭২, উড়িষ্যা–২৫৫, আসাম–৫৪৫, কুচবিহার–৬৭, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ৩২৮ মণ। মোট ৫৮৬৭ মণ।

দেশ বিভাগের কিছুদিন আগেও গাঁজার কৃষি পুরাদমে চলিতেছিল। কিন্তু, দেশ বিভাগের পর গাঁজা ভারতে রফতানী হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। ফলে, গাঁজার বাজারে দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৪২৪৫ মণ গাঁজা উৎপাদন হয়। তন্মধ্যে পরবর্তী তিন বৎসরে বিক্রী হয় ১২৪৩ মণ। অবশিষ্ট পোড়াইয়া ফেলা হয়। প্রায় ৬ লক্ষ টাকা তখন

---

৪৬. Imperial gazetteer of India, Eastern Bengal and Assam. P. 203

৪৭. Statistical account of Rajshahi District P. 61

৪৮. Bengal District Gazetteer, Rajshahi P P 134-144

৪৯. Statistical account of Rajshahi District PP. 62-63.

৫০. Administration Report of the Rajshahi Division for 1898-99

ঘাটতি হয়। তাছাড়া গাঁজার পাওনা পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক কো: অঃ ব্যাঙ্কের খাতে তখন ৩, ৩০, ০০০ টাকা জমা থাকে। কিন্তু তাহা এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই (?)। ইহার দরুণ নওগাঁর গাজা সোসাইটি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগেকার তুলনায় বর্তমানে গাঁজার চাষ কমিয়া যাইতেছে। ১৯৫১-৫২ সালে কেবলমাত্র ১০ একর জমিতে ৩ টন গাঁজা উৎপন্ন হইয়াছে। বর্তমানে (১৯৬৩-৬৪ সালে) ৩৬ একর জমিতে গাঁজার চাষ হইয়াছে।

প্রথমের দিকে গাঁজার চাষীরা নিজ বাড়ীতে গাঁজা রাখিয়া ফড়িয়া বা দালাল দ্বারা গাঁজা বিক্রী করিতে পারিত। পরবর্তীকালে সোসাইটি স্থাপিত হইবার পর দালাল প্রথা বন্ধ হইয়া যায়। নওগাঁতে গাঁজা কালটিভেটারস কোঅপারেটিভ সোসাইটি স্থাপিত* হইবার পর, এই সোসাইটির মাধ্যমে ৫৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জামে মসজিদ, মন্দির; তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটি পশু চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। এতদব্যতীত বাস যোগ্য বহু সুরম্য দালান কোঠা, শতাধিক মাইল রাস্তা ঘাট, গাঁজা মহলের সেচ বাঁধ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। মোট কথা গাঁজার বদৌলতে নওগাঁ টাউন ও গাঁজা মহলের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখনও কিছু কিছু হইতেছে। বলা বাহুল্য নওগাঁ টাউনের শ্রী-সমৃদ্ধির মূলে গাঁজা সোসাইটিব দান অপরিসীম।

আজ হইতে প্রায় ৯৪[৫১] (১৯৬৪ সাল হইতে) বৎসর পূর্ব হইতে মালদহ জেলায় লাক্ষার কৃষি হইতেছে। বর্তমানে মালদহের লাক্ষার চাষ রাজশাহী জেলার নওয়াবগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। সাঁওতাল পরগণা হইতে আগত সাঁওতালগণ সর্বপ্রথম এই চাষ প্রবর্তন করে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এই চাষ আসাম হইতে এই দেশে আমদানী হয়। আসামের বনে-জঙ্গলে দেশের আদিবাসী কর্তৃক ইহার চাষ হইত। এখনও সেখানে প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। এই চাষ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের আদি চাষ[৫২]। ইহা এদেশের রেশম ও কার্পাসের সমসাময়িক চাষ বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। ইহা অত্যন্ত লাভজনক কৃষি। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে নওয়াবগঞ্জের বিরাট সংখ্যক মুসলমান সম্প্রদায় এই চাষ শুরু করিয়া প্রভূত উন্নতি করিয়াছিল।

লাক্ষা (Lac)

প্রকার ভেদে লাহা, দানা: চাপড়া-গালা-চাঁচ হইতে প্রধানত: গ্রামোফোন রেকর্ড, বার্ণিশ, রং, পালিশ, পোষ্টাফিসের গালা, অলঙ্কারের গড়নে ও সিল মোহরে প্রভৃতি কার্য্যে লাহা বা লাক্ষার ব্যবহার হয়। নওয়াবগঞ্জ অঞ্চলে প্রধানত: কুলগাছ হইতে লাক্ষা প্রস্তুত হয়। কিন্তু ডুমুর, পলাশ, বাবলা, খয়ের, লিচু গাছেও লাক্ষার বীজ জন্মে ও প্রস্তুত হয়। রাজশাহীর লাক্ষা গবেষণাগারে রেণ্টট্রি ও ঘুমানিয়া নামক দুই প্রকার বিদেশী (থাইল্যাণ্ড) গাছের পরীক্ষামূলক সন্তোষজনক চাষ হইতেছে।

লাক্ষা বা লাহা ব্যবহার

দেশ বিভাগের আগে নওয়াবগঞ্জের বিনোদপুর ও দাদনচক প্রভৃতি গ্রামে প্রায় ২ লক্ষাধিক টাকার লাক্ষা প্রস্তুত হইয়া, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদেশে রফতানী হইত। বর্তমানে

---

* বগুড়ার নওয়াবজাদা আলতাফ আলী মরহুম কর্তৃক নওগাঁতে গাঁজা কালটিভেটারস কো-অপারেটিভ সোসাইটি উদ্বোধন হয়।

৫১. Bengal District Gazetteers, alda, P 65

৫২. A Survey of the Industries and resources of Eastern Bengal and Assam PP 81-84.

১৫ শতাধিক লোক লাক্ষা শিল্পে কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে লাক্ষা চাষের গাছের সংখ্যা ৩৭,২০০। এখন বিনোদপুর দাদনচক, মনাকষা ও শিবগঞ্জ প্রভৃতি লাক্ষা উৎপাদনের প্রধানতম কেন্দ্র। গড়ে নওয়াবগঞ্জের লাক্ষা উৎপাদন কেন্দ্রে প্রতি বৎসরে আনুমানিক ১,৩৩,০০০ টাকা প্রতি বৎসরে আয় হইতেছে। নওয়াবগঞ্জের অন্যান্য শিল্পের মতই লাক্ষা শিল্প লাভজনক একটি অর্থকরী শিল্প। এই হইল রাজশাহী জেলার কৃষি-শিল্প সম্পদ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের মোটামুটি কথা।

**পথঘাট ও যানবাহন :**

রাজশাহী জেলা প্রাচীন পৌন্ড্র বর্দ্ধনের একটি খণ্ডিত অংশ; ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা পাকিস্তান আমলের একটি বিশিষ্ট জেলা। এই হিসাবে রাজশাহীর প্রাচীন পথঘাটের কথা বলিতে গেলে বাঙলার প্রাচীন যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বলা দরকার।

বাঙলার প্রাচীন শাসন-লিপিগুলিতে যে সকল গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা একটু বিশ্লেষণ করিলে প্রায়ই দেখা যায় গ্রামের প্রান্ত সীমায় রাজপথের উল্লেখ; অনেক সময় এই পথ গুলি এক বা একাধিক দিকে গ্রাম সীমা অথবা ভূমি সীমা নির্দেশ করে এবং সেই হিসাবেই পথগুলির উল্লেখ। এই পথগুলি গ্রাম হইতে গ্রামে ও নগরে বিস্তৃত ছিল। আমাদের অতীত নগর বন্দরের ধ্বংস স্তূপে দাঁড়াইলে তাহা অনুমান করা যায়। জঙ্গল কাটিয়া বা মাটি ভরাট করিয়া নূতন নুতন গ্রাম ও নগরের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াত পথও ক্রমশ: বিস্তৃত হইয়াছে। এই সব স্থলপথ ছাড়া নদীমাতৃক দেশে অসংখ্য নদীনালা, খালবিল বাহিয়া আভ্যন্তরীন জলপথও ছিল। সমসাময়িক প্রাচীন মধ্যযুগীয় সাহিত্যে সেই সব নদীনালার যানবাহন স্বরূপ নৌকা, পানসী, জঙ্গ, বজরা, ডোঙ্গা কোশা, দোনা, দুনি, ডিঙ্গি, ভেলা, বালাম, ছিপ ময়যরপঙ্খী প্রভৃতি নানা নাম হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তখন জলপথে নৌকা যোগে যাতায়াত ছিল স্থলপথ অপেক্ষা প্রশস্ততর। এই সব যাতায়াত পথঘাট ছাড়া দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এবং দেশের প্রান্তসীমা অতিক্রম করিয়া দেশান্তরে যে সব স্থল ও জলপথ বিস্তৃত ছিল সেই সব পথ ধরিয়া যুগেযুগে অসংখ্য নরনারী তীর্থযাত্রী,ধর্মপ্রচারক, পর্য্যটক ও রাষ্ট্রদূতেরা নানা বিচিত্র কর্ম উপলক্ষে দেশ-বিদেশে গ্রামে-নগরে তীর্থ পীঠে যাতায়াত করিত। জলপথে নৌকা ও স্থলপথে গো-শকট, রথ, পাল্কী, ও ডুলি প্রভৃতি তাহাদের যাতায়াতের বাহন ছিল। সেই সব পথ বাহিয়া দেশ বিদেশের বাণিজ্য সম্ভার বিনিময় হইত। বিদ্যার্থী ও পরিব্রাজকদের পথও ছিল উহাই*। জীবন ধারণও জ্ঞান বিকাশের প্রেরণায় সেকালে দূর্গম বন-জঙ্গল কাটিয়া পাহাড় পর্বত ডিঙ্গাইয়া, নদী সাঁতরাইয়া মানুষ যে সব পথের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,সেই সব পথ একদিনেই চিহ্নিচহ্ন হইয়া যায় না। মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহারে তাহার স্মৃতি এবং নূতন পথের মধ্যে সেই সব পথ বাঁচিয়া থাকে। পৃথিবীর সর্বত্রই তাহা ঘটিয়াছে। আমাদের দেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। নদীনালার প্রবাহ প্রাচীনকালে জলপথ নির্ণয় করিত। আজও করিয়া থাকে। সেই সব যাতায়াত পথ ধরিয়া দেশ- দেশান্তরের সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক যোগাযোগ রক্ষা হইত।

* প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ নীহার রঞ্জন রায় বলেন, তখনকার অধিকাংশ স্থলপথ বাহিয়া ইংরেজ আমলের রেলপথ গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রাচীন বাঙলার পথঘাটের বিবরণ খুবই অল্প। শিলালিপি, পর্য্যটকদের বিবরণী ও সমসাময়িক সংস্কৃত সাহিত্যে এবং ফা-হিয়ান, ইৎসিং, হিয়েন সিয়াং, কিয়াতান, চাওকিয়াং প্রভৃতি পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই সব পথঘাটের কিছু কিছু উল্লেখ ও ইঙ্গিত পাওয়া যায়[৫৩]। হিন্দু শাসন যুগে পরিব্রাজক, ধর্মপ্রচারক ও রাষ্ট্র দূতেরা জলপথ অপেক্ষা স্থলপথ ধরিয়া অধিক সময় ভ্রমণ করিয়া তাহাদের বাণিজ্যতরী বণিকগণ জলপথে যাতায়াত সুবিধাজনক মনে করিয়া তাহাদের বাণিজ্যতরী সমুদ্রে ভাসাইয়া বাঙলার নদীনালা, খালবিল বাহিয়া যাতায়াত করিত। পণ্য সম্ভার বিনিময় করিত। সূফী দরবেশগণও এই পথে বাঙলার সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। বঙ্গের আউলিয়া ও বাণিজ্যের ইতিহাসে উহার উল্লেখ আছে।

মধ্যযুগের পথঘাট

মধ্যযুগে হিন্দু শাসন আমলের যাতায়াত পথগুলি মুসলমান দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা ও সুলতানদের হস্ত স্পর্শে পূর্বাপেক্ষা উন্নততর হয় এবং বহু নূতন পথের সৃষ্টি হয়। সেই সব নূতন পুরাতন যাতায়াত পথেই মুসলমান অভিযাত্রী ও সেনাবাহিনীদের পথ এবং সেই সব পথ দিয়াই দেশ-বিদাশের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ ও সামরিক ও সাজ-সজ্জা, হাল হাতিয়ার বিনিময় হইত।

রাজশাহী জেলা প্রাচীন বঙ্গের দুইটি রাজধানী যথা-পোন্ড্র-বর্ধনের মহাস্থান ও গৌড়ের মধ্যস্থলে বিস্তৃত থাকায় রাজশাহীর পথঘাট খুবই উন্নত ছিল। এই সব পথ দিয়া জনসাধারণ, শিক্ষার্থী ও ধর্মযাজকরা বিদেশে যাতায়াত করিতেন। তাই আমরা দেখিতে পাই চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম শতকে যে পথটি ধরিয়া চীনা পরিব্রাজক, তিব্বতী বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীরা নালন্দা, পাটুলীপুত্র, চম্পা, কজঙ্গল, কর্ণসুবর্ণ হইয়া রাজশাহীর পাহাড়পুর, ধানোরা, বিহারেল ও সেকালের পৌণ্ড্রবর্ধনের বিভিন্ন বৌদ্ধ মন্দিরে যাতায়াত করিতেন। সমসাময়িক ইতিহাস ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত ছাড়াও জন প্রবাদে তাহার কিছু কিছু

রাজশাহীর অবস্থান

স্মৃতি এখনও গৌড়ের পথ জাগিয়া আছে। গেওড়ের একডালা দুর্গ হইতে যে পথটি আজিকার পাকুয়া, শালালপুর ও পোরশা বিষ্ণুপুরের নিকট (কিছুটা উত্তর দিকে ক্রম বক্র) হাঁপুনিয়ার আইল বলিয়া পরিচিত; সেই পথটি রাজশাহীর সীমান্তে উত্তর ও পশ্চিম কোল ঘেষিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে দিবেবাক, আগ্রাদ্বিগুণ মহীসন্তোষ, জগদ্দল, মঙ্গলবাড়ী স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সোমপুরী বিহার অর্থাৎ অধুনা পাহাড়পুর ও হলুদ বিহারের (দ্বীপগঞ্জ) দিকে গিয়াছে। এবং পাহাড়পুর হইতে আর একটি পথ পূর্বদিকে বগুড়া জেলার সোনামুখী বন্দর (বা হাট) হইয়া যুগীর ভবন[৫৪] দিয়া উত্তরমুখে বাঘল হইয়া ভাসু-বিহারের দিকে গিয়াছে। সোমদেবের 'কথা সরিৎ সাগরে' পৌণ্ড্রবর্ধন হইতে পাটুলীপুত্র পর্য্যন্ত যে সুবিস্তৃত পথটির উল্লেখ আছে বোধ হয় উহাই সেই ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম শতকের সুপ্রশস্ত রাজপথ। ষ্টেপল্ ষ্টোনের গৌড়ের

৫৩. J Legge, Travels of Fa-hien, S Beal, Buddhist Records of the Western World (by Hiuen Tsang); S. Beal, life of Hiuen Tsang, H Sastri, 'Nalanda in ancient literature' procedings of the Fifth Oriental Conference I.1930; F A Schiefner, Tarantha's, Geschichte-des Buddhisus in Indien; J.N. Samddar, Glories of Magadha, T. Watters, on Yuan Chwang ete., সোমদেবের 'কথা সরিৎ সাগর' ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎ কথা মঞ্জরী'; বুধ স্বামীর 'বৃহৎ শ্লোক সংগ্রহ ও কহলেনের 'রাজ তরঙ্গিনী ইত্যাদি।

৫৪. বগুড়ার ইতিকাহিনী পৃষ্ঠা ৪৪৭-৪৮২।

বিবরণীতে এক ডালা হইতে বিস্তৃত কয়েকটি প্রাচীন পথের ইঙ্গিত আছে। তাহার উত্তর পূর্বগামী পথটি বোধহয় আলোচ্য পাটুলীপুত্র- পৌণ্ড্রবর্ধন পথটির ইঙ্গিত দিয়াছে। সপ্তম শতকের দ্বিতীয় পাদে হিয়েনসাং বারাণসী, বৈশালী, পাটুলীপুত্র, বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, নালন্দা, অঙ্গ চম্পা প্রভৃতি বৌদ্ধতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া কজঙ্গলে অর্থাৎ উত্তর রাঢ়ে আসিয়াছিলেন। রাজমহেলর ১৮ মাইল[৫৫] দক্ষিণে কজঙ্গল এবং এই কজঙ্গল হইতে আর একটি পথ সাঁওতাল পরগণার উত্তর প্রান্ত দিয়া রাজা শশাঙ্কের কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ) হইয়া গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎপর গঙ্গার বিপরীত দিকে অর্থাৎ গোদাগাড়ী, প্রেমতলী কুমারপুর হইতে একটি পথ পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্যে বিস্তৃত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সেই পথটিই ছিল বৌদ্ধ পণ্ডিত-প্রবর হিয়েন সাংএর পৌন্ড্রবর্ধনে[৫৬] আসিবার পথ। তিনি কর্ণসুবণ হইতে গঙ্গা পার হইয়া এই পথ ধরিয়া রাজশাহীর কুমারপুরের মধ্য দিয়ে বোধ হয় তালাই, মাড়ইল, ধনোরা, বিহারৈল ও পাহাড়পুর অতিক্রম করিয়া পৌন্ড্রবর্ধনের (পুন্ন-ফ-তা-ন্না) রাজধানী মহাস্থানে পৌছিয়াছিলেন[৫৭] এবং সেখান হইতে তিনি কিছুটা উত্তর দিকে যাইয়া একটি বেগবান বা বেগবতী বিশালকায় নদী অথাৎ করতোয়া অতিক্রম করিয়া কামরূপে গমন করিয়াছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালী অধ্যক্ষ শীলভদ্রের[৫৮] সময়ে সমতট বিহারে (অর্থাৎ ঢাকা বিভাগে) ও পৌন্ড্রবর্ধনের অন্যান্য বৌদ্ধবিহারের (যেমন বর্তমানের ভাসুবিহার, গাকুল প্রভৃতির) সহিত নালন্দার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই নিকটতর ছিল। হয়ত সেই হিসাবেই পথঘাটগুলির এত সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজশাহীর বর্তমান ভূ-খণ্ডে পাহাড়পুর ছাড়া পালযুগের স্মৃতি বিজড়িত কতকগুলি প্রসিদ্ধ স্থান ও কয়েকটি জয়স্তম্ভের নিদর্শন আমরা দেখিতেছি। যেমন জগদ্দল, রামাবতী, লক্ষ্মণপাড়া, যোগীঘোপা, দিবেবাক স্মৃতি ও গরুড় স্তম্ভ প্রভৃতি। যদিও এইগুলি মুসলমান যুগের ইতিহাসের মত ততখানি সুস্পষ্ট নয় তবুও এই স্থানগুলি যে তখন জনবহুল ও সমৃদ্ধশালী ছিল সে বিসয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সেই হিসাবেই স্থানগুলির মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নতর ছিল। এবং মুসলমান বিজয়-পূর্ব পর্য্যন্ত সেগুলি বেশ সুপরিচিত ছিল এমন মনে করা যায়।

গৌড়ের পথ

(২) আর একটি পথ; যে পথটি প্রাচীন গৌড়ের দক্ষিণে অর্থাৎ মহদীপুরে পাকিস্তান চেকপোষ্ট হইতে পূর্বমুখী কামালপুর মৌজায় 'আটিয়াধাপ'বলিয়া যে উঁচু জাঙ্গালটি প্রসিদ্ধ সেটিকে একটি সুপ্রশস্ত প্রাচীন রাজপথ হিসবে গণ্য করিযা লইলে বলিতে পারা যায়, এই পথটি মহানন্দার কতকগুলি প্রাচীন খাতের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া কানষাট অতিক্রম

---

৫৫. Vide Cunningham's Archeological Survey Report Vol., XV, P 110 and also Cunningham's ancient Geography of India. P 478.

56 Going from this Country (Ka-Chu-Wen-hi-to- (Kajangala) East ward and crossing the Ganges.... we come to pun-na-fata-nna (pundravardhana).. from there going east 900 li or so crossing a great river.... we come to the country of kia-mo-lu-po, Beal translation of si-yu-ki 194, and also Beal life pp 131-133

57 On yuan chowang's travels in India by T watters Vol. 11, p 187

58 Vide Nalanda p. 9 and 10

করিয়া চৌডালা হইয়া রহনপুরের নওদার বুরুজ স্পর্শ করত: পূর্ণভবা নদীর পূর্ব ধার বাহিয়া রুক্কিনীপুরের (সন্নিকট) দ্বীপদান স্তম্ভ হইয়া পোরশার পশ্চিমপার্শ্বে নীতপুর, বিষ্টপুর দিয়া রামাবতী ও জগদ্দল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পথের আর একটি শাখা রহনপুর হইতে উজিরপুরের দর্গা অতিক্রম করিয়া আমনুরা ভূষনা হইয়া দেবপাড়া বা দেওপাড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রাচীন সাক্ষ্য প্রমাণ মূলে স্থানীয় জনশ্রুতি ও বর্তমানে বড় বড় আইলের চিহ্নবিশেষ দেখিয়া হিন্দু শাসনযুগে চতুর্থ হইতে অষ্টম-নবম-দশম-একাধম দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত আপাততঃ রাজশাহীতে উল্লিখিত এই তিনটি রাজপথের নির্দ্দেশ করা যায়। উল্লিখিত আইলগুলিকে সাধারণত: জাঙ্গাল বা পুল বলা হয়। যেমন হীরানটির পুল, রাণীর জাঙ্গাল, আঁটিয়ার ধাপ, হাঁপুনিয়ার আইল, রাজার পুল ইত্যাদি। রাজশাহী জেলায় উল্লিখিত পথ কয়েকটি সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ। এই পথগুলি বর্তমানে সরকারী পথ হিসাবে গণ্য নয়। ইহার তিনটি নদীর তীর হইতে ৮।৯ মাইল দূরে, কোনটি মরা নদীর তীরে, কোনটি মাঠ-প্রান্তরে অবস্থিত। কোন কোনটিতে প্রাচীন খিলান যুক্ত ইষ্টক নির্মিত সাঁকো বর্তমান রহিয়াছে। বগুড়ার শেরপুর গামী জাঙ্গালের ইষ্টক নির্মিত সাঁকোটি একটি ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য বিষয়। আঁটিয়ার ধাপ, হীরানটির পুল, হাঁপুনিয়ার আইল, রানীর জাঙ্গাল সংস্কার করিলে পুনরায় ইহা যাতায়াতের পথ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। কালের পরিবর্তনে এই সব পথের কোন কোন স্থান নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কতক নদীগর্ভে বিলীন, কতক কৃষিক্ষেত্রের সামিল হইয়াছে। তখনকার যুগে এইসব রাজপথগুলি নদীর তীরে রাস্তা ও বাঁধ দুই কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত। ইহা ব্যতীত বান-বন্যায় প্রতিরোধের জন্য যে সব বাঁধ নির্মিত হইত মানুষের আনাগোনায় সেই সব বাঁধও সাধারণ পথে পরিণত হইয়াছিল। বর্তমানে রাজশাহী হইতে গোদাগাড়ী পর্য্যন্ত সুপ্রশস্ত পথটি উহার একটি দৃষ্টান্ত রূপে ধরা যায়। যদিও তখন উহা রাস্তা হিসাবে নির্মিত হইয়াছিল। মুসলমান আমল শুরু হইবার পূর্বে এ জেলার পথ-ঘাটের এতটুকু বিবরণ জানা যায়। এখন আমরা মুসলমান আমল হইতে বর্তমান পথঘাটের কথা কিছু বলিব।

বাঙলাদেশ প্রধানত: পাঠান সুলতান ও মোগল বাদশাহদের হস্তগত হইবার পর যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। সেইসব পথঘাট দিয়া দেশ- দেশান্তরে সামরিক, বাণিজ্যিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ চলিত। তখন রাজ্যের মধ্যে সুবিস্তৃত বড় বড় পথগুলিকে সাধারণত: 'শাহীপথ' বলা হইত। করতোয়ার তীর ধরিয়া বগুড়ার শেরপুর হইতে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ একটি সুবিস্তৃত 'শাহীপথের' জন-প্রবাদ এখনও উত্তর বঙ্গের অত্রাঞ্চলে প্রচলিত আছে। রাজশাহীর পশ্চিম সীমান্তে গৌড়ের আঁটিয়ার ধাপ এর 'শাহী' নাম সেখানকার লোকেরা এখনও ভুলিয়া যায় নাই। পাবনার চাটমহর হইতে বগুড়ার শেরপুর পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত প্রাচীন পথটি এখনও অত্রাঞ্চলে 'শাহীপথ' নামে কথিত হইয়া থাকে। প্রয়োজনের তাগিদে তখন এইসব সুবিস্তৃত পথগুলি বঙ্গের স্বাধীন সুলতান ও মোগল বাদশাহ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। সমসাময়িক ইতিহাসে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে।

যাহা হউক রাজশাহীতে জনশ্রুতি আশ্রিত যে পথটিকে আমরা বাদশাহী পথ বলিয়া আসিতেছি বাস্তবিকই তাহা মুসলমান শাসন আমলের একটি প্রাচীন সুবিস্তৃত পথ।

উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এখনও তাহার কিছু কিছু স্মৃতি চিহ্ন রহিয়াছে। বলা বাহুল্য তখন (১) এই পথটিই উত্তর বঙ্গের সামরিক দিক দিয়া বিখ্যাত পথ ছিল। এই পথটি বর্তমান মালদহ গৌড়ের দক্ষিণ সীমান্তে কোতয়ালী[৫৯] দরওয়াজা অতিক্রম করিয়া তাহাখানার (out Post of Gaur) ছোট সোনা মসজিদ স্পর্শ করিয়া কানষাট তারপর বিখ্যাত "বলিয়া"* সাহেবের দরগার কিছুটা উত্তর দিয়া মহানন্দা অতিক্রম করিয়া নওয়াবগঞ্জ, হুজরাপুর-সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী, কুমারপুর ও রামপুর বুয়ালিয়া (বর্তমান রাজশাহীর শহর) হইয়া বাঘা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তারপর বাঘা হইতে পূর্বদিকে লালপুরের মধ্যে দিয়া পাবনার চাটমহর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তথা হইতে এই পথ ইউসুপশাহী পরগণার মধ্যে সমাজ-মির্জ্জাপুর, নবগ্রাম, হাণ্ডিয়াল, তারাশ, নিমগাছী স্পর্শ করত: বগুড়ার শেরপুরে গমন করিয়াছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এই পথটি গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ হইতে বরাবর কখন পদ্মা কখন কখন মহানন্দা নদীর উত্তর কোণ ঘেষিয়া শক্ত মাটিতে নির্মিত ছিল। নদীর খাত পরিবর্তনের ফলে এই পথটি কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন নামের সৃষ্টি করিয়াছে। এই পথটি কোন সময়ে নির্মিত হইয়াছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। ফানডেন ব্রুক ও রেনেলে সাহেব তাহাদের বঙ্গনকশায় এই পথটিকে এতদাঞ্চলের সর্বপ্রাচীন বৃহৎ সামরিক পথ হিসাবে (Great Military Road) উল্লেখ করিয়াছেন[৬০]। পরবর্তীকালে মিঃ হান্টার ও জেলা গেজিটিয়ার লেখকগণ এই পথটিকে মুসলমান আমলের একটি প্রাচীন সামরিক পথ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন[৬১] মিঃ হান্টারের রাজশাহী জেলার একাউন্টে ইহা রামপুর-বুয়ালিয়া হইতে পাবনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত (৪২ মাইল দীর্ঘ)। পথটি বানান ভুলের দরুণ Pabna road এর স্থলে Patna road হইয়াছে[৬২]। উল্লিখিত এই পথটি মোগল শাসন আমলের নির্মিত একটি সামরিক পথ ছিল। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মোগল সেনানিবাস ও যুবরাজ খুররম্ ভ্রমণ প্রসঙ্গে আইন-ই-আকবরী ও বাহার-ই-স্থান ঘাইবীতে উহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। মোগল বাদশাহ আকবরের সময়ে বঙ্গে বারভূঁইয়া বিদ্রোহী হইলে বগুড়ার শেরপুর প্রভৃতি স্থানে সেনানিবাস স্থাপিত হয়। পাবনার চাটমহর ও রাজশাহীর আলাইপুর, নাজিরপুর, শাহপুর, ফতেপুর প্রভৃতি স্থানে (বঙ্গে) মোগল সেনাদের গড় বা দুর্গ ছিল সে কথা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। এইসব স্থানে সৈন্য সামন্তদের যাতায়াত ও রণ-সম্ভার আদান-প্রদানের জন্য সুপ্রশস্ত পথঘাট ছিল এবং সেই জন্যেই হয়ত জনপ্রবাদে এই প্রাচীন পথের স্মৃতিচিহ্নকে কোন কোন স্থানে আজিও 'শাহীপথ' বলা হইয়া থাকে। ইংরেজ আমলে এই পথটির বিভিন্ন জেলার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। রাজশাহীর রামপুর বুয়ালিয়া হইতে পাবনা পর্য্যন্ত 'পাবনা রোড' এবং রামপুর বুয়ালিয়া হইতে গোদাগাড়ী পর্য্যন্ত 'গোদাগাড়ী রোড' ও গোদাগাড়ী হইতে মালদহের গৌড় পর্য্যন্ত 'মালদহ রোড' নামে পরিচিত।

---

৫৯. Memories of Gaur and Pandua. P 76, Cunningham's Vol XV PP 477
* বারোঘরিয়া নওয়াবগঞ্জের পশ্চিমে মহানন্দার নদীর তীরে।
৬০. Dutch Map of Vanden Broucke, 1660; Major Rennell's Bengal Atlas, 1781.
৬১ Statistical account of Bogra district PP. 266-267; Eastern Bengal district Gazetteer, Bora (1910) P 104; Rajshahi district Gazetteer, P 179.
৬২. Statistical account of Rajshahi district, P 81.

মেজর রেনেলের বঙ্গ নকশায় (Map) রাজশাহীর ভূমিখণ্ডে অপর একটি প্রাচীণ পথের উল্লেখ আছে। কিন্তু মিঃ হান্টারের একাউন্টে এই পথটি একটি সামরিক[৬৩] পথ হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই পথটি গৌড়ের পুরাতন রাজধানী হইতে রাজশাহীর মহীসন্তোষ* ফার্সীপাড়া নাজিরপুর–শাহপুর ও নওগাঁর ফতেপুর অতিক্রম করিয়া অধুনা বগুড়ার[৬৪] জামালগঞ্জ– ক্ষেতলাল–শিবগঞ্জ–গড় ফতেপুর–গড় দুর্গাহাটা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উক্ত নাজিরপুর, শাহপুর, ফতেপুর, শিবগঞ্জ, গড় ফতেপুর ও গড় দুর্গাহাটা মোগল আমলের সেনানিবাস হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং গৌড়ের রাজধানী হইতে তৎকালীন পাঠান স্মৃতি বিজড়িত বিখ্যাত মহীসন্তোষ হইয়া উত্তর বঙ্গের এই কয়েকটি ছাউনীর সহিত সামরিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য সুবিস্তৃত পথ থাকা স্বাভাবিক সত্য। মিঃ হান্টার বলিয়াছেন যে, মুসলমান শাসনের শেষের দিকে এই সামরিক পথ (In the later days of the Muhammadan Empire) নির্মিত হইয়াছিল। অবশ্য মিঃ হান্টারের সময়ে এই পথের বহুলাংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু, ইংরেজ আমলে পুনরায় এই পথটির সংস্কার হইয়াছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। সেইজন্যই হয়ত রাজশাহীর পূর্বাঞ্চলে এই পথটির বহুলাংশ বর্তমানে বিচ্ছিন্ন হইলেও কোথাও কোথাও ইহার অস্তিত্ব রহিয়াছে। বগুড়া জেলায় জামালগঞ্জ– ইঁটা খোলার হাট– ক্ষেতলাল–শিবগঞ্জ পথটি বর্তমানে জেলা বোর্ডের একটি প্রসিদ্ধ পথ।

যাহা হউক, পাঠান ও মোগল আমলে রাজশাহীর ভূখণ্ডে আরও কয়েকটি প্রাচীন পথের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। ১৮৫০ সালের ভূমি জরিপ নকশাতে এইসব পথের উল্লেখ থাকিলেও তাহার অধিকাংশই এই জেলার রাজা জমিদারদের কীর্তি। হান্টারের ইতিহাসেও উহার ইঙ্গিত আছে। এই পথগুলি স্থানীয় প্রাচীন রাজা জমিদারদের বাড়ী পর্য্যন্ত প্রসারিত। যেমন তাহিরপুর হইতে সাঁতুল এবং সাঁতুর হইতে লস্করপুর অর্থাৎ বর্তমান পুঁঠিয়া এবং পুঁঠিয়া হইতে তাহিরপুর। আলাইপুর হইতে পুঁঠিয়া পর্য্যন্ত আর একটি সুপ্রশস্ত পথও ছিল। এখনও এইসব পথের অস্তিত্ব রহিয়াছে। ইহার কয়েকটি রাজশাহী জেলা পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে চলিয়া গিয়াছে।

ইহা ছাড়া রাজশাহীতে মোগল ও পাঠান আমলে একাধিক জলপথও ছিল। এবং এই জলপথগুলিতে ভ্রমণ অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ছিল। সেইজন্যই মোগল আমলের অধিকাংশ ছাউনী নদীর তীর ধরিয়া স্থাপিত ছিল। পদ্মা, আত্রাই, নারোদ, পূর্ণর্ভবা, মহানন্দা প্রভৃতি তাহার স্মৃতি বহন করিতেছে। এইসব জল ও স্থলপথই ছিল মোগল আমলের সেনাবাহী পথ। জয়যাত্রা, রণসম্ভার বিনিময়ের পথ। ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষা-সমৃদ্ধি সাধক দরবেশদের পথ। বাদশাহ্, সুলতান, আমীর-ওমরাহ্রা এইসব পথ দিয়াই দেশ- দেশান্তরে ভ্রমণ করিতেন। তাই আমরা দেখিতেছি এই রাজশাহীর বিভিন্ন জল ও স্থলপথে বাদশাহ্ শাহজাহান, আহমদ শাহ্, শাহ্ আলম, ইসলাম শাহ্ প্রভৃতির স্মৃতিচিহ্ন রহিয়াছে। বহু সাধক দরবেশ, তাঁহাদের জীবনব্যাপী সাধনার অমৃতময় ফল এইসব পথঘাটের দুই পার্শ্বে রাখিয়া গিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। মুসলিম বাঙ্লার বিভিন্ন

৬৩. Renneli's Bengal Atlas 1781, Statistical account of Bogra. P. 267

* জেলার প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থান দ্রষ্টব্য

৬৪. বগুড়ার ইতিকাহিনী দ্রষ্টব্য।

বিবরণ ও ইতিহাসে উহার উল্লেখ আছে[৬৫]।

বঙ্গের নওয়াবী আমলের শেষ রাজধানী মুর্শিদাবাদ। রাজস্ব আদায় ও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে বরেন্দ্রভূমির (ইংরেজদের উত্তরবঙ্গ) নওয়াবী আমলের পথঘাট উল্লেখযোগ্য। মুর্শিদাবাদের সহিত রাজশাহীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় এতদঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর ছিল। সেইজন্য রাজশাহীর ভূখণ্ডে নওয়াবী আমলের বহু কীর্তি বর্তমান রহিয়াছে।

নওয়াবী আমলের পথ

মুর্শিদাবাদ সদর হইতে সোজা উত্তর দিকে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত একটি সুপ্রশস্ত স্থলপথ নওয়াবী আমলের কীর্তি। উহা রাজশাহীর গোদাগাড়ী হইতে আমনুরা-পার্বতীপুর-তেঁতুলিয়া হইয়া (বর্তমান ভারতের তপন থানা দিয়া) দিনাজপুরে প্রবেশ করিয়াছে। এই পথ ইংরেজ আমলে রাজশাহীতে "দিনাজপুর রোড" এবং দিনাজপুরের দক্ষিণে "মুর্শিদাবাদ রোড" নামে পরিচিত। স্বনামধন্য মুর্শিদকুলী খাঁ কর্তৃক উহা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া "মুর্শিদাবাদ রোড" নামে মুর্শিদাবাদ কাচারীতে (বা নওয়াবী মহলে) এখনও কথিত হইয়া থাকে।

মুর্শিদাবাদ পথ

পরবর্তী কালে ১৮৬৩ সালে[৬৬] 'মেজর শিয়ার উইল' তাঁহার দিনাজপুর বিবরণীতে এই পথকে ব্রিটিশ কর্তৃক স্থাপিত বলিয়া রায় দিয়াছেন। কিন্তু, আসলে উহা নওয়াবদের কীর্তি এবং সেজন্য এখনও উহার 'মুর্শিদাবাদ রোড' নাম অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। মুর্শিদাবাদের নওয়াবী মহফুজ খানায় প্রাচীন নথিপত্রে উহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। এতদব্যতীত নওয়াবী আমলের আরও দুইটি পথে মুর্শিদাবাদ হইতে ঢাকায় যোগাযোগ চলিত। ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদ আসিতে হইলে নিম্নবর্ণিত পথ ও প্রধান স্থান অতিক্রম করিয়া যাতায়াত করিতে হইত।

ঢাকা-জাফরগঞ্জ-শীতলাই*-নাটোর হইয়া মুর্শিদাবাদ এবং মুর্শিদাবাদ হইতে জিয়াগঞ্জ-আখেরীগঞ্জ, সরদহ, চাপিলা ও নাটোর হইয়া ঢাকা প্রথম পথ। মুর্শিদাবাদ, ভগবানগোলা, বড়গাছি, বুয়ালিয়া, কাপশিয়া-পুঁঠিয়া ও নাটোর হইয়া ঢাকা দ্বিতীয় পথ।

তখন মুর্শিদাবাদ হইতে রাজশাহী ভূখণ্ডে যে দুইটি স্থলপথে যাতায়াত চলিত; উহার প্রথমটি মুর্শিদাবাদের আখেরীগঞ্জ হইয়া রাজশাহীর সরদহ সোজাসুজি পথ ছি। সিপাহী বিপ্লব প্রসঙ্গে রাজশাহী গেজেটে উহার ইঙ্গিত আছে[৬৭]। আর দ্বিতীয়টি মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা লালগোলা হইয়া রাজশাহীর গোদাগাড়ী সোজাসুজি পথ ছিল। পদ্মা ও নারদ নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে এই পথদ্বয়ের যোগাযোগ কিছুটা বিচ্ছিন্ন হইলেও বর্তমানে এই পথদ্বয়ই যাতায়াত পথরূপে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। কালীনাথ চৌধুরীর রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত

রাজশাহী মুর্শিদাবাদ পথ

---

৬৫. Vide, Ain-i-Akbari-Vol II; Akbaranama, Part III; J. A S. B old series, Vol XLIV 1875, J A S B. part I, 1904 Bengal past and present 1928, Five thousands years of Pakistan, Bengal past and present, Vol. XXX, part II, Serial No 70, Sharifs of Bengal and Riayus-Salatian, Memoir of the A S. Bengal; Baharistan-i-Ghaybi. 2 বাংলার স্বাধীন জমিদারদের পতন, প্রবাসী ১৩২৯-ভাদ্র।

৬৬. Report on the Dinajpur district, 1863.

* বর্ত্তমান পাবনার 'শীতলাই'।

৬৭. Rajshahi Gazetteer. P. 46

ইতিহাসে[৬৮] 'মুর্শিদাবাদ–ঢাকা' পথের কিছুটা ইঙ্গিত আছে। উল্লিখিত পথঘাট বাহিয়া নওয়াবী রাজস্ব মুর্শিদাবাদ রাজকোষে পৌঁছিত। জাফরগঞ্জ, শীতলাই, ভগবানগোলা ব্যতীত অবশিষ্ট প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থানগুলি রাজশাহী ভূখণ্ডে আজও নওয়াবী আমলের কীর্তি হিসাবে খ্যাত।

নওয়াবী আমলে এক প্রকার নয়া বাহনের সংবাদ পাওয়া যায় তাহা বলদ ও গাধার বাহন*। গাধা ও বলদ বাহন কিছুদিন আগেও ছিল। এখনও বীরভূম ও পাবনা জেলায় ইহার প্রচলন আছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে রাজশাহীর সুপারভাইজার কর্তৃক নাটোর হইতে মুর্শিদাবাদ দরবারে লিখিত কতকগুলি চিঠি[৬৯] পত্র মূলে রাজশাহীর বিভিন্ন স্থানে দস্যু তস্করের উপদ্রবের সংবাদ জানা যাইতেছে। হয়ত সেই জন্য তখন বড় বড় পথঘাটের স্থানে স্থানে ছাউনী থাকিত। এতদুদ্দেশ্যে সেই সব স্থানে দীঘি পুষ্করিণী খনন করিয়া জলাভাব দূর করা হইত। তাই হয়ত রাজশাহীর প্রাচীন পথগুলির দুই পার্শ্বে (২।৩) দুই তিন মাইল অন্তর অন্তর বাদশাহী ও নওয়াবী আমলের দীঘি পুষ্করিণী বর্তমান থাকিয়া অতীতের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ পথে তেঁতুলিয়া, পার্বতীপুর-আড্ডা ও আমনুরা প্রভৃতি স্থানে ছাউনী ছিল। এইসব স্থানে বিরাট বিরাট দীঘি পুষ্করিণী রহিয়াছে। জনসাধারণ এখনও ইহার কোনটি 'নওয়াবী হাওদা' কোনটি 'নওয়াবী ছাউনী' কোনটি বা বাদশাহী দীঘি বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

ইংরেজ আমলে রাজশাহীতে সরকারী সাহায্যে যাতায়াত ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে কয়েকটি নূতন পথের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু সরকারী হিসাবে সেই সব পথঘাটের পরিমাণ জানা যায় না। তবে একজন সরকারী ডিষ্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে জেলাবোর্ডের অধীনস্থ পথগুলি পরিচালিত হইত। এই সময় জেলার আভ্যন্তরীন পথঘাটের পূর্বাপেক্ষা উন্নতি হয় এবং প্রতিবেশী জেলার সহিত যোগসূত্র সহজসাধ্য করিবার জন্য জেলাবোর্ডের অধীনস্থ পুরাতন পথগুলির সংস্কার ও সম্প্রসারণ হয়। ইংরেজ আমলে রাজশাহীর স্থলপথগুলির মধ্যে 'রাজশাহী-নাটোর'; 'রাজশাহী-নওহাটা'; 'রাজশাহী মালদহ', 'মুর্শীদাবাদ-পাবনা'; 'নাটোর-বগুড়া'; 'আক্কেলপুর-বদলগাছি'; প্রভৃতি ছত্রিশ-সাইত্রিশটি (৩৬।৩৭) ভিন্ন ভিন্ন নামীয় পথ উল্লেখযোগ্য[৭০]।

ইংরেজ আমলে

উত্তরবঙ্গ ও ঢাকা পথ

এ সব পথঘাটের মধ্যে 'নাটোর-রাজশাহী' পথ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও জেলার প্রধানতম পথ। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার সহিত এই পথটি রাজশাহীর সংযোগ রক্ষা করিয়া

৬৮. রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

* গাধা গাদীর রূপক কিচ্ছার একটি ধুয়াগান পূর্ব বগুড়ায় বহুল প্রচলিত। তাহার এক পংক্তি এইরূপ–"গাধার বাহনে যায় রজক রজকীরা নদীর ঘাটে......জল বাইতে– রে–এ–এ– হে–এ.....।

৬৯. Vide, letter copy book of the supervisor of Rajshahi at Nator (Records of the Govt of Bengal) Edited by the Bengal record room, 1925

৭০. Vide Rajshahi District Schedule of all public works. From the year 1888-1918

থাকে। এবং এই পথ দিয়াই রাজশাহীবাসী রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলায় গমনাগমন করিয়া থাকে। ইহাই এ জেলার পর্য্যটক, পরিব্রাজক, রাজকর্মচারী, বিদ্যার্থী ও পথিকদের পথ। সেইজন্যই এই পথের এতখানি প্রসিদ্ধি। সাধারণতঃ ইহা 'নাটোর পথ' নামে কথিত হয়। রাজশাহী জেলার সদর নাটোরে থাকা কালে নাটোর হইতে বুয়ালিয়া বন্দরে যাতায়াতের একটি সাধারণত: মামুলী ধরণের পথ ইংরেজ আমলের আগে হইতেই ছিল। তখন এই পথটি সাধারণত: 'নাটোর' অথবা 'বুয়ালিয়া' পথ নামে কথিত হইত। ইং ১৮২৫ সালে জেলার সদর বুয়ালিয়া বন্দরে স্থানান্তরিত হইলে এই পথটির গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। এবং ইহাকে পুন: সংস্কার ও রাজপথে উন্নীত করার বিষয় বিবেচিত হওয়ায় বাঙলা সরকার রাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে স্থানীয় জমিদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তদনুযায়ী দিঘাপতিয়ার জমিদার রাজা প্রশন্ননাথ রায় ইং ১৮৫৪[৭১] সালে ৩৫,০০০ টাকা ব্যয়ে নাটোর পথটির পুন: সংস্কার করেন। তখন হইতে এই পথ 'নাটোর রাজপথ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ কবে। তৎপর সরকার ও জমিদারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই পথটির উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটিতে থাকে। নানা প্রকার দেশী ও বিলেতী দুস্প্রাপ্য বৃক্ষাদি উহার দুই পার্শ্বে রোপিত হয়। সেইসব বৃক্ষাদিই তো আজ নাটোর পথের শোভা সৌন্দর্য্য পথিকদের কল্পনার খোরাক।

ঊনবিংশ শতকের শেষে ১৮৮৮ সালে (?) রাজশাহী জেলার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ নিকোলাস উইলিয়াম ম্যাকেনজির তত্ত্বাবধানে (Mr. Nicholas William Makenjee) ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তায় ১২ ফুট চওড়া করিয়া পাথর ও খোয়া দ্বারা বুয়ালিয়া প্রবেশ পথে 'নাটোর-বুয়ালিয়া' পথে ১২ মাইল পরিমাণ রাস্তা পাকা করা হয়। এবং জেলার রাস্তা পাকা করার সূচনা এই স্থান হইতেই শুরু হয়। তৎপূর্বে ১৮৩০ সালের (?) দিকে বুয়ালিয়া টাউনের ২।১টি পথ পাকা করা হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

বর্তমানে রাজশাহী জেলার নদী নালা ও বিল হাওড়ের গতিপথ পরিবর্তনের ফলে পুরাতন ভূমিতে পথঘাট নির্মাণে যতটা সুবিধা ও সহজতর হইয়াছে, পুর্বে ততটা সুবিধা ছিল না। যত্রতত্র বিল ও নদী নালার অবস্থিতির দরুন চা‌ু ও নরম ভূমিতে পথঘাট বা সেতু নির্মান খুবই দুঃসাধ্য, বহু শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল ছিল। পশ্চিমে রাজমহল ও উত্তরে জয়ন্তী পাহাড় হইতে পাথর সংগ্রহ করা তখন খুবই ব্যয় সাধ্য হইত। তবুও প্রয়োজনের তাগিদে তাহা অনেক ক্ষেত্রে করিতে হইয়াছিল। ইংরেজ আমলে জেলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পথঘাট বা সেতু নির্মানের জন্য আর ততখানি ভাবিতে হয় নাই। ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত রজাশাহী জেলা বোর্ডের অধীনে পাকাপথের পরিমাণ ছিল ৪৫ মাইল, কাঁচাপথ ৫০৫ মাইল। এতদব্যতীত ৯২৮ মাইল গ্রাম্য পথ ছিল। তখন অধিকাংশ পথ কর্দমাক্ত থাকায় জনসাধারণের গমনা-গমনের কষ্টের একশেষ হইত। গ্রীষ্মের সময় পথ ঘাটে বড় বড় গর্ত হইত। তাহাতে অনেক সময় গরু বা মহিষের গাড়ী পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইত। পশ্বাদির জীবন হানী হইত। বরিন্দ অঞ্চলে গো-যানে যাতায়াত খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। বর্তমানে সে অবস্থার বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়া পূর্বাপেক্ষা জনসাধারণের প্রভূত উপকার হইয়াছে। এই সময় 'বুয়ালিয়া' হইতে নাটোর,–বুয়ালিয়া হইতে নওহাটা, শান্তাহার রেলষ্টেশন হইতে নওগাঁ, বুয়ালিয়া হইতে পাবনা পথের

[৭১]. The Modern History of India Chiefs Rajas and Zaminders, Part II P. 375.

কতকাংশ এবং নাটোর হইতে দিঘাপতিয়া পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা ছিল। ইহার স্বল্পকাল পরে, লালপুর হইতে গোপালপুর পথ পাকা করা হয়।

**নাটোর পথ :**

রাজশাহী সদর কাচারী প্রাঙ্গন হইতে (৩০ মাইল) সবুজ মাঠ-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া নাটোর টাউন পর্য্যন্ত বিস্তৃত; ইহাতে যে কোন রকমের ভারবাহী গাড়ী গমনাগমন করিতে পারে। বর্তমানে এই পথটি সু-উচ্চ বাঁধ সদৃশ। ইহার ২১ মাইলে ঝল মলিয়াতে মুছাখান নদীতে বর্ষার সময় ফেরী থাকিত। গ্রীষ্মের সময় অস্থায়ীভাবে ১৫০ ফুট দীর্ঘ নৌকার সেতু দেওয়া হইত। তখন যাত্রীদের পাবাপারের জন্যে কোন দক্ষিণা লাগিতনা। তারপর ১৯০৯ সালে এখানে পাকা সেতু নির্মিত হয়। তখন অনান্য পথের ন্যায় এই পথেও লোহার দূরত্ব ফলক (Mile post) ছিল। বর্তমানে উহার পরিবর্তে সীমেণ্ট জমানো পোষ্ট দেওয়া হইয়াছে। তখন এই পথে প্রধানত: অধিকাংশ যাত্রী এক্কা-গাড়ীতে গমনাগমন করিত। তখন এক্কাগাড়ীই ছিল এখানকার একমাত্র সৌখিন ও নির্ভরযোগ্য বাহন। রাত্রিতে দলবল বাধিয়া মালবাহী গোযানের বহর চলিত। বানেশ্বর, বিড়ালদহ, পুঁঠিয়া প্রভৃতি স্থানে গাড়ীর আড্ডা জমিত। এখন সেই সব স্থানে হাট-বাজার বসিয়াছে। কতক পুরাতন আড্ডা উঠিয়া গিয়াছে।

জেলার বিশিষ্ট পথগুলির পরিচয়

**নওহাটা পথ :**

সাড়ে ৯ মাইল; এই পথ দিয়া বারাহী নদী অতিক্রম করিয়া জেলার উত্তরাঞ্চলে মান্দা প্রভৃতি দূর মফঃস্বলে ভ্রমণ করা যাইত। বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা এই পথের যোগাযোগ ব্যাপকতর হইয়াছে।

**মালদহ পথ :**

সাড়ে ৫৩ মাইল; এই পথটি কাচারী হইতে প্রথম ২ মাইল পর্য্যন্ত পদ্মার বাঁধের কার্য্য করিত এই জন্য (P.W.D) পূর্তবিভাগ কর্তৃক এই দুই মাইল পথ সংরক্ষিত হইত। প্রেমতলী, বড় গাছি ও গোদাগাড়ী হইয়া সুলতানগঞ্জ পর্য্যন্ত রাজশাহীর অধীনে ছিল। বর্তমানে এই পথটি নওয়াবগঞ্জ হইয়া মহানন্দা নদী অতিক্রম করিয়া গৌড়ের প্রাচীন পথের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। শিবগঞ্জ থানা হইয়া তাহ্‌খানা পাকিস্তান চেকপোষ্ট পর্য্যন্ত এই পথে গমনাগমন করা যায়।

**পাবনা পথ ঃ**

সাড়ে ৩৫ মাইল; বুয়ালিয়া হইতে অরণখোলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমানে এই পথটির বহুলাংশ পদ্মার ভাঙ্গনে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। বুয়ালিয়া জনপদের সন্নিকট (সাহেবগঞ্জ হইতে) নাটোর পথ হইতে বহির্গত হইয়া আচিনতা খাল, সরদহ, চারঘাট, মীরগঞ্জ, বাঘা, বিলমাড়িয়া, লালপুর হইয়া পাবনা জেলায় প্রবেশ করিয়াছে।

**দিনাজপুর পথ :**

৪৬ মাইল; মুর্শিদাবাদ হইতে এই পথ দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বিভাগ পূর্ব কালে রাজশাহীর মধ্যে এই পথের দূরত্ব ছিল ১৬ মাইল। রাজশাহীর গোদাগাড়ী হইতে সোজা উত্তর দিকে এই পথ দিনাজপুরে প্রবেশ করিয়াছে। সেজন্য রাজশাহীতে ইহা দিনাজপুর পথ নামে খ্যাত। নওয়াবী আমলে মুর্শিদাবাদ হইতে "লালবাগ, গোদাগাড়ী, পর্য্যন্ত ফেরীর সাহায্যে পদ্মা অতিক্রম করিয়া এই পথে উত্তরবঙ্গে যাতায়াত চলিত। কোম্পানীর আমলে রেলপথ স্থাপিত হইবার পূর্বে কলিকাতার ডাক এই পথে মুর্শিদাবাদ হইয়া দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত গমনাগমন করিত। তখন ইহার একটি শাখা হিমালয়ের সিকিম হইয়া গ্যাংগটেক মালভূমি প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত ছিল। রাজশাহীর পশ্চিমাঞ্চলের ইহা একটি বিখ্যাত সুদৃঢ় পথ বটে।

**বগুড়া পথ :**

(বগুড়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত ইহার দূরত্ব ২৫ মাইল?); ইহা নাটোরের উত্তর-পূর্বদিক হইতে প্রথম ১৩ মাইল পর্য্যন্ত আত্রাই বারাহী ও গুড় এই তিনটি নদী (বকেশ্বর, সিয়ারকোল ও সিংড়া) অতিক্রম কবিয়া হাইলার বিল হইয়া নন্দীগ্রাম দিয়া বগুড়া জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। হাইলার বিল গ্রীষ্ম ঋতুতে শুষ্ক থাকে। নদীত্রয়ে গ্রীষ্ম ও বর্ষার সময় ফেরীর বন্দোবস্ত থাকিত; এখন গ্রীষ্মে সিংড়া ব্যতীত অন্যান্য নদী ও খাঁড়ি প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়। যাহা হউক এই পথটি এতদঞ্চলে একটি প্রাচীন পথ। কোম্পানীর আমলে থাকবট নকশায় এই পথটি কোম্পানরি সড়ক নামে উল্লিখিত। সম্ভবত: ইহা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে পুন: সংস্কার হইয়াছিল। সেই হিসাবে উক্ত নামের উল্লেখ হইয়া থাকিবে। আসলে এই পথটি বাদশাহী আমলের কীর্তি। পথটি বর্তমানে গমনাগমনের অযোগ্য।

পাকিস্তান আমলেব পথঘাট

আজাদী পূর্বকালে রাজশাহী জেলাবোর্ডের মোট পথের পরিমাণ ছিল ১৬৪৩ মাইল ৪ ফার্লং। তন্মধ্যে কাঁচা ১৫৭৩ মাইল এবং পাকা ৭০ মাইল ৫ ফার্লং। আজাদী উত্তরকালে দিনাজপুর ও মালদহ হইতে ২৮৮ মাইল কাঁচা ৪ মাইল পাকা অর্থাৎ ২৯২ মাইল যোগ হইলে জেলাবোর্ডের মোট পথের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৩৫ মাইল। তন্মধ্যে ১৮৬১ মাইল কাঁচা ৬৭৪ মাইল ৫ ফার্লং পাকা।

অতঃপর পাকিস্তান সরকার দেশের আভ্যন্তরীন আমূল উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে সমুদয় পথঘাটের উন্নতিব জন্য মনোযোগী হইলে পর্ব-পাকিস্তান সরকারের 'সি, এণ্ড, বি' এবং পরে 'পথ বিভাগ' কর্তৃক প্রদেশের অন্যান্য জেলার পথঘাটের ন্যায় রাজশাহীর পথঘাট ও সেতু প্রভৃতির উন্নতি পর্ব আরম্ভ হয়। ইং ১৯৫০-৫১-৫২ এবং ১৯৬১-৬২ ও ৬৩ সালে রাজশাহী জেলা বোর্ডের অধীনস্থ প্রধানতঃ 'রাজশাহী-নাটোর'; 'নাটোর-মুলাডুলী', 'রাজশাহী- গোদাগাড়ী', 'গোদাগাড়ী- নওয়াবগঞ্জ–শিবগঞ্জ, 'রাজশাহী-নওহাটা'; বানেশ্বর–সরদহ এবং শান্তাহার–নওগাঁ–মহাদেবপুর–পত্নীতলা; প্রভৃতি পথ সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সব পথগুলির মধ্যে ইতিমধ্যেই ১৫২ মাইল পথ পাকা করা হইয়াছে। আগামী দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৬৫-'৬৬ সাল) মধ্যে

রাজশাহী জেলার অবশিষ্ট বড় বড় পথগুলি পাকা হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই সব পথঘাটের মধ্যে পুরাতন সেতুর সংস্কার করিয়া পাকা করা হইতেছে। এতদব্যতীত বড়ল নদী (মুলাডুলী) ও কয়েকটি খাড়িতে সেতু নির্মাণ করিয়া যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা হইয়াছে। অধিকন্তু প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার সদর ও মফঃস্বলের টাউন বন্দরের সেতু ও পথঘাটের উন্নয়ন সাধন করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিতেছেন। বর্তমানে সদর ও মহকুমা টাউন বন্দরের অধিকাংশ পুরাতন পথ পাকা হইয়া গিয়াছে এবং প্রয়োজন বশতঃ কতকগুলি নূতন পথের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালে জেলার প্রসিদ্ধ নাটোর পথ ৫৩,১৩,৫১৭.৫৭ টাকা ব্যয়ে পাকা করা হইয়াছে।

সদর ও মফস্বলের পথঘাট পুনঃসংস্কৃত ও পাকা হইবার সঙ্গে সঙ্গে পথগুলির নূতন নামকরণের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। মুসলিম বাঙলার শিরোমণি সাধক, দরবেশ, পীর, আউলিয়া, দিগ্বিজয়ী বীর, নওয়াব, বাদশাহ্, আজাদী আন্দোলনের অমরনেতা, সমাজপতি কর্মী প্রভৃতি মণীষীদের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য পথঘাটের ভিন্ন ভিন্ন নাম যথা–জিন্নাহ্ এভিনিউ (Greater Road), লিয়াকত, শাহ সুজা, নওয়াব সলিমুল্লাহ, হোসেনশাহ, আল্লামা ইকবাল প্রভৃতি রোড বা পথের নূতন নামের সৃষ্টি হইয়াছে। বলাবাহুল্য আজাদীর প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ এইরূপ নূতন নূতন দৃষ্টান্ত জাতীয় বোধের পরিচায়ক।

জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন সহজ হইতে সহজতর হইয়া উঠিতেছে তেমনি বিবিধ রকম বাহন আবিস্কৃত হইয়া মানুষের জীবনযাত্রাও সহজ হইতে সহজতর হইয়া উঠিতেছে। আগের যে সব যানবাহনের সহিত রূপকথায় পরিচিত হওয়া যাইত। অধুনা সেগুলি যেন বিজ্ঞানের যাদু প্রভাবে বাস্তবায়িত হইয়াছে। আজ কেবল জেলার আভ্যন্তরীণ উন্নতিই হয় নাই দেশ দেশান্তরে যাইতে হইলে আর পথে বসিয়া ভাবিতে হয় না। সাতরাত সাতদিন প্রবাসী হইতে হয়না। জেলার সদর বা রাজধানীতে গমনাগমনের জন্য দলবল লইতে হয় না। হাতী ঘোড়া সাজাইতে হয় না। একাকী গমনাগমন করা যায়। ছয়দিনের পথ ছয় ঘণ্টা, ছয় মাসের পথ একদিনে যাওয়া যায়। জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির প্রত্যক্ষ ফল মানুষ এইভাবে ভোগ করিতেছে। তাই আমরা আজ যেমন শকটের পরিবর্তে হাতের কাছে ঘরের কোণে স্থলপথে রেলগাড়ী, মটর, বাস, সাইকেল, স্কুটার প্রভৃতি; পালতোলা, গুণটানা নৌকার পরিবর্তে জলপথে যেমন বাষ্পীয় পোত, লঞ্চ ইত্যাদি বাহন পাইয়া থাকি, তেমনি শূন্যে ভ্রমণের জন্য পাইয়া থাকি–উড়োজাহাজ, হেলিকেপ্টার প্রভৃতি। হয়ত এমন দিনও আসিবে যেদিন মানুষ আর রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ, মটর প্রভৃতিতে ভ্রমণ করিবেনা–এর চেয়েও সহজতর উপায়ে ভ্রমনের চেষ্টা করবে। আজ যেমন পল্লীর ডুলি, পাল্কী, রথ, হাতে টানা রিকশো, প্রভৃতি অতীতের বিস্মৃত সম্পদ জাতীয় চিত্রশালার সম্পদরূপে সংরক্ষিত হইতেছে। আর একদিনে তেমনি আজিকার রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ, বাষ্পীয় পোত, মটর, সাইকেল প্রভৃতি চিত্রশালার (Museum) সম্পদ হিসাবে পরিণত হইবে এমন মনে করা যায়। একদিন বুয়ালিয়া টাউনে ইংরেজদের আমদানীকৃত ফিটান গাড়ীর প্রচলন ছিল। উহার

যানবাহন

দ্বিতীয় সংস্করণে এখন রাজশাহীর আবিষ্কৃত এক্কাগাড়ী দেখিতেছি; আজ সেই এক্কাগাড়ীর পরিবর্তে-সাইকেল বা মটর রিকশো পাইলে এক্কাগাড়ীতে আর ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হয় না। এইভাবে ক্রমবিকাশের উন্নতির কথা বলা যায়।

আজ রাজশাহীতে স্থলপথে বাহনের প্রধান অবলম্বন রেলগাড়ী মটর, সাইকেল, স্কুটার, রিকশো; জলপথে নৌকা, লঞ্চ প্রভৃতি সহজতর বাহন। এতদব্যতীত রাজশাহীর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত পাবনার ইশ্বরদীতে উড়োজাহাজ ঘাটি হইতে রাজশাহীর সরকারী বে-সরকারী কর্মচারী ও ব্যবসায়ীরা রাজশাহী হইতে এদেশের বিভিন্ন স্থানে যথা–ঢাকা অথবা চট্টগ্রাম হইয়া ব্যবসা শিক্ষা প্রভৃতি বিবিধ কর্মপোলক্ষে দেশ দেশান্তরে গমনাগমন করিয়া থাকেন। সম্প্রতিকালে যান বাহনের আর একধাপ উন্নতি হইয়াছে। দ্রুত গমনের জন্য রাজশাহী শহরে হেলিকেপ্টার ঘাটি প্রতিষ্ঠার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আজাদী আমলের আগে রাজশাহীর বড় বড় নদীতে যাতায়াতের বাহন হিসাবে বাষ্প চালিত জাহাজ ও বড় বড় নৌকার ব্যবস্থা ছিল। বিশেষতঃ পদ্মা, মহানন্দা নদীতে বাষ্পচালিত জাহাজ যাতায়াত করিত। গোয়ালন্দ ঘাট হইতে রাজশাহী অতিক্রম করিয়া রাজমহল, দীঘা, পাটনা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করা যাইত। আজাদী উত্তর যুগে প্রতিবেশী দেশের সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং পদ্মার গতিপথ সব সময় একই স্থানে না থাকায় উভয় দেশের সীমান্ত অঞ্চল দিয়া গমনাগমন বাধা নিষেধ হেতু এই নদীদ্বয়ের বাষ্পীয় যানবাহন ব্যবস্থা ১৯৫২ সালেব দিকে একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তখন রাজশাহীতে পদ্মার তীরে বড়গাছি. প্রেমতলী, খরচাকা, বুয়ালিয়া, (রাজশাহী শহর) খোঁজাহাটি, সরদহ, চারঘাট, হাজরাহাটি, মিরগঞ্জ, আলাইপুর, কালিদাস খালি, লালপুর প্রভৃতি স্থানে জাহাজ ঘাট ছিল। এইসব স্থানে বৎসরের সকল ঋতুতে মালবাহী ও যাত্রীবাহী জাহাজ ও বড় বড় নৌকা ভিড়িত। মহানন্দার তীরে সুলতানগঞ্জ, নওয়াবগঞ্জ, চাঁপাই, মকরমপুর, ভোলাহাট ও মালদহ প্রভৃতি স্থানে প্রধানত: জাহাজ ঘাট ছিল।

রিভার্স-ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী (R S N Co.) এবং ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন ও রেলওয়ে কোম্পানী (J. G. N. Co. and R Co.) একযোগে পদ্মাতে লালগোলা ঘাট হইতে চারঘাট পর্য্যন্ত দৈনিক যাতায়াত করিত। বুয়ালিয়াতে অবস্থিত আর এক যুক্ত কোম্পানীর (J. Co) জাহাজ ইং ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত চারঘাট, দামক-দিয়া জলঙ্গী ও বেনগুড়ি পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। তখন রামপুর বুয়ালিয়ায় কলিকাতাগামী যাত্রীগণ পাকশীর বিপরীত দিকে সারা ব্রিজের সন্নিকট দামুকা-দিয়া ঘাটে অবতরন করিয়া রেলপথে কলিকাতা গমন করিত। ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতাগামী বুয়ালিয়ার যাত্রীদের এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। তারপর ১৯২৯ সালের আগষ্ট হইতে বুয়ালিয়ার কলিকাতাগামী যাত্রী রাজশাহীর রেলপথে আবদুলপুর হইয়া সারা ব্রীজ (১৯১৫ সালে উদ্ঘাটন) অতিক্রম করিয়া কলিকাতাভিমুখে গন্তব্যস্থলে গমনাগমন করিত। উক্ত দামুকাদিয়া ঘাট হইতে আর একটি জাহাজ পদ্মা, মহানন্দা বাহিয়া মালদহ পর্য্যন্ত দৈনিক যাতায়াত করিত। তারপর মালবাহী বৃহদাকার জাহাজ গোয়ালন্দ হইতে পাটনার সন্নিকট দীঘা পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। এই মালবাহী জাহাজ গোয়ালন্দ হইতে দীঘার পথে দ্বিতীয় দিনে বুয়ালিয়া ও গোদাগাড়ীতে ভিড়িত। তারপর দীঘা হইতে গোয়ালন্দের পথে

নরম দিনে লালগোলা ঘাট ও বুয়ালিয়া বন্দরে ভিড়িত; ফিরতিপথে চারঘাটে, কালীদাসখালী, রাজাপুর, বেনগুড়ি হইয়া গোয়ালনন্দ পৌঁছিত। বর্তমানে কেবল বর্ষার সময় পদ্মা ও মহানন্দা নদীতে রাজশাহীর সীমার মধ্যে যাত্রীবাহী লঞ্চ যাতায়াত করিয়া থাকে। ভরাগঙ্গায় কখন কখন বড় বড় মালবাহী জাহাজ গোয়ালন্দের দিক হইতে আসিয়া পণ্য দ্রব্য খরিদ করিয়া আবার চলিয়া যায়।

বর্তমানে রেলপথে জেলার বিশিষ্ট টাউন-বন্দরে গমনাগমন করা সহজতর হইয়াছে। জেলার সদর রেল ষ্টেশন হইতে পশ্চিমগামী রেলপথে আমনুরা হইয়া এক শাখা রহনপুর বন্দর পর্য্যন্ত গমন করিয়া নৌকা ও গো যানে দূর মফঃস্বলে ভ্রমন করা সুবিধাজনক। অপর দুইটির একটি নওয়াবগঞ্জ টাউনে আর একটি বাহিয়া গোদাগাড়ী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করা যায়। সদর হইতে পূর্ব ও উত্তরগামী রেলপথে আবদুলপুর হইয়া নাটোর অতিক্রম করিয়া শান্তাহার পর্য্যন্ত গমন করতঃ মটর বা রিকশো প্রভৃতি বাহনে নওগাঁ টাউনে যাওয়া যায়। তারপর নৌকা ও গো-যানে নওগাঁ মহকুমার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করা যায়। রাজশাহী জেলার পূর্বাঞ্চলে রাণীনগর রেল ষ্টেশন হইতে শান্তাহার জং, ছাতিনগ্রাম, তিলেকপুর ও আক্কেলপুর পর্য্যন্ত ৪০ মাইল রেলপথ রাজশাহীর সীমান্ত অঞ্চলে বগুড়া জেলার ভূমি অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে গমন করিয়াছে। পদ্মায় গোদাগাড়ীর নীচে চর জমিয়া গেলে ইং ১৯১৫ সালে গোদাগাড়ী হইতে কাটিহার পথের একটি শাখা বর্দ্ধিত করিয়া পদ্মার তীরে নয়া রেল-ষ্টেশন স্থাপিত হয়। অতঃপর উহার নামকরণ হয় গোদাগাড়ী ঘাট। তারপর যখন এই ঘাটের নীচেও চর পড়িতে থাকে; তখন ক্রমশঃ এই রেলপথ বড়গাছি ও প্রেমতলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। দেশ বিভাগের পর মুর্শিদাবাদের লালগোলা ঘাটের সহিত গোদাগাড়ীর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হইলে কিছুদিন পর এই রেলপথ উঠাইয়া লওয়া হয়। বর্তমানে গোদাগাড়ী-কাটিহার রেলপডথ গোদাগাড়ী হইতে রহনপুর পর্য্যন্ত কার্য্যকরী রহিয়াছে; কাটিহার ভারতভুক্ত হওয়ায় ভারত সীমান্তে রহনপুরের অদূরে উহার সংযোগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রেলপথ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রেলপথের মাধ্যমে রাজশাহী জেলার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য নূতন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু, যুদ্ধের শেষে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িলে এই নূতন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্ভবপর হয় নাই। উক্ত নূতন পরিকল্পনার একটি সার্ভে নকশায় তিনটি নূতন রেলপথের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। এই তিনটি প্রস্তাবের প্রথমটি (১) শান্তাহার হইতে রহনপুর পর্য্যন্ত। (২) আর অপর দুইটির একটি, যেটি আবদুলপুর হইতে রাজশাহী হইয়া আমনুরাতে 'কাটিহার– গোদাগাড়ী' পথ বর্তমানে বিস্তৃত আছে। কিন্তু, ইহার প্রথম প্রস্তাব ছিল নাটোর হইতে বুয়ালিয়া হইয়া গোদাগাড়ী পর্য্যন্ত। আর দ্বিতীয়টির প্রস্তাব ছিল ঈশ্বরদি হইতে বুয়ালিয়া হইয়া গোদাগাড়ী ২১ মাইলে অর্থাৎ বর্তমান নাচোল ষ্টেশনে গোদাগাড়ী কাটিহার পথে সংযুক্তকরণ ইত্যাদি। কাটিহার অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইলে সেখানকার নিপীড়িত জনগণ কর্তৃক 'আবদুলপুর–আমনূরা' পথটি নির্মিত হয়। ১৯২৯ সালে ইহাতে যাত্রীবাহী রেলগাড়ী চালু হয়*।

* রেল কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া এইসব তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

পাকিস্তান আমলে ১৯৬২ সালে পূর্ব্ব-পাকিস্তান রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রহনপুর হইতে শান্তাহার পর্য্যন্ত প্রায় ৭০ মাইল (ব্রোড গেজ) রেলপথের প্রস্তাব গৃহীত হইয়া উহার প্রয়োজনীয় সার্ভে প্রভৃতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

রাজশাহী জেলায় বাষ্পীয় পোত রেলপথ প্রবর্তিত হইবার পূর্বে জল ও স্থলপথে এই জেলার ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। তখনও জলপথে নৌকা, স্থলপথে গো-শকট প্রভৃতি ছিল। জেলার আভ্যন্তরীণ বড় বড় নদী যেমন পদ্মা, মহানন্দা, পুণর্ভবা, আত্রাই, বড়াল প্রভৃতি নদী প্রবহমান ছিল। রেলগাড়ী বাষ্পীয় পোত প্রভৃতি চালু হইবার পরও বর্তমান শতকের প্রথমের দিকেও এই ব্যবস্থা অপরিবর্তিত ছিল। এখন কেবল বর্ষার, সময় মটরলঞ্চ প্রভৃতি ছোট বাষ্পীয় পোত পদ্মা, মহানন্দা ও আত্রাই নদীতে চলিতে পারে। গ্রীষ্মের সময় ছোট ছোট নৌকা যাতায়াত করিয়া থাকে। মালবাহী বড় নৌকা চলিতে পারে না। এই সব নদী নালার গতির পরিবর্তন হওয়ার দরুণ নদীগুলির কোন কোন স্থানে চর সৃষ্টি হওয়ায় এমনতর দুরবস্থা ঘটিয়াছে। তখন কোশা নৌকাগুলি কেবল মাল বহন করিত। ডোঙ্গা, সরেঙ্গা ও ডিঙ্গি প্রভৃতি ছোট নৌকাগুলি মৎস্য শিকারের কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। পানসী প্রভৃতি ছই বিশিষ্ট নৌকাগুলি যাত্রী বাহনের কার্য্যে লাগিত। এখনও এই শ্রেণীর বিবিধ প্রকারের নৌকা রহিয়াছে। ভরা বর্ষার সময় নদীকূলে দাঁড়াইলে এইসব নৌকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

**বাজার-বন্দর :**

রাজশাহী জেলায় জনবসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের তাগিদে যুগে যুগে বাজার-বন্দর প্রভৃতির পত্তন হইয়াছে। কালের আবর্তন বিবর্তনে তাহার কতকগুলি এখনও জাগিয়া রহিয়াছে। এইসব বাজার-বন্দর নদী ও দীঘি-পুষ্করিণীর তীর কোথাও বা একাধিক নদীর মোহনা ধরিয়া স্থাপিত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। খাত পরিবর্তনের ফলে যে সব নদীর মৃত্যু ঘটিয়াছে– সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার বাজার-বন্দরগুলিরও মৃত্যু হইয়াছে। ঘুকশী বিলের চারিপার্শ্বের এই শ্রেণীর কয়েকটি প্রাচীন বাজারের স্মৃতি এখনও কালের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। আর কয়েকটির নাম আছে কিন্তু বাজার নাই। আর কয়েকটির নাম শোনা যায় কিন্তু, তাহার ভূমি বিল প্রান্তরে লয় হইয়া গিয়াছে। ধামৈরহাট ইংরেজ আমলের কীর্তি। নূতন নদীর তীরে নূতন বাজার-বন্দর সৃষ্টি হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নূতন নামের ও প্রবর্তন হইয়াছে। যুগে যুগে এমনিতর কত বাজার বসিয়াছে, কত বাজার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে–ইতিহাসে তাহার সবগুলির ধারাবাহিক তালিকা পাওয়া যায় না। এইসব হাট-বাজারের সহিত–কত নগর-বন্দর, কত সওদাগর, কত ধর্মযাজকের যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ধর্মযাজকদের আবির্ভাবে তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া বহু হাট-বাজার সৃষ্টি হইয়াছিল। রাজা-বাদশাহ্ ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষনায় কতকগুলি স্থাপিত হইয়াছিল, আর কতক সওদাগরদের বিশ্রাম স্থলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজশাহী শহরের 'রামপুর-বুয়ালিয়া' বন্দর এই শেষোক্ত শ্রেণীর বন্দর ছিল। সে কথা আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। জমিদারদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রতিষ্ঠিত হাট-বাজারগুলির কতক পতন হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে যে সব বাজার-বন্দর ও হাট রাজশাহী জেলার অতীতের

স্মৃতি বহন করিতেছে–এখানে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করিব।

(১) রামপুর-বুয়ালিয়া : শাহ্ মখদুম্ আউলিয়া ও ওলন্দাজদের কীর্তি*। এই প্রাচীন বন্দর আজ জেলা ও বিভাগীয় সদরে উন্নীত হইয়াছে।

(২) ফিরোজপুর : ফিরোজপুর তাহ্খানায় এখন কোন হাট-বাজার নাই। সুলতানী আমলে গৌড়ের এই উপশহরে একটি বিখ্যাত হাট ছিল। বর্তমানে ভারত সীমান্তে মহদীপুরের বাজার, ইংরেজ কোম্পানীর তুঁত চাষীদের স্মৃতি। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিনে কানষাট শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি স্মরণার্থে একটি অস্থায়ী মেলা বসে। ১৮৬৪ সালে অত্যধিক জনসমাবেশের ফলে কলেরা রোগে বিস্তর লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন হইতে উহার শ্রীভ্রষ্ট হইতে থাকে। তরতীপুরে ইংরেজ আমলের একটি নীল ও পাট কেনা বেচার বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল।

(৩)–নওয়াবগঞ্জ : প্রাচীন বাণিজ্য বন্দর। ইহা ইংরেজ আমলে ১৯০৩ সালে মিউনিসিপ্যাল টাউনে পরিণত হয়। বর্তমানে নওয়াবগঞ্জ মহকুমা সদরে উন্নীত হইয়াছে। ইহা মহানন্দার তীরে অবস্থিত।

(৪)–রহনপুর : পুনর্ভবার তীরে প্রাচীন বাণিজ্য-বন্দর ও বিখ্যাত হাট।

(৫)– ভোলা হাট : রেশমের প্রাচীন বন্দর। মহানন্দার তীরে অবস্থিত।

(৬)–রামচন্দ্রপুর হাট ঃ প্রাচীন গঙ্গার তীরে ইংরেজ আমলের রেশম ও নীল উৎপাদন কেন্দ্র ছিল। বর্তমানে একটি সাপ্তাহিক হাট বসে।

(৭)– গোমস্তাপুর : ইহা ইংরেজ আমলে স্থাপিত। মনাকষায় বিস্তর গরু, মহিষ আমদানী হইয়া থাকে। গঙ্গা, পদ্মা, মহানন্দার চর অঞ্চলে প্রায় নদীর তীর ঘেষিয়া ইহা অবস্থিত**।

(৮)–শিবগঞ্জ : প্রাচীন বাণিজ্য বন্দর। রেশম শিল্পের কারখানার জন্য বিখ্যাত ছিল। এখনও খ্যাতি আছে। ইহা প্রাচীন গঙ্গার তীরে অবস্থিত।

(৯)–শাহপাহাড় : প্রাচীন হাট। এখানে প্রচুর গরু মহিষ কেনা বেচা হয়। বিহারীরা স্থানান্তরে গমন করিয়াছে। পাকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত।

(১০)–শিবপুর ও আগ্রাদ্বিগুন হাট: আগ্রাদ্বিগুণ হাট হিন্দু শাসনামলের স্মৃতি। শিবপুরও প্রাচীন। পশ্বাদি বেচা কেনা হয়।

(১১)–মধৈইল: নূতন হাট।

(১২)– মাহিসন্তোষ, আমৈর ও যোগীঘোপা হাট বা বন্দর এখন নাই। ইহার অদূরে বাজার বসে।

(১৩)–রাঙ্গামাটি : প্রাচীন হাট। আগের সমৃদ্ধি এখন আব নাই। এখানে একপ্রকার সাদা মাটি পাওয়া যায়।

(১৪)–চন্দনপুব : হাট নাই। তবে নাম আছে। প্রাচীন আত্রাই তীবে স্থিত।

(১৫)–পত্নীতলা ও নাজিবপুর: প্রাচীন বন্দর। মোঘল আমলেব স্মৃতি। আত্রায়ের তীরে।

---

* বাজশাহীব ইতিহাস প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

** দেশ বিভাগেব পর যে বিষয়টি পাকিস্তানেব সব চেয়ে বেশী ক্ষতি করিয়াছে এবং দেশেব পক্ষে যাহা সেরা দুষমন তাহা হইল দুর্নীতি। এই দুর্নীতির জন্যে নাকি মনাকষা ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল কুখ্যাত ছিল। নওয়াবগঞ্জ কোর্টে ইহার সমসাময়িক প্রমাণাদি পাওয়া যাইতে পারে।

(১৬)–মাতাজী : বিখ্যাত হাট। মোগল শাসনামলের কীর্তি। রাজশাহী জেলার মধ্যে গরু-মহিষ প্রভৃতি কেনা বেচার জন্য এত বড় হাট আর নাই। ইংরেজ আমলে ইহা খুবই সমৃদ্ধ ছিল।

(১৭)– বদলগাছি : ইংরেজ আমলের বাজার। কাটা যমুনার তীরে।

(১৮)– গবরচাপা : প্রাচীন হাট।

(১৯)– দ্বীপগঞ্জ : অতি প্রাচীন বাজার।

(২০) মঙ্গলবাড়ী : প্রাচীন হাট। শ্রী (চিরি) নদীর অদূরে অবস্থিত। ঐতিহাসিক স্থান।

(২১)– ভাণ্ডার পুর : প্রাচীন বন্দর। এখন হাট বসে। মরা নূরনদীর তীরে অবস্থিত।

(২২)– মহাদেবপুর ও প্রসাদপুর : প্রাচীন বন্দর। বর্তমানে হাট বসে। আত্রায়ের তীরে অবস্থিত।

(২৩)– পাঠাকাটা : আধুনিক হাট। আত্রায়ের তীরে।

(২৪)– নওগাঁ-সুলতালপুর : ইংরেজ রেশম ব্যবসায়ীদের কীর্তি। কাটা যমুনার তীরে অবস্থিত।

(২৫)– আহছানগঞ্জ : আধুনিক হাট। মোল্লা পরিবারের কীর্তি। আত্রাই নদীর অদূরে স্থিত।

(২৬) কালীগঞ্জ : প্রাচীন বন্দর। নাগরের তীরে অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে পতিসর।

(২৭)– আছিন ঘাট : অতি প্রাচীন বন্দর। এখন ক্ষুদ্র বাজার বসে। বারনই নদীর তীরে।

(২৮)– মোহনগঞ্জ : একডালিয়া ও ব্রহ্মপুর নদী বন্দর। এখন হাট বসে। বারানই নদীর তীরে অবস্থিত।

(২৯)– তাহিরপুর : অতি প্রাচীন হাট। নদী বন্দর। তাহিরপুর রাজাদের কীর্তি। বারানই নদীর তীরে অবস্থিত।

(৩০)– সাধনপুর ও নলহাটি : আধুনিক বাজার। বারানই তীরে অবস্থিত।

(৩১)– আত্রাই : প্রাচীন নদী বন্দর। পাটের বিখ্যাত আড়ত আছে। কয়েকটি ধানভানা মিল ও গুদাম আছে।

(৩২)– চৌবাড়িয়া : প্রাচীন বাজার। জমিদারদের কীর্তি।

(৩৩)– সিংড়া : প্রাচীন বাজার।

(৩৪)– কলম : চলনের মাছ ও পাখী কেনা বেচার প্রাচীন বাজার।

(৩৫)– দিঘাপতিয়া : রাজার বাজার। দিঘাপতিয়া রাজের কীর্তি।

(৩৬)– চাপিলা : প্রাচীন বাজার। এখন অচরাবস্থা। নওয়াবী কীর্তি।

(৩৭)– নন্দকুজা : নদী বন্দর। ইংরেজ রেশম কুঠিয়ালদের স্মৃতি। বড়ল নদীর তীরে অবস্থিত।

(৩৮)– তে-বাড়িয়া : প্রাচীন হাট। নাটোর রাজাদের কীর্তি। এখানে প্রচুর পরিমানে বাজারজাত পণ্যদ্রব্য কেনাবেচা হয়। বিস্তর গরু মহিষ ও মুরগী পাওয়া যায়। নারোদের তীরে অবস্থিত।

(৩৯)– গোপালপুর : আধুনিক প্রসিদ্ধ হাট।

(৪০)– লালপুর ও বিলমাড়িয়া : প্রাচীন হাট ও বাজার। ইংরেজ কুঠিয়ালদের স্মৃতি।

(৪১)–বাঘা : প্রাচীন হাট। পদ্মার অদূরে অবস্থিত। সুলতানী আমলের স্মারক স্মৃতি।

(৪২)–আরাণী ও চারঘাট : বড়ল নদীর তীরে অবস্থিত। প্রাচীন নদী বন্দর। খেজুরের গুড় ও হলুদ কেনা বেচার জন্য প্রসিদ্ধ।

(৪৩)– বানেশ্বর : প্রাচীন হাট। বিস্তর পশ্বাদি কেনা- বেচা হয়। কলা আমদানীর জন্যও প্রসিদ্ধ।

(৪৪)–নওহাটা ও বায়া : অতি প্রাচীন হাট। বারানই তীরে ইহার অবস্থান। বায়ার নিকট নদী মরিয়া যাওয়ায় নওহাটা হাটের সৃষ্টি ও অধুনা সমৃদ্ধ।

(৪৫)–কাঁকন হাট : প্রাচীন হাট। প্রচুর ধান্য কেনা বেচা হয়।

(৪৬)–আমনুরা, নাচোল, মুণ্ডুমালা ও রাজবাড়ী : প্রাচীন হাট। এই হাট চতুষ্টয়ে প্রচুর চাউল ধান আমদানী হইয়া থাকে।

(৪৭)– গোদাগাড়ী : প্রাচীন হাট। মহানন্দার তীরে অবস্থিত।

(৪৮)– সুলতানগঞ্জ : এক সময় সুলতান সাহেবকে কেন্দ্র করিয়া সুলতানগঞ্জ বাজার গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখন বাৎসরিক মেলা হয়। নওয়াব আলীবর্দী খান এই গঞ্জ স্থাপন করিয়াছিলেন...বলিয়া জনশ্রুতি আছে। সুলথান পীরের নামানুসারে ইহার "সুলতানগঞ্জ" নাম হইয়াছে।

(৪৯)–ঝলমলিয়া ও পুঁঠিয়া বাজার : জমিদারদের কীর্তি।

(৫০) চাঁচকৈড়, নাজিরপুর ও কাছিকাটা : এই হাটত্রয় ইংরেজ আমলের বিখ্যাত বাণিজ্য বন্দর। এখনও ইহার প্রসিদ্ধি আছে।

এতদব্যতীত রাজশাহী জেলায় আরও ছোট ছোট বহু হাট-বাজার ও নদী বন্দর আছে। স্থানাভাবে সেই সবের উল্লেখ করা সম্ভবপর হইল না।

দৈনিক বাজারের মধ্যে–ইংরেজ আমলের রামপুর-বুয়ালিয়া, নাটোর, সরদহ্, চারঘাট, পুঁটিয়া, দিঘাপতিয়া, হাতিয়ানদহ, কলম, নওগাঁ, নওয়াবগঞ্জ, কানষাট ও ভোলাহাট প্রভৃতির নাম অবগত হওয়া যায়।

**গ্রাম ও শহর :**

এখানে একাধিক নদী- মোহনার চর অধ্যুষিত একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে বিখ্যাত হজরত শাহ্ মখদুম্ আউলিয়া আসিয়া আস্তানা করেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া কালে সমৃদ্ধ জনপদ গড়িয়া উঠে। পরে, ওলন্দাজ ও ইংরেজগণের আনাগোনা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে স্থানটি পূর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিলে ইহার নানাভাবে সংস্কার সাধন হয়। তারপর ১৮২৫ সালে নাটোর হইতে রাজশাহী জেলার সদর স্থানান্তরিত হইলে স্থানটি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। ১৮৫০ সালে বুয়ালিয়ার অদূরে শ্রীরামপুর অবস্থিত জেলার সদর পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইলে কোর্ট-কাচারী বর্তমান বুলনপরে স্থানান্তরিত হয়। পরে শ্রীরামপুর বুয়ালিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া "রামপুর-বুয়ালিয়া" নামকরণ হয়।

তারপর মিউনিসিপ্যালিটি ও বিভাগীয় সদর-দপ্তর, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রাজা-জমিদারের কুঠি ইত্যাদি স্থাপিত হইয়া স্থানটির আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এইভাবে ক্রমশ: গ্রাম হইতে টাউন তারপর টাউন হইতে শহরে উন্নীত হয়। পাকিস্তান আমলে ইহার প্রভূত ক্রম উন্নতি ঘটিয়াছে। অত্র ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বর্তমানে পদ্মার বাম ক্রোড়ে অর্থাৎ উত্তর তীরে ইহা অবস্থিত[৭২]।

বর্তমানে নাটোর টাউন যে স্থানে অবস্থিত পূর্বে সেখানে চন্দ্রাবতীর বিল ছিল। আবার ইহাও কথিত হয় যে, "ছাইভাঙ্গা বিলের মধ্যে নাটোরের রাজবাড়ী স্থাপিত। এই নাটোরের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া এক সময় পদ্মার প্রধানতম স্রোত প্রবাহিত হইত। সে কথা আমরা নদীর ইতিহাসে আলোচনা করিয়াছি। যাহা হউক, নাটোরের রাজা নওয়াবী কৃপায় বাঙ্লা ১১১৩ সালে জমিদার লাভ করিলে লস্করপুর পরগণার তরফ কানাই খালি মৌজায় বর্তমান স্থানে রাজস্ব আদায় কাচারী ও বসতবাটী স্থাপন করেন। পরে এই রাজবাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া নাটোর টাউন গড়িয়া উঠে। অতঃপর তাহা রাজশাহী রাজ্যের শাসনকেন্দ্র উন্নীত হয় এবং ১৭৯৩ হইতে ১৮২৫ সাল পর্য্যন্ত রাজশাহী জেলার সদর সেখানেই স্থাপিত ছিল। ১৮২৯ সালে নাটোর স্বতন্ত্র মহকুমা গঠিত হয়।

মুর্শিদাবাদে বাঙ্লার রাজধানী থাকা কালে নাটোরের যাবতীয় যোগাযোগ মুর্শিদাবাদে চলিত। তারপর রাজধানী কলিকাতা স্থানান্তরিত হইলে নাটোরের জমিদারী সংক্রান্ত সমুদয় বিষয়াদি কলিকাতায় সম্পাদিত হইত। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে নাটোর রাজ-পরিবারের একটি বাড়ী কলিকাতায় স্থাপিত হয় তখন হইতে নাটোরের রাজপরিবারের পরিজনবর্গ সকলেই কলিকাতায় চলিয়া যান। তিথি-পরবে আমোদ প্রমোদের জন্য সময়ে সময়ে তাহারা নাটোরে আসিতেন। কর্মচারীবৃন্দ জমিদারী সংক্রান্ত সকল কার্য্য নাটোরে সম্পাদন করিতে। রাজার নাটোর ত্যাগ করিলে কর্মচারীদের মধ্যে নানা কুসংস্কারের তাণ্ডবলীলা দ্বিগুন বর্দ্ধিত হয় এবং সামাজিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। রাজাদের আমদানী করা বাইজী পতিতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া নাটোর টাউন উত্তরবঙ্গের একটি কুখ্যাত স্থানে পরিণত হয়। তখন পতিতাদের বিশেষ বাধা নিষেধ না থাকায় রাজবাড়ীর চারিধারে ও সমৃদ্ধ পল্লীগুলি বেশ্যালয়ে পরিণত হয়। এমনও শোনা যায় যে, মদমত্ততায় উন্মত্ত হইয়া লম্পটরা অনেক সময় ভদ্র ঘরেও হানা দিত। জোর জবরদস্তি করিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরেও ব্যভিচারী করিত। আরও শোনা যায়, তখন নাটোবের জন সংখ্যার অনুপাতে শতকরা ৩- জন বেশ্যা ছিল। তখন চোর-জুয়াচোর গুণ্ডা লম্পটদেরও সংখ্যা নগণ্য ছিল না। নাটোরের এইরূপ অবনতি এই বিভাগ পূর্বকালেও অপরিবর্তিত ছিল। জোয়ারীর বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী প্রমথ নাথ বিশি নাটোরের এইরূপ বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, "নরক দেখি নাই, নাটোর দেখিলাম।" ইহাতে সহজেই অনুমিত হয় যে, তখনকার নাটোরের অবস্থা কেমনতব ছিল। তখন জমিদারদের মধ্যে গণিকালয় লইয়া প্রতিযোগিতা চলিত। প্রত্যেক হিন্দু জমিদারদের আশ্রয়ে বেশ্যা থাকিত। রাজবাড়ীর চারিধারে তাহাদের জায়গা দেওয়া হইত। দিঘাপতিয়া রাজের "কেলি পুকুর (বা দীঘি কুখ্যাত। এই পুকুর দিঘাপতিয়া ও নাটোর রাস্তার মধ্যপথে অবস্থিত। তখন ইহার চারিধারে ফুলবাগান ও প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এখন কেবলমাত্র পুকুরটি তাহার স্বাক্ষর দিতেছে। এখানে

৭২. রাজশাহীর ইতিহাস প্রথম খণ্ডে ইহার ঐতিহাসিক পটভূমি দ্রষ্টব্য।

স্থানীয় বড় বড় জমিদারগণ ষোড়শীদের আনিয়া উলঙ্গ অবস্থায় পুকুরে "কেলি" করিত। বসন চুরি হইত। আরও কত কি! নাটোর রাস্তা ঝলমলিয়াতেও এমন একটি কুখ্যাত আড্ডা ছিল। পুঁঠিয়াতে কেলি পুকুরের কথা সর্বজনবিদিত। এখনও তাহার নির্দশন বর্তমান আছে তবে তাহাদের এখন দুর্দ্দিন; কুলি মজুরদের আড্ডাস্থল। মোটকথা রাজশাহীর সকল জমিদার বাটি ও হাট-বাজারে তখন বেশ্যালয় ছিল। নাটোর ছোট তরফের রাজা লাখনোও এলাহাবাদ হইতে যে সব বাইজী আমদানী করিয়াছিলেন, তাহাদিগকেও নৃত্য ও ব্যভিচার কার্য্যে ব্যবহার করা হইত। শোনা যায়, রাজা প্রমাদানাথ রায়ের সময়ে দীঘাপতিয়া রাজ নাটোরকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল। রাজ বাড়ীতে ষোড়শীদের উলঙ্গ চিত্রগুলি উহার চরম নিদর্শন। যাহাহউক, সুখের বিষয় এই যে, বিভাগোত্তর কালে স্বনাম খ্যাত জনাব পি, এ, নাজির নাটোরে এস, ডি, ও, থাকাকালে এখানকার বেশ্যালয়ের উচ্ছেদ হইয়া স্থানান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে, এখনও যেন প্রচ্ছন্নভাবে উহার বীজ রহিয়া গিয়াছে। রাণী ভবাণীর যুগে নাটোরের এতটা অধঃপতন ঘটিয়াছিল কি না তাহা জানা যায় না।

বিভাগোত্তরকালে পূজা পার্বনের নাটোর যেমন ঢাকা-ঢোল, খোল-করতাল কাঁশির বাদ্যে মুখরিত থাকিত, যাত্রীদের আনাগোনা চলিত; নাটোরের মহর্রম পর্বেও ঠিক এমনিতর আনন্দ উৎস হইত। এই মহরর্ম পর্ব নওয়াবী আমল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। নওয়াব দিগকে খুসী রাখিবার জন্য নাটোর-রাজ রাজ বাড়ীর চারিধারে ১২টিরও অধিক দরগা স্থাপিত করিয়া লাখেরাজ নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। মুসলমান দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন হইত। নাটোরে মহর্রমের দরগাগুলির কোন কোনটিতে এখনও সন্ধ্যা দেওয়ার রীতি আছে। কানাইখালি মৌজাতে ইষ্টক নির্মিত গগনচুম্বী গওয়ারাদির ধ্বংস স্তূপ এখনও কালের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। এই দরগাগুলি বুড়ামাদারের দরগা, গাড়ীখানা দরগা, ময়দা পট্টী দরগা, ন্যাঙ্গ শোয়ারের বা কোতোয়ালী দরগা, কানাইখালি দরগা ইত্যাদি নামে পরিচিত। কোতোয়ালী দরগা এখন মসজিদে রূপান্তরিত। এখানে আগে ইমাম বাড়ী ছিল। ১২৯২ সালের ভূমিকম্পে ইহা ভাঙ্গিয়া পড়িলে এই স্থানে ১৬টি দরজা বিশিষ্ট একটি মসজদি স্থাপিত হয়। তাহাতের এক সারি লোক নামাজ পড়িতে পারিত। সবেকদর ও অন্যান্য তিথি-পরব ও মর্হরমে ইমাম বাড়ীতে নানা রঙ্গেব আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হইত। মহর্রমে আর একটি বিষয় সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাহা মহর্রমের ৫ই তারিখ হইতে নাটোর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বেশ্যারা মাথায় তেল ব্যবহার করিত না। কালো পোষাক পরিহিত এলোকেশী পতিতারা রাস্তায় রাস্তায় মাতম করিয়া বেড়াইত। মরচিয়া হইত। মুহর্রমের ১০ই পর্য্যন্ত তাহারা পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিত। সেই সময় কোন ব্যভিচারীকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। মাছ স্পর্শ করিত না। আতপ চাউল খাইল। রাজার শোভাযাত্রার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়া চলিত। ১০ই তারিখ কারবালা পর্য্যন্ত তাহারা এইরূপ রীতিনীতি পালন করিয়া চলিত। কোতোয়ালী দরগা এক সময় যে ইমামবাড়ী ছিল তাহার নমুনা স্বরূপ আমরা ১৯৫৯ সালে কয়েকটি টিনের পাঞ্জা, শালু কাপড় ও ৫/৬টি ভাঙ্গা তরবারী-চাকু প্রভৃতি উক্ত স্থানে কবর সন্দেহে খনন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছি। এখন এই স্থান ফকিরের আস্তানায় পরিণত হইয়াছে। নাটোরের রাজাদের মহর্রমের দরগাগুলি কতকটা মন্দিরের আকৃতি। যাহা হউক, এত কিছু অমানুষিক ব্যভিচার লাম্পট্যাগিরির আড্ডাস্থল থাকা সত্ত্বেও নাটোরের রাজাও রাণী ভবানীর নানা পুণ্যকীর্তির জন্য নাটোর বিখ্যাত। বর্তমানে নাটোর

রাজের পূর্বশ্রী আর নাই। কেবলমাত্রা রাজবাড়ী ও হর্ম্যরাশির ধ্বংসাবশেষ কালের সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। বহু অমূল্য জিনিস-পত্র ও নওয়াবী আমলের দলিল দস্তাবেজ, হাল-হাতিয়ার কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে*। বিভাগোওর কালে যাহা অবশিষ্ট ছিল তথাকথিত পাত্রমিত্র ও কতিপয় স্থানীয় কর্মচারীদের হস্ত স্পর্শে তাহাও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এখনও রাজবাড়ীর বির্শিষ্ট ও ভগ্ন ইমারতগুলির হুকুম দখল করিয়া সরকারী বেসরকারী কার্য্যের জন্য ব্যবহার করা হইতেছে। তবুও এই নাটোর রাজ্যের দৌলতে রাজশাহী বাসী গৌরবন্বিত। এখনও দৈনিক শত শত যাত্রী নাটোর ভ্রমণ করিয়া থাকে। সম্প্রতি কালে নাটোর রাজের পারিবারিক মিউজিয়ামটি তাহার মূল ইমারত হইতে স্থানান্তরিত করিয়া বহু দুস্প্রাপ জিনিষ পত্র নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। কামানগুলি সরাইয়া নাটোর ষ্টেশনের সন্নিকট জিন্নাহ স্মৃতি সৌধের পার্শ্বে রক্ষী স্বরূপ রাখা হইয়াছে। তবুও নাটোর তাহার অতীতের ঐতিহ্যের জন্য গর্বিত ও বিখ্যাত।

দেশী সম্পদ কেনা-বেচার জন্য একদিন নাটোরের আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল। রাজশাহীর ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা নাটোরের কথা প্রসঙ্গত: উল্লেখ করিয়াছি[৭৩]।

নাটোরের নটী বিখ্যাত। এই নটী পাড়া নট-নটী হইতে নাটোর নামের উৎপত্তি। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের আমলে নাটোরে ইংরেজী ও বাঙলা ভাষা শিক্ষার নিমিত্তে বিদ্যালয়াদির সূত্রপাত হইয়াছিল। তৎপূর্বে আধুনিক শিক্ষার কোন উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না। অবশ্য নাটোরে আধুনিক শিক্ষার বিদ্যালয়ের সূত্রপাত করিয়াছিলেন চৌধুরী পরিবারের আবদুর রশিদ খান।

নাটোরের অধিবাসীদের মধ্যে টাউনের অধিক সংখ্যক ব্যবসয়ী পাবনা নিবাসী। এখানকার ক্যাপেড় পট্টি, ব্যাসনা পট্টি ও স্বর্ণকার পট্টির বেশীরভাগ লোক পাবনার অধিবাসী। ইহারা এখানকার প্রাচীন ব্যবসায়ী। বিভাগপূর্ব কালে নাটোরে মুসলমান রীতিনীতি হিন্দুরা বরদাস্ত করিতে পারিত না। সেইজন্য অধিকাংশ মুসলমান পরিবারে হিন্দু রীতি নীতি পূর্ণ মাত্রায় ছিল। নাটোরে হিন্দু পূজা পার্বনে মুসলমানদের ভীড় আগেও ছিল এখনও আছে। চৌধুরী ও কাজী পরিবার স্বীয় স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়া চলিত বলিয়াই, মনে হয় সাধারণ মুসলমানরা তখন বিপথগামী হইতে পারে নাই। নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকিয়াও, তাহারা ঈদে-চান্দে স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের পরিচয় দিত। বিভাগোত্তরকালে নাটোরের মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে। সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমানগণ আগাইয়া আসিয়াছে। রাজনীতি-সমাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই মুসলমানদের প্রাধান্য হইয়াছে। নাটোরের আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সে অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনসেবা ও ধর্মীয়, সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। ঢাকাগামী পথটি নাটোর অতিক্রম করিয়াছে। নাটোর এখন নটির জন্য কুখ্যাত নয়, একটি মুসলমান প্রধান টাউন হিসাবে

---

* কুমার জয়ন্তর সহিত কলিকাতায় যোগাযোগ স্থাপন করিয়া বিষয়টি সত্যতা সম্পর্কে অবগত হইয়াছি।

৭৩. Vide, Hunter's Statistical Account of Bengal, Rajshahi; The fifth report, Imperial Gazetteer; Eastern Bengal and Assam, Rajas of Rajshahi, Calcutta review, A hand book of Sericalture; Monograph on the Silk Fabrics of Bengal; The Modern History the India Chiefs Rajas and Zamınders, Part II, Riyausu s-Salatın. মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও Rajshahi Gazetteer প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

গড়িয়া উঠিতেছে। 'নওয়াব সিরাজুদ্দৌলা ডিগ্রী কলেজ' নাটোরের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। একাধিক উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, মক্তব, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, পার্ক, খেলার ময়দান, পাবলিক লাইব্রেরী, ক্লাব, বাহাদুর শাহ্ ও জিন্নাহ্ স্মৃতিস্তম্ভ* প্রভৃতি অনুষ্ঠান নাটোর বাসীর শিক্ষা প্রীতির পরিচায়ক। ১৮৮৪ সালে ১৮ জন (৯ জন মনোনীত ও ৯ জন নির্বাচিত) কমিশনার লইয়া নাটোর মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। মৌলবী ফজলার রহমান খান চৌধুরী অন্যতম ও ১নং সদস্য ছিলেন। নাটোরের বর্তমান মহকুমা-হাকিমের আফিস রাজশাহী জেলায় সর্বপ্রাচীন সরকারী ইমারত। ১৭৯৫ সালে ইহা বিনির্মিত। পূর্বে এই ইমারতের কয়েকটি কামরা সার্কিট হাউসের কার্য্যে ব্যবহার হইত। ১৭৮৮ সালে ইংরেজ কোম্পানী এই নাটোরকে জেলার সদর মনোনীত করিয়াছিলেন। নাটোর নিম্নভূমি এবং প্রধানত: জল নিকাশের অব্যবস্থা ও বিশুদ্ধ জলের অভাবের দরুণ নাটোর অস্বাস্থ্যকর হয়। ফলে ১৮২৫ সালে জেলার সদর 'রামপুর বুয়ালিয়াতে' স্থানান্তরিত হয়। নাটোরের লালদীঘি একটি বিল ছিল। সম্ভবত: ইহাই চন্দ্রাবতী অথবা ছাইভাঙ্গার বিল। কথিত আছে যে, নাটোর রাজবাড়ী নির্মাণের জন্য লালদীঘি খনন করা হইয়াছিল। বিগত একটি বিবরণে অবগত হওয়া যায় যে, রাজা রামজীবন রাজবাড়ী স্থাপন করিয়া রাজবাড়ীর চারিধারে একটি চৌকি খনন করেন। উহাই এখন জয়সাগর নামে পরিচিত।

নাটোর মিউনিসিপ্যাল কমিটির বর্তমান আয়তন ২১/২ বর্গমাইল। ১৯৬১ সালের জনসংখ্যা ১৩,৩,৫১ জন। জনাব খোরশেদ আলম খান চৌধুরী ইহার বর্তমান চেয়ারম্যান। দুইটি সাধারণ দৈনিক বাজার এবং নীচে ও উপর বাজার নামে তাহা পরিচিত। নাটোরের প্রাচীনত্ব নওয়াব মুর্শিদ কুলি খাঁর আমল হইতে ধরা যাইতে পারে। নওয়াব আলীবর্দ্দী খাঁর আমলে বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে মুর্শিদাবাদ হইতে বহু সংখ্যক মুসলমান এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন মুসলমানদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার উন্নতি ছিল। ধর্মীয় কার্য্যাদি সম্পাদনের জন্য বহু মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। এখনও সেই সব মসজিদের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন পল্লীগুলিতে দৃষ্ট হয়। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে আসিয়া মুসলমানরা তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার অসচ্ছলতার দরুণ স্বীয় স্বাতন্ত্র হারাইয়া নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল।

দিঘাপতিয়া জমিদার নানাবিধ পুণ্য কীর্তির জন্য বিখ্যাত। দিঘাপতিয়া ও রাজশাহী শহরের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির প্রতিষ্ঠার মূলে দিঘাপতিয়া রাজার দান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। দিঘাপতিয়া রাজবাড়ী রাজশাহীর একটি উল্লেখযোগ্য

দিঘাপতিয়া

দ্রষ্টব্যস্থান। এখানে প্রাচীন শিল্পের বহু নিদর্শন ও বহু দুষ্প্রাপ্য বইপুস্তক রক্ষিত আছে। সম্প্রতিকালে এই রাজবাড়ীর বহু মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য জিনিষ পত্র নাকি উধাও হইয়া গিয়াছে। এখানে দৈনিক বহু যাত্রীর আনাগোনা হইয়া থাকে। ইহার রক্ষনা- বেক্ষনের জন্য স্থানীয় একটি শুভেচ্ছা সমিতি থাকিলে কালের স্বাক্ষর হিসাবে বহুকাল ইহা জীবিত থাকিবে। নাটোর হইতে প্রায় আড়াই মাইল উত্তরে ইহা অবস্থিত[৭৪]। দিঘাপতিয়ার নিকট দিয়া এক সময় প্রবহমান নদী ছিল। এখন তাহা মরিয়া গিয়াছে।

---

* বাহাদুর শাহ্ ও জিন্নাহ্ স্মৃতি সৌধ রাজশাহীর পূর্বতন ডি, সি, জনাব নাজিবের কর্ম প্রচেষ্টার অবদান। জেলা কাউন্সিলের অর্থে ইহা নির্মিত।

৭৪. Vide, Statistical Account of Bengal, Rajshahi and Rajshahi District Gazetteer and also Vide 'দিঘাপতিয়া রাজবংশ'।

ইহা মালঞ্চী রেল ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরে বরল নদীর তীরে অবস্থিত। দয়রাম-পুর দিঘাপতিয়া রাজের "ছোটতরফ" বলিয়া পরিচিত। রাজশাহী মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত কুমার শরৎ কুমার ও বসন্ত কুমার রায় প্রমুখ তিন সহোদর এখানে বাস করিতেন। ইহাও একটি সুশোভিত রাজ-প্রসাদ। এই রাজ প্রাসাদের নিজস্ব লাইব্রেরীতে বহু দুষ্প্রাপ্য জিনিষ-পত্র ও বই পুস্তক আছে। তাহা ঠিক ভাবে পরিচালিত না হওয়ার দরুণ কতিপয় স্বার্থপর শিক্ষিত লোকের কোপে পড়িয়াছে। এ ব্যাপারে জেলা কর্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া উচিৎ।

দয়রামপুব

রাজশাহীর পূর্ব-সীমান্তে অবস্থিত গুরুদাসপুর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। বিল চলনের দস্যুবৃত্তি নিবারণ কল্পে ১৯১৭ সালে গুরুদাসপুর থানা স্থাপিত হয়। এখানকার 'গুরুদাসপুর থানা শিক্ষা সঙ্ঘ" একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এই সঙ্ঘের বদৌলতে এতদঞ্চলে বহু জনহিত কর কার্য্য সম্পাদন হইতেছে। সঙ্ঘের মুখপত্র স্বরূপ 'অভিযান' নামক একটি বার্ষিকী গত কয়েক বৎসর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। স্থানীয় সমাজ কর্মী অধ্যাপক আবদুল হামিদ প্রমুখ এই সঙ্ঘের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা। এই সঙ্ঘের একটি নিজস্ব ইমারত ও লাইব্রেরী প্রভৃতি আছে। ইহা গুমানীর তীরে স্থিত। প্রাচীন বিবরণে ইহার উল্লেখ আছে[৭৫]। গুরুদাসপুরের অদূরে চাঁচকৈইর ও নাজিরপুব গ্রামদ্বয় বিখ্যাত ও মুসলমান প্রধান। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম ও বাণিজ্য কেন্দ্র।

গুরুদাসপুব

প্রাচীন বাণিজ্য বন্দর। এখানে প্রচুর পরিমাণে পাট আমদানী ও রফতানী হয়। কতকগুলি সরকারী গুদাম আছে। আত্রায়ের খাদি প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা আন্দোলন যুগের একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এখানে মহাত্মা গান্ধী, সুভাস বোস, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখ মণীষীবৃন্দ শুভাগমন করিয়াছিলেন। আত্রায়ের অদূরে নদীর দক্ষিণ তীরে পাচুপুরে পুলিশ থানা স্থাপিত ছিল। উত্তরবঙ্গ রেলওয়ে এই আত্রাই নদী অতিক্রম করিয়াছে এবং এখানে রেলওয়ে ষ্টেশনটি প্রাচীন[৭৬]।

আত্রাই

নদী বন্দর হিসাবে নওগাঁ টাউনের সৃষ্টি। কুমারখালি স্থিত 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' অধীনে ১৭৮২ সালে নওগাঁতে কোম্পানীর একটি রেশম ও নীলকুঠি স্থাপিত হয়। উত্তর-বঙ্গ রেলওয়ে সুলতানপুর (পরে শান্তাহার জংশন) অতিক্রম করিলে নওগাঁর উন্নতি হইতে থাকে। ধীরে ধীরে বিত্তশালীলোক ও বিভিন্ন জেলার সওদাগর, ব্যবসায়ীরা বসতি বিস্তার করিতে থাকিলে নওগাঁর উত্তরোত্তর ক্রম উন্নতি বৃদ্ধি পায়। তারপর নওগাঁতে গাঁজার চাষ আমদানী হইলে নওগাঁর কথা সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমশ: এই গাঁজার চাষই নওগাঁও সমৃদ্ধির মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই গাঁজাই নওগাঁর শ্রীসমৃদ্ধির মূলে সর্বোতভাবে সাহায্য করে। এখানকার শিল্প প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, লাইব্রেরী ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি গাঁজার ব-বদৌলতে সৃষ্টি হইয়া গড়িয়া উঠে; একটি ক্ষুদ্র পল্লী হইতে টাউনে পরিণত হয়। নওগাঁ আজ কেবল মহকুমা শহর হিসাবেই নয়, উত্তরবঙ্গের মধ্যে একটি উন্নত শ্রেণীর বাণিজ্য বন্দর।

নওগাঁ

৭৫. Vide, Rajshahi District Gazetteer.

৭৬. Vide, Statistical account of Bengal, Rajshahi

১৯২৩ সালের আগে ফেরীর নৌকার সাহায্যে নওগাঁর এপার ওপার যাতায়াত করিতে হইত। মহকুমা শহরে উন্নীত হইবার পর নওগাঁতে প্রথমত: মুনসেফ কোর্ট, সাব-রেজিষ্টার অফিস, কেডি হাই স্কুল ও একটি বালিকা বিদ্যালয়, সংস্কৃত টোল ও একটি ডাক বাংলো, দাতব্য চিকিৎসালয় (তুলসী গঙ্গা নদীর পূর্বপারে চকরামপুরে) প্রভৃতি স্থাপিত ছিল। কিন্তু এখনও গাঁজার তাপ-নিয়ন্ত্রণ গুদাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

নওগাঁর চারিপার্শ্বে একসময় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাট, আখ ও বাঁশ জন্মিত। গাঁজার চাষ আমদানী হওয়াতে আখের চাষ কমিতে থাকে। ধীরে ধীরে নওগাঁর বিখ্যাত বাঁশের ঝাড়ও কমিয়া যাইতেছে। নীল ও রেশম বহুদিন আগেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আখ চাষ এখন নাই বলিলেই চলে।

নওগাঁও জন বসতির মধ্যে পার-নওগাঁতে প্রাচীন মুসলমান বসতি ছিল। এবং ইহাই নওগাঁর আদি স্থান। যদিও কুঠিয়ালরা বর্তমান কাচারী প্রাঙ্গনে অবস্থান করিতেন। বগুড়া- রোড-ডিভিশনের বিশেষ সহকারী ইঞ্জিনিয়ার নওগাঁতে অবস্থান করিতেন বলিয়া বোধ হয়। নওগাঁ টাউনের পশ্চিমধারে মহাদেবপুর রাস্তার পার্শ্বে তাহার সমাধি আছে*। বর্তমান টাউনের পাঠান পাড়া (খাঁ পাড়া), কাজী পাড়া ও তরফদার পাড়া প্রাচীন। ইহাদের মধ্যে তরফদার পরিবার সর্বপ্রাচীন। এই তরফদারদের বাস্তু-ভিটা পার নওগাঁ সুলতানপুরে অবস্থিত। নওগাঁর খানবাহাদুর বছিরউদ্দীন আহমদ বিভিন্ন সদানুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও একজন জ্ঞানবৃদ্ধ সজ্জন প্রকৃতির লোক ছিলেন। কাজী পরিবারের খাকী সাহেবের লিখিত একটি রচনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "খাঁরা প্রথমত: শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন।" নওগাঁর উকিলপাড়া একটি সমৃদ্ধ পল্লী। নওগাঁর হাটবারে নদীতে সওদাগরী নৌকার বিস্তর ভীড় হইয়া থাকে।

বিভাগোত্তর কালে নওগাঁ টাউনের দ্রুত উন্নতি হইতেছে। এক সময় নওগাঁর ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সুনাম ছিল। ইহা ১৯৪৬ হইতে ৬০ সাল পর্য্যন্ত স্থাপিত ছিল। ১৯৬৩ সালে ইহা জেনারেল কলেজে পরিণত হয়। কে, ডি, হাই স্কুলও একটি প্রাচীন শিক্ষা (স্থাপিত ১৮৮৪ খ্রী:) প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ডিগ্রী কলেজ, বালিকা বিদ্যালয়, পি, টি, স্কুল, করোনেশন স্কুল, নওজোয়ান সমিতি, কো-অপারেটিভ ক্লাব ও লাইব্রেরী প্রভৃতি শিক্ষা ও সদানুষ্ঠানগুলি নওগাঁবাসীর শিক্ষা প্রীতির পরিচায়ক। নওগাঁর প্যারীমোহন লাইব্রেরী প্রাচীন। ইহা ১৯১০ সালে পার-নওগাঁ নিবাসী প্যারীমোহন সান্ন্যাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এখানে বহু দুস্প্রাপ্য পুঁথিপত্র ও বই-পুস্তক রক্ষিত আছে। বর্তমানে এই লাইব্রেরীটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। নওজোয়ান সমিতি একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান ছিল। তথাকথিত রাজনৈতিক দলের কোন্দলে পড়িয়া ইহার পূর্বগৌরব কিছুটা ক্ষুন্ন হইয়াছে। নওগাঁ কো-অপারেটিভ লাইব্রেরী ১৯২১ সালে স্থাপিত হয়। প্রথমে ইহা কো-অপারেটিভ ক্লাব নামে পরিচিত ছিল। তখন উহা গাঁজা সোসাইটির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৫৮ সালে উহ পুনর্গঠিত হইয়া সাধারণ লাইব্রেরীতে পরিণত হইয়াছে। এই পুনর্গঠিত লাইব্রেরীর চেয়ারম্যান খান সাহেব মোহাম্মদ আফজাল ও সেক্রেটারী জনাব মোজাম্মেল হক। ইহার প্রথম সেক্রেটারী ছিলেন শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ মজুমদার। এখানে বহু

---

* Mr, C. F Cooke, R F , Assistant Engineer in the Bogra Special Division তিনি কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আধুনিক বই-পুস্তকের সমাবেশ রহিয়াছে। বর্তমানে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এতদব্যতীত এখানে 'ভাই ভাই সঙ্ঘ' ভ্রাতৃ সঙ্ঘ, কালীতলা যুব সঙ্ঘ, ভবুঘরে ক্লাব, রিক্রেয়শন ক্লাব প্রভৃতি নওগাঁর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

নওগাঁর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে সান্ন্যাল পরিবার নওগাঁর উন্নয়ন কল্পে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রায় দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহার আদি নিবাস ছিল ছাতিয়ান (বগুড়া) গ্রামে। এই দানপুণ্যের জন্য তিনি "রায় সাহেব" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। প্যারীমোহন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা কল্পে নওগাঁর তদানীন্তন মহকুমা হাকিম শ্রী জগদীশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। নওগাঁ মহকুমার হাসপাতাল, সেতু, ঢোল ইন্দারা প্রভৃতি উন্নয়ন মূলক কার্য্যের জন্য ধনজ্ঞইল নিবাসী রুক্কিনী কান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রায় ৭০।৮০ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এতদব্যতীত নওগাঁর উন্নয়ন কল্পে দুবোলহাটি ও বলিহার জমিদারদ্বয়ের কিছু কিছু দান রহিয়াছে। এইভাবে সকলের ঐক্যবদ্ধ ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নওগাঁর পটভূমি রচিত হয়।

বর্তমান নওগাঁ টাউনের রাস্তাপথ পূর্বাপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত। এখানকার প্রধান প্রধান রাস্তার মধ্যে কাচারী ও মহাদেবপুর রাস্তা বিশিষ্ট। মহাদেবপুর রাস্তা শান্তাহার হইতে ধরা হইয়া থাকে। ইহা টাউনের বক্ষভেদ করিয়া মহাদেবপুর গমন করিয়াছে। কাচারী রাস্তা যমুনা নদীর তীর ধরিয়া উত্তর দিকে গমন করিয়াছে। শহরের মধ্যস্থলে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ইমারত ও গাঁজা সোসাইটির অফিস, জুমা মসজিদ রহিয়াছে। নওগাঁর উন্নয়ন ব্যাপারে পূর্বতন মহকুমা হাকিম জনাব আবদুর রব চৌধুরীর ভূমিকা অনন্য সাধারণ। তিনি ডিগ্রী কলেজ ও ষ্টেডিয়াম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা-কল্পে কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। নওগাঁর মহকুমা হাকিম জনাব তৌফিক ইমামের সময়ে নওগাঁ মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়।

১৮৭৭ সালে নওগাঁ মহকুমা গঠিত হয়। বর্তমানে শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে নওগাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে। ১৯৬৩ সালে ডিসেম্বর মাসে ৭ জন সদস্য (মনোনীত ৩ জন ও নির্বাচিত ৪ জন) লইয়া নওগাঁ মিউনিসিপ্যালটি গঠিত হয়। ইহার বর্তমান চেয়ারম্যান (এস, ডি-ও) জনাব এ, কে, এম, মাজেদ। মিউনিসিপ্যালটির আয়তন সাড়ে ৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) ২০,৬,৫২ জন। ১৯২৩ সালে কাটা যমুনার তীরে বর্তমান সেতু নির্মিত হয়। ১৯২১ সালে তদানীন্তন বাঙলার শিক্ষা সচিব ও বগুড়ার নওয়াব বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী কর্তৃক "নওগাঁ গাঁজা সোসাইটির" অফিস গৃহ উদ্বোধন হয়। শান্তাহার রেল ষ্টেশন হইতে তিন মাইল পশ্চিমে কাটা যমুনার তীরে[৭৭] নওগাঁ টাউনের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম।

দুবালহাটি

নওগাঁর প্রাচীনত্বের মধ্যে পার-নওগাঁয় সুলতানপুরে বাঁশঝাড়ে অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। এইখানে বগুড়ার চাপাপুর হইতে আগত খন্দকার পরিবারে গুপ্ত যুগের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। যদিও তাহা স্থানীয় সান্ন্যাল পরিবারের বদান্যতায় রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মিউজিয়ামের প্রদত্ত হইয়াছিল। খাকী সাহেবের লিখিত একটি

৭৭. Vide, Hunter's statistical account of Bengal, Rajshahi, and Rajshahi Gazetteer, Imperial Gazetteer of India, Eastern Bengal and Assam প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

রচনা অনুসারে কাজী বাড়ীর মসজিদটি ১৭৯২ সালে উলুখড়ের ছাউনি দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে ১৮৮২-৮৩ সালে এই খড়ের মসজিদটি পাকা করা হয়।

নওগাঁ টাউন হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। দুবোলহাটি জমিদার পরিবার নানাবিধ সদানুষ্ঠানের জন্য বিখ্যাত। দুবোলহাটির চারি পার্শ্বে আত্রাই নদীর খাত দিগলীর বিল নামে খ্যাত। এখানে হাই স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি সদানুষ্ঠান দুবোলহাটি রাজার কীর্তি। দুবোলহাটির রাজ-প্রসাদ এতদঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য। রাজ পরিবারের নিজস্ব লাইব্রেরীতে বহু প্রাচীন বই পুস্তক ও হাতীর দাঁতের কারুকার্য্য খচিত কয়েকটি কৃত্রিম সিংহাসন ছিল[৭৮]।

এই গ্রামদ্বয় প্রাচীন। আত্রাই নদীর তীরে অবস্থিত। মোঘল আমলের শেষের দিকে নাজিরপুবে ছাউনী ছিল। বাঙলার সুবাদার ইসলাম খাঁ উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ পথে এখানে অবতরণ করিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' আমলে এখানে রেশম শিল্পের কারখানা ও কুঠি স্থাপিত ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলন যুগে পত্নীতলাতে কংগ্রেসের একটি নামকরা শিবির ছিল। ধান চাউল কেনাবেচার জন্য 'নজিপুর' বা নাজিরপুর ও পত্নীতলা অতীতেও খ্যাত ছিল এখনও আছে। এখানে পুলিশ ষ্টেশন, সাব- রেজিষ্টার অফিস, হাই স্কুল, টেলিগ্রাফ অফিস প্রভৃতি আছে। বর্তমানে এখানে পরীক্ষা মূলকভাবে বিড়িপাতার চাষ হইতেছে। ইহা নওগাঁ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। বিভাগপূর্ব কালে পত্নীতলা থানা দিনাজপুরের অধীনে ছিল[৭৯]।

নাজিবপুব ও পত্নীতলা

নওগাঁ মহকুমার অধীনে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। কাটা যমুনার তীরে অবস্থিত। আক্কেলপুর রেল ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে, মহাদেবপুর হইতে ১২ মাইল পশ্চিম-উত্তরে ও নওগাঁর ১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে পুলিশ ষ্টেশন, হাই স্কুল বালিকা বিদ্যালয় এবং ৮/৯ টি অধুনালুপ্ত জমিদারী কাচারী আছে। এখানকার সাবুদ শাহের সমাধি দরগারূপে হিন্দু ও মুসলমান কর্তৃক পূজিত। স্থানীয় জমিদারগন ইহার সেবাকার্য্য পরিচালনার জন্য লাখেরাজ সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। এই বদলগাছি ঊনবিংশ শতকে দিনাজপুরের অধীনে ছিল। ১৮২১ সালে ইহা বগুড়ার অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৮৯৭ সালে ইহা রাজশাহীর অধীনস্থ হয়। দেশ বিভাগের পর কিছুকাল পুনরায় ইহা বগুড়ায় মধ্যে ছিল। ঐতিহাসিক বুকানন হ্যামিল্টনের বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এখানে একটি থানা আগে হইতেই ছিল। আর এখানকার জঙ্গলাদির মধ্যে এক প্রকার গাছ হইতে প্রচুর পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইত। উক্ত গাছের নামানুসারে বদলগাছি নামকরণ হয়[৮০]।

বদলগাছি

ইহা একটি বৰ্দ্ধিষ্ণু প্রাচীন হিন্দু পল্লী। পাকিস্তান আমলে ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। ইহার প্রায় ৭ মাইল উত্তরে পাহাড়পুর বৌদ্ধ মন্দির এবং প্রায় ১ মাইল দক্ষিণে হলুদ বিহার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। ভান্ডারপুরের নীচে দিয়া এককালে নূর-নদী প্রবাহিত হইত। পূর্বে ইহা কম্প নদী নামে খ্যাত ছিল। তখন বাণিজ্য বন্দর হিসাবে উহা প্রসিদ্ধ ছিল।

ভান্ডারপুরে

৭৮. Vide, Rajshahi Gazetteer

৭৯. Vide, Dinajpur District Gazetteer and statistical account of Bengal; Eastern India Vol., II 1838

৮০. Martin, Eastern India Vol. II(1836) pp 668-70

আক্কেলপুর রেল ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে ভান্ডারপুর অবস্থিত। এখানে দাতব্য চিকিৎসালয়, হাই স্কুল, লাইব্রেরী, ইউনিয়ন কাউন্সিল, হাট প্রভৃতি আছে। ইহা নওগাঁ মহকুমার অর্ন্তভক্ত।

**ভাতসাইল ও চাকরাইল**

বদলগাছি অদুরে বড় রাস্তার পার্শ্বে ভাতসাইল ও চাকরাইল গ্রামদ্বয় অবস্থিত। ভাতসাইল গ্রামে হাই স্কুল, পোষ্টাফিস ও একটি সঙ্ঘ আছে। ইহা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও এখানকার প্রগতি সঙ্ঘের কমীবৃন্দ একটি পাঠাগার স্থাপন করিয়া তাহাদের কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। তাহারা এখানে পল্লীগীতি সাহিত্য, ইতিহাস ও ধমীয় বই-পুস্তাক সংগ্রহ করিতেছেন। চার কামরা বিশিষ্ট প্রায় ৫০ হাত দীর্ঘ এই লাইব্রেরীব আয়তন। পল্লী অঞ্চলে এই শ্রেণীর লাইব্রেরীর ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। লাইব্রেরীটির প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে স্থানীয় জনাব মুসারফ হোসেন চৌধুরীর ত্যাগ ও অধ্যবসায় সর্বজন বিদিত। চাকরাইল গ্রামেও অনুরূপ একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী আছে। তাহাতেও প্রচুর বই পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। ভাতসাইল অপেক্ষা চাকরাইল লাইব্রেরী প্রাচীন।

**নীৎপুর ও পোরশা**

এই গ্রামদ্বয় বিখ্যাত। নীৎপুর প্রাচীন বাণিজ্য বন্দর। পুণভবা নদীর তীরে অবস্থিত। পোরশা থানা এখন নীৎপুরে নীত। পোরশার সাহুরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে এক সময় নীৎপুরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পরে সেখানে বিহারী ও বাঙ্গালী সওদাগরদের আনাগোনায় স্থানটি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। দেশ বিভাগের পর হিন্দু ব্যবসায়ীরা স্থানান্তরে গমন করিলে নীৎপুরের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। এক সময় দিনাজপুরের পোরশার কথা বলিলে পথিককে রাস্তা-ঘাট দেখাইয়া দিতে হইত না। পোরশার এতই প্রতাপ ও প্রসিদ্ধি ছিল। পোরশার সাহুগণ খুব বড় জমিদার ছিলেন না বটে কিন্তু জোতদার হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পোরশার গোলায় এতই ধান্য মজুত থাকিত যে, পূর্বে কোন বৎসরে উত্তর-বঙ্গে দুর্ভিক্ষ হইলে বা দৈব-দুবিপাক ঘটিলে পোরশার গোলাই তাহার বেশীর ভাগ চাহিদা মিটাইতে পারিত। পূর্ব ধারে 'লড়াই ডাঙ্গার' মাঠ ইংরেজদের সহিত একটি লড়াই এর স্মৃতি বহন করিতেছে। এই জনশ্রুতিটির প্রকৃত তথ্য আমরা উদঘাটন করিতে পারি নাই।

দস্যু তস্করের অত্যাচার ও উপদ্রব প্রতিরোধ কল্পে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে, দেশের সমৃদ্ধশালী লোকেরা সুরক্ষিত দুর্গ বিশেষ যে সব বাড়ী ঘর নির্মিত করিতেন, পোরশার প্রাচীন দালান-বাড়ী (মৌঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী ও আবদুল গোফুর চৌধুরী সাহেবের বাড়ী) তাহার একটি নিদর্শন। আম্রকাননে পরিবেষ্টিত পোরশার দ্বিতল মাদ্রাসা ও মসজিদের মিণার এবং গ্রামের দৃশ্য অতি মনোরম। সুউচ্চ গগনচুম্বী মিণারে উঠিলে গ্রামটি কুঞ্জকানন ও কতকটা গোলাপ কুঞ্জের মত দেখায়। পোরশার ইষ্টক নির্মিত বাড়ীগুলি দ্বিতল এবং অবশিষ্ট মাটির বাড়ীগুলিও দ্বিতল। এখানকার বাড়ীগুলির একটি বৈশিষ্ট আছে। আগে পোরশার সাহুরা স্বীয় বংশের মধ্যেই বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ থাকিতেন। সাহুদের সিনিয়র মাদ্রাসা, মুসাফিরখানা ও দাতব্য চিকিৎসালয় উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ইহা এখন নওয়াবগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত[৮১]। পোরশার পূর্বে স্বর্ণগড় (সোনার গড়?) একটি প্রাচীন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। রহনপুর রেল ষ্টেশন হইতে পোরশা প্রায় ২০ মাইল

৮১. Vide, Statistical account of Dinajpur and Dinajpur Gazetteer.

উত্তরে অবস্থিত।

**রহনপুব**

পূন্যর্ভবা নদীর তীরে প্রাচীন গ্রাম ও বাণিজ্য বন্দর। দেশ বিভাগের পর রহনপুরের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। রহনপুরের আগের গৌরব এখন আর নাই। বিভাগোত্তর কালে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ হইতে কয়েক ঘর ব্যবসায়ী এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা আগের গৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই। এখানকার মোহন্ত- ষ্টেট, হাই স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে সদাই পীরের দরগাহ হিন্দু মুসলমানের পীঠ স্থান। রহনপুরের হাট প্রসিদ্ধ। আগে গোদাগাড়ী-কাটিহার রেল লাইন রহনপুর অতিক্রম করিত। দেশ বিভাগের পর রাজশাহী হইতে রহনপুব পর্য্যন্ত রেলপথে ভ্রমণ করা যায়। রহনপুর সুলতানী আমলের একটি গড় (?) ইংরেজ আমলে একটি পুলিশ ফাঁড়ী ছিল[৮২]। ষ্টীমার ঘাটও ছিল।

**চাঁপাই**

মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে নওয়াবী আমলের একটি মসজিদ আছে। চাঁপাই হইতে গোমস্তাপুরে পুলিশ ষ্টেশন স্থানান্তরিত হইলে কিছুদিন যাবৎ এই পুলিশ ষ্টেশন "চাঁপাই- গোমস্তাপুর" নামে কথিত হইত। এখানকার পোষ্ট-অফিস নওয়াবগঞ্জ স্থানান্তরিত হইয়াছে। ১৯০৩ সালে নওয়াবগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি গঠন হইবার পর চাঁপাই'য়ের শ্রীসমৃদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। ইহা একটি প্রাচীন বন্দর[৮৩]। ষ্টীমার ঘাটও ছিল। বর্তমানে ইহা মৃত্যুপ্রায়।

**শিবগঞ্জ**

পাগলা নদীর তীরে (প্রাচীন গঙ্গা) অবস্থিত একটি প্রাচীন স্থান। এখানে পুলিশ ষ্টেশন, পোষ্ট-অফিস প্রভৃতি আছে। নওয়াবগঞ্জের মুনসেফ কোর্ট আগে এখানে স্থাপিত ছিল। রেশমের কাপড়ের জন্য বাঙলাদেশে বহুকাল হইতে শিবগঞ্জ বিখ্যাত। নওয়াবগঞ্জ হইতে ১২ মাইল পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। ইহার ২ মাইল দূরে পাগলা নদীর তীরে 'তরতীপুর' পাট কেনা বেচার প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। বর্ষার সময় এখন এখানে মটরলঞ্চ যাতায়াত করে। প্রাচীন বিবরণে শিবগঞ্জের উল্লেখ আছে[৮৪]।

**দাদনচক**

ইহা একটি শিক্ষা কেন্দ্র। 'আদিনা ফজলুল হক কলেজ' হাইস্কুল, মাদ্রাসা, শিল্প বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি ৮।৯টি প্রতিষ্ঠান স্থানীয় মৌলবী ইদ্রিস আহমদ প্রমুখের সংগ্রামী জীবনের কীর্তি। দাদনচকের অদূরে মনাকষা হাট প্রসিদ্ধ। মনাকষার চৌধুরী পরিবারও প্রসিদ্ধ। দাদনচক, মনাকষা, বিনোদপুর প্রভৃতি গ্রাম লাক্ষা শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

রাজশাহী জেলার পশ্চিম সীমান্তে মহানন্দার তীরে ভোলাহাট রেশম শিল্পের কারখানার জন্য ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে বিখ্যাত[৮৫]; এখানে হাজার হাজার

৮২. Vide, statitical account of Bengal, and District Gazetteer of Malda

৮৩. Vide, Malda Dsitrict Gazetteer and Statistical account of Malda

৮৪. Vide, Malda District Gazetteer and Statistical account of Malda. A survey of the Indudstries and resourses of Eastern Bengal and Assam for 1707-08

৮৫. Vide, Malda Dsitrict Gazetteer and Statistical account of Malda A survey of the Industries and resources of Eastern Bengal and Assam, for 1907-08 Imperial Gazetteer of India Eastern Bengal and Assam

লোক কোম্পানীর রেশম কারখানায় শ্রমিক হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করিত। এখনও তুঁতের চাষের জন্য ভোলাহাট বিখ্যাত। এখানকার অধিকাংশ প্রাচীন দালান-কোঠা গৌড়ের ইঁট দ্বারা নির্মিত। স্থানীয় পাকা এবং প্রধান রাস্তাটি এক সময়ে উল্লেখযোগ্য ছিল। রাস্তাটির বহুলাংশ গৌড় হইতে আনিত পাথর দ্বারা বাঁধান ছিল। ভোলাহাট অঞ্চলে কয়েকটি গ্রামে কতকগুলি আবরী ফারসী শিলালিপি রক্ষিত আছে। আমরা সেখান হইতে কিছু সংখ্যাক প্রাচীন মুদ্রা গিল্টী করা ইঁট সংগ্রহ করিয়াছি।

ভোলাহাট

মহানন্দার তীরে অবস্থিত নওয়াবগঞ্জ বর্তমানে মহকুমা টাউন। নওয়াবগঞ্জের বিপরীত দিকে বারোঘরিয়া যখন রেশম, পাট প্রভৃতি কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর, তখন নওয়াবগঞ্জ "বারোঘরিয়া-নওয়াবগঞ্জ" নামে পরিচিত ছিল। তারপর যখন বারোঘরিয়ার রেশম কারবার বন্ধ হইয়া নওয়াবগঞ্জ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে তখন নওয়াবগঞ্জ স্বতন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ হয়। এবং ৪/৫ মাইল উত্তরে চাঁপাইয়ের পতন ঘটে। ১৯০৩ সালে ১২ জন কমিশনার সমন্বয়ে নওয়াবগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। তখন শিবগঞ্জস্থিত মুনসেফ কোর্ট উঠিয়া নওয়াবগঞ্জ স্থাপিত হয়। এবং নওয়াবগঞ্জের অগ্রগতি উত্তরোত্তর অব্যাহত থাকে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ হইলে মালদহ ও দিনাজপুর জেলা হইতে কয়েকটি থানা রাজশাহী জেলার অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৯৪৮ সালে নভেম্বর মাসে ৫৩টি ইউনিয়ন সহ ১০৯৫টি গ্রাম সম্বলিত ৬টি থানা লইয়া নওয়াবগঞ্জ একটি স্বতন্ত্র মহকুমা গঠিত হইলে, ইহার উন্নতি ও সংস্কার সাধন জরুরী হইয়া পড়ে। প্রথমের দিকে রাজশাহী সদরের মহকুমা হাকিম বর্তমান নওয়াবগঞ্জের কার্য্যাদি সম্পাদন করিতেছিলেন। তারপর সরকারী অফিসাদির জন্য স্থানীয় কয়েকটি বাড়ী হুকুম দখল করিয়া তাহাতে মহকুমার যাবতীয় দপ্তরাদি স্থানান্তবিত করা হয়। তৎপর স্বতন্ত্র মহকুমা হাকিম নিযুক্ত করা হইলে প্রয়োজনীয় অফিসাদি নির্মান ইত্যাদি হইতে থাকে। ১৯৪৯ সালে মহকুমা জেলখানা ও ১৯৬২-৬৫ সালে ফৌজদারী কোর্ট বিনির্মিত হয়। অতঃপর ডিগ্রী কলেজ, ষ্টেডিয়াম, লাইব্রেরী, ক্লাব, উচ্চ বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নওয়াবগঞ্জের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সম্প্রতিকালে বিজলী বাতী ও টেলিফোন হইয়াছে। এবং রাস্তাঘাট পূর্বাপেক্ষা কিছুটা উন্নত হইযাছে। নওয়াবগঞ্জের আয়তন ও জনসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেকগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার সাধন ও নুতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। নওয়াবগঞ্জ টাউন আম্র কাননে পরিবেষ্টিত। টাউনেব দৃশ্য অতীব মনোরম। স্থানটি স্বাস্থ্যপ্রদ তো বটেই।

নওয়াবগঞ্জ

আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি নওয়াব আলীবর্দ্দী খাঁর আমলে নওয়াবগঞ্জের অস্তিত্বের কথা অবগত হওয়া যায়। বর্তমান রেল ষ্টেশনের সন্নিকট হুজরাপুর ঘেষিয়া 'আমিরা-বাজার'; বর্তমান টাউনের আগে সেখানেই নওয়াবগঞ্জের সূত্রপাত হয়। আপাৎকালে এই বাজার ধ্বংস হইয়া গেলে বর্তমান স্থানে নওয়াবগঞ্জ বাজার স্থানান্তরিত ও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমীরা-বাজার যে এক কালে ঘন জনবসতি ও বন্দর ছিল নদীর ভাঙ্গনে সেই স্থানে অলঙ্কারাদি ও প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি আবিস্কৃত হওয়ায় তাহা প্রমাণিত হয়। আমীরা বাজারের অদূরে পাঠান পাড়াতে আগে দুর্ভেদ্য

জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। চাঁপাইয়ের পথে গোকুলেও নিবিড় বন ছিল। সেখানে নানা প্রকার বন্য শিকার ও হিংস্র জানোয়ারের লীলাক্ষেত্র ছিল। নওয়াবী কর্মচারী ও নওয়াবজাদাগণ এই স্থানে তাঁবু করিয়া বনে-জঙ্গলে কখন কখন শিকার করিতেন। শিকার প্রভৃতি ব্যাপারে স্থানটি তখন মুর্শিদাবাদে খুবই পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। নওয়াব আলী বর্দ্দীর আমলে মুর্শিদাবাদ তথা পশ্চিমবঙ্গ মারাঠা বর্গী কর্তৃক আক্রান্ত হইলে বরেন্দ্রভূমি নিরাপদ মনে করিয়া মুর্শিদাবাদ, খরদহ, বর্দ্ধমান, বীরভূম, নদীয়া প্রভৃতি স্থান হইতে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ পরিবার, কংস শিল্পী, তামুলী ও বহু মুসলমান সওদাগর গঙ্গা-মহানন্দার সংগমস্থলে বর্তমান নওয়াবগঞ্জ ভূমিখণ্ডে উঠিয়া আসিয়া বসতি স্থাপন করে। তখন এই স্থানে (চরজোড় প্রতাপ) নলিয়া নামীয় মুসলমানের বাস ছিল। নল খাগড়ার জিনিষ-পত্র প্রস্তুত করিয়া তাহারা জীবিকা নির্বাহ করিত। তারপর পশ্চিমবঙ্গ হইতে মোহাজেরগণ আসিয়া বসতি স্থাপন করিলে স্থানটি সরগরম হইযা উঠে এবং কালক্রমে নওয়াবদের নামানুসারে এই স্থান "নওয়াবগঞ্জ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। শিক্ষার আলোকে নলিয়ারা এখন ব্যবসা বাণিজ্য সরকারী বেসরকারী চাকরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। ইহাদের বর্তমান সংখ্যা প্রায় ছয় শত ঘর হইবে। বর্তমানে যে স্থানে পুলিশ ষ্টেশন: আগে সেই স্থানে শশ্মান ছিল। এই শশ্মান সংলগ্ন একটি সতীদাহ ঘাটের কথা শোনা যায়। সেখানে একটি প্রকাণ্ড বটগাছও ছিল। নওয়াবগঞ্জের কাঁসারী পট্টী ও প্রাচীন। রাজারামপুর আজাইপুর ও নামো-শঙ্করবাটি ও কাঁসারী পট্টীতে যে সব মুসলমান কাঁসারী আছে-ইহাদের অনেকেই এখন ওস্তাদ শিল্পী। অতীতের বিবরণীতে প্রকাশ, ইহাদের পূর্ব-পুরুষেরা মুর্শিদাবাদ হইতে আগত কাঁসারীদের দোকানে মজুরী করিয়া দিনাতিপাত করিত। এখন ইহারা অধিকাংশই স্বাবলম্বী। ইহাদের বর্তমান সংখ্যা প্রায ২৫০ ঘর হইবে। নওয়াবগঞ্জের মুসলমান সুতারগণ গাড়ীর চাকা প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্ত। সম্প্রতি লাক্ষা গবেষণাগারের একটি ফারম এখানে স্থাপিত হইয়াছে। নওয়াবগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির বর্তমান আয়তন ৩/২৫ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ২৯,৭,২৫ জন। এই শতকের গোড়ার দিকে চাঁপাই হইতে পোষ্টাফিস নওয়াবগঞ্জে স্থানান্তরিত হয়। মালদহ ইংরেজ বাজারের সন্নিকট, রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় (নওয়াবী আমলের) আরও কয়েকটি নওয়াবগঞ্জ থাকায় অনেক সময় এখানকার চিঠি-পত্র ও অন্যান্য সংবাদাদি ব্যাপারে গোলমাল হইতে থাকে। ফলে জন সাধারণের খুবই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। সেই জন্য পরে নওয়াবগঞ্জ পোষ্টাফিস চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ" নামে পরিচিত হয়[৮৬]।

রাজশাহী শহর হইতে ১৯ মাইল উত্তর-পশ্চিমে পদ্মার উত্তর তীরে অবস্থিত গোদাগাড়ী প্রাচীন গ্রাম। বর্গীর হাঙ্গামার সময় বরেন্দ্রভূমি নিরাপদ মনে করিয়া নওয়াব আলীবর্দ্দী খাঁন সাময়িকভাবে তাঁহার রাজধানীর মূল্যবান জিনিষ পত্র, টাকা পয়সা, পরিবার বর্গ-ডিপুটি গবর্ণর নোয়াজেস মোহাম্মদ খানের অধিনে এই গোদাগাড়ী গ্রামের অদূরে বাড়ই-পাড়া গ্রামে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। পরে তাহা কেল্লায়েবারুই পাড়া" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানে এখন নওয়াবী রাজধানীর গড়, খাজাঞ্চি ভিটা, দীঘি, পুষ্করিণী প্রভৃতি আছে। কিছুদিন আগে স্থানীয় প্রধানগণ খাজাঞ্চি ভিটা খনন করিয়া কিছু মুদ্রা প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এখানে বর্তমানে কয়েকটি ইষ্টক

৮৬. Vide, Malda District Gazetteer and Hunter's statistical account of Malda, Imperial Gazetteer of India, Eastern Bengal and Assam

নির্মিত প্রাচীরের চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। নওয়াবী পরিজনবর্গ ছাড়াও তখন মুর্শিদাবাদ হইতে বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী ও নাগরিক পদ্মা পার হইয়া এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ফলে গোদাগাড়ী একটি সমৃদ্ধ উপনিবেশ ও বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল। তখন অনুরূপ সমৃদ্ধ উপনিবেশ মালদহ জেলার 'জাহাঙ্গীর নগর' ও 'নওয়াবগঞ্জ', 'রামপুর বুয়ালিয়া' প্রভৃতি স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। সে সব কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। উপরন্ত, তখন বর্গীদের অত্যাচার লুন্ঠন অগ্নিসংযোগ নারী নির্য্যাতন ইত্যাদি জুলুম হইতে আত্মরক্ষা নির্মিত্তে হাজার হাজার চাষীকুলও পদ্মা পার হইয়া রাজশাহীর সীমান্তে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল। কালে তাহারা অনেকেই রাজশাহীর অধিবাসী বানিয়া গিয়াছে। সে জন্য এখনও পদ্মা তীরের জনসাধারণের ভাষা ও চালচলনের একটি স্বাতন্ত্র আছে। তাহাদের চালচলন ও ভাষার সহিত বরেন্দ্রভূমির অধিবাসীদের ভাষা ও চালচলনের কিছুটা অসামঞ্জস্য লক্ষ্য কবা যায়।

এই গোদাগাড়ীর নীচে পদ্মা, মহানন্দার সংযোগ স্থল। এখানকার থানা, ডাক বাংলো, রেজিষ্টারী অফিস, শুল্ক অফিস ও দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রাচীন। কাটিহার-গোদাগাড়ী রেললাইন, গোদাগাড়ী ঘাট পর্য্যন্ত যাতায়াত রক্ষা করিত। বিশেষ, ষ্টীমার এখান হইতে লালগোলা পর্য্যন্ত যাতায়ত করিত। লালগোলা ঘাট হইতে তখন কলিকাতা যাইবার ইহাই এই অঞ্চলের একমাত্র পথ ছিল। দেশ বিভাগের আগে বরেন্দ্র অঞ্চলের ধান, চাউল কেনাবেচার ইহা প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। এখনও আছে। তবে পূর্ব গৌরব কিছুটা ক্ষুন্ন হইয়াছে। সম্প্রতি ইহার উন্নয়নের জন্য স্থানীয় অধিবাসীরা সন্তোষজনক প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন। পুনরায় মুর্শিদাবাদ ও মালদহ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু সংখ্যক লোক আসিয়া কারবারে আত্মনিয়োগ করিয়াছে[৮৭]।

**খেতুর ও প্রেমতলী**

রাজশাহী সদর হইতে ১৩ মাইল পশ্চিমে প্রেমতলী,–২ মাইল উত্তরে অবস্থিত খেতুর প্রাচীন গ্রাম। চৈতন্য ভক্ত নরোত্তম ঠাকুরের সাধন পীঠ খেতুর গ্রামে অবস্থিত। নরোত্তম ঠাকুর একজন বৈষ্ণব সাধক ছিলেন। তাঁহার পিতা কৃষ্ণানন্দ একজন বড় জমিদার ছিলেন। কুমারপুরে তাঁহার বাস ছিল।

রাজশাহীর গেজেটিয়ারের মতে বিগত ১৯১৩ কি ১৪ সাল হইতে খেতুরে একটি মেলার সৃষ্টি হয়। সেখানে মৃদঙ্গবাদন কৌশলে সংকীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। এখানকার মন্দিরাদি এই শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত। খেতুরে শ্রীচৈতন্য ও তদীয় স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বর্ণ-নির্মিত মূর্ত্তি ছিল। তাহা ১৯৫৭ সালে এখানকার সেবাইত চুরি করিয়া মুর্শিদাবাদের বালুচরে লইয়া গিয়া সেখানে একটি মেলা বসাইয়াছে। এই বালুচর জিয়াগঞ্জের নিকট অবস্থিত। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে খেতুর ও প্রেমতলীতে মেলা বসে। শ্রীচৈতন্য পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করিয়া গঙ্গা (পদ্মা) বাহিয়া গৌড়ে গমন পথে প্রেমতলীতে স্নান-তর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেখানে মেলার সৃষ্টি হইয়াছে। আগে এই মেলায় ১০/১২ হাজার যাত্রীর সমাগম হইত। এখন সেখানে মাত্র কয়েকশত লোক জমা হইয়া থাকে। প্রেমতলী মেলা খেতুর অপেক্ষা বহু প্রাচীন। মাসাধিক কাল স্থায়ী থাকিত[৮৮]।

রাজশাহী শহর হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে পদ্মার উত্তর তীরে অবস্থিত ইহা

৮৭. Vide, The Sair-ul-Mutakharin Vol, II, and Hunter's statistical account of Rajshahi; সিরাজউদ্দৌলা ও বাংলাব ইতিহাস প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

৮৮. Vide, নরোত্তম চরিত ও নরোত্তম বিলাস এবং Statistical account of Rajshahi and District Gazetteer

একটি প্রাচীন গ্রাম। রেশম ও নীল কারবারের বন্দর হিসাবে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছিল বুয়ালিয়ার রেশম শিল্প প্রসঙ্গে সরদহের আংশিক বিবরণী আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখানে 'ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' আবাসিক বাণিজ্য কুঠি ছিল। তাহারা রাজশাহীর বুয়ালিয়ার সহিত একযোগে বাণিজ্য করিতেন। ১৮৩৫ সালে "রবার্ট ওয়াটশন কোম্পানী" এই কুঠি খরিদ করিয়া বিরাটাকারে রেশমের কারবার খুলিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে এই কুঠি 'বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানীর' হাতে চলিয়া যায়।

সবদহ

তারপর তাহা মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর হস্তান্তর হয়। অতঃপর বাঙলা সরকার উক্ত কুঠি খরিদ করিয়া ১৯১২ সালে অক্টোবর মাসে সরদহ পুলিশ ট্রেনিং কলেজ স্থাপন করেন। দেশ বিভাগের আগে রাজশাহীর সরদহ বাঙলা দেশে পুলিশ ট্রেনিং কলেজের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখনও সে সুনাম অক্ষুন্ন আছে। এখানে শিক্ষানবীশ পি, এস, পি, হইতে কনষ্টেবল পর্য্যন্ত পুলিশী শাসনের যাবতীয় বিদ্যা ও কলা কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ১৯১৫ সালে শিক্ষানবীশ ১২ জন সহ পুলিশ সুপার (Probationary Assistant Superintendent), ২ জন উপ-পুলিশ সুপার (Probationary Deputy Superintendent), ১২০ জন সাব ইন্সপেক্টর ও ৪০০ জন কন্সটেবলকে (Probationary Sub-Inspector and constable) শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। তখন এই কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন মেজর এইচ, চেমনী। সরদহে সরকারী পুলিশ ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হইবার পর কোম্পানীর কুঠিগুলি কলেজের কার্য্যে ব্যবহার হইত। এবং এখনও সেইভাবেই ব্যবহার হয়। যেমন বড়কুঠি (প্রাচীন বৃক্ষাদির দ্বারা বেষ্টিত এবং সুদৃশ্য ময়দানে অবস্থিত) শিক্ষানবীশ সহপুলিশ সুপারের আবাসগৃহ। ইহা তখনকার দিনেও বাঙলা দেশে একটি বিশিষ্ট কুঠি; ছোট কুঠি অধ্যক্ষ সাহেবের বাসগৃহ; অন্যান্য কুঠিগুলির মধ্যে দুইটি ইংলিশ 'ড্রিল মাষ্টারের' জন্য এবং আর ৬টি কুঠি পুলিশ ব্যারাক, ক্লাশ-রুম, লাইব্রেরী, ক্লাব, অশ্বশালা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যবহার হইত। এতদব্যতীত তখন কলেজের প্রয়োজন বোধে পরবর্তী কালে আরও কতকগুলি ইমারত নির্মিত হইয়াছে। যেমন—ডাক্তার খানা, দ্বিতল হাসপাতাল সহ-অধ্যক্ষের বাসগৃহ, সেপাইদের ব্যারাক, রন্ধনশালা ইত্যাদি[৮৯]।

পাকিস্তান আমলে সরদহের কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। স্থানীয় হাই স্কুলটি পাইলট স্কুলে পরিণত এবং সরদহ ইউনিয়ন কাউন্সিলের উদ্যোগে জেলা কাউন্সিলের প্রদত্ত টাকায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। এতদব্যতীত ইউনিয়ন কাউন্সিলের একটি বিশ্রাম কেন্দ্র (Rest house), জুনিয়র মাদ্রাসা, খেলার ময়দান প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় রাস্তা ঘাটেরও উন্নতি হইয়াছে। চারঘাট হইতে সরদহ পর্য্যন্ত রাস্তাটি পাকা করা হইয়াছে। ১৯৬৩ সালে সরদহ পুলিশ কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শ্যাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান এখানে তসরিফ ফরমাইয়াছিলেন। বর্তমানে প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এখানে একটি সামরিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া কার্য্যারম্ভ (১৯৬৪ সাল) হইয়াছে। মোট কথা সরদহ পূর্ব্ব-পাকিস্তানে নানা কারণে এখন বিশিষ্ট ও বিখ্যাত স্থান। সরদহের রাস্তাঘাট, হাট-বাজার বৃক্ষশোভিত ও

৮৯. Vide, Rajshahi Gazetteer

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে রেশম ও নীল কুঠিয়ালদের একটি গোরস্থানও আছে।

বড়ল নদীর পদ্মা সংগমে বর্তমানে চারঘাট নানাদিক দিয়া উন্নততর বাণিজ্য বন্দর এখানকার পুলিশ- ষ্টেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন। রাজাপুর পুলিশ ষ্টেশন উঠিয়া আসিয়া চারঘাটের সহিত যুক্ত হয়। রাজাপুর পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইলে উহা প্রথমত: পানী-কামড়াতে স্থানান্তরিত হয়। তারপর নারায়ণপুর-বাজুবাঘাতে কিছুদিন অবস্থানের পর চারঘাট পুলিশ ষ্টেশনের সহিত যুক্ত হয়। এই চারঘাটের চারিপার্শ্বে খয়ের শিল্পের বিস্তর কারখানা আছে। প্রধানত: হলুদ ও খয়ের এখানকার বাণিজ্য সম্পদ[৯০]।

চারঘাট

নাটোরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, লালপুর হইতে ৩ মাইল ও গোপালপুর হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত এই বিল মাড়িয়া গ্রাম। আগে এই গ্রামে ২ মাইল দক্ষিণে পদ্মার তীরে ষ্টীমার ষ্টেশন ছিল। এখানে মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর রাজাপুর মহলের কেন্দ্রীয় কুঠি ও কার্য্যালয় ছিল। কোম্পানীর একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও ছিল। এই অঞ্চলে বিস্তর পাখী শিকার হইত।

বিল মাড়িয়া

মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী খাজনার রেট ও পত্তনি জমির মূল্য বৃদ্ধি করিয়া প্রজাদিগের উপর সময়ে অসময়ে নানাভাবে জুলুম করিত। অবশেষে ১৯২১ সালে এখানে প্রজাবিদ্রোহের ফলে কোম্পানীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল।

পৃজা বিদ্রোহ

এই গ্রামদ্বয় প্রাচীন। রেশম ও নীল কুঠি স্থাপনের মাধ্যমে লালপুর প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং পরে পুলিশ ষ্টেশন স্থাপিত হয়। গোপালপুর অঞ্চলে প্রচুর আখের চাষ হয়। পরে সেখানে চিনি উৎপাদনের মিল স্থাপিত হয়। এই চিনির মিলের মূল অংশীদার বর্তমানে ভারতের (?) অধিবাসী[৯১]।

লালপুর গোপালপুর

নারদ-মুছাখান- হোজা এই নদীত্রয়ের বেষ্টনী মধ্যে পুঁঠিয়া একটি প্রাচীন গ্রাম। ইহা নাটোর হইতে প্রায় ১০১/২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার হাইস্কুল, দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রাচীন। জমিদার পরেশ নারায়ণ কর্তৃক ইহার যাবতীয় ব্যয়াদি হইত। প্রজা-সাধারণের মঙ্গলার্থে রাণী হেমন্ত কুমারী ও রাণী শরৎ সুন্দরী মুক্ত হস্ত ছিলেন। দেশ বিভাগের পর পুঁঠিয়ার জমিদারগণ ভারতে গমন করিলে পুঁঠিয়ার গৌরব বিনিষ্ট হইয়া যায়। নারিকেল ও আম্রকাননে পরিবেষ্টিত পুঁঠিয়ার রাজপ্রাসাদ ও সদানুষ্ঠান, মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ বিগত দিনের সমৃদ্ধির পরিচায়ক। দেশ বিভাগের আগে পুঁঠিয়ায় নগণ্য সংখ্যক মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা ছিল না। হিন্দু রীতি-নীতিতে জীবন যাপন করিত। ধর্মীয় অনুষ্ঠানদির কোন সংবাদ শোনা যায় না। বিভাগোত্তর কালেও সেখানে মুসলমানরা এমন কি গরু পর্য্যন্ত কোরবানী করিত না। সম্প্রতিকালে সেখানে কয়েকজন উৎসাহী বুদ্ধিমান কর্মীর আবির্ভাব হওয়াতে মসজিদ, বালিকা বিদ্যালয় ক্লাব প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। পুঁঠিয়াতে পুলিশ সারকেল-ইন্সপেক্টরের সদর দপ্তর স্থাপিত আছে[৯২]। পুঁঠিয়ার সন্নিকট "পুকুরচুরির"

পুঁঠিয়া

৯০. Vide, Rajshahi Gazetteer.

৯১. Vide, Rajshahi District Gazetteer.

৯২. Vide, Rajshahi District Gazetteer and statistical account of Rajshahi, পুঁঠিয়া রাজবংশ, রাণী শরৎ সুন্দরীর জীবন চরিত প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

একটি জনশ্রুতি প্রবল। পুঁঠিয়ার জমিদার নীলকর সাহেবদের শায়েস্তা করিবার জন্য একটি কুঠি এক রাত্রিতে লুঠ করিয়া সেইখানে একটি পুকুর খনন করিয়াছিলেন। রানী শরৎ সুন্দরী নীলকরদের দৌরাত্ম্য নিবারণ কল্পে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

পুঁঠিয়ার ৮ মাইল উত্তরে ইহা অবস্থিত। পানানগরের নিকট দিয়া এক সময় সুন্দর নদী প্রবাহিত হইত। পানানগরের নীচে শোনাইকান্দা বিল। এই বিলের তীরে দমদমা একটি প্রাচীন গ্রাম। এই দমদমাকে 'কসবে-দমদমা' বলা হয়। জনশ্রুতি

পানানগর

মুলে–এখানে একটি সুলতানী ছাউনীর কথা শোনা যায়। নাটোর রাস্তায় শিবপুরে–উত্তর মুখী হইয়া পানানগরে গমনাগমন করা যায়। পানানগর, দুর্গাপুর ও দমদমায় নীলের চাষ হইত। পরবর্তীকালে রেশম কুঠি স্থাপিত ছিল। পানানগরের তীরে ইংরেজ আমলের হোজা ক্ষীণস্রোতা; পশ্চিমে দুর্গাপুর এককালে প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর ছিল। এখানকার পুলিশ ষ্টেশনও বেশ প্রাচীন[৯৩]।

পুঁঠিয়া হইতে ১২ মাইল উত্তরে বারানই নদীর তীরে ইহা অবস্থিত। তাঁহিরপুরের বর্তমান রাজবাড়ীর উত্তরে (নদীর উত্তর ধারে) রামরামা ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা গনেশের আদি বাসভূমি। রাজশাহী জেলার রাজপরিবারগুলির মধ্যে তাহিরপুর ও সাঁতুল জমিদারী সর্ব প্রাচীন। মুসলিম বাঙলার রাজনৈতিক ফারসী ইতিহাস গুলিতে–তাহিরপুরের উল্লেখ আছে[৯৪]। ক্ষুদ্র মোহনপুরের "ভাতুড়িয়া"*

তাহিরপুর

গ্রামটি রাজা গনেশ ও ভাতুড়িয়া পরগণার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। তাহিরপুর হাট বিখ্যাত। এখানে প্রচুর পরিমাণে পেঁয়াজ আমদানী হয়। বর্ষার সময় বহু সওদাগরী নৌকা দক্ষিণ বঙ্গ হইতে এখানে যাতায়াত করে। তাহিরপুর হাইস্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মাদাব বিলের দক্ষিণ দিকে, শেষভাগে এবং তানোর থানার প্রায় ৪ মাইল উত্তরে ইহা অবস্থিত। তালন্দ জমিদার প্রসিদ্ধ ছিল।

ললিত নগর রেল- ষ্টেশনের অদূরে পাকড়ী একটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম। এখানে কয়েক ঘর প্রাচীন জোতদার পরিবারের বাস আছে।

পাতিসর

নাগর নদীর তীরে অবস্থিত। বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের কাচারী বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আছে। এখানকার হাইস্কুল ঠাকুর পরিবারের দানে প্রতিষ্ঠিত।

জোয়াবী

খ্যাতনামা লেখক প্রমথনাথ বিশির জন্মভূমি ও জমিদার বাটীর ধ্বংসাবশেষ আছে।

কবমাড়িয়া

বিখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য্য যদুনাথ সরকারের আদিবাসভূমি। ইহারাও জমিদার ছিলেন।

৯৩. Vide, Rajshahi Gazetteer.

৯৪ Vide, রিয়াজ-উস-সালাতিন, আইন-ই-আকবরী, তারিখি-ই-ফিরিস্তা, মাছির-ই-রাহিমি, তাবাকাৎ-ই-আকবরী, Martin's Eastern India, Vol. 11, History of Bengal (D. U.) Vol. 11, steward's History of Bengal, statistical account of Rajshahi and District Gazetteer প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

* এই ভাতুড়িয়া গ্রামে বিগত ১০/১২ বৎসর আগে রাজ্যপালের একটি কৃষ্ণ-প্রস্তরে খোদাই করা লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহুকাল ধরিয়া ইহা স্থানীয় মৌঃ আবুল কাসেমের বাড়ীতে রক্ষিত ছিল। বর্তমানে ইহা বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সম্পত্তি।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

# ঐতিহাসিক বিবরণ

"বাঙ্গালীর পূর্ব্ব কাহিনী বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত। তজ্জন্য বাঙ্গালী এখন সর্বোতভাবে বহির্মুখী। আত্মপরিচয়হীন অর্ববাচীন উচ্চ শিক্ষার আলোক পুলক তাহাকে বাস্তব অপেক্ষা অবাস্তবের অধিক পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছে।" ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের উপরুক্ত বাণী একদিন অকপটভাবে সত্য ছিল। এখন বাঙ্গালীর সে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন আর তাহারা তাহাদের পূর্ব-কাহিনী সম্বন্ধে ততখানি অজ্ঞ নয়। প্রাচ্য বিদ্যাকে তাহারা কেবলমাত্র সাদরে গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। তাহারা ইহার মূল্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। ইতিপূর্বে যাহারা অজ্ঞাত অল্পজ্ঞাত ছিল তাহারা আজ অনেকেই আত্মনির্ভবশীল। তবে প্রাচ্য বিদ্যায় বাঙ্গালী হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা সুস্পষ্ট। ইহার পশ্চাতে ঐতিহাসিক কারণ রহিয়াছে। তাই বিভাগোত্তর কালে পাকিস্তানে পুরাতত্ত্ববিদের অভাব হওয়ায় সরকারকে বাধ্য হইয়া হুইলার প্রমুখ বিজাতীয় পণ্ডিত নিয়োগ কবিয়া পুরাবিদ্যা ও পুরাকীর্তির উদ্ধার ব্যবস্থা করিতে হয়। অধুনা অবস্থা পরিবর্তিত হইতে চলিতেছে। তরুণ পুরাতত্ত্ববিদেব আবির্ভাব ঘটিতেছে। তাঁহারা তাঁহাদের অতীত ইতিহাস, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য, ধ্যান ধারণা, সামাজিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক মান, শিল্পকলা. ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেকখানি সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। ঊনবিংশ শতক হইতে পাশ্চাত্ত ও মধ্য প্রাচ্যের দেশ সমূহ উন্নতির শীর্ষস্থানে পৌছিবার জন্য বিরামহীন সংগ্রাম করিয়াছেন এবং করিতেছেন। সে ক্ষেত্রে সবেমাত্র যাত্রা শুরু করিয়া মুসলমানগণ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছেন। ইতিপূর্বেও তাহারা নির্বোধ, নিষ্ক্রিয় ও অখ্যাত ছিলেন না। তাঁহাদের ভারত (হিন্দুস্থান) ও বঙ্গ-বিজয় ইতিহাসের বিস্ময় রূপে পরিগণিত হইয়াছে। অলৌকিক ক্ষমতাশালী ধর্মযোদ্ধা ও সূফী দরবেশদেব অপূর্ব আত্মত্যাগ সাধনা ও অধ্যবসায়ের কাহিনী রহিয়াছে। তাঁহাদের সৃষ্ট স্থাপত্য ভাস্কর্য্যের জগৎ মুগ্ধকারী অস্তিত্ত্ব রহিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেব দেশ সমূহে তাহাদের শিল্প বাণিজ্যের ও বাণিজ্য-সম্ভারের রোমাঞ্চকর কথা আছে। তাঁহারাই বাঙলার সৃষ্টি সভ্যতার ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর ও বাঙলার ইতিহাসই হইল মুসলমানদের ইতিহাস। ত্রয়োদশ শতকের আগের ইতিহাস—মূলত: সামন্তচক্রের ইতিহাস। তাহা অনেকটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। মুসলিম বাঙলার ইতিহাসের তুলনায় তাহা অর্বাচিন ও অস্পষ্ট। খ্রীষ্টীয় ১০০৭ সাল হইতে ১৭৬৫ সাল পর্য্যন্ত মুসলমানগণ এই উপমহাদেশের সমস্ত কিছুরই হর্তাকর্তা বিধাতা ছিলেন। এই যুগ পাক-ভারতের গৌরবময় যুগ। এই যুগে পাক-ভারতের ইতিহাসের অভাব নাই। অবশ্য বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস পদবাচ্য হইবার যোগ্যতা আজ অনেকগুলিরই নাই। হিন্দুযুগের ভারত সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ উদ্ধার প্রাপ্ত তাম্রশাসন, প্রস্তরলিপি মুদ্রা ইত্যাদি হইতে ইতিহাস গঠন করিয়াছেন বটে। এই ইতিহাসে অজ্ঞাত অন্ধকারপূর্ণ বহু শতাব্দী

পড়িয়া আছে। কেবলমাত্র রাজার নামটি পাওয়া গিয়াছে–আর কিছুই জানিবার উপায় নাই। কিন্তু, মুসলমান শাসনের সাড়ে সাতশত বৎসরের আলোই প্রকৃতপক্ষে পাক-ভারতের ইতিহাসের আলো। কেবল তাই নয়;–এই আলোতে পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহ আলোকিত হইয়াছিল। যেদিন পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিক এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবে– সেইদিন প্রকৃতই জাতীয় চেতনার উদ্বোধন হইবে। ইহার জন্য আজ উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা এখানে রাজশাহীর (হিন্দু ও মুসলমানের) অতীতের দুই চারিটি বিস্মৃত অধ্যায়ের কথা আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। যদিও তাহার অনেকগুলিই অনেকেই অবগত আছেন। প্রথমেই আমরা পাহাড়পুরের কথা দিয়া আরম্ভ করিব।

ইখতিয়ার উদ-দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলিজির বঙ্গাভিযানের বহু আগের কথা। বরেন্দ্রবাসী তখন সুখী ও সমৃদ্ধশালী জাতি হিসাবে সমগ্র পাক-ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। একাদশ শতকের কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর বর্ণনায় তাহার প্রমাণ সুস্পষ্ট। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী (বগুড়ার–বড় বড়িয়ার নিবাসী?) তখন তাঁহাব কেন্দ্রস্থল বরেন্দ্র মণ্ডলকে "বসুধার শীর্ষস্থান" (বা বরেন্দ্র চুড়ামণি) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন[৯৫]। কবির বর্ণনা বহুলাংশে সত্য। কারণ, গ্রীষ্মপ্রধান এই নদী মাতৃক দেশে বরেন্দ্র মণ্ডলে হিন্দু যুগের যে সমস্ত পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা কবি কল্পনা নহে; প্রত্যক্ষ, যেমন সত্য তেমনি বিস্ময়াবহ। উত্তরবঙ্গ রেলওয়ে ষ্টেশন জামালগঞ্জ হইতে তিন মাইল পশ্চিমে (হিমালয়ের পাদদেশে–দক্ষিণে) রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমায় অবস্থিত পাহাড়পুরের (২৭ একর জমি জুড়িয়া) ধ্বংসস্তূপ তাহার একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহা বহুদূর হইতে পাহাড়ের ন্যায় দেখাইত বলিয়া পাহাড়পুর নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া রাজশাহীতে আরও কয়েকটি পাহাড়পুর ছিল (এখনও আছে যেমন– গোদাগাড়ী, বদলগাছি, ধামৈর হাট থানার পাহাড়পুর) কিন্তু, আলোচ্য পাহাড়-পুরের তুলনায় সেগুলি নগণ্য। নওগাঁর পাহাড়পুর এখন লালিত্যহীন ধ্বংসাবশিষ্ট হইলেও তাহার সর্বাঙ্গে এক প্রবল পুরুস্কার জড়িত রহিয়াছে। তাহা কোন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের ব্যক্তিগত পুরুস্কার নহে; বংশ পরম্পরাগত জাতীয় অধ্যবসায় পূর্ণ অসামান্য আত্মচেষ্টার অনির্বাচনীয় নিদর্শন। অতীতে বহু পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ইহা দর্শন করিয়া ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বুকানন হ্যামিলটন (১৮০৭-১১ খ্রীঃ) ইহাকে একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন[৯৬]। নব্বই বৎসর পূর্বে ওয়েষ্টমেকট (১৮৭৫ খ্রীঃ) তাহার খনন কার্য্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন[৯৭]। কিন্তু বাঙ্গালী তখনও সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ১৮৮০ সালে জেনারেল কানিংহাম পাহাড়পুর পরিদর্শন করিয়া তাহার খনন কার্য্যের আয়োজন করিলে বাঙ্গালী ভূ-স্বামী (বলিহারের জমিদার) কৃষ্ণেন্দ্র রায় কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুন্ন হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন[৯৮]। তৎপূর্বে ১৮৭৬ সালে জনৈক ঘনশ্যাম নামক ব্যক্তি ইহার রহস্যোদ্ঘাটন উদ্দেশ্যে উত্তর ধারে খনন কার্য্য চালাইলে, উক্ত ভূ-স্বামী কর্তৃক তিনিও

৯৫. 'রামচরিতম' কবি প্রশস্তি দ্রষ্টব্য।

৯৬. Eastern India, Vol. 11, P 669

৯৭. J. A. S B, 1875, P 191 and Vol. XL 111, P 189.

৯৮. Cunningham s Archaeological Survey Report. Vol XV, P 118.

বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন[৯৯]। রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সদস্যবৃন্দ ইহার রহস্যোদ্ঘাটনের আশায় বহুবার উহা পরীক্ষা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

হ্যামিলটন বুকাননের আগে এই পাহাড়পুর একটি জনশ্রুতি মূলে 'গোপালচিতারভিঁটা' বলিয়া বিঘোষিত হইত। মুসলমানরা "মৈদল রাজার বাড়ী" বলিয়া ঠাওর করিত। তিনি সত্যপীরের জন্মদাতা বলিয়া কথিত হইতেন। এক সময় উত্তবঙ্গে সত্যপীরের শিন্নী প্রচলিত ছিল। এখনও কোন কোন স্থানে অজ্ঞ মুসলমানদের মধ্যে সত্যপীরের মলিদা'* বিতরণ হইয়া থাকে। কিন্তু এই জনশ্রুতি যে ঐতিহাসিক কালের পরিচয় প্রদান করিত, তাহা মুসলমান শাসন কালীন। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপ তাহার বহু আগের স্মৃতি চিহ্ন বলিয়া বোধ হইত। কারণ ইহার চতুর্দ্দিকে পরি-খাদির চিহ্ন বিশেষ না থাকায় ইহাকে রাজবাড়ী বা রাজদুর্গ বলিয়া অনুমান করা যুক্তি সঙ্গত হইত না। কোন কোন ঐতিহাসিক তাহা ধর্ম সংক্রান্ত কোন মন্দির বিশেষ বলিয়া অনুমান করিতেন। ইংরেজ রাজপুরুষগণ তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন কালের চিতার উপর চৈত্য নির্মাণের কথা সুবিদিত। পাহাড়পুর পরীক্ষা কালেও তাহা প্রচলিত ছিল, এখনও সে প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই। পাহাড়পুরকে তখন কেহ কেহ চৈত্যাবশেষও বলিতেন। পাহাড়পুরের উত্তর পশ্চিম কোণে ৮।৯ মাইল দূরে চ্যাংগার বিলের তীরে একটি স্তুপ ছিল। এখন তাহা নাই। তাহাই বোধ হয় কানিংহামের গোপালচিতার ভিঁটা ছিল। বৈশাখ মাসে শুক্ল দশমীতে দেবপাল রাজার নামে সেখানে পূজা হইত। কানিংহাম তাহাকে দেবপালের চৈত্যাবশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[১০০]। স্থানীয় লোকেরা তখন তাহাকে "দেবপাল রাজা কা ছত্রী[১]" বলিত। পালরাজ বংশের প্রথম রাজা গোপালদেবের ভস্মাধার পূর্ণ চৈত্য ধ্বংসাবশেষ অনুমান অসঙ্গত নয়। কারণ প্রজাপুঞ্জ "মৎস্য ন্যায়" নামক অরাজকথা দূর করিবার মানসে গোপালদেবকে রাজপদে নির্বাচিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ধর্মপালদেবের খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে উহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে[২]। গোপাল ও তাঁহার বংশধরগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। মধ্যযুগে তাঁহারাই বাঙলার বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান আশ্রয় স্থল ছিলেন। তাহা ঐতিহাসিক সত্য। খালিমপুরে এই তাম্রশাসন আবিস্কৃত হইবার পর ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা ভুক্ত হয়। সপ্তদশ শতকে তিব্বতী ঐতিহ্যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের কথা সুস্পষ্ট। সে কথা আমরা একটু পরেই আলোচনা করিব। নারায়ণ পালদেবের সমর হইতে মদন পালদেবের সময় পর্য্যন্ত পাল রাজগণের যে সমস্ত তাম্রশাসন আবিস্কৃত হইয়াছে তাহার প্রত্যেক শাসনের প্রথম শ্লোকে-- গোপালদেবের দ্বিতীয় "দশবল লোকনাথ" বলিয়া উল্লেখিত[৩]। "দশবল" অর্থে বুদ্ধদেব। রাজকবি গোপালদেবকে বুদ্ধদেবের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন[৪]। গোপাল দেবের পুত্র ধর্মপালদেব সমগ্র আর্য্যাবর্তে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ

৯৯. Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol XV, P 120

* প্রধানতঃ আলো চাউলের কাঁচা আটা, কলা, চিনি (অভাব পক্ষে গুড়) ও দুধ মিশ্রিত কবিয়া এক প্রকারের পায়েস প্রস্তুত হয়। তাহাকে সাধারণ মুসলমানরা 'মলিদা' বলে। হিনদরা ইহাকে 'নাবায়ণ ভোগ' বা মোক্ষিত বলিয়া থাকে।

১০০ Vide, Ibid, P 121. ডঃ নীহার রঞ্জন রায়েব বাঙ্গালীর ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

১. Cunningham's Vol, XV, P 121.

২. গৌড় লেখমালা ১১-১৭ পৃঃ।

৩. গৌড় লেখমালা ৫৬-৬২ পৃঃ।

হইয়াছিলেন। হয়ত তিনি পিতার চিতাভস্ম সংরক্ষণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গোপাল চিতার ভিঁটা তাহারই স্মৃতি বহন করিয়া পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে।* সুতরাং কানিংহামের বর্ণিত গোপালচিতার ভিঁটা সত্য হইলেও হইতে পারে। কেননা গোপালদেবের 'জনকভু' (পিতৃ ভূমি) বরেন্দ্রীর অন্তর্ভুক্ত[৫]। "রামচরিতে" উহার উল্লেখ সুস্পষ্ট। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার বগুড়ার মহাস্থানের অদূরে গোপাল দেবের বাসভূমির উল্লেখ করিয়াছেন[৬]। যাহা হউক, কানিংহাম পাহাড়পুর ধ্বংস স্তূপের একটি বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। "এই বৃহৎ ধ্বংস স্তূপ একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে ১৫০০ ফুট দীর্ঘ পার্শ্ববিশিষ্ট একটি চতুর্ভুজ ক্ষেত্র বেষ্টনী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা বিপুলায়তন মৃৎ প্রাচীরে গঠিত। তাহার পূর্বদিকের বিস্তার ১৫০ ফুট, অন্যান্য দিকের বিস্তার ১০০ ফুটের অধিক হইবে না[৭]। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে অবস্থিত ধ্বংসাবশেষটির উচ্চতা ১৫০ ফুট হইতে পারে বলিয়া বুকানন অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু কানিংহামের মাপে ইহা ৮০ ফুট মাত্র। তিনি ইষ্টকের আয়তন ধরিয়া গণনা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। 'অট্টালিকাটি অক্ষতাবস্থায় ১০০ ফুট ছিল। যেমন বৃহৎ তেমনি সুন্দর ছিল। তাহার বহির্ভাগ কারুকার্য্য খচিত ইষ্টক দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। তিনি ইহার প্রমাণ স্বরূপ একটি ইষ্টক চিত্রও মুদ্রিত করিয়াছেন[৮] বুকানন ইহাকে হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলেন নাই। কেননা হিন্দু মন্দিরের মধ্যে সাধারণত: গর্ভ বা কক্ষ থাকে। মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িলে বাহিরের উচ্চতা রক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ অত্যধিক উচ্চতায় তখন বৌদ্ধ মন্দিরের ইঙ্গিত করিত। ইহার প্রাচীর সংলগ্ন কক্ষগুলি উচ্চতা রক্ষা করিতে পারে নাই। সেইজন্য বোধ হয় তখন ওয়েষ্টমেকট উহাকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাস কক্ষের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু কানিংহামের সংগৃহীত ইষ্টকগুলির মধ্যে একটিতে কৃশোদরী কালিমূর্তি অঙ্কিত ছিল দেখিয়া পাহাড়পুরকে "ব্রাহ্মণ্য" মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। বুকানন, ওয়েষ্টমেকট ও কানিংহামের এই সব সংগৃহীত তথ্যাদির অনৈক্য পণ্ডিতদের মধ্যে নানা তর্কবিতর্কের সূত্রপাত করে। ফলে পাহাড় পুরের ঐতিহাসিকতা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা বাক্ বিতণ্ডা চলিতে থাকে। এই সমস্ত কারণে ১৯২৭ সালে ১৮ই মার্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতায় ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কানিংহামের উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া পাহাড়পুরকে বৌদ্ধ কীর্তির নিদর্শন বলিয়াছিলেন। তারপর পাহাড়পুর নিবাসী জনৈক ছমির সোনার উক্ত ধ্বংসাবশেষের দক্ষিণ–পশ্চিম কোণে একটি প্রাচীর হইতে ইষ্টক আহরণ করিতে গেলে একটি প্রস্তর স্তম্ভের লিপিযুক্ত কিয়দংশ আবিস্কৃত হইয়া পড়ে। এই লিপিটি আবিস্কৃত হইবার পর উহা বৌদ্ধ কীর্তির নিদর্শন বলিয়া প্রতিভাত হইয়া উঠে। উহা অষ্টকোন বিশিষ্ট "বজ্র" শ্রেণীর স্তম্ভের অগ্রভাগ[৯]। তাহাতে চারি পংক্তি লিপি খোদিত ছিল। বরেন্দ্র

৪. গৌড় লেখমালা ১২–১৩ পৃষ্ঠা (ফুট নোট দ্রষ্টব্য)।

* গ্রন্থকারের পরবর্তী 'উত্তর বঙ্গের ইতিহাসে' বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৫. "রামচরিতম্" প্রথম পরিচ্ছেদ, ৩৮ শ্লোক–and also Ibid. P 34.

6 Vide. History of Bengal (D U.) Vol. I, দ্রষ্টব্য।

৭. Cunningam's Vol XV. P 118

৮. Vide, Ibid, P 120

9 K N D. Excavation at PaharPur, Bengal M. A S T. No-55, P 75

অনুসন্ধান সমিতির সদস্য শ্রীরাম মৈত্রেয় মহাশয় তাহা সংগ্রহ করিয়া রাজশাহীতে সমিতির কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার লিপিটি এইরূপ :

ওঁ রত্ন ত্রয় প্রমোদেন।
সত্বানাংহিতকাংক্ষয়া।
শ্রীদশবল গর্ভেন।
সুভোয়স্কারিতো বর:*।

উহার ভাবনুবাদ এই যে: ত্রিরত্নের (ধর্ম–বুদ্ধ–সঙ্ঘের) প্রমোদ সাধনার্থ জীব সমূহের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায় শ্রীদশবল গর্ভ নামক ব্যক্তি কর্তৃক এই উৎকৃষ্ট স্তম্ভ নির্মাণ করা হইয়াছিল। এই স্তম্ভ লিপি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও ঐতিহাসিক উপাদানের আধার ছিল*। এই লিপিটি আবিষ্কারের ফলে পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ লইয়া পণ্ডিত মহলে তখন চাঞ্চল্য ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিক মৈত্রেয় মহাশয় উক্ত লিপির মর্ম প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "দানপতি দশবল গর্ভ পূণ্যস্থানের প্রতি (পাহাড়পুর মন্দিরের প্রতি?) সম্মান প্রদর্শন নিমিত্তে সর্বসত্ব হিতাকাঙ্খা প্রণোদিত হৃদয়ে এই প্রস্তর স্তম্ভটি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যে পুণ্য স্থানে এই পুণ্য কর্ম সম্পাদিত হইয়াছিল তথায় পূর্ব হইতেই অট্টালিকাদি বর্তমান না থাকিলে, এরূপ স্তম্ভোৎসগ ব্যাপার সুসংঙ্গত বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে না।" সুতরাং একাদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই পাহাড়পুরে অট্টালিকাদি নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, আমরা জানি মৌর্য্য সম্রাট অশোকের আগে বুদ্ধদেব পৌণ্ড্রবর্ধনে আগমন করিয়াছিলেন, কোন কোন গ্রন্থে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়[১০]। পরে, সম্রাট অশোকের সময় সেখানে একটি সঙ্ঘারাম নির্মিত হইয়াছিল (যেখানে বুদ্ধদেব কিছুকাল অবস্থান করিয়া জৈনদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন)। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পৌণ্ড্রবর্ধনে (উত্তর বঙ্গে) বৌদ্ধধর্ম সুপ্রাতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে বাঙলা দেশের সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্ম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বোধ হয় চতুর্থ শতকের কিছু আগে হইতেই চীনের বৌদ্ধ শ্রমণেরা বাঙলা দেশে বিশেষত: উত্তর বঙ্গে যাতায়াত করিতেন। মহারাজা শ্রীগুপ্ত এই সব চীনা ভিক্ষুদের ব্যবহারের জন্য উত্তরবঙ্গে একটি 'চীনা মন্দির' নির্মাণ করাইয়া তাহার সংরক্ষনের জন্য ২৬টি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। পঞ্চম শতকের গোড়ায় চীনের বৌদ্ধ শ্রমণ (খ্রী: ৩৯৯-৪১৪) ফা-হিয়েন বাঙলা দেশে আসিয়াছিলেন[১১]। এই সময় বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধি কম ছিলনা। রাজশাহী ও বগুড়া তথা উত্তর বঙ্গে আবিস্কৃত বৌদ্ধ মূর্তিগুলিতে তাহার প্রমাণ মিলে। ষষ্ঠ শতকের গোড়াতে বাঙলার পূর্বতম প্রান্ত ত্রিপুরায় মহাষাণ বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল।

---

* উল্লিখিত লিপিব "দশবল" শব্দটি প্রথম দসবল রূপে খোদিত হইয়া পরে সংশোধিত হইয়াছিল। "প্যাগু–সাম-জন-জঙ্গ" নামীয় তিব্বতীয় গ্রন্থে বৌদ্ধগণের নামেব মধ্যে দশদলশ্রী, অজয়-গর্ভ, শ্রীগর্ভ আনন্দ গর্ভ রামের পরিচয় পাওয়া যায়।

* এই স্তম্ভ লিপিটি আবিস্কৃত হইয়া পড়িলে ১৯১৯ সালে পাহাড়পুর ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন কীর্তিব অন্তর্ভূক্ত হয়।

১০. Cunningham's Vol XV P 103, And also vide the life of Hiuen Thsang, chapter IV, P 131

১১. S Beal records, vol, 11, p. 105; ডঃ নীহার রঞ্জন রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় কত 'বাঙ্গালীর ইতিহাসে' বৌদ্ধ ধর্মেব আলোচনা দ্রষ্টব্য;

চীনা শ্রমণের গ্রন্থে সপ্তম শতকের বাঙলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্দ্ধে পাক-ভারতের ইতিহাসে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক (খ্রী: ৬২৯ হইতে ৬৪৫) হিয়েন সিয়াং এর কাল। তিনি সম্ভবত: খ্রী: ৬৪২-৪৪৩ সালে বাঙলা দেশ পরিভ্রমণ করেন[১২]। এই সময় তিনি পৌণ্ড্র বর্ধনে শতাধিক দেবালয় এবং ২০টি সংঙ্ঘারামে তিন সহস্রাধিক মহাযানী হীনযানী ভিক্ষু; সমতটের ত্রিশটি বিহারে দুই হাজার স্থবিরবাদী শ্রমণ দেখিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিবরণের পৌণ্ড্রবর্ধনে ২।৩টি বিহার বা স্তূপ ব্যতীত আর গুলির আবিষ্কার হয় নাই। অশোক রাজ নির্মিত স্তূপ 'ভাসু বিহারের' ধ্বংসাবশেষ আধুনিক ঐতিহাসিকদের পো-সি- পো-বা অপভ্রংশে ভাসুবিহার। কানিংহাম-এর আমলে এই স্তূপটি ৩০ ফুট ছিল। বর্তমানে ইহার উচ্চতা ২০ ফুটের কিছু কম হইবে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৃষ্টির অন্তরালে ক্ষয়জনিত কারণে এই স্তূপটির চারিপার্শ্বে কৃষিক্ষেত্র রচিত হইতেছে। কিছুদিন আগে হইতে এখানে স্বর্ণ মুদ্রাদির প্রাপ্তির সংবাদ শোনা যাইতেছে। ১৯৬১ সালে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ্য মাসে দুইটি স্বর্ণ মুদ্রার খবর পাইয়া আমি উহার উদ্ধারের আয়োজন করিবার পূর্বেই স্বর্ণকাররা তাহা ভাঙ্গিয়া অলঙ্কার প্রস্তুতের কাজে লাগাইয়াছিল। উহার একটির ওজন ছিল আট (৷৷০) আনা, অপরটির ওজন সাত (=) আনা। উদ্ধারকারী। শ্রমিকদের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, এই মুদ্রা দুইটির এক পৃষ্ঠে নাকি মানুষের হাতে ত্রিশুল ছিল। সম্প্রতিকালে আমি এখান হইতে একটি পোড়ামাটির জৈন মূর্তি সংগ্রহ করিয়াছি। দুঃখের বিষয়, এখনও ইহার খনন কার্য্যের কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় উক্ত ভাসুবিহারের প্রাচীনতার সমর্থনযোগ্য কোন তথ্য উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই।

সে যাহা হউক, চীনা পরিব্রাজক হিয়েন সিয়াংএর 'ভ্রমণ বৃত্তান্তে' আমাদের আলোচ্য পাহাড়পুরের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় সপ্তদশ শতকের লামা তারনাথের ইতিহাসে (ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস)। এই ইতিহাসে বরেন্দ্রী মণ্ডলে সোমপুরা বা সোমপুরীতে দেবপাল কর্তৃক একটি বিহার স্থাপনের বিবরণ আছে[১৪]। বোধগয়া ও নালন্দা হইতে আবিষ্কৃত[১৫] দুইটি উৎকীর্ণ লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, একাদশ শতকের শেষার্দ্ধে এই সোমপুরী বিহার বিদ্রোহী বঙ্গাল সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত ও অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল। এই সোমপুবা (বা সোমপুরী) বিহারের আরও উল্লেখ পাওয়া যায় ভোজ বর্মনের বেলাব তাম্রশাসনে[১৬]। বলা বাহুল্য পাহাড়পুরই যে "সোমপুরা বিহার"–খনন কার্য্যের ফলে আবিষ্কৃত উপাদানে তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে[১৭]।

১২. Julien's Hiuen Thsang vol III, P 74, and also Cunningham's Archaeological survey Report, Vol XV

১৩. S Beal's Records Vol II, P 105, এবং মদীয় 'বগুড়াব ইতিকাহিনীর' বিহার গ্রাম দ্রষ্টব্য; The ancient Monuments' of Varendra

১৪. Nalanda, P 9, 1959, Ibid, P 209

১৫. K C Sarker's Bouthgouah দ্রষ্টব্য।

১৬. Inscriptions of Bengal, Vol III, P P. 14-24.

১৭. K N Excavations at Paharpur, Bengal (Paharpur Monument) and also Vide-Mahasthan and its environs

অষ্টম হইতে একাদশ শতক পর্য্যন্ত এই সোমপুরী বৌদ্ধ সংঙ্ঘারামটি জ্ঞানগৌরব মণ্ডিত হইয়া সমগ্র বরেন্দ্রী মণ্ডলের যশোপ্রভা বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সময় সোমপুরা বিহারটি বৌদ্ধ দীপঙ্করগণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশে মুখরিত ও জ্ঞানালোকে সমগ্র ভারতবর্ষে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর (দ্বাদশ শতকে?) বাঙলায় বৌদ্ধ ধর্মের হীনাবস্থায় সেই মহা সমৃদ্ধশালী দিগন্ত বিশ্রুত সোমপুরী বৌদ্ধ সংঙ্ঘারামটি তাহার সকল ভূষণ সম্ভার লইয়া বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিলীন হইয়া উঠিল। নানাপ্রকার হিংস্র জন্তু জানওয়ারের আবাসক্ষেত্র রচিত হইল। অতীতে উহা কত পথচারীকে থমকাইয়া দাঁড় করাইত, কত কবির কল্পনায় ইহার স্মৃতি পড়িয়া রহিল তাহার সবগুলির খবর অবগত হইবার উপায় নাই। এইরূপভাবে যুগে যুগে বহুকাল অতীত হইবার পর আবার তাহার উন্মোচনের ব্যবস্থা হইল। দুর্ভেদ্য বন-জঙ্গল পরিষ্কার হইল। মানুষ আসিল বটে, কিন্তু সেই সব ভস্মাধার আর গ্রহণ করিল না। যাহারা বরেন্দ্রভূমির সকল ভূষণ সম্ভার দিয়া ইহার অঙ্গাভরণ রচনা করিয়াছিল, তাহারা বহুযুগ আগেই গত হইয়া গিয়াছে। এখন কেবল কালের স্বাক্ষর স্বরূপ সেই বিশ্ব বিশ্রুত সংঙ্ঘাবামটির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে।

বহুবার বহু ঐতিহাসিকদের পরীক্ষা ও পরিদর্শনের পর পাহাড়পুর খননের আয়োজন হয়। জেনারেল কনি হামের পর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কুমার শরৎ কুমার রায় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক (প্রথম পর্য্যায়ে আরম্ভ ১৯২২-২৩ সাল এবং দ্বিতীয় পর্য্যাযে ১৯২৫-২৬ সাল হইতে) প্রচেষ্টা সফল হইলে আসিলেন–'পূর্বাঞ্চল পুরাতত্ত্ব বিভাগের পক্ষে ঐতিহাসিক ড: ভাণ্ডাবকর ও রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এবং অবশেষে ১৯৩৩-৩৪ খ্রীঃ কে, এন দীক্ষিত কর্তৃক পাহাড়পুর খনন কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। অতঃপর পাহাড়পুরে যে সমস্ত পোড়ামাটির মূর্তি জীবজন্তু–পশু পক্ষী মন্দির গাত্রে[১৮] আবিষ্কৃত হয় তাহার অধিকাংশই পাহাড়পুরের চতুষ্পার্শ্বে ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এখনও পরিলক্ষিত হয়।

পাহাড়পুবে খননকার্য

পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত মৃৎফলক শীলমোহরগুলির উপরিভাগে ধর্মচক্র ও মুখোমুখি যুগল মৃগ খোদিত, নিম্নভাগে প্রস্ফুটিত পদ্ম ও মধ্যভাগে উৎকীর্ণ লিপি 'শ্রী সোমপুরে শ্রীধর্মপালদেব–মহাবিহারীরার্থ ভিক্ষু সজ্ঘস্য' অর্থাৎ সোমপুরে অবস্থিত শ্রী ধর্মপাল দেব মহাবিহারে আর্য্য ভিক্ষু সঙ্ঘের শীলমোহর[১৯]। এই শীলমোহর আবিষ্কৃত হইবার পর আমরা অবগত হই; পাল রাজা ধর্মপাল কর্তৃক অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সোমপুরে এই মহাবিহার স্থাপিত হয়। যদিও তিব্বতী ঐতিহ্যে দেবপালকে ইহার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হয়ত তারনাথ জনশ্রুতি মূলে দেবপালকে সোমপুরী বিহারের প্রতিষ্ঠাতা রূপে শুনিয়া থাকিবেন। এতদঞ্চলে ধর্মপালের শীলমোহর আবিষ্কৃত হওয়ায় উক্ত সোমপরী ই যে পাহাড়পুর তাহাতে আর কাহারও দ্বিমত নাই। এবং স্থানীয় প্রচলিত জনশ্রুতি– "শোনাপুরাই" যে প্রাচীন সোমপুরা বা সোমপুরীর অপভ্রংশ সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। পাহাড়পুরের অদুরে 'ওমপুর' গ্রাম সোমপুরী বিহারের আর একটি স্বাক্ষর বহন

আবিষ্কৃত উপাদান

১৮ London News, Jan, 29, 1927, P. 160, Modern Review Apnl, 1928, P 502

১৯. 'সাহিত্যপত্র' পৃঃ ১২৯ ও ১৩০ দ্রষ্টব্য, ১৩৬৬ সাল।

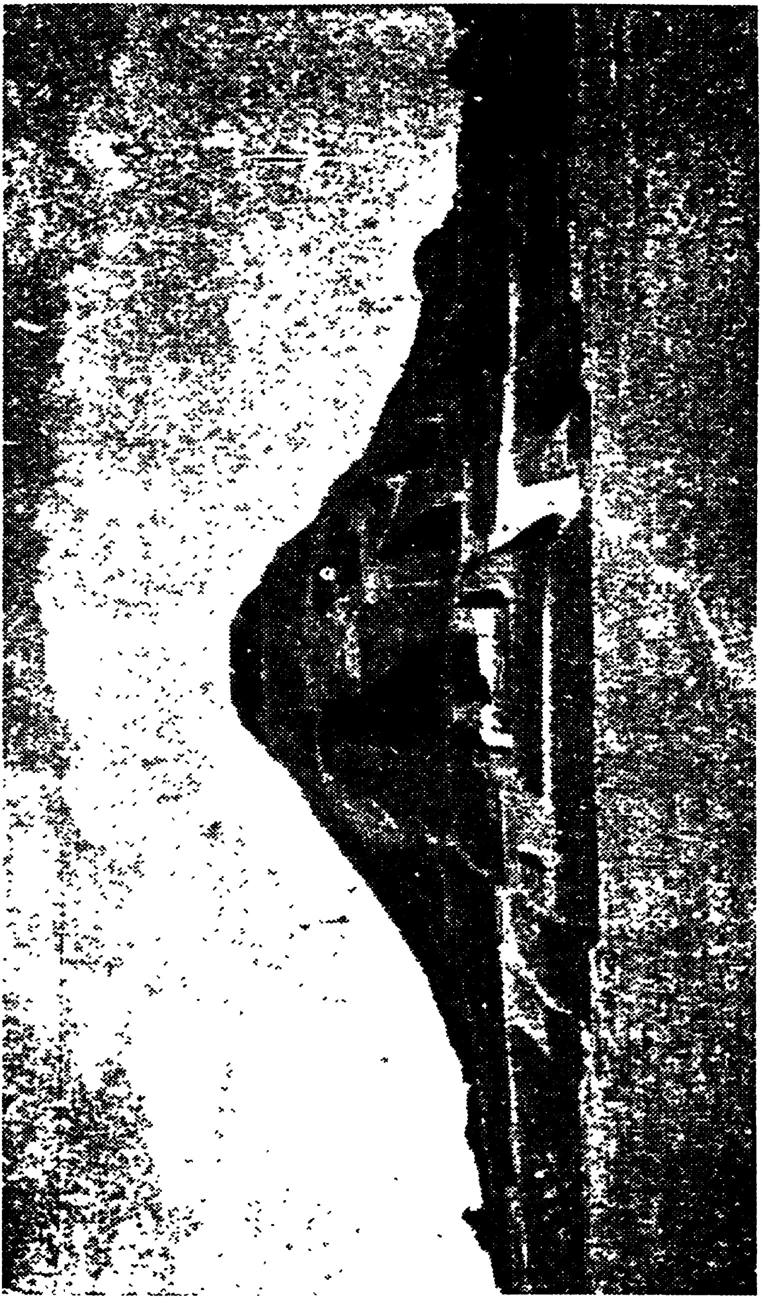
করিতেছে।

তাহা ছাড়া আমরা আরও জানিতে পারি; এই মহাবিহারের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটির ভূমি নকশা ও আকৃতি প্রকৃতি; পাক-ভারতে আবিস্কৃত অন্যান্য সংঙ্ঘারামগুলির সাধারণ নকশা অনুযায়ী সোমপরী বিহারটি স্থাপিত হইয়াছিল এবং ইহার চারি পার্শ্বে সারিবদ্ধ কক্ষ বিশিষ্ট একটি চতুষ্কোনায় তন চত্বর ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ এই কক্ষগুলিতে বাস করিতেন। ইহা ব্যতীত চত্বরটিতে রন্ধনশালা, কার্য্যালয় ও আরও কিছু পীঠ প্রভৃতি ছিল। পাক-ভারতে আবিস্কৃত সংঙ্ঘারামগুলির মধ্যে আলোচ্য সোমপুরী সংঙ্ঘারামটি নানা কারণে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ও আয়তনে সবচেয়ে বৃহৎ ছিল। চারিকোণ বিশিষ্ট ভূমিটির প্রতিটি বেড় নয়শত ফুট দীর্ঘ এবং চতুষ্পার্শ্বে ভিক্ষুদের সর্বমোট ১৭৭টি মতান্তরে ১৮০টি কক্ষ ছিল। প্রত্যেক কক্ষের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া একটি অলিন্দ ছিল। এই ত্রিতল সু উচ্চ মন্দিরটি ক্রমশ: উপরের দিকে সরু হইয়া উঠিয়া গিয়াছে। উত্তরে প্রকাণ্ড সিঁড়ি ধাপে ধাপে ত্রিতল পর্য্যন্ত বিন্যস্ত। দ্বিতলে মন্দির প্রকোষ্ট; সেখানে বিহারের অধিষ্ঠাতা দেবতার পূজা হইত। মন্দিরের চারিপার্শ্বে চওড়া উঠান, প্রত্যেক কোণে একটি করিয়া মণ্ডপ ছিল। ইহা পীড়া মিডাকৃতি ত্রিতল মন্দির; উপরে শিকারাকৃতি চূড়া এবং ইহার ভূমি নকশা ক্রুশাকৃতি। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ৩৫৬১/২ ফুট এবং পূর্ব পশ্চিমে ৩১৪৩´ ইঞ্চি এবং এখনও অবশিষ্ট দীর্ঘতম উচ্চতা ৭০ ফুটের কিছু কম রহিয়াছে। ইহার স্বাপত্যরূপ অভিনব। ইহার সর্ব নিম্নতল জুড়িয়া প্রস্তর ফলকের সারি এবং আর এক সারি মৃৎ–ফলক। দুইটি উপরের তলার দেওয়ালগুলিও দুই সারি করিয়া পোড়া মাটির ফলকে আচ্ছাদিত। এই সোমপুরী মহাবিহারটি আবিস্কৃত হওয়ায় বিশেষত: আমরা পৌণ্ড্রবর্ধনের সেকালের মানুষের ধর্মীয় রীতিনীতি, সামাজিক সম্বন্ধ, অর্থনৈতিক অথবা শিল্পকলা সম্বন্ধনীয় নূতন তথ্য জানিতে পারিলাম। এবং এই সুপ্রাচীন রূপরেখাটি৬ ধরিতে পারাইতো প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার সার্থকতা।

উত্তরে দামোদরপুর হইতে দক্ষিণে ধানাইদহ শতাধিক মাইলের দূরত্ব এবং পশ্চিমে বানগড় হইতে পূর্বে মহাস্থানগড়ের দূরত্ব প্রায় ৮০ মাইল। এই চতুঃসীমা বেষ্টনীর মধ্যে রাজশাহী জেলার উত্তর-পূর্ব কোণে পাহাড়পুরের অবস্থান বিশেষ অর্থময়। আবার এই পাহাড়পুরের ৭।৮ মাইল পশ্চিমে প্রাচীন আত্রায়ের খাতের (ঘুকশীর বিলের তীরে) উত্তর তীরে জগদ্দল-মহাবিহার এবং দক্ষিণে রামাবতীর উল্লেখ ঐতিহাসিকদের নিকট আজ কম অর্থপূর্ণ নয়। অত্র ইতিহাসে প্রাচীন পথঘাটে আমি পাহাড়পুর, গরুড়স্তম্ভ, বানগড়, জগদ্দল মহাবিহার, রামাবতী প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ করিয়াছি। মহাস্থানগড় হইতে পাহ-ড়পুরের অবস্থানের দূরত্ব প্রায় ৩০ মাইল।

অষ্টম হইতে একাদশ শতক পর্য্যন্ত বাঙলা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের জয় জয়কার। পাল রাজাদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধর্ম বাঙলা বিহার ছাড়িয়া আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই সময়ের বৌদ্ধ বিহার মহাবিহার গুলি বৌদ্ধ ধর্ম ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত, বিক্রমশীল-মহাবিহারে তিব্বত হইতে অগণিত বৌদ্ধ জ্ঞান পিপাসুরা সেখানে আসিয়া জ্ঞান চর্চ্চা করিতেন। রাজশাহীর সোমপুরা মহাবিহারে প্রায় ৮০০ ভিক্ষুর বাসোপযোগী স্থান

পাহাড়পুরের অবস্থান



পাহাড়পুরের স্তূপ



পাহাড়পুরে আবিস্কৃত মৃৎশিল্পের লোকায়ত্ব রূপ

ছিল। এখানে বাস করিতেন মহাপণ্ডিতাচার্য্য বোধি ভদ্র বহুখ্যাত দীপঙ্করশ্রীজ্ঞান অতিশ। তিনি* বহু বৎসর ধরিয়া সোমপুরা মহাবিহারে অধ্যয়নে রত ছিলেন। এবং তাঁহার গুরু রত্নাকরশান্তি এই বিহারের স্থবির ছিলেন।

বুদ্ধগয়ার এক লিপিতে উল্লেখ আছে যে. স্থাবির বীর্যেন্দ্র সোমপুরাতে বাস

---

* বাঙ্গালী বৌদ্ধ মহাচার্য্যাদের মধ্যে দীপঙ্করশ্রীজ্ঞানেব নাম এখনও বাঙ্লা দেশের বৌদ্ধ পবিবারে সুপরিচিত। তাঁহাব জন্মভূমি ছিল পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে। আনুমানিক ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গৌড়ের বাজ-পবিবাবে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কল্যাণশ্রী, মাতাব নাম প্রভাবতী। বাল্যকালে তাঁহাব নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। যৌবনে তিনি বরেন্দ্র নিবাসী একজন বৌদ্ধ আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পব পশ্চিম ভারতের কৃষ্ণগিরি বিহাব হইতে রাহুল গুপ্তেব নিকট বৌদ্ধ ধ্যানে দীক্ষা গ্রহণ কবেন। সেখানে তাঁহার নাম হয গুহ্যজ্ঞানবজ্র। ১৯ বৎসর বযসে ওদন্তপুবী বিহাবে আচার্য্যশীল বক্ষিতের (?) নিকট দীক্ষা গ্রহণ কবিলে তখন তাঁহার নাম হয় দীপঙ্কবশ্রীজ্ঞান। ১২ বৎসব পব তিনি ভিক্ষুব্রতী হন এবং আচার্য্যধর বক্ষিতের নিকট বোধিসত্ত্ব ব্রতে দীক্ষিত হন। তাহাব পর তিনি সুবর্ণ দ্বীপে-চন্দ্রকীর্তির নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ করিয়া সেখানে ১২ বৎসব অতিবাহিত করেন। সেখান হইতে তিনি সিংহল হইয়া মগধে (বিহার) ফিবিয়া আসেন। ইহাব পব তিনি ধর্মপালেব আহ্বানে বিক্রমশীল মহাবিহারে আচার্য্যপদ গ্রহণ করেন। বিক্রমশীল অবস্থানেব সময তিব্বতেব বাজ-পরিবার তাঁহাকে আহ্বান করেন। পরে, তিনি বারবাব অনুরোধের পর শেষ পর্য্যন্ত তিব্বতে গিয়াছিলেন। তিব্বতের পথে নেপাল রাজেব পুত্র পদ্মপ্রভ তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিব্বত পথের সঙ্গী হন। তিব্বতে তিনি বহুস্থান পরিভ্রমণ কবিযা ধর্ম প্রচার করেন। তিব্বতের থো-লিং বিহারে ১৩ বৎসর অতিবাহিত করিবার পর ৭৬ বৎবসব বয়সে ১০৫৩ সালে তাঁহাব মৃত্যু হয়।

করিতেন; তাঁহার বাসভূমি ছিল সমতটে। বিপুলশ্রীমৈত্রের নালন্দা লিপি হইতে[২০] তিনজন তপস্বী-বিপুল শ্রীমিত্র নিজে, তাঁহার পরম গুরুর গুরু করুণা শ্রীমৈত্র ও মৈত্র শ্রীমৈত্রের নাম জানা যায়। পূর্বোক্ত স্তম্ভগাত্রে শ্রীদশবল গর্ভ, অজয়গর্ভ ও শ্রীগর্ভের নামতো আগেই উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহারা সকলেই সোমপুরীতে বাস করিতেন। পরে, বঙ্গাল সৈন্যরা বিদ্রোহী হইয়া এই সোমপুরী বিহার অগ্নিদগ্ধ করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত তিব্বতী গ্রন্থে আরও বৌদ্ধ বিহারের নাম পাওয়া যায়। যেমন–নালন্দা, বিক্রমশীল, ওদন্দপুরী (বিহার) বিক্রমপুরী (ঢাকার বিক্রমপুরে), পণ্ডিত বিহার (চট্টগ্রাম), জগদ্দল মহাবিহার (রাজশাহী), দেবকোট বা বানগড় (পশ্চিম দিনাজপুরে), শন্নগর (রাজশাহীর ঘাটনগরের সন্নিকট?) পাট্টিকেরক (সম্ভবত: ময়নামতীতে আবিস্কৃত বিহারটি) এবং সম্প্রতি ময়নামতীতে আরও কয়েকটি বিহার আবিস্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। এবং ত্রিপুরাতে কনক স্তূপ বিহার ইত্যাদির কথা অবগত হওয়া যায়। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি ছোট বিহার পালরাজগণের 'জনকভু' বরেন্দ্রীতে ছিল। এইসব বিহারে অসংখ্য খ্যাত অখ্যাত আচার্য্যেরা অক্লান্ত ভাবে জ্ঞান সাধনা করিতেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই তিব্বতী ভাষায় অনূদিত।

"সেন বর্মণ পর্বে বাঙলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও দেবদেবীর প্রভাব ক্রমশ: হ্রাস পাইতেছিল। বিহার-মহাবিহার এবং আচার্য্যদের আগেকার সে প্রতিপত্তি ছিল না। এমন কি সাড়ে তিনশত বৎসর ধরিয়া যে বৌদ্ধ ধর্ম উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে এতখানি প্রসার লাভ করিয়াছিল যে, সেখানেও দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকের বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি খুঁজিলে খুব বেশী পাওয়া যায় না। সেন, বর্মণ, রাজবংশ, বৌদ্ধ ধর্ম ও সঙ্খের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন না। বরং তাহাদিগের প্রতি বিরাগ ও ভৎসনায় বৌদ্ধদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই দ্বন্দ্ব সংঘাত বহু আগে হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। এই ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম নায়কদের বাক বিতণ্ডার ইতিহাসই হইল প্রাচীন ও মধ্যযোগীয় পাক-ভাবতের ধ্যান ধারণার ইতিহাস। আমরা আরও দেখিতে পাই, ধর্মের যত কিছু ছোঁয়াচ, সংঘাত তাহা সমস্তই সমাজের উপরস্তরে। নীচের তলায় তেমন দেখা যায় না। সাধারণের মধ্যে মিলন আর সমন্বয়ের ভাব আগেও ছিল এখনও আছে।"

সেন বর্মণ পর্বে বৌদ্ধ ধর্ম

পালচন্দ্র পর্ব হইতে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর রূপ কল্পনায় তাহার ছাপ পড়িয়াছিল। বৌদ্ধ বিহারগুলিতে যেমন ব্রাহ্মণ্য দেবায়তণগুলিতে বৌদ্ধ দেবদেবীরা স্থান পাইয়াছে। এই সমন্বয় সাধন যেমন দেখা গিয়াছে নালন্দা বৌদ্ধ বিহার মন্দিরে– শিব, বিষ্ণু, পার্বতী, গনেশ, মনসা ইত্যাদি। তেমনি পাহাড়পুর মন্দিরেও দেখা গিয়াছে– প্রস্তর, মৃৎফলক গুলিতে উৎকীর্ণ ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মুর্তি। এই ফলকগুলিতে বৌদ্ধ দেবদেবী যতনা চিত্রিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী চিত্রিত হইয়াছে তদপেক্ষা অধিক বেশী। তাহা ছাড়া রামায়ণের বহু গল্প, এবং শিব, গনেশ ও অগ্নিমূর্তি তো আছেই। বোধিসত্ব, বৌদ্ধ পানির মূর্তি, মঞ্জুশ্রী, জম্ভল, মৈত্রেয় যেমন আছে তেমনই আছে গনেশ, শিব, গরুড়, ব্রহ্ম, সূর্য্য। দিগম্বর জৈন নাগ-নাগিনী ও মনসার মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। বিষ্ণু ও

২০. Vide-Nalanda by A Ghosh, 1959, P 47.

সূর্যামূর্তি আসনাবস্থায় নমুনামাত্র। বৌদ্ধ মন্দির বা দেবালয়গুলিতে এই সমস্ত উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি পূজার উদ্দেশ্রে নয়– বোধ হয় সৌষ্ঠব বর্ধনের জন্য মন্দিরগাত্রে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

পাহাড়পুরে আবিস্কৃত সুপ্রাচীনকালের কৃষ্টি-সংস্কৃতির এই উপাদানগুলির শ্রেণীবিন্যাস ও গঠন রীতি দেখিয়া মনে হয়– সোমপুরী মহাবিহার স্থাপিত হইবার আগে সেখানে বোধ হয় কোন ব্রাহ্মণ্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের কিছু প্রতিমা-নিদর্শন পরবর্তী কালের এই বৌদ্ধ মন্দিরের গাত্রে গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই মন্দিরটির দেওয়াল ও ভিত্তি অলঙ্করনের জন্য বিভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন শিল্পরীতিতে প্রস্তুত ৩৬টি প্রস্তর ফলক ব্যবহার করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রধানত: তিনটি ধারা বিশেষ লক্ষণীয়–

(ক) এক শ্রেণীর ফলকে রহিয়াছে ব্রাহ্মণ্য সমাজের অবসর পুষ্ট উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণী বিন্যাসের শিল্প সৃষ্টি এবং রুচি বোধ। এই ফলকগুলি ষষ্ঠ শতকের বলিয়া অনুমান করা যায়। গুপ্ত শিল্প রীতি এই সমস্ত ফলকে খুবই সুস্পষ্ট। সম্ভবত: এই সময়ের কোন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে এই সমস্ত সংগৃহীত হইয়াছিল।

(খ) আর এক ধরণের ফলকে আছে যাহার শিল্পরীতি স্থুল, রূঢ়, শিথিল ও গুরুভার। ইহারও বিষয় বস্তু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী এবং তাহাদের মূর্তিরূপও ব্রাহ্মণ্র শাস্ত্র অনুযায়ী। গঠন স্থুল, গুরুভার, আকাঠ, আরষ্ট চেহারা। রেখায় সুক্ষ্মতা নাই। মুখচ্ছবিতে কোন লাবণ্য নাই। এইগুলি তো ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে প্রস্তুত। তাহাতে পরবর্তী পালযুগের ফলকগুলির শিল্পরীতির পূর্বাভাষ ধরিতে পারা যায়।

(গ) তৃতীয় ধারাটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই ফলকগুলিতে রহিয়াছে খোদাই করা নানা প্রকার কাহিনী। তাহা ছাড়া আছে মানুষের আটপৌরে জীবনের প্রতিচ্ছবি। তাহাদের পরিধেয় পোষাক-পরিচ্ছদ সাধারণ। শরীরে অলঙ্কারাদি নাই। চাল-চলন মুখের ভাব ভঙ্গি স্থুল– অনেক ক্ষেত্রে অমার্জিত। দাঁড়ানোর ভঙ্গি বলিষ্ঠ কিন্তু আড়ষ্ট। চোখে মুখে সরল ও অনাবিল হাসি। প্রত্যেকটি মূর্তিতে রহিয়াছে লৌকিক জীবনের প্রাণ প্রাচুর্য্য আর গতিময়তা। শিল্পরূপের দিক হইতে যতই স্থুল, অমার্জিত ও অসম্পুর্ণ হউক না কেন– তাহাতে রহিয়াছে গভীর মানবিক বোধ এবং জীবনের অকুণ্ঠ বিস্তার আর অফুরন্ত প্রাণরস।

ইহা ছাড়াও এখানে পাওয়া গিয়াছে নানা রকমের পোড়ামাটির ফলক। এই সমস্ত পোড়ামাটির ফলকে বহিয়াছে প্রাচীন কালের কৃষি জীবনের সুস্পষ্ট ছাপ। মন্দিরের অঙ্গ সুসজ্জিত করিবার জন্য তখন গ্রাম্য-শিল্পীদের ডাকা হইয়াছিল। তাহারা যে যেরকম জীবনে অভ্যস্ত ছিল তাহাই চিত্রিত করিয়াছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই মন্দিরের গাত্রে কৃষ্ণ-চরিত লীলা; ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী ছাড়াও এই মৃৎফলকগুলিতে গ্রাম্য জীবনের সুস্পষ্ট রূপ। এই যেমন– জননীর ক্রোড়ে শিশু, লাঙ্গলধারী কৃষক, কূপে জলহরনতা নারী। আরও রহিয়াছে আদিবাসী ও শবরগণের জীবন চিত্র। প্রকৃতির কোলে লালিত-পালিত পশু পক্ষীর কথাও শিল্পীগণ বাদ দেয় নাই। কত হংস ময়ূর, ইঁদুর, টিকটিকি, মেষ, ছাগল, শূকর, শৃগাল, খরগোস চিত্রিত রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও উৎকীর্ণ বহিয়াছে কৃষকের কুটীরের কদলী ও নারিকেল গাছ ইত্যাদি। আরও একটি জীবন- যাহার প্রত্যক্ষ নজীর

এখনও সোমপুরে বা পাহাড়পুরের চারিপার্শ্বে রহিয়াছে। যেমন ক্রিয়ারত মল্লবীর, দীর্ঘ শ্মশ্রু আনতপৃষ্ঠ অস্থিচর্মসার সন্ন্যাসী ভিক্ষু, শিকারবাহী ব্যাধ, নৃত্যপরা ও সঙ্গীতরতা নারী, মোরগ ও ষাঁড়ের লড়াই আরও কত কি। বলা-বাহুল্য, পাহাড়পুরের অদূরে জামালগঞ্জের সন্নিকট ভাতসার ময়দানে শীত-মৌসুমে- শবর সাঁওতাল, বুনা-ধাঙ্গরেরা এখনও ষাঁড় ও মোরগের লড়াই দেখাইয়া থাকে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে এই অঞ্চলে ষাঁড়ের লড়াইয়ের খ্যাতির কথা এখনও লোকে ভুলিয়া যায় নাই। অথচ সহস্রাধিক বৎসরের আগের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন চিত্রের এই দৃশ্য আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে। মোটকথা সেকালের সমসাময়িক জীবনের কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই। শিল্পীরা যেন প্রকৃতির প্রতিটি প্রাণী, জীবজন্তু, পশু-পক্ষীর তালিকা করিয়া এই মন্দির গাত্রে সাজাইয়া দিয়াছিলেন। পৌরাণিক কাহিণী হইতে শুরু করিয়া চারিপার্শ্বের প্রাণীজগৎ মানুষের উদয়াস্ত শ্রম জীবন দুঃখ, বেদনা, তামাসা-স্ফূর্তি, নানা অভ্যাস সংস্কার; ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী, দেবদেবী সব কিছুই চিত্রিত করিয়াছেন। এই শিল্প একান্তই লৌকিক শিল্প; ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রথাবদ্ধ প্রতিমা শিল্পের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। রাজাশ্রিত উচ্চ শ্রেণীর লোকদের অর্থে যে সমস্ত মন্দির-বিহার-মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই সমস্ত মন্দিরের অঙ্গ সজ্জায় এই শ্রেণীর সাধারণ গ্রাম্য অবহেলিত শিল্পীদের কেন ডাকা হইয়াছিল? যে মৃৎশিল্প অভিজাতদের শিল্পের পার্শ্বে কোন দিনই স্থান পায় নাই, ব্রাহ্মণ মন্দিরে, বিহারে কেমন করিয়া তাহার স্থান হইল? ইহার উত্তর এই : ভালবাসার তাগিদে নয়; নেহায়েত ঠেকিয়া পড়িয়াই লৌকিক শিল্পকে সেদিন মন্দিরের অঙ্গ সজ্জায় জায়গা দিতে হইয়াছিল। কেননা বাঙলা দেশে এত প্রস্তর নাই যাহা দিয়া বিরাট মন্দিরের গাত্র ঢাকিয়া দেওয়া যায়। সুতরাং মাটির ফলক ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিলনা। এই শিল্প কেবল মাত্র গ্রাম্য মানুষদেরই আয়ত্বে ছিল। তাই মাটির টানে মন্দিরের অঙ্গাভরনে গ্রামের এই অবহেলিত লৌকিক শিল্পীদের ডাক পড়িয়াছিল। আলোচ্য লৌকিক ও মৃৎ-ফলকের অনুরূপ ফলক শিল্প পাওয়া গিয়াছে বগুড়ার মহাস্থানে, ঢাকার সাভারে এবং কুমিল্লার ময়নামতীতে। ময়নামতীতে পুনরায় খনন কার্য্যের ফলে অনুরূপ ফলক মৃৎশিল্প প্রভৃতি আবিষ্কার হইয়াছে। অনুরূপ কয়েকটি মৃৎশিল্পের ফলক পাহাড়পুরের ৮ মাইল দক্ষিণে হলুদ বিহার স্তূপ (দীপগঞ্জ) হইতেও আমরা সংগ্রহ করিয়াছি।

মৃৎশিল্পের লোকায়তরূপ

এই অবসরে আমরা কয়েকজন বাঙ্গালী কৃতী শিল্পীর নাম উল্লেখ করিব। সপ্তম শতকের শেষার্দ্ধ হইতে পাক-ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস একটি স্বতন্ত্র রূপ ধারন করে। আঞ্চলিক আদর্শ ও ধারণা ভারতীয় জীবনের নানা দিকে দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকে। পাল ও সেন পর্বে এই ভাবধারা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। এই যুগের শিল্পীরা ছিলেন সমাজের নিম্নস্তরের লোক। তাঁহারা সকলেই ছিলেন পেশাগত। এই যুগের কৃতী শিল্পীদের মধ্যে ধীমান ও তাঁহার পুত্র বিটপাল। ইঁহারা দুইজনই খোদাই শিল্পী হিসাবে খুব নাম করা শিল্পী ছিলেন। এই শিল্পীদ্বয় ধাতব, মৃতশিল্প আর চিত্রকলার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট শিল্পী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাজকীয় দলিল-পত্রে ইহাদের নামের উল্লেখ আছে। প্রস্তর

সেকালের কৃতীশিল্পী

ফলকে ও তাম্রপত্রে খোদাই কর হিসাবে যাঁহাদের নাম জানা যায় তাঁহারা হইতেছেন- ভাস্কর-তাতট মংকদাস, বিমল দাস, বিষ্ণুভদ্র, মহীধর, শশীদেব, কর্নভদ্র, তথাগতসার রানক ও শূলপানি। গৌড়-লেখমালায় ইঁহাদের অনেকের নাম পাওয়া যায়[২১]।

আদি যুগের বৌদ্ধ বিহারগুলি ছিল অতিদীনহীন। পাহাড় খুঁড়িয়া যে সব গুহা তৈয়ারী করিত তাহাই ছিল আদিম বৌদ্ধ বা জৈন বিহার। তাহাকে স্থাপত্য বলা যায় না। তাহাতে বুদ্ধি বা সৌন্দর্য্য বোধের কোন স্থান ছিল না। ইহা ছাড়া খড় কুটা পাতায় ছাওয়া ইট প্রস্তরের ভিত্তি, কাট বাঁশের বিহার তৈয়ারীর চেষ্টাও হইয়াছিল। তারপর যখন বৌদ্ধ ও জৈন সঙ্ঘে যতই লোক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সমৃদ্ধি দেখা দিল-ততই ইষ্টক দ্বারা নির্মিত আরও বড় বিহারের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। ক্রমশ: একতলা, দোতলা,তে-তলা এমন কি নয়তলা (?) পর্য্যন্ত বিহার প্রস্তুত হইয়াছিল। এই সমস্ত বিহার তখন কেবল ভিক্ষুকদের আস্তানাই হইয়া থাকিল না। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-কর্ম সাধন-ার বিরাট কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙলা দেশেও অনেক ছোট বিহার ছিল। বরেন্দ্রীর (উত্তর বঙ্গের) নানা স্থানে এই শ্রেনীর বহু বিহার ছিল। বগুড়ার 'বানিয়াদীঘি স্তূপ', গরনাদোপাড়ার মধ্যস্থলে 'গরনা স্তূপ; সংসার দীঘির চারি পাশ্বে, 'বানিয়া পুকুর' 'ধাপ' 'সন্ন্যাসীর ধাপ', 'আলী গ্রামের মঠ', 'ফেণী গ্রামের স্তূপ', 'মির্জাপুরের স্তূপ', নারায়ণ শহরের দক্ষিণে 'নয়াপুকুরেব মঠ' (বর্তমান ভুমিসাৎ প্রায়), পাঁচবিবি পাথর ঘাটার 'মহীপালের স্তূপ', 'ছিলিমপুরের মঠ' 'শাহবাজপুরের স্তূপ', তালোরা রেল ষ্টেশনের সন্নিকট 'পাঁচ পীর তলার স্তূপ' 'ধাপ সুলতান গঞ্জের স্তূপ', 'কাহালুর মঠ' এবং মহাস্থানের চারিপার্শ্বে আরও দ্বীপ বা মঠ ইত্যাদি ৪০ টিরও বেশি স্তূপে ধ্বংসাবশেষ এই জেলায় আছে। দিনাজপুর জেলার প্রায় ১৫ টি, রাজশাহী জেলায় প্রায় ২০/২১ টি, রংপুরে ৭/৮ টি, পাবনা জেলায় ৩/4 টি ধাপ বা স্তূপ রহিয়াছে। এই গুলির কোন কোনটি বৌদ্ধ বিহারও হইতে পারে। এই সমস্ত ইষ্টক নির্মিত ধ্বংস-স্তূপগুলির মধ্যে বগুড়ার 'গোকুল' ও রাজশাহীর 'পাহাড়পুর' এবং পশ্চিম দিনাজপুরের 'বানগড়ে' খনন কার্য্য হইয়াছে। অবশিষ্ট গুলিতে এখনও খনন কার্য্য হয় নাই এবং ইহার অনেকগুলিই বর্তমান প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিকট অজ্ঞাত বহিয়াছে। এই স্তূপগুলির অধিকাংশই আমরা পর্য্যটক করিয়া অল্প বিস্তর তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছি*। উল্লিখিত স্তূপগুলির মধ্যে প্রায় ৫৭/৫৮ টির নাম ইতিপুর্বেই একবার প্রকাশিত হইয়াছিল[২২]।

আদি যুগেব বৌদ্ধ বিহাব

আমাদের আলোচ্য পাহাড়পুরে অন্তত: দুইটি বিহার ছিল। বট গোয়ালী বা গোয়াল[২৩] ভিটায় ছিল জৈন বিহার। তাহার আকৃতি প্রকৃতি ও ভুমি নক্সা জানিবার উপায় নাই। কেবল ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত সোমপুরী বৌদ্ধ মহাবিহারটির (পাহাড়পুর) ভুমি নক্সা ও আকৃতি প্রকৃতি আজ জানা গিয়াছে। অষ্টম ও নবম শতকে হীনযান লুপ্ত হইয়া বাঙলা

২১। গৌড়-লেখমালা, পৃষ্ঠা-১১, ৫৬, ৮৫, ৯২, ১১২, ১৪৬, ১৪৮; বাঙ্গালীয় ইতিহাস, পৃষ্ঠা১৮৮।

* উত্তব বঙ্গেব ইতিহাসে এই সব স্তূপেব ধাবাবাহিক ছবিসহ বিস্তৃত বিতরণ সন্নিবেশিত হইবে

২২. The ancient Momument of varendra, pp 22-24

২৩। Cunningham s Report, Vol. p. 117

দেশে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম নূতন তান্ত্রিক ধ্যান ধারণায় রূপান্তরিত হয়। ফলে বাঙলা দেশে ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক যুগসন্ধিক্ষণ পর্বের সূচনা, তন্ত্র মন্ত্র ও দুর্বোধ্য দর্শনের প্রাধান্য ছিল। এই দর্শনে নরনারীর যৌনক্রিয়ার আধ্যাত্মিক ও প্রতীকি অর্থের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।" পাক-ভারতের পূর্বাঞ্চলগুলিতে বৌদ্ধ ধর্মের এই রূপান্তর অষ্টম-নবম শতকেই ধরা পড়িয়াছিল। বাঙলা বিহারে এই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যুগ বিবর্তনের কারণ বোধ হয় ইহাই ছিল যে, সপ্তম শতকের শেষাশেষী হইতে কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, ভূটান প্রভৃতি দেশের সহিত মধ্য ও পূর্ব পাক-ভারতের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছিল। এই সময় পার্বত্য দেশের আদিম সংস্কার ও সংস্কৃতির স্রোত বাঙলা দেশে প্রবেশ করিতে থাকে। তখন বাঙলা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তর বঙ্গে এই সময় জৈন ধর্মের কিছুটা প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত গুপ্তাব্দ ১৫৯ অথবা খ্রীষ্টীয় ৪৭৯ অব্দের একটি তাম্রশাসনে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই শাসনে জনৈক ব্রাহ্মণ নাথ শ্রমণ ও তাঁহার স্ত্রী রামী কর্তৃক জৈন শ্রমণ গুহনন্দী ও শিষ্যদিগের দ্বারা বটগুহালীতে প্রতিষ্ঠিত বিহারে (অর্হতদিগের দ্বারা সুচারু রূপে পরিচালনার জন্য) একখণ্ড ভূমি রাজ সরকার হইতে ক্রয় করিয়া দান করার বিষয় উল্লিখিত আছে[২৪]। পাহাড়পুর মন্দিরের অদূরে কানিংহাম বর্ণিত গোয়াল ভিঁটার কথা পূর্বোক্ত বট গোহালীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। খুব সম্ভব অষ্টম শতকের মাঝামাঝি বট গোহালীর জৈন মন্দিরের সন্নিকট অথবা জৈন বিহারের উপর বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়া জৈন মন্দিরটির অস্তিত্ব বিলোপ পাইয়া ছিল। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী বৃন্দ আলোচ্য পাহাড়পুরকে মালঞ্চী পাহাড়পুরও বলিয়া থাকে। ইহাও যেন একটু নূতন খবর বলিয়া বোধ হইতেছে*।

পাহাড়পুরের প্রায় আট (৮) মাইল দক্ষিণে হলুদ বিহার মৌজায় "হলুদ-বিহার স্তূপ" অবস্থিত। ইহা পাহাড়পুরের সমসাময়িক একটি বৌদ্ধ বিহার বলিয়া বোধ হয়।

হলুদ-বিহার স্তূপ (দ্বীপপুঞ্জ)

ইহার বিহার নামটিতে যেন সেই ইঙ্গিত দিতেছে। ১৯৬৩ সালে স্থানীয় কতিপয় লোক এই স্তূপ হইতে ইষ্টক সংগ্রহ কালে কৃষ্ণ-প্রস্তরের একটি বৌদ্ধ মূর্তির (আবক্ষের) একাংশ ও কয়েকটি মৃৎফলক আবিস্কৃত হইয়া পড়ে। তন্মধ্যে হংসের ফলকটি অন্যতম। আমি ইহার সংবাদ শুনিযা তৎক্ষণাৎ স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জনাব মোজাহার আলী সাহেব সমভিব্যাহারে উহা উদ্ধার করিয়া লইয়া আসি। ইতিপুর্বেও নাকি এখানে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা ও কিছু মৃৎশিল্প পাওয়া গিয়াছে। সংগৃহীত এই উপাদান প্রাপ্তির ফলে আমাদের পূর্ব ধারনা আরও বদ্ধ মূল হইয়াছে। ইহার ভৌগলিক অবস্থান একটি নগর বিহারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই স্তূপের দক্ষিণে দীঘির পাড়ে আর একটি স্তূপের ধ্বংসচিহ্ন রহিয়াছে। উত্তর পার্শ্বেও একটি স্তূপ ছিল। সম্প্রতি স্থানীয় জনসাধারণ এই দুইটি স্তূপ হইতে ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া (বাড়ী) তৈয়ারীর কাজে ব্যবহার করিয়াছে। প্রাপ্ত ইঁটগুলি পাহাড়পুরের সমসাময়িক বলিয়া প্রমাণ করা যায়। ইহার মধ্যে কয়েকটি নকাশী

---

২৪। Vide, E. I. Vol. 20 1929-30 (G E. 159)

* আলোচ্য অধ্যায়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের লেখা হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

ইটও রহিয়াছে। আলোচ্য হলুদবিহার স্তূপটির পশ্চিম পার্শ্বে একটি প্রাচীন নদীর খাত বর্তমান। বর্ষার সময় এই স্তূপের প্রায় তিন দিকে জল দাঁড়াইলে, স্তূপটি দ্বীপের ন্যায় দেখায়। এই হলুদবিহার মৌজা হইতে একটি প্রাচীন পথ কোলা অতিক্রম করিয়া পাহাড়পুরের দিকে গিয়াছে। আমরা তাহা নক্সার সাহায্যে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। পাহাড়পুর হইতে আর একটি পথ জগদ্দল-মহাবিহারের দিকে গিয়াছে। তাহারও ইঙ্গিত রহিয়াছে। এই হলুদবিহারের ঐতিহাসিকতার আরও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় স্থানীয় একটি জনশ্রুতি হইতে। পাহাড়পুরের অশিক্ষিত অধিবাসীদের বিশ্বাস সত্যপীরের অভিশাপে পাহাড়পুরের উচ্চ স্তূপের উন্নত মস্তকটি উড়িয়া গিয়া হলুদবিহারে পতিত হইয়াছিল। উভয় স্থানের এক সময়ে যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, এই জনশ্রুতি তাহারই পূর্বাভাষ প্রদান করে। ইহার মধ্যে প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। খনন কার্য্য সুসম্পন্ন না হইলে তাহাব পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটিত হইতে পারে না। তখন হয়ত একটি চৈত-সংযুক্ত সঙ্ঘারাম প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

এই 'দ্বীপের' প্রান্তদেশে একটি প্রাচীন গঞ্জের অবশেষ রহিয়াছে। এই 'গঞ্জ ও দ্বীপ' এই দুই নাম একত্র হইয়া ইহার 'দ্বীপগঞ্জ' নাম-কারণ হইয়াছে।

মঠ-পুকুব

এই দ্বীপগঞ্জের অদূরে একটি দীঘির পশ্চিম পাড়ে কয়েকটি মঠ ছিল। উহার একটি এখনও অক্ষতাবস্থায় রহিয়াছে। ইহাও একটি প্রাচীন কীর্তি বলিয়া অনুমিত হয়। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে সন্ন্যাসীর মঠ বলিয়া থাকে।

ভাণ্ডারপুর হইতে সেনপাড়া। এই সেনপাড়ার এক মাইল উত্তরে টঙ্গিনী শহর। এবং এই টঙ্গিনী শহরের সহিত বটতলার পুঁথির ভাষা 'সোনাভানের কিচ্ছার সম্পর্ক বিজড়িত।

টঙ্গিনী শহর

নিকটেই 'কহর দরিয়া' গভীরতম একটি নদীর খাত-চ্যাংগার বিলের সহিত যুক্ত। টঙ্গিনী শহরের প্রাচীন মঠটি বর্তমানে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। এখন সেখানে কয়েকটি শিমুলের গাছ এই স্থানের স্বাতন্ত্র ঘোষণা করিতেছে।

গৌড় শাহী?

বদল গাছি হইতে চাকরাইল। এই চাকরাইলের পূর্বে গোড়শাহী গ্রামে একটি প্রাচীন নিম গাছ আছে। ইহার বেড় ১৮ ইঞ্চি হাতের প্রায় ৪৮ হাত হইবে। স্থানীয় অশিক্ষিত লোকেরা গাছটির নানা মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া থাকে। প্রাচীন গৌড়ের সহিত এই গোড়শাহী গ্রামের কোন সম্পর্ক আছে কি না-তাহা অনুসন্ধান যোগ্য।

রাজশাহী জেলার পূর্ব সীমান্তে, বগুড়ার জয়পুরহাট রেল ষ্টেশন হইতে ছয় মাইল পশ্চিমে মুকুন্দপুর মৌজাস্থিত 'মঙ্গলবাড়ী' ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। এই

মঙ্গলবাড়ী গরুড়স্তম্ভ বা ভীমের পান্ঠি ও হর গৌরি মন্দির

মঙ্গলবাড়ী হইতে একটি প্রাচীন রাজপথ সোজা জয়পুরহাট রেল ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া ক্ষেত-লাল হইয়া রাজা 'শশাঙ্কর-দীঘি (সংসার দীঘি)-নারায়ণ শহর-শিবগঞ্জ থানা স্পর্শ করিয়া বগুড়ার পূর্ব সীমান্তে গড় ফতেপুর ও গড় দুর্গাহাটা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হোসেন শাহী আমলেও এই রাজপথের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইংরেজ আমলে এই পথটি বহুলাংশে উন্নত। উত্তর বঙ্গের ইহা একটি প্রাচীন পথ। এবং এই পথের দুই পার্শ্বে প্রাচীন কালের বহু কীর্তি বিদ্যমান-তাহা আমরা যথাস্থানে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। পাহাড়-

কৈবর্ত রাজেয় প্রতিষ্ঠা স্তম্ভ

পুর হইতে আলোচ্য মঙ্গলবাড়ীর দূরত্ব প্রায় দশ মাইল। মঙ্গলবাড়ীর চতুঃপার্শ্বে বহু দীঘি পুষ্করিণী ও উঁচু উঁচু ভিঁটা এবং কয়েকটি রাজবাড়ীর চিহ্নাবশেষ রহিয়াছে। এখানকার উঁচু ভিঁটাগুলিতে ইংরেজ কোম্পানী আমলে প্রচুর পরিমাণে নীল ও রেশমের চাষ হইত। 'বুঁদেলা' বা অধুনা 'বাদল' নামক স্থানে কোম্পানীর কুঠি ছিল। এখনও উহার ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে[২৫]।

মঙ্গলবাড়ীর ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যের মধ্যে 'হরগৌরীর মন্দির', 'গরুড়স্তম্ভ', বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এই হরগৌরী মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের দক্ষিণে অবস্থিত পাল-বংশীয় দ্বিতীয়–তৃতীয়–চতুর্থ ও পঞ্চম পালের মন্ত্রী বংশের পবিচয় সম্বলিত উৎকীর্ণ লিপিসহ 'গরুড়স্তম্ভ' নামক একটি 'স্তম্ভ' প্রাচীন কালের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। মঙ্গলবাড়ীব হাটের ১/৪ মাইল দক্ষিণে উক্ত স্তম্ভটি নিম্ন সমতলভূমির মধ্যে অবস্থিত। এই প্রস্তর স্ত

স্তম্ভ পবিচয়

ম্ভটি একদিকে ইষৎ হেলিয়া পড়িয়াছে এবং বজ্রদীর্ণ শীর্ষভাগ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য ইহার মূলে কিছুদিন আগে একটি ইষ্টক বেদী সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার পরিধি ১৮ ফুট ১০ ইঞ্চি। বেদী সংলগ্ন প্রস্তর স্তম্ভ মূলের পরিধি ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। বেদিকার উপর হইতে ১ ফুট ৪ ইঞ্চি উর্দ্ধে প্রস্তর লিপিটি সমাপ্ত। লিপিটি সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ। তাহা অষ্টবিংশতি পংক্তি–বিন্যস্ত, অষ্টবিংশতি শ্লোকাত্মক ক্ষুদ্র কাব্য বিশেষ। পংক্তিগুলি প্রায় ১ ফুট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ; অক্ষরের আয়তন অর্দ্ধ ইঞ্চি ১/২/ ২৩/ ২৫/ ২৭/ সংখ্যক শ্লোকের কোন কোন অক্ষর বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য অক্ষরগুলি বেশ সুস্পষ্ট। স্তম্ভটি এক অখণ্ড কৃষ্ণাভ ধূসর প্রস্তরে নির্মিত। ইহার গাত্রে যে বজ্রলেপ সংযুক্ত ছিল, তাহা এখন বহুলাংশে উঠিয়া গিয়াছে। তথাপি স্তম্ভগাত্র বিলক্ষন মসৃন। এই প্রস্তর স্তম্ভলিপিতে যে সমস্ত ঐতিহাসিক বিবরণ উল্লিখিত আছে, ঐতিহাসিক প্রবর অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তাহার বিষয়ে আলোক পাত করিয়া গিয়াছেন[২৬]। তৎপুর্বে যাঁহারা এই সমস্ত লিপির পাঠোদ্ধারে ব্যপৃত ছিলেন তাহারা হইতেছেন অধ্যাপক[২৭] উইলকিন্স (১৭৮৮ খ্রী), দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্ট মেকট ও হরচন্দ্র চক্রবর্তী[২৮] (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে) এবং অধ্যাপক কিলহর্ণ[২৯] ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অধ্যাপক কিলহর্ণ ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মূলানুগত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছিল। এতদব্যতীত অন্যান্যদের পাঠোদ্ধার নানা ক্রটিপূর্ণ।

উল্লিখিত 'গরুড়স্তম্ভ' কোম্পানী সাহেবদের বিবরণে 'বুঁদেলার গরুড়স্তম্ভ' নামে

ভীমেব পান্টি

পরিচিত ছিল। কিন্তু মঙ্গলবাড়ীর সন্নিকট বুঁদেলা বলিয়া কোন স্থান পরিদৃষ্ট হয় না। মঙ্গলবাড়ীর তিন মাইল দূরে বাদল নামক যে ক্ষুদ্র গ্রামটি রহিয়াছে উহাই তখন বুঁদেলা গ্রাম নামে অভিহিত ছিল। ইংরেজ সাহেবদের নিজেদের কুঠির নামানুসারে এই গরুড়স্তম্ভের নামকরণ করিয়াছিলেন 'বুঁদেলা গরুড়স্তম্ভ'। আসলে উহা মঙ্গলবাড়ীর সন্নিকট এবং সেইজন্য ইহার নাম মঙ্গলবাড়ীর

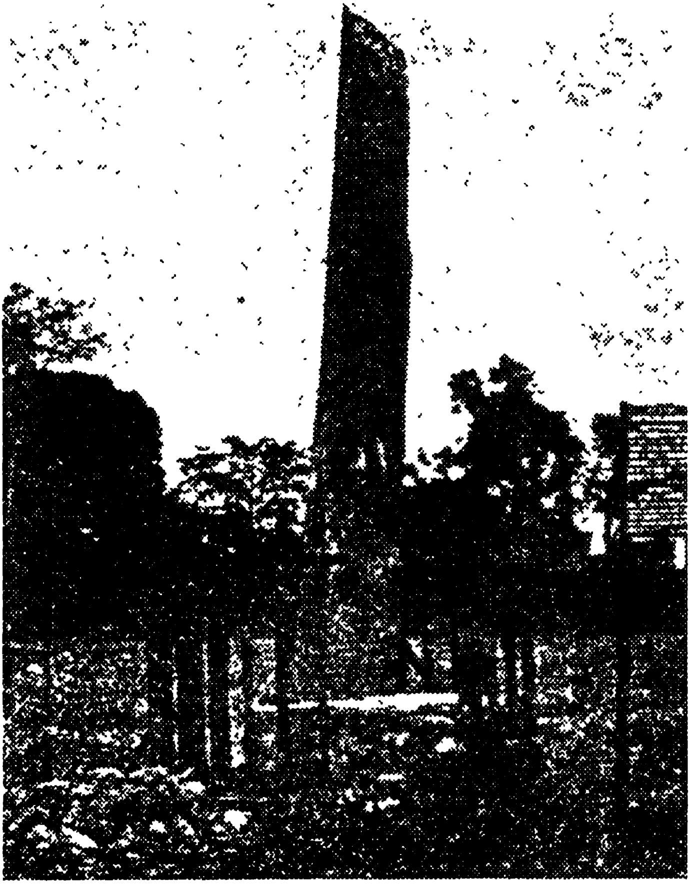
২৫. গৌড় লেখমালা– পৃষ্ঠা ৭০ দ্রষ্টব্য।

২৬ গৌড় লেখমালা–পৃষ্ঠা ৭৭-৮৫ দ্রঃ।

২৭ Asiatic Researches, vol. 1, PP, 133-144

২৮. G, A, S B, 1874.

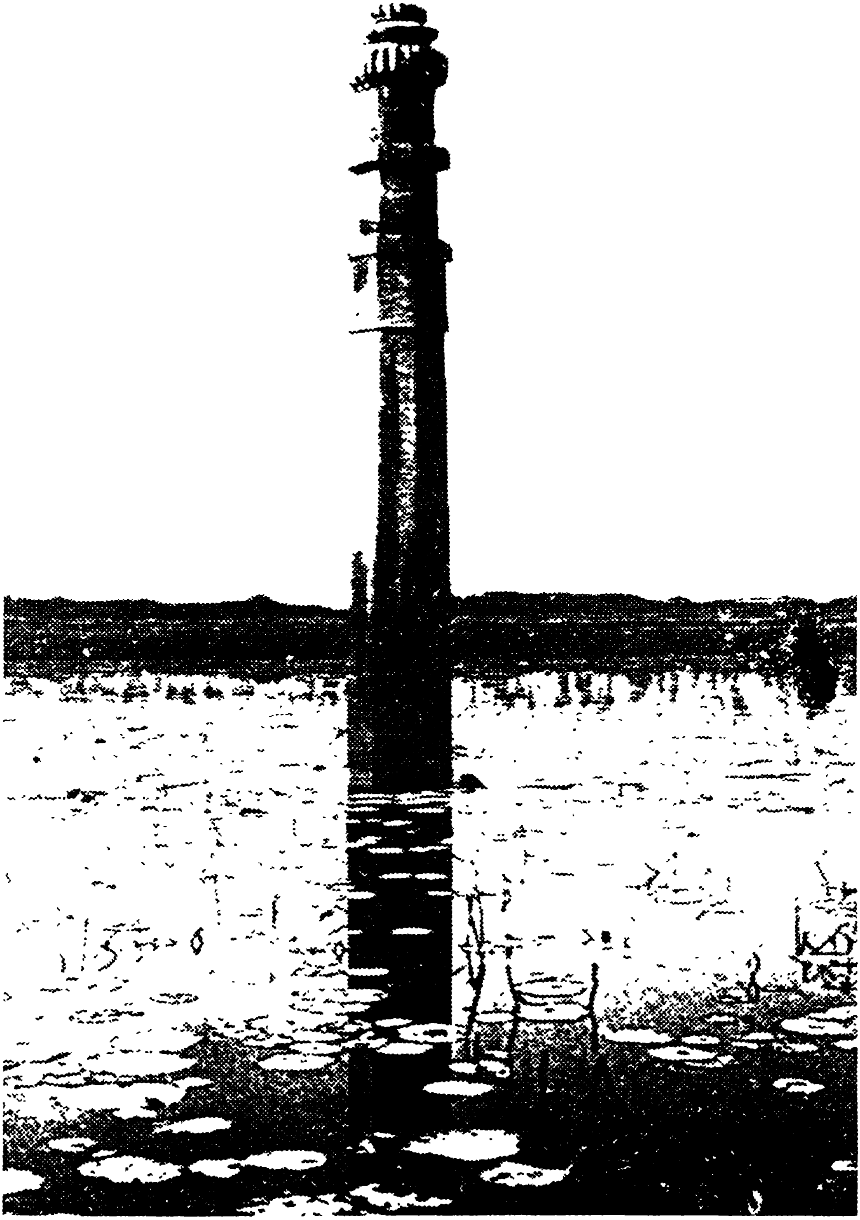
২৯ Epigraphia Indica, vol. 11, P P 160-167.



ভীমেব পান্টি

গরুড়স্তম্ভ হওয়ায় যুক্তিযুক্ত। অধুনা কেহ কেহ ইহাকে ' মঙ্গলবাড়ীর গরুড়স্তম্ভ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আমরাও এই নাম ব্যবহার করিলাম। এই স্তম্ভের শীর্ষদেশে একটি গরুড়পক্ষী (বিষ্ণুব বাহন) স্থাপিত ছিল এবং ইহার গাত্রে প্রশস্তি সূচক লিপি খোদিত থাকায় ইতিহাসে তাহা 'গরুড়স্তম্ভ' লিপি নামে পরিচিত। কিন্তু, স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এই 'গরুড়স্তম্ভ' ভীমের পান্টি নামে সমধিক খ্যাত। এই খ্যাতির মূলে ঐতিহাসিক কারণ রহিয়াছে।

মঙ্গলবাড়ীর এই গরুড়স্তম্ভ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভট্টগুরুর কর্তৃক পালরাজত্বের দশম শতকে স্থাপিত হইয়াছিল। বুঁদেলা বা বাদাল কুঠির অধ্যক্ষ উইলকিন্স ১৭৮০ সালে



ধীবর দীঘিতে কৈবর্ত রাজের জয়স্তম্ভ

বর্তমান স্থানে জঙ্গলের মধ্যে শীতকালে (দ্বাদশ ফুট উচ্চ) এই স্তম্ভটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই স্তম্ভটি আবিষ্কার হইবার পর মালদহের কুঠির অধ্যক্ষ জর্জ উড্‌নী (১৭৮৩ খ্রী:) পরিদর্শন করিয়া স্তম্ভগাত্রে আপন নাম উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছিলেন। পরে আরও বহু পর্যটক ইহা পরিদর্শন করিয়া নিজ নিজ নাম উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। আজও তাহা স্তম্ভগাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

পালবংশের রাজারা ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি তাঁহাদের অনাদর ছিল না। একটু আগেই তাহার ইঙ্গিত করিয়াছি। বরং সেন বর্মণ আমলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা নির্য্যাতীত হইয়াছিল।

দশম শতকে পরম উদার ও আদর্শ নরপতি নারায়ণ পাল (৯৫৬ খ্রী:) প্রজাদিগের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য ব্রাহ্মণ্য দেবালয় প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে ভূমিদান ইত্যাদি কার্যে সহায়তা করিতেছিলেন। এই সময় তদীয় মন্ত্রী (ভাগলপুরে[৩০] প্রাপ্ত তাম্রশাসনের দূতক-মিশ্র বংশীয়) ভট্টগুরব কর্তৃক এই মঙ্গল বাড়ীর গরুড় স্তম্ভ শঙ্খ-সংহিতার বর্ণিত বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি কবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন। কবিত্ব শক্তির বলে ভট্টগুরব তখন দ্বিতীয় বাল্মিকী বলিয়া পরিচিত ও খ্যাত ছিলেন। এই স্তম্ভ লিপিটি তাঁহারই রচিত। এই স্তম্ভে উৎকীর্ণ শীলালিপীতে মিশ্র বংশের গুনাবলী বর্ণিত[৩১] আছে। আগেই বলিয়াছি পাল বংশের নৃপতিগণ ব্রাহ্মণ্য দেব- দেবী ও আচার্য্যদের প্রতি শ্রদ্ধা করিতেন এবং ব্রাহ্মণদের উপদেশ বেদ বাক্য বলিয়া মনে করিতেন। পাল বংশীয় রাজাগণ মিশ্র বংশীয় মন্ত্রীগণের বিনানুমদনে কোন কর্মে হস্তক্ষেপ করিতেন না। স্তম্ভ লিপিতে (৬– শ্লোক) বর্ণিত[৩২] আছে যে, ধর্মপালের পুত্র রাজা দেবপাল উপদেশ গ্রহণের জন্য মন্ত্রীবর দর্ভ পানির দ্বারদেশে তাঁহার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিতেন। এবং তাঁহারই মন্ত্রণা কৌশলে দেবপালের রাজত্ব সেতুবন্ধ ও বেরারের উৎপত্তিস্থল হইতে উত্তরে হিমালয় ও পূর্ব-পশ্চিমে সাগর উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি এই বংশের শ্রেষ্ঠ ন্যায় পরায়ণ নরপতি রূপে নবম শতকের প্রথমার্দ্ধে রাজত্ব করিতেন। এই স্তম্ভের নিকট এবং রাজধানীর সন্নিকটে মন্ত্রী ভবন ছিল। গরুড়স্তম্ভটি মন্ত্রী ভবনের একাংশ মাত্র–ষষ্ঠ শ্লোকে তাহার ইঙ্গিত আছে। সুতরাং এই গরুড় স্তম্ভের অনতি দূরে কোন এক স্থানে রাজবাড়ী স্থাপিত ছিল। তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই স্তম্ভের উত্তর পার্শ্বেই হরগৌরীর মন্দির এবং মন্দির চত্বরে শিবমূর্তি অঙ্কিত শিবলিঙ্গ স্থাপিত। ১৯৫৭ সালে হরগৌরীর সেবাইত-হরগৌরীর যুগল মূর্তিসহ ভারতে

(ক) মিশ্র বংশ।
(খ) ধীরদেব মিত্র।
(গ) পঞ্চাল মিশ্র।
(ঘ) গর্গ মিশ্র স্ত্রীর নাম ইরাবতী দেবী।
(ঙ) দর্ভ পানি (ইনি দেবপালের মন্ত্রী–স্ত্রী শর্করা দেবী।)
(চ) সোমেশ্বর (রাজ্যপালের মন্ত্রী–স্ত্রী বণা দেবী–তরলা)।
(ছ) কেদার মিশ্র –(সূরপালের সমসাময়িক-স্ত্রী বধব দেবী)।
(জ) গুরুব মিশ্র–নারায়ণ পালের মন্ত্রী।

৩০. J A S.B, 1900, PP 190-195; গৌড় লেখমালা পৃষ্ঠা, ৫৫-৬৯
৩১. মিশ্র বংশ শাণ্ডিল মিশ্র (গোত্রের প্রথম পুরুষ)।
৩২. গৌড় লেখমালা পৃঃ ৭৮ (৫ম-৬ষ্ঠ শ্লোক দ্রঃ)

পলায়ণ করিয়াছেন। কেবল মাত্র শিবলিঙ্গ প্রভৃতি সেবাইত অভাবে হতশ্রী ও জীর্ণ হইয়া ধ্বংসস্তপে পড়িয়া আছে।" "India Icnography তে (Gopinath), এই শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে।" দক্ষিণ ভারতে গুড্ডিমনেরনয়নে এই শ্রেণীর শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয়। উক্ত Icnographyর মতে খৃ: পূ: ২০০ অব্দে এই শিবলিঙ্গ চিত্রিত ও অঙ্কিত হইয়াছে। অতএব মঙ্গল-বাড়ীর এই গরুড় স্তম্ভের সহিত আলোচ্য হরগৌরী ও শিবলিঙ্গের প্রাচীন সম্বন্ধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাহা বলাই বাহুল্য। এক্ষেত্রে এই স্থানটির প্রাচীনত্ব এবং ইহা যে একটি ব্রাহ্মণ্য অধ্যুষিত প্রাচীন প্রসিদ্ধ যজ্ঞস্থল তাহাও সুস্পষ্ট।

হরগৌরি মন্দির

উক্ত যজ্ঞস্থলে প্রতি মঙ্গলবার সর্ব সাধারণের জন্য শান্তিজল লইবার দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল। দেশ দেশান্তর হইতে লোকজন সমবেত হইত। কেহ বা এখানে শান্তিজল লইতে আসিয়া এই পুণ্যতীর্থে দীঘি পুস্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া কৃতার্থ হইতেন। কেহ বা এখানে থাকিয়া যাইতেন। তখন উপস্থিত জনমন্ডলীর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যে সামান্য ২/১ টি দোকান পসার ছিল তাহাই ক্রমশ: ক্ষুদ্র বাজার হইতে কালে বৃহৎ হাটে পরিণত হয়। এই হিসাবে মুকুন্দপুর মৌজাস্থিত মঙ্গলবাড়ী হাটটিও সমসাময়িক প্রাচীন বলিয়া বিবেচিত হয়। এখনও প্রতি মঙ্গলবার 'হাটবার' ব্যতীত প্রতি বৎসরে বৈশাখ মাসে প্রতিদিন কিছু সংখ্যক লোক এখানে জমায়েত হইয়া থাকে। গরুড়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা, হরগৌরীর মন্দির ও মঙ্গলবাড়ীর হাটের ইহাই হইল ক্রম পরিচিত। একটু আগেই বলিয়াছি যে, এই গরুড়স্তম্ভটি সাধারণ্যে ভীমের পান্টি নামে সমধিক খ্যাত। এবং ভীমের স্মৃতির সহিত ইহার কি সম্বন্ধ তাহা এক্ষেত্রে আলোচনা করিব।

মঙ্গলবাড়ী হাট

আমরা পাহাড়পুর প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করিয়াছি, পাল নৃপতিগণ স্বীয় পুণ্যকর্মের ফলে সমগ্র প্রাচ্য ভূ-মন্ডলের খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। রাম চরিতের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তখন তাঁহার জন্মভূমি বরেন্দ্রীকে (উত্তরবঙ্গকে) "বসুধার শীর্ষস্থান" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই দান শৌন্ডপাল নৃপতি গণের রাজত্বে পৌনেতিন শত বৎসর অতিক্রম হইবার পর তৃতীয় বিগ্রহ পালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করিয়াছিলেন। ইঁনি যেমন দুশ্চরিত্র তেমনি অত্যাচারী রাজা ছিলেন[৩৩]। ইঁনি এত দুর অত্যাচারী এবং দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, লোকে তাহাকে মহিপালের পরিবর্তে 'অহিপাল' নামে অভিশাপ দিত। তাঁহার প্রজাপীড়ন ও অত্যাচারে কোন লোকের মান সম্মান, স্ত্রী কন্যা কিছুই নিরাপদ ছিলনা। একাদশ শতকের মধ্যভাগে ইহাঁর স্বেচ্ছাচারিতায় এবং অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া রাজ্যমধ্যে সৈন্যদলে এমনকি রাজ পরিবারে অন্ত: বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহ দমন করিতে যাইয়া তিনি তদীয় ভ্রাতাদ্বয় শূরপাল ও রামপালকে নিষ্ঠুর ভাবে লৌহ নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। প্রধান সেনাপতি দিব্বোককে তাঁহার পদ হইতে অপসৃত করিয়া বিদায় দিলেন। তাঁহার এই অবিমৃষ্যকারিতায় বিদ্রোহী অনন্ত-সামন্ত চক্র লাঞ্চিত দিব্বোককে তাঁহাদের প্রজাপতি রূপে বরণ করিয়া লইলেন। সামন্ত বীর দিব্বোক নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিলে রাজ সৈন্যদের মধ্যে ভাঙ্গন উপস্থিত হইল। বহু রাজ সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া সামন্ত

৩৩। Vide- Ramacharita

রাজগণের পক্ষাবলম্বন করিলেন। অনন্ত সামন্তদের সহিত মহিপালের যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে মহীপাল পরাজিত ও নিহত হইলেন। ইত্যবসরে কৌশলে কারাগার হইতে শুরপাল ও রামপাল মুক্ত হন এবং গঙ্গা পার হইয়া (অঙ্গ-চম্পা ভাগলপুর) মাতুলালয়ে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। দুশ্চরিত্র মহিপাল যুদ্ধে নিহত হইলে সামন্তগণ ও প্রজাপুঞ্জ সম্মিলিত সভায় দিব্বোককে (১০৭৫ খৃ:) গৌড় সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন[৩৪]। দিব্বোক ইতিপূর্বে

**বরেন্দ্রীর প্রজাবিদ্রোহ**

মহীপালের পিতার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি যেমন বীর তেমনই ধার্মিকও ছিলেন। রামচরিতে এই কৈবর্ত্ত বিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে[৩৫]। বৃদ্ধ মাহিষারাজ স্বল্পকাল রাজত্ব করেন। তাহার মৃত্যু হইলে তদীয় অনুজ রুদ্রোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর অধিপতি হইলেন। তিনি যেমন কর্মঠ ও তেজস্বী তেমনি ধার্মিকও ছিলেন। ভীম বরেন্দীর রাজপদ বরণ করিয়া প্রজা সাধারণের কল্যাণ কর কার্য্যদির দ্বারা বরেন্দ্রবাসীর হৃদয় জয় করিয়া রাজ্য মধ্যে গনতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি রংপুর জেলার 'ডমন নগরে' রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই 'ডমননগরই' বর্তমান ই, বি রেলওয়ের "ডোমার ষ্টেশন"। ভীম বরেন্দ্রীর অধিপতি হইয়া নিজ বুদ্ধি ও বাহুবলে প্রজাবৃন্দের সুখ সুবিধার নিমিত্তে নানা স্থানে দীঘি -পুষ্করিণী খনন, মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা উত্তরোত্তর প্রজা-সাধারণের খুবই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। চারিদিকে আদর্শ ও গণতন্ত্রী প্রজারজ্ঞক নৃপতি বলিয়া ভীমের গুণাবলী প্রচারিত হইতে লাগিল।

এদিকে পলাতক ভ্রাতৃদ্বয় শুরপাল ও বামপাল "জনকভু" বরেন্দ্রী উদ্ধারের জন্য ষড়যন্ত্র ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রামপাল গৌড়-রাজ্যের অন্যান্য দেশের সামন্তগণকে একত্র করিবার জন্য রাঢ়-অঙ্গ-মগধাদি প্রদেশ ভ্রমণ করিলেন। প্রচুর অর্থ ও জমির বিনিময়ে ক্রমে বহু সামন্তচক্র রামপালের সহিত একত্রিত হইলেন। যে সকল নৃপতি রামপালের সহায়তা করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ১৪ জনের নাম অবগত হওয়া যায়। ১ মগধাদিপতি ভীমযশ, ২ কোটাটধিপতি বীরগুণ, ৩ দন্ত্রভুক্তিপতি জয়সিংহ, ৪ দেব-গ্রামপতি বিক্রম, ৫ অপার মন্দারপতি লক্ষ্মীশুর, ৬ কুজবটিরাজ শুরপাল, ৭ তৈলকম্পপতি রুদ্রশিখর, ৮ উচ্ছ্বলপতি ময়গল সিংহ, ৯ ঢেক্করীয় বাজ প্রতাপ সিংহ. ১০ কয়ঙ্গলপতি নরসিংহার্জ্জুন, ১১ সঙ্কটগ্রামপতি চন্ডার্জ্জুন, ১২ নিদ্রাবলীরাজ বিজয়, ১৩ কৌশাম্বীরাজ দ্বোরপবর্দ্ধন, ১৪ পদুবন্ধপতি সোম[৩৬]। সাহায্যকারি নরপতি বৃন্দ ব্যতীত রাষ্ট্রকুট রাজ মহাবীর মথন বা মহন, তাঁহার পুত্র মহা মাগুলিক কাহনুর ও সুবর্ণদেব এবং তাঁহার ভ্রাতুস্পপুত্র শিবরাজ রামপালের সহায়তা করিয়াছিলেন। রাজ্যপালাদি পুত্রগণের মধ্যে কেহ অশ্ব, কেহ গজবাহিনী এবং স্বয়ং রামপাল সমগ্র বাহিনীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সম্মিলিত সৈন্য বরেন্দ্রীতে প্রবেশ করিবার পূর্বে রামপাল বরেন্দ্রীর অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য মহনের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতিহাব শিবরাজকে একবার সসৈন্যে বরেন্দ্রীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দেবতা ও ব্রাহ্মণের সম্পত্তির কোন অনিষ্ট হইবে না বলিয়া তিনি এইরূপ

৩৪। গৌড় রাজমালা পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯ (ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রের কৈবর্ত নায়ক দিব্বোককে প্রথম রাজা না বলিয়া তদীয় ভ্রাতুষ্পত্র ভীমকেই প্রথম রাজা বলিয়াছেন।)

৩৫। Vide-Ramacharita by Sandhyakara Nandi (V R.A S Musum Rajshahi).

৩৬. গৌড়রাজমালা পৃঃ ৪৮। শ্রী অযোদ্ধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক সম্পাদিত। বামচরিতের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

আশ্বাস দিয়া রামপালকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। অতঃপর সম্মিলিত সৈন্য পরপাড় হইতে নৌকায় গঙ্গারবক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া শত্রুর অলক্ষ্যে বরেন্দ্রীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন[৩৭]। রামপালের সাহায্যকারী সামন্তদের মধ্যে কেহ বরেন্দ্র নিবাসী ছিলেন না। কিন্তু, রামপালের এই রূপ প্রভূত সৈন্য সংগ্রহ ও সর্তকতার সহিত বরেন্দ্র আক্রমণের বিপুল উদ্যোগ দেখিয়া প্রতিযোদ্ধা বরেন্দ্রীরক্ষক ভীমের বাহুবল অনুমান করা যায়। রাম ও ভীমের যুদ্ধ এবং ভীম সৈন্যের স্বদেশ-প্রাণতা (১/১৭) রামচরিতম কাব্যে সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। হস্তীপৃষ্ঠে আরোহনাবস্থায় ভীম যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হইলেন। তাঁহার সুহৃদ সেনানায়ক হরি ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের একত্র করিয়া পুণর্বার রামপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ কবিলেন। কিন্তু এত অধিক সৈন্যের বিরুদ্ধে হরি বেশীক্ষণ টিকিয়া থাকিতে পারিলন না। অবশেষে করিপৃষ্ঠে অবস্থিত হরি বন্দী হইলেন। (২/১২-২০)। বন্দী ভীম ও হরির প্রাণবধ হইল। "এই উপলক্ষ্যে সন্ধ্যাকর একপক্ষে সাগর অপর পক্ষে রাবনরূপী ভীমের চরিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। শ্লেষের অনুরোধেই হউক, আর সত্যের অনুরোধেই হউক, ভীমের চিত্র উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।" রামচরিতে লিখিত এই প্রজা বিদ্রোহের কিছু কিছু আভাস তৎকালেব তাম্র-শাসন এবং শিলালিপিতে পাওয়া যায়। কামরূপের রাজা বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে (৪র্থ শ্লোক) রামপাল সম্বন্ধে লিখিত আছে:- "যুদ্ধ সাগর লঙ্ঘন করিয়া, ভীমরূপী রাবন বধ করিয়া, 'জনকভু' উদ্ধার করিয়া রামপাল ত্রিজগতে দাশরথি রামের ন্যায় যশ বিস্তার করিয়াছিলেন[৩৮]। সারনাথের ভগ্নস্তূপে ১৯০৮ সালের মার্চ মাসে আবিস্কৃত একখানি শিলালিপিতে রামচরিতমে উল্লিখিত কয়েকজন যোদ্ধা পুরুষের নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়[৩৯]। যাহাহউক, রামপাল বরেন্দ্রী উদ্ধাব করিয়া ভীমের রাজধানী রমনীয় 'ডমননগর' লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত ও অগ্নিসংযোগে ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে বরেন্দ্রীর গণতন্ত্র ও রাজবংশ লোপ পাইল। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বলিয়াছেন (২।১৭ শ্লোক) "ইহা বিধি বিড়ম্বনা[৪০]।"

একাদশ শতকের শেষভাগে কৈবর্ত নায়ক ভীমেব রাজত্বে বরেন্দ্রবাসী পরম সুখে দিনাতিপাত করিয়াছিল এবং তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্যে এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে, পরবর্তীকালেও তাঁহার নাম বিস্মিত হয় নাই। তাই হয়ত এখনও সেই বীর পুরুষের নামানুসারে উত্তরবঙ্গে নানা স্থানে দীর্ঘিকা-মৃৎপ্রাকার, বহু ধ্বংসাবশেষ মন্দিবাদি ও জয়স্ত স্তম্ভাদি দৃষ্ট হয়। মঙ্গলবাড়ীর গরুড়স্তম্ভটি তাঁহারই নামানুসারে স্থানীয় অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে এখনও ভীমের পান্টি বলিয়া কীর্তিত*। পত্নীতলা থানাব পশ্চিমে শাহ-পাহাড়ের

গঙ্গা অতিক্রম সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-কর্তৃক মুদ্রিত রামচরিতের ভূমিকায় লিখিত আছে। The allied army threw a bridge of boats in the Ganges, p 14; রাখাল বাবুর palas of Bengal এ-ইহার সমর্থন বহিয়াছে।

গৌড় রাজমালা পৃষ্ঠা–৪৯।

Epigraphia Indica, Vol IX, PP. 323-326

Vide, Ramacharitama

এতদাঞ্চলে ভীমের পান্টির কিংবদন্তী এইরূপঃ–"ভীম সৃষ্টিকর্ত্তার এক প্রতিনিধি। সমস্ত পৃথিবী কর্ষন কবিয়া শস্য উৎপাদনের দায়িত্ব তাঁহাব উপব ন্যাস্ত ছিল। বৎসরেব এক নির্দিষ্ট দিনে নিশীথে পৃথিবী কর্ষন কবিতেন। কোন এক অজ্ঞাত কাবনে ভূমি কর্ষন সমাপ্ত হইবার আগেই মঙ্গলবাড়ীতে আসিয়া বাত্রি প্রভাত হইয়া যায়। তিনি চক্ষুব অন্তবাল হইবাব জন্য তাহার স্বর্ণ নির্মিত লাঙ্গল জোয়াল,



জগদ্দল মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ

আলোচ্য ভীমের জাঙ্গালের স্থানে স্থানে বেষ্টনী আছে। এই বেষ্টনীর মধ্যে কোন কোনটি গড় ও দেবয়তনাদি রূপে কথিত হইয়া থাকে। রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলে বিশেষতঃ রহনপুর রেল-ষ্টেশন ও পোরশা থানার কোন কোন স্থানে পুর্ণভবা নদীর অদুরে এই শ্রেণীর মৃৎ-প্রকারের বেষ্টনী দৃষ্ট হয়। দিনাজপুর ও রংপুরের ভীমকীর্তিগুলি আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিব। মহারাজ দিব্বোক ও ভীম 'কৈবর্ত্ত' বলিয়া বর্ণিত*। তাঁহারা যুদ্ধ ব্যবসায়ী। বরেন্দ্র ভূমিতে তাঁহাদের স্বজাতীগণ মাহিষ্য বলিয়া অভিহিত। প্রধানতঃ রাজশাহীর নওগাঁ মহকুমা, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় ইহাদের বাস আছে। ইহারা বরেন্দ্র ভূমির অধিবাসী এবং ভীমের বংশধর বলিয়া কেহ কেহ দাবীও করিয়া থাকে।

ভীমের বংশধর

রাজ রামপাল পিতৃভূমি বরেন্দ্রী উদ্ধার করিয়া রাজধানী-নগর ও শিক্ষা বিস্তার কল্পে বিহার স্থাপন করিয়া বরেন্দ্র ভূমির শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এই বিহারের নাম 'জগদ্দল-মহাবিহার' এবং রাজধানীর নাম রাখিয়াছিলেন-'রামাবতী'। এই রামাবতীই পাল রাজবংশের শেষ 'রাজধানী'। ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ রামাবতীর অনুসন্ধান করিয়া দর্শন[৪৩] করিয়াছিলেন-আত্রাই নদীর পুরাতন খাতের পশ্চিম তীরে যোগীঘোপা হইতে প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। জেনারেল কানিংহামের আমলে এখানে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়াছিল। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এইস্থানে পরিদর্শনকালে প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন[৪৪]। কানিংহামের আমলে এই স্থানটি অরক্ষিত ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল[৪৫]। বর্তমানে যদিও ইহার অধিকাংশ স্থান আবাদীক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। তবুও প্রায় ৫ মাইল জুড়িয়া প্রাচীনকালের বহু দীঘি পুষ্করিণী ও পাকা রাস্তা-পথের চিহ্ন রহিয়াছে। এই ভূমিখন্ডে এখনও ৩/৪টি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে এই রামাবতীর বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে৪৬। গৌড়ের পাড়ুয়ার মসজিদে প্রাপ্ত 'শেখ শুভোদয়া' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে রামাবতীর প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। পরবর্তীকালে দিনাজপুর জেলার মনহলি গ্রামে আবিস্কৃত পাল রাজবংশের মদনপালদেবের তাম্র শাসনে 'রামাবতী পরিসর' জয়স্কন্দাবার প্রতিষ্ঠার উল্লেখ দেখিয়া ঐতিহাসিক নগেন্দ্রনাথ বসু বর্তমান স্থানের বিষয় অবগত না হইয়া দিনাজপুরের অন্য একটি স্থানের উল্লেখ করিয়াছিলেন[৪৭]। পল্লীগাথাতে স্থানটি আজও আমামাবাদ বা আম্বাশ্বর[৪৮] নামে খ্যাত। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে আম্বাস শহর বলিয়া থাকে। কানিংহাম ইহাকে আমাই বা আমৈর বলিয়াছেন[৪৯]। আলোচ্য আমাই-(আমৈর) এর দক্ষিণে একটি ইষ্টক স্তূপ রহিয়াছে। সেখানে নাকি মাঝে মাঝে

রামাবতী ও জগদ্দল-মহাবিহার

* মদীয় পরবর্তী উত্তর-বঙ্গের ইতিহাসে রংপুর অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচ্য দ্রষ্টব্য।

৪৩. গৌড় লেখমালা পৃঃ ৫০, ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪৪. Vide-Old catalogue of V R S Museum

৪৫. Archaeological Survey of India, Vol XV, P 121

৪৬ Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, No 1, 1910 এবং বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'রাম রাম চরিত' দ্রষ্টব্য।

৪৭ গৌড় লেখমালা পৃষ্ঠা ১৪৭-১৫৮।

৪৮. প্রাচীন পল্লীগাথার কিছু সংগ্রহ "ভাতসাইল প্রগতিশীল লাইব্রেরীতে" রক্ষিত আছে।

৪৯. Cunningham's Report Vol, XV, P. 121

প্রাচীন স্বর্ণ ও রজত মুদ্রাদি পাওয়া যায়। এই রামাবতীর ১১/২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে 'বৃন্দাবন'। এই বৃন্দাবনের সন্নিকটে একটি বৃক্ষের নীচে কতকগুলি ভগ্নমূর্তি পড়িয়া আছে। সেখানে চৈত্র মাসে মেলা বসে। সেখানকার অষ্টশক্তি ও ১ টি বিষ্ণুমূর্তি বর্তমানে বরেন্দ্র মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এই আম্বাশ্বরের ভৌগলিক অবস্থান ও অন্যান্য প্রাচীন কীর্তি সত্যি সত্যিই একটি প্রাচীন শহরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আম্বাশ্বর বা আমৈর—'রামাবতীর'* অপভ্রংশ এবং এখানকার প্রাচীন শহরের জনশ্রুতি এখনও বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। এককালে ইহার অবস্থান অতীব মনোরম ছিল। তখন আত্রাই নদী ইহার নীচে দিয়া প্রবাহিত হইত। এখন সেই মরা নদী ঘুকশীর বিলে পরিণত। কোন কোন ঐতিহাসিক ইহাকে যমুনা নদীর মরা স্রোত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু, আসলে ইহা আত্রাই নদীর প্রাচীন খাত। মধ্যযুগের নদীর ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহার হদিস পাওয়া যাইতে পারে। এই নদীর পরপাড়ে 'জগদ্দল-মহাবিহার' রামপাল' কর্তৃক স্থাপিত[৫০]। ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বলিয়াছেন, "প্রজা বিদ্রোহের অবসানে রামপালদেব এক নূতন নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহাই পাল রাজগণের শেষ রাজধানী 'রামাবতী'। তাহা বরেন্দ্র ভূমির শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। 'জগদ্দল-মহাবিহার' নামক একটি বৌদ্ধ বিহার ইহার নিকট অবস্থিত।

"এই মহা-বিহারের দক্ষিণে চারিটি বৃহৎ সিঁড়ি বিশিষ্ট তক্কে-মাড়ীর দীঘি নামক বিরাট দীঘি। এই দীঘির উত্তরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া পরস্পর দুইটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। পূর্ব্ব পার্শ্বেরটি একটু ছোট এবং পশ্চিম পার্শ্বেরটি একতলা বা দ্বিতল চকমেলান ইষ্টকনির্মিত বাড়ীর ধ্বংসাবশিষ্ট। বলা-বাহুল্য, রাজশাহী জেলার ধামৈর হাট থানার এই 'জগদ্দল-মহা-বিহারের' প্রাকৃতিক অবস্থান এতই মনোরম যে, যে না দেখিয়াছে সে রাজশাহীর কোন সৌন্দর্য্যই উপভোগ করে নাই। স্থানীয় শবর, সাঁওতালগণ ইহাকে রাজবাড়ী বলিয়া থাকে[৫১]। স্থানীয় অন্ত্যজদের ধারণা অমূলক নয়। এককালে জগদ্দল-মহাবিহার রাজবাড়ীই ছিল। তবে সেখানে রাজা-মহারাজাদের কাচারী বসিতনা অথবা রাজকার্য্য পরিচালিত হইতনা। জ্ঞানচর্চ্চা হইত। হিয়েন সিয়েন তাঁহার 'ভারত ভ্রমন বৃত্তান্তে' সপ্তম শতকের পৌণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি এবং কর্ণ-সুবর্ণের লোকদের জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানচর্চ্চার খুব প্রশংসা করিয়াছেন[৫২]। নালন্দা মহা-বিহারের (নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়) সঙ্গে বাঙলার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। নালন্দা মহাবিহারের মহাচার্য্য শীলভদ্র বাঙ্গালী ছিলেন[৫৩]। তিনি ছিলেন সমতটের ব্রাহ্মণ্য রাজবংশের সন্তান ও হিউয়েন সাংএর শিক্ষাগুরু। তাঁহার সময়ে নালন্দা মহাবিহারের শ্রমন সংখ্যা ছিল ১০,০০০ হাজার। তখন বাঙলাদেশের বৌদ্ধ-বিহারগুলি জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র ছিল। এখানে বৌদ্ধ ধর্মের চর্চ্চা ও বৌদ্ধ-শাস্ত্র পাঠ ছাড়াও ব্যাকরণ শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চতুর্বেদ, সাংখ্য, সঙ্গীত,

---

* রামাবতীর সন্নিকট হুদুমশর (বা হর্দশ্বর) কে স্থানীয় লোকেরা রামপালের 'লড়াইক্ষেত্র' বলিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে।

৫০. Nalanda, page-9

৫১. A.N.N Report, A/S, I, E/c 1920-21, PP 30-31

৫২ Vide, S Beal Buddhist Records of the western world (by Hiwen Tsong)

৫৩ শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'প্রাচীন বাঙলার গৌরব' পৃঃ ২৮—৩১।

চিত্রকলা, মহাযান শাস্ত্র, অষ্টাদশ নিকায়বাদ, যোগশাস্ত্র, জোর্তিবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইত। পাল চন্দ্র পর্বের বাঙলাদেশের আসল গৌরব ছিল বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতি। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংস্কৃতির বড় বড় কেন্দ্র ছিল জগদ্দল-মহাবিহার, সোমপুরী মহাবিহার, পাণ্ডুভূমি, ত্রৈকুটক, বিক্রমপুরী, দেবীকোট, সন্নগর, ফুল্লহরি, পণ্ডিত প্যাট্রিকেরক ইত্যাদি বিহার। আলোচ্য জগদ্দল-মহাবিহারের দুইজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের নাম আমরা অবগত হইতে পারি-তাঁহারা হইলেন দানশীল ও বিভূতিচন্দ্র। বিভূতিচন্দ্র ছিলেন একাধারে গ্রন্থকার, টীকাকার, অনুবাদক ও সংশোধক। ইনি কিছু দিন নেপালে ও তিব্বতে ছিলেন। তিব্বতী ভাষায় তিনি অনেক বই অনুবাদ করিয়াছিলেন। আচার্য্য দানশীল প্রায় ৬০ খানা তন্ত্র গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ করিয়াছিলেন। আর একজন আচার্য্যের নাম আমরা জানি-তিনি হইলেন মোক্ষাকর গুপ্ত। তর্কভাষা নামক বৌদ্ধ ন্যায়ের উপর তিনি একটি পুঁথি লিখিয়াছিলেন। আর একজন বৌদ্ধচার্য্য অভয়াকরগুপ্ত। সম্ভবতঃ ইঁনি রামপালের সমসাময়িক ও জগদ্দল বিহারের একজন আচার্য্যে ছিলেন[৫৪]। ইতিপূর্বে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক জগদ্দল মহাবিহ-ার হইতে কিছু মৃৎ-ফলক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চান্দব ও আরানগব

এই জগদ্দল মহাবিহারের দক্ষিণে (অদুরে) চান্দর ও আবানগর 'রামাবতীর' সমসাময়িক ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমিত হয়। এই দুই স্থানে প্রাচীন কালেব বহু দীঘি পুষ্করিণী, পথঘাট ও বাড়ী-ঘরের চিহ্নাবশিষ্ট বর্তমানে বহিয়াছে। এই স্থানদ্বয়ের প্রাচীনতা বৌদ্ধ কীর্তির প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ সংগৃহীত হইয়া ববেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

নাথধর্মের প্রতিষ্ঠিতা মৎস্যেন্দ্রনাথ। তিনি চন্দ্র দ্বীপেব একজন ধীবর। তাহাব শিষ্য গোরক্ষনাথ ছিলেন রাজা গোপীচন্দ্রের সমসাময়িক। সিদ্ধ গোরক্ষনাথের শিষ্য গোপিচন্দ্রের মা মদনাবতী বা ময়নামতীর যোগশক্তি সম্বন্ধে এখনও বাঙলা দেশে অনেক গল্প প্রচলিত আছে*। উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গে নাথ পন্থীদের এক সময় যথেষ্ট মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি ছিল। তান্ত্রিক শক্তিধর্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে নাথধর্ম ও সম্প্রদায় অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। উত্তর-বঙ্গে (বরেন্দ্রীতে) এই নাথ সম্প্রদায়ের প্রধানতম কেন্দ্র ছিল বগুড়ার 'যুগীর ভবন'। এখনও সেখানে তিথিপরবে ফালগুনি পূর্ণিমায় স্থানীয় নাথ পন্থীদের সমাবেশ হইয়া থাকে। আলোচ্য যোগীঘোপা বগুড়ার যোগীরভবনের একটি শাখা। পাহাড়পুর হইতে প্রায় আট মাইল উত্তর-পশ্চিম কোনে ঘুকশীব বিলের তীরে এই যোগীঘোপা অবস্থিত[৫৫]। এই ঘোপার বর্তমান সেবাইত ও স্থলাভিষিক্ত শ্রী সুবতাই নাথ মোহন্ত। তিনি এখানকার অনুষ্ঠানাদি ও দেবোত্তর (তিন শত বিঘা লাখেরাজ) প্রভৃতি পরিচালনা করিয়া থাকেন। জেনারেল কানিংহাম এই স্থানটি পরিদর্শন করিয়াছিলেন[৫৬]।

নাথধর্ম ও যোগীযোপা

এই স্থানত্রয় প্রাচীন। গগনপুরের একটি ভিঁটাতে ঘরের ভিত তৈয়ারী করিবার সময়

৫৪. Indian Teachers of Buddhist Universitis (Madras, 1923), প্রাচীন 'বাঙলার গৌরব' পৃঃ ৪০-৪২।

* এ বিষয়ে আমি কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ কবিয়াছি।

৫৫. বগুড়াব ইতিকাহিনী পৃষ্ঠা ৮২, ৮৪, ৪৪৭।

৫৬ Cunningham's Archaeological survey Report, Vol XV PP 120-121

গগনপুর, কাশীপুর, ত্রিমোহনী

একটি প্রাচীন বৃহৎ ইষ্টক নির্মিত ইন্দারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাশীপুর প্রাচীন গ্রাম। চৈত্র সংক্রান্তিতে ত্রিমোহনীর বারুনীর স্নান ও মেলা বিখ্যাত। মহীসন্তোষের সন্নিকট উক্ত কাশীপুর ইষ্টক স্তূপ হইতে বরেন্দ্রী কৃষ্টির নিদর্শন স্বরূপ কিছু মৃৎশিল্প ও বিষ্ণুমূর্তি[৫৭] সংগৃহীত হইয়া রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়াছে।

বর্তমান রাজশাহী জেলার পশ্চিম সীমান্তে বালুরঘাট সদর (বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুর জেলার প্রধান নগর) হইতে প্রায় দুই মাইল পূর্বে আত্রাই নদীর প্রায় দেড় মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে পরগণা সন্তোষের অন্তর্গত প্রাচীন মহীসন্তোষে[৫৮] অবস্থিত

বারবাকাবাদ (মহীসন্তোষ) বা মাহিগঞ্জ

'মাহিগঞ্জ মুসলিম স্মৃতি বিজড়িত উল্লেখযোগ্য স্থান। ইহা সুলতান রুকুনউদ্দীন বারবাক শাহের রাজত্ব কালে সরকার বারবাকাবাদের প্রধান নগর ছিল। রাজা টোডর মলের রাজস্ব বিভাগ অনুসারে এই সরকারের মহল সংখ্যা ৩৮. রাজস্ব ১৭, ৪৫১, ৫৩২ দাম নির্দিষ্ট ছিল। রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া ও পাবনার উত্তরাংশের বহুলাংশ ভূমি এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখনও বারবাকাবাদ সরকারের কোন কোন মহলের নাম এই চারিটি জেলার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। যেমন—আমরুল, লস্করপুর, তাহিরপুর, কালীগাঁও প্রভৃতি। এই সরকার ৫০টি অশ্বারোহী ও ৭,০০০ হাজার পদাতিক সৈন্য সরবরাহ করিত। অবশ্য মুসলমান আমলে ভিন্ন ভিন্ন বাদশার সময়ে এই সব সরকারের পরগণা ও মহলের নাম ও স্থানের অনেক পরিবর্তন পবিবর্দ্ধন হয়। তাহা যথাস্থানে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রাচীন মহীসন্তোষ পাল নৃপতি রাজা মহীপালের কীর্তি বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। তাহার রাজত্বে এখানে হয়ত কোন সংঙ্ঘারাম নগর অথবা জয়স্কান্ধাবার নগর স্থাপিত ছিল। নামেও যেন তাহার একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ইহা মুসলমানদের অধীনে আসিলে এখানে সরকার বারবাকাবাদের সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। এখানকার আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক উপাদানগুলিতে তাহার স্বাক্ষর রহিয়াছে। একটু পরেই আমরা তাহার আলোচনা করিব।

আলোচ্য মহীসন্তোষ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "কাম্বোজান্ধ্ররাজ গৌড়পতিব কবল হইতে বরেন্দ্র উদ্ধার কবিয়া মহীপালেরও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল; এবং অশোকের ন্যায় মহীপালও যুদ্ধবিগ্রহ পবিত্যাগ কবিয়া পরহিতকর এবং পারত্রিক কল্যাণকর কর্মানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। রাঢ় দেশে (মুর্শিদাবাদ জেলায়) "সাগরদীঘি," এবং বরেন্দ্রে (দিনাজপুর জেলায়) "মহীপাল দীঘি" অদ্যাপি মহীপালের পরহিত নিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে। এই তিনটি সুবৃহৎ নগরের ভগ্নাবশেষ; বগুড়া জেলাব অন্তর্গত "মহীপুর" (পাঁচবিবির সন্নিকট তুলসীগঙ্গা নদীর তীবে), দিনাজপুর জেলার "মহীসন্তোষ" (বর্তমান রাজশাহী জেলা) এবং মুর্শিদাবাদ জেলার "মহীপাল" মহীপালের নামের সহিত জড়িত রহিয়াছে[৫৯]।

সেন বর্মণ আমল হইতে বাঙলার বৌদ্ধ কীর্তিগুলি হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছিল।

৫৭. The ancient Monument of Varendra, P. 8

৫৮. The ancient Monument of Varendra, P. 8.

৫৯. Vide গৌড়রাজমালা পৃষ্ঠা ৪১-৪২ দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধবিরোধী হিন্দুদের অত্যাচারে উত্তর-বঙ্গের কতকগুলি বৌদ্ধ বিহারের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল (?)। তখন হয়ত হিন্দু ও বৌদ্ধ অধ্যুষিত নগর "বান-নগরের"[৬০] অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বঙ্গ-বিজেতা বখতিয়ার খিলিজি কর্তৃক নোদিয়া– লক্ষ্ণৌতী বিজিত[৬১] হইলে উক্ত বান নগর পর্য্যন্ত বখতিয়ার খিলজির কবলিত হইয়াছিল[৬২]। এই সময় বান-নগর বা বান-গড় উত্তর-বঙ্গের শাসনকন্দ্রে হিসাবে (দেবীকোট বা দেবকোট) বিবেচিত হইয়া শক্তিশালী মুসলিম সেনানিবাস (?) কেন্দ্রে পর্য্যাবসিত হইযাছিল। তখনই হয়ত ইহার অনতিদূরে (৪ মাইল দূরে ?) উল্লিখিত মহী-সন্তোষ মুসলমান শাসন কবলিত হইয়া সংস্কারমুক্ত হইয়া থাকিবে। এবং পরবর্তীকালে ইলিয়াস শাহ বংশের রুকুনউদ্দীন বারবাক শাহের রাজত্বকালে উত্তর বঙ্গের এই অঞ্চলের একটি শক্তিশালী শাসনকেন্দ্র হিসাবে মহী-সন্তোষ বিবেচিত হওয়ায় সেনানিবাস, রাজকীয় দপ্তর, টাকশাল প্রভৃতি স্থাপিত হইয়া স্থানটি খুবই সমৃদ্ধশালী হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং বারবাকাবাদ নামে পরিচিত ছিল। রুকুনউদ্দীন বারবাকশাহের রাজত্বকালে ৮৬৪ হিজরীতে (খ্রীঃ ১৪৫৯) এই বারবাকাদের টাকশালে প্রস্তুত একটি মুদ্রা আবিস্কৃত হইয়া তাহা সপ্রমাণিত করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, পরবর্তীকালে এই বারবাকাবাদ টাকশালে প্রস্তুত ৮৯৬ হিজরীর (খ্রী: ১৪৯০) সুলতান সমস-উদ্-দীন আবু নছর মজাফ্ফর শাহের এবং ৯২৮ হিজরীর (খ্রী: ১৫২৯) নাছিরউদ্দীন নশরৎ শাহের মুদ্রাও এখানে আবিস্কৃত হইয়াছে[৬৩]। সুতরাং ইহাই যে, বারবাকাবাদের সদর ছিল– সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই বারবাকাবাদের পূর্বনাম মহীসন্তোষের পরিবর্তে বর্তমান 'মাহিগঞ্জ' নামটি মুসলমানী শাসনের আর একটি নিদর্শন। কেননা তুর্কী যোদ্ধা কর্তৃক বঙ্গ-বিজয় হইলে বাঙলা দেশে ফার্সী-ভাষার প্রচলন হয়। ফার্সী 'গেন্জ' হইতে গঞ্জ শব্দের উৎপত্তি। সম্ভবত: মহীপালের কীর্তির উপর মুসলমান কীর্তি স্থাপিত হইয়া মহীসন্তোষের পরিবর্তে মুসলমান আমলে 'মহীগঞ্জ' বা মাহীগঞ্জ নামে স্থানটি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইংরেজ আমলের শেষ অধ্যায়েও এই গঞ্জের নিদর্শন ছিল। তাই হয়ত হিন্দুর ইতিহাসে এই স্থানটির 'মহীসন্তোষের' উল্লেখ থাকিলেও স্থানীয় লোকদের নিকট আজও ইহা 'মাহীগঞ্জ' নামে সমধিক পরিচিত। এই গঞ্জ ছোট বাজার বন্দরও হইতে পারে অথবা বৃহত্তর হইতে পারে। যদিও ইহার কোনটিই আজ বর্তমান নাই। তথাপি এই স্থান মাহাত্মের কথা এখনও চারিদিকে সুপরিচিত। কেবল মাত্র ৪/৫টি মসজিদের ভিত, দুইজন পীরের এবং একজন উজিরের সমাধি; কতকগুলি দীঘি পুষ্করিণী এবং দীঘি পুষ্করিণীর পাড়ে পাকা বাড়ীর (মহল্লার) ভগ্নাবশেষ, পাকা পথঘাট স্থানে স্থানে পতিত ভিঁটা (ময়দান ?) এবং কয়েকটি ইষ্টক নির্মিত বাড়ীর চত্বর ও প্রাচীর বেষ্টিত একটি গড় (ছাউনী) ইতঃস্তত জঙ্গলাবৃত হইয়া কালের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। স্থানটি যে এককালে খুবই সমৃদ্ধশালী নগর বন্দরে সুশোভিত ছিল, ইহার বর্তমান আয়তন, আকৃতি প্রকৃতি, ভৌগলিক অবস্থান

৬০. এই বান-নগবের বিস্তৃত বিবরণেব জন্য দ্রষ্টব্য Archaeological Survey Report, Vol XV, PP 95-100, Martin Eastern India, Vol. 11, PP, 659-664, And also see K. G Goswami Excavation of Bangarh, P 2: And V R S Monograph No 4

৬১. Raverty's Tabakat-i-Nasiri, PP 556-558.

৬২. Raverty's Tabakat-i-Nasiri, PP. 484-486

৬৩. J P H S Vol 1 1953-PP 409-410 And also Vide appendix

দেখিয়া তাহা মনে করা যায়। এই স্থানটি ইষ্টকময় এবং প্রচুর প্রস্তর খণ্ড সমাকীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই স্থানের প্রাচীন গৌরবের সাক্ষ্য প্রমাণিক ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যের মধ্যে একটি জীর্ণ কামান ও কয়েকটি তরবারী তিনটি আরবী শিলালিপি ও কয়েকটি মসজিদের মেহরাব আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ওয়েষ্ট মেকট সাহেব[৬৪] (দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট) এখানে আবিষ্কৃত তিনটি শিলালিপির দুইটির সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। উহার বড়টি স্থানীয় সমাধির প্রবেশদ্বারে স্থাপিত ছিল। যদিও এই লিপির সহিত উক্ত সমাধির কোন সম্পর্ক নাই। এই লিপিটিতে সুলতান রুকুন উদ্দীন বারবাক শাহের রাজত্বকালে (খ্রীঃ ১৪৫৯-৭৪ হিজরী ৮৬৪-৭৯) একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার তারিখ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। উলুগ একরার খাঁ রুকুন উদ্দীন বারবাক শাহের সরলস্কর (সেনাপতি) ও উজির ছিলেন। এই উলুগ একরার খাঁ যখন মাহিগঞ্জের শাসন কেন্দ্রে (?) থাকিয়া উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চল শাসন করিতেছিলেন তখন মাহিগঞ্জে তাঁহার অধীনস্থ উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী আশরাফ খান কর্তৃক ১৪৬০-৬১ সালে (হিজরী ৮৬৫) সুলতান মুহম্মদ শাহের পুত্র সুলতান রুকুন উদ্দীন আবুল মুজাহিদ বারবাক শাহের রাজত্বকালে একটি মসজিদ নির্মান করাইয়াছিলেন[৬৫]। মাহিগঞ্জে আবিষ্কৃত ওয়েষ্টমেকট সাহেবের ছোট লিপিটি একটি ভগ্নলিপি। এই লিপি অনুসারে মশহুর শহর বারবাকাবাদ[৬৬] মকানের উজির খানে আজম কর্তৃক ৮৭৬ হিজরীতে (খৃ ১৪৭১-৭২) একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। এই আজম খান উজির উলুগ একরার খানেব পরবর্তী উজির ছিলেন। তিনিও এই বারবাকাবাদে (মাহিগঞ্জে) অবস্থান করিতেন। তাহা এই লিপিটির মর্ম হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে। সুতরাং মহীসন্তোষ যে পরবর্তীকালে (সম্ভবতঃ সুলতান রুকুন উদ্দীনের সময় হইতে) সরকাব বারবাকাবাদের লিপিটিতে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। এবং ইহা একটি মশহুর শহর ছিল তাহাও === হইতে প্রতিফাত হইয়া উঠিয়াছিল[৬৭]।

(৩) আর একটি আরবী লিপি যাহা কুমার শরৎ কুমার রায় কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়া বরেন্দ্র মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। বরেন্দ্র মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠাতা কুমার বাহাদুর মাহিগঞ্জ পরিদর্শন কালে স্থানীয় মিঠা পুকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে জঙ্গলের মধ্যে একটি ভগ্ন মসজিদের স্তূপ হইতে এই প্রস্তর লিপিটি আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। এই লিপিটিতে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে ৯১২ হিজরীতে (খ্রীঃ ১৫০৯) জনৈক সুহাইলের পুত্র কর্তৃক রমজান মাসের ৯ই তারিখে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার বিষয় উৎকীর্ণ আছে[৬৮]। কুমার বাহাদুর কর্তৃক আবিষ্কৃত হোসেন শাহী এই লিপিটির (১৯ ইঞ্চি × ৯ ইঞ্চি) অপর পৃষ্ঠায় পদ্ম ও অন্যান্য শিল্প নিদর্শনের মধ্যে বিষ্ণু (সম্ভবতঃ একাদশ শতক) মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। এবং বরেন্দ্র মিউজিয়মের ইসলামিক বিভাগে (দক্ষিণ পার্শ্বের কক্ষে) মাহিগঞ্জ হইতে কুমার বাহাদুর কর্তৃক আনিত যে মেহরাবটি সুসজ্জিত ভাবে প্রদর্শনের জন্য রক্ষিত আছে— তাহার পৃষ্ঠদেশে পদ্ম ও অন্যান্য শিল্প-নমুনার মধ্যে সূর্য্য

৬৪. Martin's Eastern India, 11, P. 667.

৬৫. Ibid, Vol. XI IV, Pt. I, P 290, Inscriptions of Bengal, Vol IV, P. 74.

৬৬. J. A S. B old Series, Vol XV IV, 1875, Pt 1, P 291.

৬৭. Inscriptions of Bengal. Vol. IV, P. 90

৬৮. Inscriptions of Bengal, Vol IV, P. 179, Annual Report of the V R S 1928, P 18.

ও বিষ্ণুমূর্তি প্রভৃতি খোদিত রহিয়াছে। তিন অথবা ততোধিক মসজিদের মেহরাবের টুকরা একত্র করিয়া এখানে সম্পূর্ণ একটি মেহরাব প্রদর্শিত হইয়াছে। মাহিগঞ্জ হইতে সংগৃহীত আরবী শিলালিপিও মসজিদের মেহরাবটির পৃষ্ঠদেশে সূর্য্য ও বিষ্ণুমূর্তি এবং অন্যান্য শিল্প নিদর্শনগুলি পাল ও সেন পর্বের বলিয়া অনুমিত হয়। এবং এই নিদর্শনগুলিই মহীসন্তোষের প্রাচীনতার পরিচায়ক। পূর্বাহ্নে উল্লেখ করিয়াছি–হিন্দু-বৌদ্ধ কীর্তির উপর মুসলিম কীর্তি স্থাপিত। এবং বৌদ্ধ, হিন্দুর সৌধরাজির মালমসলাগুলি যে পরবর্তীকালে বঙ্গ সুলতানরা ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাও উপরের বিবৃতি হইতে প্রতিভাত হইতেছে।

রাজশাহী জেলা পর্য্যটনকালে (৪র্থ বারে) ১৯৬৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আমরা এই মাহিগঞ্জ পরিদর্শন করিয়াছি। এখানে শীত মৌসুমে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার বাস করে। তাহা ছাড়া বৃহৎ বৃহৎ সর্পাদির কথা তো সুবিদিত। তখন আমাদের হাতী কতকগুলি কুঞ্জবনে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তবুও অতিকষ্টে আমি আমার দল সহ প্রাগুক্ত আলাউদ্দীন হোসেন শাহের ভগ্ন মসজিদের উত্তর দরওয়াজা দিয়া চত্বরে প্রবেশ করি। বিরাট আয়তনের মসজিদ। পশ্চিম দেওয়ালে পাঁচটি মেহরাব এবং এই সব মেহরাবের কোন কোনটিতে লতাপাতাসহ ঝুলন্ত শিকলে ফুলের- তোড়া- গুচ্ছাদি, দুই পার্শ্বে প্রস্ফুটিত পদ্ম প্রভৃতি উৎকীর্ণ আছে। মুসলিম বঙ্গেব প্রাথমিক যুগের মসজিদ গুলিতে বিশেষত: অনৈসলামিক দেশকে আলোকিত করিবার জন্য হয়ত মুসলমানের (পার্থিব জগতে লক্ষ্যস্থল) পবিত্রতম স্থান মসজিদের মেহরাবে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল[৬৯]। তাহারই যেন স্বাক্ষর মাহিগঞ্জ মসজিদের মেহরাবে রহিয়াছে (মুসলিম বঙ্গের প্রাথমিক যুগের ইসলামের আলোর পূর্ব্বাভাসের নিদর্শন)। এই সব নিদর্শন অধিকাংশই হোসেন শাহী ও তদীয় বংশধর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদ গুলিতে পরিলক্ষিত হয়। লতাপাতা ও প্রস্ফুটিত পদ্ম উৎকীর্ণ এই সব মেহরাবের প্রস্তর খণ্ডগুলির সবগুলিই কৃষ্ণ প্রস্তরের নয়। শ্বেত প্রস্তরও রহিয়াছে। এই শ্রেণীর একটি সজ্জিত প্রস্তর খণ্ড মাহিগঞ্জের সন্নিকট 'বস্তাবর' নামক গ্রামের মসজিদ প্রাঙ্গনে মুচ্ছল্লীদের পাদুকা রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে ছিল। মিউজিয়মের সম্পদ হিসাবে আমি উহা স্থানান্তরে রাখিয়া আসিয়াছি। চতুস্পার্শ্বে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আবৃত থাকায় আমরা আলোচ্য ভগ্ন মসজিদটির আকৃতি প্রকৃতির নকশা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আনুমানিক আয়তনে কুশুম্বা মসজিদের সমান হইবে। উত্তর ও পূর্ব পার্শ্বের প্রবেশ পথ দুইটির ভিত কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা রচিত। হয়ত অন্যান্য প্রবেশ পথগুলিও অনুরূপ ভাবে রচিত ছিল। মসজিদ প্রাঙ্গনে কৃষ্ণ প্রস্তরের স্তূপ দেখিয়া মনে হয় ইহা আকারে ছোট হইলেও গৌড়ের (রাজশাহীর ছোট সোনা মসজিদ) ছোট সোনা মসজিদের অনুরূপ ইহার গঠন রীতি ও দেওয়াল গাত্র প্রস্তর দ্বারা আবৃত ছিল। পশ্চিম দেওয়ালেব গাঁথুনীর উচ্চতা প্রায় ৩।৪ ফুট বর্তমান রহিয়াছে। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে শাহী বারোদুয়ারী (১২ দরওয়াজা বিশিষ্ট) মসজিদ" বলিয়া থাকে। ইহাতে নাকি ১০টি গুম্বজ ছিল। বর্তমানে এই শাহী মসজিদ প্রাঙ্গনে যেন তেন প্রকারের একটি চালাঘরে স্থানীয় ২।৩ জন লোক কখন কখন নামাজ আদায় করিয়া থাকে।

৬৯. Encyclopeadia of Islam 'Mihrab'

প্রাগুক্ত তিনটি সমাধির দুইটি দুইজন জানানা পীরের সমাধি রূপে পরিচিত। এবং ইহা মিঠা-পুকুরের পশ্চিম তীরে–গড়ের দক্ষিণে অবস্থিত। প্রাচীর বেষ্টিত ইষ্টক নির্মিত এই পীরদ্বয়ের সমাধি দরগারূপে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান কর্তৃক পূজিত এবং প্রতি বৎসরে সেখানে একটি ঔরস-মহাফেল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্থানীয় লোকের নিকট এই পীরদ্বয়ের একজন মায়ি-সন্তোষ অর্থাৎ 'মা' অপরজন তাঁহার কন্যারূপে কথিত। আরও কথিত যে, এই মায়িসন্তোষ পীরের নামানুসারে নাকি–'পরগণে মহীসন্তোষ' নামকরণ হইয়াছে। ইহার সত্যতা সম্পর্কে আরও গবেষণা আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে। তবে এই পীরদ্বয় সুলতানি আমলের পরেব বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ সুলতানী আমলে ইঁহাদের সমাধি হইলে, নিশ্চয়ই কোন না কোন নিদর্শন এতদিনে আবিষ্কৃত হইয়া পড়িত। এই সমাধির দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ভগ্ন মসজিদের চত্বর পরিলক্ষিত হয়। কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড সেখানে পড়িয়া আছে। এই মহীসন্তোষ পরগনার প্রাচীনত্ব অনুসন্ধান করিলে হয়ত এই মহিলা পীরদ্বয়েরও কোন কথা প্রকাশিত হইয়া এই সমস্যার উপর আলোকপাত ঘটিবে। এ ব্যাপারে আমাদের পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য।

আর একটি গোর-স্থান ইহার পশ্চিমে (অনতিদূরে) অবস্থিত। ইহাতে একটি সমাধি "উজিরের কবর" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ওয়েষ্টমেকট কর্তৃক আবিষ্কৃত দুইটি আরবী লিপি বর্তমানে কলিকাতা 'ভারতীয় যাদু ঘরে' রক্ষিত আছে এবং অন্যান্য প্রত্নসম্পদগুলি রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়মে রক্ষিত আছে[৭০]।

বরেন্দ্র মিউজিয়মের পরিচালক (Director) ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ১৯১৩ সালে 'মাহিগঞ্জ' পরিদর্শনকালে বলিয়াছিলেন, "বঙ্গে স্বাধীন সুলতানদের আমলে মহীসন্তোষ বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল"। আমাদের বিশ্বাস বঙ্গ সুলতান নশরৎ শাহের আমলের পর হইতে মাহিগঞ্জের সকল গৌরব বিনষ্ট হইতে থাকে। মোঘল আমলে উত্তরবঙ্গের এই সুপ্রসিদ্ধ স্থানের সকল সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়া জনশূন্য হইয়া পড়ে। স্থানীয় জনশ্রুতি এইরূপ : "কোন এক সময়ে এখানে মহামারী হইয়া জনশূন্য হইয়া পড়ে।" তকে কি গৌড়ের আপৎকালে 'মাহিগঞ্জ'ও ধ্বংস হইয়া যায়– কে ইহার উত্তর দিবে? মাহিগঞ্জের চারিপার্শ্বে প্রায় দুই শতাধিক সাঁওতাল ও শবরদের বাস ছিল। ১৯৬২ (?) সালে তাঁহারা স্থানান্তরে গমন করিয়াছে। জঙ্গলাবৃত মাহিগঞ্জের বিভিন্ন ভিঁটাতে খনন কার্য্য চালাইলে যে প্রচুর ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ এখানকার কয়েকটি ভিঁটা-জমিতে চাষ করিবার সময় মুদ্রা ও তরবারী এবং তামার কিছু কিছু জিনিষ পত্র প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাহিগঞ্জ বর্তমানে চৌঘাট মৌজার অবস্থিত। গৌড় হইতে মাহিগঞ্জ পর্য্যন্ত একটি প্রাচীন (পাকা রাস্তা) রাজপথের চিহ্নাবশেষ এখনও কোথাও কোথাও পরিলক্ষিত হয়। তাহাছাড়া 'বানগড়'– 'জগদ্দল'– 'মঙ্গল বাড়ী' ও আত্রাদ্বিগুণের প্রাচীন পথগুলির কথা আগেই তো বলিয়াছি।

নেয়ামতপুর থানার অধীনে প্রাচীন আত্রাই নদীর (ছাতড়ার বিল) পশ্চিম তীরে এই স্থানত্রয় অবস্থিত। প্রাচীন ধর্মপুরে নওয়াবী আমলের একটি মসজিদ, রাজস্ব আদায়

৭০ Vide, Catclague of the Museum; Mohisontosh collection; V R. Society, in 1928, May

কাচারী বাড়ীর ভগ্নস্তূপ আছে। নওয়াবী আমলে সেখানে ধুমধামের সহিত তাজিয়াদি হইত। এই ধ্বংসস্তূপে চারটি ফারসী প্রস্তরলিপি আছে; উহাতে দোওয়ায়ে-কুনুত, কলেমা ও দরুদ শরীফ উৎকীর্ণ আছে। ধর্মপুরের উত্তরে চন্দন নগর নামে একটি প্রাচীন ভগ্নাবশেষ আছে। তাহা খননযোগ্য। এই অঞ্চলে বহু সংখ্যক নিম্নশ্রেণীর লোকজনের বাস আছে। এতদব্যতীত অল্প সংখ্যক অশিক্ষিত মুসলমানের বাস আছে। ইহারা অধিকাংশই মৎস্য ব্যবসায়ী। খুব সম্ভব বৌদ্ধ মন্দির মনে করিয়া জেনারেল কানিংহাম ঘাটনগর পরিদর্শন করিয়াছিলেন[৭১]। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রাম। এখানে ৪।৫টি দেব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখান হইতে দশম একাদশ শতকের কতকগুলি বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও চামুণ্ডা মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়া বরেন্দ্র মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

চন্দন নগব, পাইকারা ধর্মপুর

ঘাটনগর

এখানকার ছয়ঘাটি দীঘিটি বিখ্যাত। গ্রামের পথঘাটগুলি ইষ্টকদ্বারা নির্মিত ছিল। গ্রামের উত্তর পার্শ্বে প্রাচীর বেষ্টিত একজন ফকিরের সমাধি রহিয়াছে। এখানকার প্রাচীন জমিদারী কাচারীতে তহশীল ও পোষ্ট অফিস (?) স্থাপিত আছে। এখনও এই গ্রামের বিভিন্ন স্থানে ৫।৬টি কৃষ্ণ প্রস্তরের বিষ্ণু, বাসুদেব মূর্তি প্রায় অক্ষতাবস্থায় পড়িয়া আছে। পোরশার অনতিদূরে এই ঘাটনগর অবস্থিত। এই গ্রামের পার্শ্ব দিয়া একটি প্রাচীন নদীর খাত নির্দ্দেশ করা যায়। আইন-ই-আকবরীতে ঘাট নগরীর উল্লেখ আছে।

রাজশাহীর পশ্চিম সীমান্তে (পোরশা থানা) 'আগ্রাদ্বিগুণ একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। এখনও ইহার চারিপার্শ্বে বহু দীঘি পুষ্করিণী এবং প্রায় চারি বর্গমাইল ব্যাপী ইষ্টক নির্মিত পথঘাট ও প্রাচীন ঘরবাড়ীর চিহ্নাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে। ইহা একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমিত হয়। পাশাপাশি দুইটি প্রাচীন গ্রাম যথা আগ্রা ও দ্বিগুণ= "আগ্রাদ্বিগুণ" নামে প্রসিদ্ধ। এখানকার দীঘিগুলিব নাম যেমন–দ্বারকাদীঘি, পাথরদীঘি; ধাক্‌রানী দীঘি ও সংহার দীঘি প্রভৃতি খ্যাত। কিছুদিন আগে এই ইষ্টক স্তূপের মধ্যেস্থলে একটি শুরঙ্গ দৃষ্ট হইত। এখন তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেখানে একটি শিমুলের গাছের মূলে কয়েকটি প্রস্তরখণ্ড ইতস্তত: পড়িয়া আছে। এই স্তূপের পশ্চিম দক্ষিণ পার্শ্বে সুগভীর খাল ছিল। এখন তাহা কৃষিক্ষেত্র। পূর্ব ও উত্তর পার্শ্বে ইষ্টক নির্মিত পাকা বাড়ী ছিল–এখন তাহা জনবসতিতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখানে প্রাপ্ত-প্রত্নসম্পদগুলির কতক কলিকাতা আশুতোষ মিউজিয়মে আর কতক রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত নবম-দশম শতকের গরুড়ারূঢ় বিষ্ণু ও অলঙ্কৃত নারীর মুখমণ্ডল বিশেষ উল্লেখযোগ্র শিল্প নিদর্শন[৭২]। ইহাতে খননকার্য্য চালাইলে হয়ত এমন কিছু ঐতিহাসিক উপকরণ আবিস্কৃত হইয়া পড়িবে–যাহার দ্বারা এখানকার সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।

আগ্রাদ্বিগুণ

বর্তমানে এখানে একটি হাইস্কুল, মডেল স্কুল ও একটি হাট প্রভৃতি আছে। নওদার বুরুজের বিরাট ধ্বংসস্তূপ পাক-ভারতের ঐতিহাসিকদের নিকট একটি নূতন জিনিষ। নওদা নামটি বহু প্রাচীন। ইহার ভোগলিক অবস্থান

নওদা

৭১. Archaeological Survey Report, Vol. XV, P 122
৭২. 'ভারতের যাদুঘরে' পৃষ্ঠা ১৯।



মাহিগঞ্জ সুলতানী মসজিদেব ভগ্নাবশেষ

জয়স্কন্ধাবার নগর অথবা নগর রাজধানী প্রভৃতি নানা কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এক সময় ইহার পশ্চিম তীরে পূর্ণভবা তাহার স্রোত প্রবাহিত করিত। এখন ক্ষীনস্রোতা পূর্ণভবা প্রায় এক মাইল পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। অপর তিন দিকে সুগভীর গারিখা বেষ্টিত ছিল। পূর্বদিকে একটি অথবা দুইটি তোরণ এবং এই তোরণের পরেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর ছিল। এখন এই প্রান্তর শস্যক্ষেত্রে রূপায়িত। এই শস্যক্ষেত্রের উত্তরপার্শ্বে সংলগ্ন–শরব সাঁওতাল–অন্ত্যজদের বাস। এবং বিংশ শতকেব গোড়ার দিকে এই অন্ত্যজদের মধ্যে একটি খ্রীষ্টান মিশন গড়িয়া উঠিয়াছে। এইস্তূপে তিনটি পরস্পর ভগ্নাবশেষ আছে। স্থানীয় লোকেরা অপেক্ষাকৃত ছোট দুইটি স্তূপ হইতে ইষ্টকাদি সংগ্রহকালে দুইটি বাড়ীর চত্বর আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। বর্তমানে দুইটি বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ প্রায় ভূমি সমান হইয়া গিয়াছে। সর্ব- দক্ষিণেবটি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার বর্তমান উচ্চতা প্রায় ৫৫ ফুট হইবে। এখনও বহুদূর হইতে ইহার গগনচুম্বী চূড়া দৃষ্ট হয়। ইহা এককালে এই জয়স্কম্বারের মন্দির অথবা সুউচ্চ শান্ত্রিগৃহ (Tower) ছিল বলিয়া বোধ হয়।

এখানে প্রাপ্ত শিবউৎকীর্ণ প্রস্তর খণ্ড, বিষ্ণু, চামুণ্ডা, সূর্য্য ও আরও কিছু মূর্তি ও মৃতশিল্প-বরেন্দ্র মিউজিযমে ও মালদহে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইংরেজ মিশনারিরাও নাকি কিছু মূর্তি সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ১৯৫১ সালে গৌড় ভ্রমণকালে আমি নওদা পরিদর্শন করি। তখন তথায় একটি (প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষনের) নোটিশ ও কতকগুলি ভগ্নমূর্তি ইতস্ততঃ দেখিয়াছিলাম। নোটিশটি এখন সেখানে নাই।



আগ্রাদ্বিগুণ স্তূপ

১৯৬৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে নওয়াবগঞ্জের এস, ডি, ও, উক্ত মূর্তিগুলি সংগ্রহ করিয়া নওয়াবগঞ্জে লইয়া গিয়াছেন। এই প্রত্নসম্পদগুলির অধিকাংশই দ্বাদশ শতকের উর্দ্ধের নয়। দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বলিয়া অনুমান করা যায়।

স্থানীয় লোকেরা (জনশ্রুতি মূলে) ইহাকে নওদার বুরুজ বলিয়া থাকে। প্রাচীন লোকের ধারণা, ইহা নাকি দস্যুভবন ছিল। ছয় মাইল পূর্বে (প্রাচীনকালে) মুর্শিদাবাদ-দিনাজপুর রোড দিয়া উত্তর বঙ্গের রাজস্ব মুর্শিদাবাদ প্রেরণকালে (এবং অন্যান্য সময়েও) দস্যুগণ নাকি রাহাজানি ডাকাতি করিত এবং এখানে আসিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিত। ১৯৩৬ সালের দিকে (জনশ্রুতির আশ্রয়ে) জনৈক মওলানা (হাজি) আবদুল হামীদ (এম এ) সাহেব নওদার স্তূপ অবলম্বনে একটি কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাহার পুস্তকেও ইহা একটি দস্যুকেন্দ্র বলিয়া বর্ণিত। ১৯৬০ সালে তিনি উহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন[৭৩]। রহনপুর রেলষ্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তরে (বরিন্দ দিয়ার অঞ্চলের সীমান্তবর্তী স্থানে) ইহা অবস্থিত। ইহার চারি পার্শ্বে এখন কৃষিক্ষেত্র। এই ধ্বংসস্তূপের কিছু দক্ষিণে কতকগুলি পুকুর পুষ্করিণী বেষ্টিত ৮ দরওজা বিশিষ্ট একটি ভগ্ন মন্দির (?) অবস্থিত। এই অঞ্চলের রেশম ও নীলকরদের আমলে এখানে কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসী বাস করিত। সেই হিসাবে ইহা কোম্পানী আমলের কীর্তি বলিয়া অনুমিত। ড: দানী ইহাকে সপ্তদশ শতকের এমারত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (M. Arch. in Bengal, p. ২৫৫)

এই নওদা নামীয় আরও কয়েকটি স্থান– যেমন বগুড়ার নওদা-বগা ও নদা বা নওদাপাড়া, মুর্শিদাবাদ জেলার মির্জ্জাপুর থানার সন্নিকট 'নওদা' ও বারা (বিহার) জেলার 'নওদা' উল্লেখযোগ্য[৭৪]। এই সব স্থান শুধু মাত্র প্রাচীন গ্রাম। আলোচ্য নওদার মত ভৌগলিক অবস্থানের দিক দিয়া এই গ্রামগুলি ততখানি অর্থপূর্ণ নয়। আলোচ্য নওদা যেন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলিজি বিজিত 'নোদিয়হ'র অপভ্রংশের ইঙ্গিত দিতেছে। প্রাচীন বিবরণী, শিললিপি নকশা প্রভৃতির দ্বারা আমরা মধ্য যুগের নদীর ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাস (১৫৫০ সালে জাও-ডি-বারোসের নকশা) হইতে কিছুটা পুনর্গঠিত করিতে পারি। তাহার আগের ইতিহাস জানিবার কোন উপায় নাই। বাঙ্লা দেশে গঙ্গার প্রবেশ পথের সন্নিকট লক্ষ্মাবতী) গৌড়, পাণ্ডুয়া, টাঁড়া, রাজ মহল ইত্যাদিতে মধ্যযুগে বহুদিন ধরিয়া একের পর এক বাঙ্লার প্রাচীন রাজধানী (স্থাপিত) ছিল। সামরিক ও রাষ্ট্রিয় কারণেই তাহার প্রয়োজন ছিল। ঐতিহাসিক যুগে এই সব রাজধানী বেশীর ভাগ সময় গঙ্গার উত্তর তীরেই অবস্থিত ছিল। রাজা শশাঙ্কের পর হইতে মুসলমান যুগের মুর্শিদাবাদ রাজধানী প্রতিষ্ঠার আগে পর্য্যন্ত (রাজমহল ছাড়া) অধিকাংশ সময় বাঙ্লার রাজধানী পর্য্যায় ক্রমে গঙ্গার উত্তর তীরেই অবস্থিত ছিল। গঙ্গার দক্ষিণ কুলের গৌড়দেশের রাজধানীর কথা তত সুস্পষ্ট নয়; নদীর গতি পরিবর্তনে ২।১ বার নীত হইয়া থাকিলেও তাহা বেশীদিন স্থায়ী ছিল না। মালদহ জেলার ইংরেজ বাজারের উত্তর পশ্চিমে তিন মাইল দূরে (পুরাতন গঙ্গার উত্তরে) সাগর দীঘির সন্নিকট কথিত বল্লাল বাড়ী বা ভোগবাটীই[৭৫] সম্ভবত: গৌড়ের লক্ষ্মণাবতীর প্রাচীন স্মৃতি। আলোচ্য 'নওদার-বুরুজ' হইতে উত্তর-পশ্চিম

৭৩ Vide "স্তূপ" এবং The Mound, হামিদিয়া লাইব্রেরী, বাজশাহী।

৭৪. Inscritions of Bengal, Vol. IV, P. 277 and 186, বগুড়ার ইতিকাহিনীর নওদা বগা ও নদাপাড়া দ্রষ্টব্য।

৭৫. Memoirs of Gaur and Pandua, PP 162-163 and P 15



নওদার স্তূপ



বিজয় নগরেব গড়

কোনে উক্ত বল্লাল বাড়ীর দূরত্ব প্রায় ৩০।৩২ মাইল। পুরাতন গৌড়ের সন্নিকট গঙ্গা হইতে বল্লাল বাড়ীর দূরত্ব এখন বোধ হয় ১১/২ মাইল। বর্তমান নদীয়ার নবদ্বীপ হইতে আলোচ্য নওদার ব্যবধান প্রায় ১২০ মাইল হইতে পারে। তাবাকাৎ-ই-নাছিরীর বর্ণনানুসারে লক্ষ্মণাবতী হইতে 'নোদিয়হ'র ব্যবধান খুব বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না। সেজন্য আলোচ্য নওদাকেই মিনহাজের নু-দিয়া বা নোদিয়হ্ বলিতে প্রবৃত্ত হয় অথবা নওদার ভৌগলিক অবস্থান দেখিয়া তাহাই অনুমান করা যায়। পাল- সেন পর্বে ইহার পশ্চিমে কতকগুলি নদীর সংগম হইয়াছিল। বর্তমানে ইহার প্রায় সন্নিকট (কিছুটা পশ্চিমে) মহানন্দা ও পূর্ণভবার সংগম স্থল। পদ্মা এখন প্রায় ২০।২২ মাইল দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছে! এই অঞ্চলের ভূমি অধিকাংশই নবভূমি। রাষ্ট্রীয় ও সামরিক কারণেই হয়ত তখন এখানে কোন জয়স্কন্দাবার-নগর অথবা রাজধানী-নগর বরেন্দ্র ভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বখতিয়ার খিলিজি কর্তৃক নোদিয়হ বিজিত হইয়াছিল। কি ভাবে বিজিত হইয়াছিল তাহা আমার বক্তব্য বিষয় নয়। 'নওদা' 'নোদিয়হ' কি না তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। এই রাষ্ট্র বিপ্লব যুগের হিন্দুর ইতিহাস নাই। কোন পর্য্যটক বা পর্যাটকের বিবরণী নাই। নোদিয়ই বিজয়ের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস মওলানা মিনহাজ-উস-সিরাজ-উদ-দীন আবু ওমর অল জুজ্জার্নী কর্তৃক রচিত তাবাকাৎ-ই-নাছিরি[৭৬]। হোসাইন নিজামী (নিশাপুরী) রচিত তাজ-উল-মাছির[৭৭] নোদিয়হ বিজয়ের সমসাময়িক গ্রন্থ হইলেও তাহাতে বখতিয়ারের বিস্তৃত বিবরণ নাই। তাবাকাৎ-ই-নাছিরীতে যাহা আছে তাহার প্রতিটি কথাই সত্য।

মিনহাজ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "যখন রায় লখমনিয়া আহারে উপবিষ্ট তখন তাহার নিকট সঠিক তথ্য পৌছিবার পূর্বেই মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই অতর্কিত আক্রমণে হতভম্ব হইয়া (অশিতিপর) বৃদ্ধ রায় নগ্নপদে বাড়ীর পশ্চাদ্দার দিয়া বাহির হইয়া শঙ্খনাথে, বঙ্গে পলায়ন করিলেন। ইহার সল্পকাল পরেই সেখানে তাঁহার রাজত্বের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল[৭৮]।" মিনহাজ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে "রায় লখ্মনিয়া এবং তাঁহার রাজধানীকে 'দার-উল-মূলক' বা 'শহর নোদিয়হ' বলিয়াছেন।" এবং দানশীল রাজা হিসাবে লক্ষ্মণ সেনের জন্য আশীর্বাদও করিয়াছিলেন[৭৯]।"

এখন প্রশ্ন হইল যে, মিনহাজের 'শহর নোদিয়হ' কোথায়? আবুল ফজল তো 'নোদিয়হকে আধুনিক নদীয়া বলিতেছেন[৮০]। এবং আবুল ফজলের এই মতই আজ প্রচলিত। কিন্তু, আবুল ফজলের আধুনিক নদীয়া বা নবদ্বীপই যদি সেন বংশের 'রাজধানী-নগর হয়, তাহা হইলে বখতিয়ায় কোন্ পথে নবদ্বীপে আগমণ করিয়াছিলেন—তাহার প্রমাণ কোথায়? তাবাকাতের 'নোদিয়হ' যদি নবদ্বীপই হয় এবং যদি সেখানে রায় লখ্মনিয়ার 'রাজধানী শহর থাকিত তাহা হইলে বখতিয়ার নদীয়া ছাড়িয়া এত দূরে (প্রায়

৭৬. Elliot's History of India, Vol. 1 I P 210
৭৭. Ibid P 259, And also vide History of Bengal, Vol 11, P 6 and 7
৭৮. Raverty's Tabakat-i-Nasiri, PP 556-'8
৭৯. Raverty's Tabakat-i-Nasiri, PP 554-'6 P 54 Text PP 148-149
৮০ Jarrett's Ain-i-Akbari, Vol. II, P. 148

১২ মাইল) গৌড়ে আসিলেন কেন এবং সেখানে আসিয়া লক্ষ্মনাবতীতে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন কেন?[৮১] ইত্যাদি এইরূপ নানা প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক।

ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম সভাকবি ধোয়ীর পবন দুতের উদ্ধৃতি দিয়া লক্ষ্মণ সেনের দুইটি রাজধানীর উল্লেখ করিয়াছেন; বিজয়পুর ও লক্ষ্মণাবতী[৮২]। কিছুদিন আগে কলিকাতার জনৈক অধ্যাপিকা শ্রীমতী বিনীতা বন্দোপাধ্যায় যুগান্তরে লক্ষ্মণ সেন ও তাঁহার রাজধানী সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন[৮৩]। এবং ইতিপূর্বে বাঙলার কোন কোন ঐতিহাসিক বখতিয়ার এবং লক্ষ্মণ সেনের উপর অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু, রাজধানীর ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে সকলেই যেন 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, আমি একটু আগেই যে সাগর দীঘির অনতিদূরে বল্লাল বাড়ী বা ভোগবাড়ীর উল্লেখ করিয়াছি, উহাই অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের লক্ষ্মণ সেনের লক্ষ্মণাবতী[৮৪]। এই বল্লাল বাড়ী যদি লক্ষ্মণাবতী হয় তাহা হইলে ইহার নিকটে লখনৌতিও ছিল। এই অঞ্চল গৌড়ের প্রাচীনতম অঞ্চল।

লক্ষ্মণ সেনের আর একটি রাজধানী "বিজয়পুর"। এই বিজয়পুরকেই পক্ষান্তরে কেহ কেহ মিনহাজের নো দিয়হ্ বলিয়াছেন। মৃত ঐতিহাসিক প্রবর মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "পবন দূতের প্রকাশক প্রবীন প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রী মনোমোহন চক্রবর্তী 'নোদিয়া' এবং নদীয়া অভিন্ন মনে করিয়া 'নোদিয়াহ-ই' বিজয়পুর এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।" মৈত্রেয় মহাশয় রাজশাহী শহরের ৯ মাইল পশ্চিমে জনশ্রুতি মূলে (বর্তমান পদ্মার উত্তর তীরে অবস্থিত) কুমারপুর 'কুমার রাজার' বাড়ীর ধ্বংসাবশেষের নিকট আর একটি চকমেলান বাড়ীর' ভগ্নাবশেষকেই বোধ হয় বিজয় সেনের নামানুসারে 'বিজয়পুর' রাজধানী লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "ইহাই পবন দূতের বিজয়পুর" বলিয়া বোধ হয়[৮৫]।" কিন্তু, এই জনশ্রুতিই আছে– ইহাই যে, বিজয়পুর তাহার এখন পর্যন্ত কোন তথ্য আবিস্কৃত হয় নাই। আর একটি জনশ্রুতি অনুসারে এই 'কুমারপুরকে' কুমার রাজার বাড়ীব কথা শুনিতেছি এবং এই কুমারপুর হইতে পশ্চিমে প্রেমতলীর সন্নিকট 'বিদিরপুব' নামে একটি গ্রাম আছে– স্থানীয় লোকেরা এই গ্রামকেই রাজা বিজয় সেনের নামানুসারে বিদিরপুর বা 'বিজিপুর' বলিয়া থাকে। জমিদারী কাগজপত্রে 'বিদিরপুর' উল্লিখিত। ইহা বর্তমানে মুসলমান অধ্যুষিত একটি সাধারণ পল্লী। উল্লিখিত কুমারপুর ও বিজয়পুরে কতকগুলি প্রস্তর খণ্ড ইতস্তত: পড়িয়া আছে। বোধ হয় মৈত্রেয় মহাশয়ের সময়েও ছিল। হয়ত ইহা 'বিজয়পুর' হইলেও হইতে পারে। কিন্তু, ইহাই যে রাজা লক্ষ্মণ সেনের নোদিয়হ' এবং এই নোদিয়হই যে মনোমোহন চক্রবর্তীর ও ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 'বিজয়পুর' তাহা কি করিয়া বিশ্বাস করিব?

আমরা জানি, রাম পালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মদনপাল দেবের সময় পাল সাম্রাজ্য মগধ ও উত্তর বঙ্গে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র

৮১ J P H S, Vol I, Pt. iv, 1953, PP 400-402 And also Vide, Appendix (Mint Town of Medieval Bengal)

৮২. গৌড় রাজমালা, পৃ: ৭৪।

৮৩. রবিবারের যুগান্তর (১৯৫৪) রবিবার ১লা আগষ্ট।

৮৪. গৌড়রাজমালা, পৃষ্ঠা ৭৫।

৮৫ গৌড় রাজমালা, পৃ: ৭৫

রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। এই সময় বর্মণ বংশের অভ্যুদয়ে (কালে) হয়ত সামন্ত সেনের পৌত্র (হেমন্ত সেন ও রাজ্ঞী যশোদেবীর পুত্র) রাজা বিজয় সেন বরেন্দ্র ভূমির দক্ষিণাংশে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙলা দেশে সেন রাজত্বের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভাবি, হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন রাঢ়ে ও বঙ্গে বর্মন রাজ্যের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া হয়ত গঙ্গা অতিক্রম করিয়া বরেন্দ্র ভূমিতে স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকিবেন। বল্লাল সেনের 'দান সাগরের' ভূমিকায় এইরূপ ইঙ্গিত আছে যে, তদনু বিজয় সেন : প্রাদুরাসীৎ বরেন্দ্রে[৮৬] : অর্থাৎ হেমন্ত সেনের পর বিজয় সেনই প্রথম বরেন্দ্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হেমন্ত সেনের পুত্রের নাম বিজয় সেন। রাজশাহীর শীতলাই রেল স্টেশনের সন্নিকটে-দেওপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের শিলালিপিটি[৮৭] হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়।

দেওপাড়া বা দেবপাড়া লিপি অনুসারে 'বিজয় সেন' কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত[৮৮] প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে। বিজয় সেন প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের জন্য একটি সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ কবাইয়াছিলেন। এবং তাহার সম্মুখে একটি বৃহৎ দীঘি খনন করাইয়াছিলেন। এই দীঘির তীরে (পাষাণ নির্মিত?) প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের ধ্বংসস্তুপ অদ্যাপি বর্তমান। প্রসিদ্ধ কবি উমাপতি ধর কর্তৃক এই দেওপাড়া প্রশস্তি রচিত হইয়াছিল এবং ইহা বারিন্দ্রি শিল্পী গোষ্ঠীর চূড়ামণি রাণক শূলপানি কর্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল[৮৯]। রাজশাহী শহর হইতে প্রায় ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এই দেওপাড়া বহুলাংশের জঙ্গলাদী পরিষ্কৃত হইয়া এখন কৃষিক্ষেত্র বচিত হইয়াছে।

প্রদ্যুম্নেশ্বর দীঘি (অপভ্রংশে) এখন পদুমশ্বর নামে খ্যাত। জনৈক (C.T.Metealte) পর্যটক কর্তৃক দেওপাড়ার উত্তর পার্শ্বের গ্রাম হইতে ১৮৬৫ সালে উক্ত লিপি আবিষ্কৃত হইবার পর 'কুমার শরৎ কুমার রায় পরিচালিত অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক ১৯১০ ও ১৯১৯ সালে দেওপাড়ার এই ভগ্নাবশেষে খনন কার্য্য চলে। ফলে বিভিন্ন প্রকারের ১২৯ টুকরা প্রস্তর প্রত্ন সম্পদ ও মৃৎশিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা এখন বরেন্দ্র মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এইসব প্রত্ন-সম্পদের মধ্যে কিছু মনসার প্রতীকও পাওয়া গিয়াছে[৯০]। এই দেওপাড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রায় তিন মাইল দূরে 'বিজয়নগর' অবস্থিত। ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমাব মৈত্রের কথায় শায় দিয়া আমরাও বলিতেছি এই বিজয়নগরই রাজা বিজয় সেনের 'বিজয়পুর'– রাজধানী; তাহা বরেন্দ্র ভূমির দক্ষিণাংশে অবস্থিত– একথা মানিলাম[৯১] কিন্তু, রাজা লক্ষ্মণ সেনই যে (শেষ জীবন পর্যন্ত) সেখানে রাজত্ব করিতেন তাহ'র প্রমাণ কোথায়? বিজয়ের পুত্র বল্লাল সেনের 'দান সাগরে' বোধ হয় 'বিজয়পুবের উল্লেখ নাই। উল্লেখ আছে বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ীর পবনদূতে; এখন প্রশ্ন হইল পবনদূত লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের কোন সময়ে রচিত

৮৬. গৌড় বাজমালা, পৃ· ৬০

৮৭. দিকপাল চক্রপুট ভেদনগীত কীর্তি পুথিপতি বির্বজয় সেন পদ প্রকাশ ঃ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৭শ-ভাগ ১৩১৭, পৃঃ ২৩৫), Epigraphia Indica, Vol IP 309

৮৮. Inseription of Bengal, Vol III 1929, PP 42-56

৮৯. Ibid, P 311, And also vide J A S B Vol XXXIV, Pt 1, PP-128-154

৯০. Arh Survey, Eastern circle, 1918 19 P. 7 and 1920-21 P 34

৯১ গৌড় বাজমালা, পৃ· ৬৫।

হইয়াছিল– এবং বল্লাল সেনের কয়টি রাজধানী ছিল। তাহা বর্তমান যুগের আলোতে পুণরায় যাচাই করতে হইবে। এক্ষেত্রে আমরা অনুমান করি কবি ধোয়ীর 'পবন দূতের' পরে– হয়ত বরেন্দ্রী শাসনের জন্য 'গঙ্গা, মহানন্দা, পুর্নভবা' অথবা 'পুর্নভবা-মহানন্দা' অথবা 'গঙ্গা-পুর্নভবা' সংগমে বরেন্দ্র রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আর একটি রাজধানী স্থাপন করিয়া নাম দিয়াছিলেন "নোদিয়হ" যাহার অপভ্রংশ এখন 'নওদা' – জনশ্রুতির 'নওদার বুরুজ'। বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণাংশে এখনও বহু ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। যাহাতে জগতের আলো প্রবেশ করে নাই। 'নওদার বুরুজ' ইহার অন্যতম। ইহা মিনহাজের 'নোদিয়হ" হওয়া অসম্ভব নয়।

অত্র ইতিহাসের "পথঘাটে", রাজশাহীর কতকগুলি প্রাচীন পথের উল্লেখ করিয়াছি*।

১৯৫২ সালে পশ্চিম বঙ্গে তথা বিহারের (রাঢ়-মগধাদি) কতকগুলি প্রাচীন পথের সন্ধানে আমি কিছুদিন ভ্রমণ করি। তখন মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, সাওঁতাল পরগণা ও বাজমহলের বিভিন্ন স্থানে অনেক প্রাচীন পথের জনশ্রুতি শুনিয়াছি। এবং কতক পাকা পথের চিহ্নাবশেষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। রাজশাহীর পথঘাটের আলোচনায় তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিত খুবই পরিচিত। বারহাকুয়াতে (সাহেবগঞ্জের পরের রেল ষ্টেশন) প্রাচীন লোকের কাছে ইহার নানা অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছি। এই পথটি বাঙলা বিহারের বৌদ্ধ- বিহারগুলির সহিত বিভিন্ন শাখায় বহুকাল ধরিয়া সংযোগ রক্ষা করিয়াছিল। এই পথের পূর্ব দক্ষিণ-গামী একটি শাখা ধরিয়া সম্ভবতঃ গঙ্গা পাব হইয়া গোদাগাড়ী নওয়াবগঞ্জের কোন এক স্থানে হিয়েন সিয়েন পৌণ্ড্রবর্ধনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হয়ত এই পথটিই ছিল তখন বখতিয়ারের 'নোদিয়হ' বিজয়ের পথ। বোধ হয় এই পথটির কথাই তাবাকাত-ই-নাছিবীতে বর্ণিত আছে। খুব সম্ভব বখতিয়ার কজঙ্গল-চম্পা পাটলীপুত্রের এই সুপ্রসিদ্ধ পথটির অনুসরণ না করিয়া (তিনি কতকটা আত্ম গোপন করিয়া) রাজমহলের দক্ষিণে ঝাড়গ্রামের জঙ্গল ও পার্বত্য পথের মধ্য দিয়া মুর্শিদাবাদের লাল গোলার সান্নিকটে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া নওদা অর্থাৎ এই 'নদিয়হ'তে আসিয়া দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়া থাকবেন। গোদাগাড়ীর উত্তর-পূর্ব কোণে বিজয় নগর (ধোযবি 'বিজয়পুর') এবং পশ্চিম-উত্তর কোণে আলোচণ্য নওদার বিরাট ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। এখন অবশ্য মহানন্দা, নওয়াবগঞ্জ, গোদাগাড়ীর নীচে প্রবাহিত এবং গঙ্গা, পদ্মা প্রায় ১০/১১ মাইল পশ্চিম দক্ষিণ কোণে সরিয়ে গিয়াছে; নওদার দেড়মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে মকরমপুর ঘাট, মহানন্দা ও পুর্ণভবার সংগম স্থল। এই গঙ্গা-পদ্মার উত্তর তীর হইতে বরেন্দ্র ভূমির (উত্তর বঙ্গের) দক্ষিণ সীমা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। পশ্চিমে 'মহানন্দা, পূর্ণভবা' প্রবাহিত।

* এই সালে কাশি হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে (ডাউন-দিল্লী এক্সপ্রেসে) শেষ বাত্রির দিকে 'কাহালগাঁও বেল- ষ্টেশনে আমার দলেব মধ্যে আমার ও আব একজন সহযাত্রী শ্রীমানিকবাবুর চামড়ার বাক্সসহ বহু মূল্যবান জিনিষ-পত্র চুবি হইয়া যায়। দুইদিন পর্য্যন্ত সাহেবগঞ্জ রেল- ষ্টেশনে মাষ্টার মহাশয়ের অতিথি হিসাবে থাকাকালীন তৃতীয় দিনে G. R. P পুলিশ ভাগলপুব রাস্তায় একটি কাটা চামড়ার বাক্সেব সংবাদ আমাকে জানান। এই সময় আমি বহু প্রাচীন নকশা ও দলিল-দস্তাবেজ হারাইয়াছি। বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা উদ্ধার করিতে পাবি নাই। তবে- রেলওয়ের মাষ্টাব মহাশয় ও পুলিশের বদান্যতাব কথা এখনও আমার মনে আছে।

আবদুল কাদির বদাউনি, মিনহাজ ও আবুল ফজলের 'নোদিয়াহ'কে 'নওয়াদা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[৯২]। আলোচ্য নওদা ও 'নোদিয়হ'র মধ্যে বেশ কিছু অর্থ পূর্ণ উচ্চারণ সঙ্গতি আছে। মনে হয় বখতিয়ার এই 'নোদিয়হ' বিজয় করিয়া ইহার উত্তর-পশ্চিম কোণে গঙ্গাকুলে রাঢ়, বরেন্দ্র, মগধ, এই তিনটি রাজ্যের মধ্যস্থলে লক্ষ্মণাবতীকেই পছন্দ করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মণাবতীর মনমত সংস্কার করিয়া নূতন নামকরণ করিয়াছিরেন 'লখনৌতি'। তিনি যদি বর্তমান নদীয়া (পশ্চিম বঙ্গের) বা নবদ্বীপ (নুদিয়া) জয় করিয়া থাকিতেন, আর যদি সেখানে রাজধানীর রাজপ্রসাদ থাকিত তাহা হইলে নূতন বিজেতার পক্ষে এতদূরে প্রায় ১২০ মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ ছিল কি? তখন গৌড় রাজ্যের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা দেশ বলিতে বরেন্দ্রকেই বুঝাইত। যে বরেন্দ্র লইয়া বহুকাল ধরিয়া পাল, সেন, বর্মন, সামান্ত চক্রদেব মধ্যে এত দ্বন্দ্ব ও হানাহানি চলিয়াছিল। উত্তর আৎরাফে সেই ভূস্বর্গ তুল্য বরেন্দ্র ভূমি ছাড়িয়া লক্ষ্মণ সেন কি তখন নিম্নবঙ্গে সমুদ্রের প্রায় নিকটে নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছিলেন? নবদ্বীপ যে 'নোদিয়হ' হইতে পারে না তাহার স্বপক্ষে আর একটি যুক্তি হইতেছে যে নবদ্বীপ হইতে পূর্ববঙ্গ যাইবার সরাসরি কোন নদীপথ তখন ছিল না এবং বর্তমানেও নাই। নবদ্বীপ হইতে নদীপথে পূর্ববঙ্গ যাইতে হইলে বরেন্দ্রভূমি হইয়াই যাইতে হইত সুতরাং নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিলে লক্ষ্মন সেন হয় রাজধানী বিজয়পুরে একবার প্রতিবোধ ব্যূহ স্থাপন রিতে পারিতেন। কিন্তু ইতিহাসে পাই তিনি একেব বঙ্গে (বিক্রমপুরে) পলায়ন করেন; নবদ্বীপ হইতে বিক্রমপুর প্রায় ৩০০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। রাজা এই ৩০০ মাইলের মধ্যে কোথাও, এমনকি দ্বিতীয় রাজধানীতেও বিদেশী শত্রুকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিলেন না ইহা মানিয়া লইবার পক্ষে প্রবল যুক্তির অভাব আছে। সুতরাং আমাদের মতে 'নোদীয়হ' নবদ্বীপ না হইয়া 'নওদাই' হইবে। কারণ সেখান হইতে নদীপথে পূর্ববঙ্গ গমন অত্যন্ত সহজসাধ্য এবং পূর্ববঙ্গের দূরত্বও অল্প বটে। বিশেষত: এই নবদ্বীপে যে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল তাহার স্বপকে আজ পর্য্যন্ত কোন ঐতিহাসিক তথ্য আবিস্কৃত হয় নাই। বখতিয়ার নুদীয়া বিজয় করিয়াছিলেন–তাহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু সেই নুদীয়া কোথায় এবং কোন পথে তাহা বিজিত হইয়াছিল তাহার ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক কোন বিবরণ নাই। সুতরাং এমতাবস্থায় আমাদের আলোচ্য 'নওদা' ও নোদিয়হ' অভিন্ন এবং ইার ভৌগলিক অবস্থান এই অভিন্নতার পক্ষে খুবই সুসঙ্গত বা যুক্তিযুক্ত।

পালবংশের শেষ রাজধানী রামপালের রামাবতীর সন্ধানে যাইয়া আমরা নওদাকে প্রথমত: 'রামাবতী' বলিয়া মনে স্থির করিয়াছিলাম। পরে নওদার অবস্থান ও আলোচনায় আসিয়া এই মত পরিত্যাগ করিয়াছি। কেননা 'রামাবতী' নগরেই জগদ্দল-মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত[৯৩]। বর্তমান তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রামাবতী ও জগদ্দল প্রায় কাছাকাছি অবস্থিত আছে। সুতরাং এই 'নওদা' বা 'নওয়াদা'ই যে নোদিয়া ছিল তাহাই আমাদের ধারণা। পূর্বে আলোচিত হইয়াছে এই নওদা হইতে গঙ্গা-পদ্মা বাহিয়া তখন পূর্ববঙ্গে যাতায়াত

৯২. গৌড় রাজমালা।

৯৩. Memorirs A S. B. Vol. 111, P 14.

সহজতম ও প্রকৃষ্ট উপায় ছিল। লক্ষ্মণসেন বখতিয়ারের অতর্কিত আক্রমণে রাজধানীর পশ্চাদ্বার দিয়া আত্মরক্ষা নিমিত্তে এই পথেই পূর্ববঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন। আগেই বলিয়াছি নওদার ধ্বংসাবশেষের পশ্চিমে বিশালকায় নদী–আবার তিনদিকে সুগভীর পরিখা বেষ্টিত। পূর্বদিকে একটি বা দুইটি নগরদ্বার–; সম্মুখে বিস্তীর্ণ মাঠ-প্রান্তর। আজও এই স্থানের অবস্থান প্রত্যক্ষ করিলে তাহা অযৌক্তিক বলিয়া উড়িয়া দেওয়া যায় না।

হিন্দুতীর্থ নবদ্বীপে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী কোন কালেই ছিল না। থাকিলেও এতদিনে তাহার প্রমাণ আবিস্কৃত হইয়া পড়িত। নওদা-লক্ষ্মণাবতী ও নবদ্বীপের ভৌগলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই আলোচনা নিরর্থক হইবে না আশাকরি।

এই বিরাট ধ্বংসাবশেষের বর্তমান আয়তন প্রায় দুই বর্গমাইল হইবে এবং ইহার দক্ষিণ দিকের মন্দির অথবা শান্ত্রিগৃহের (Tower) ধ্বংসস্তূপের চূড়াটির উচ্চতা এখনও প্রায় ৫০।৫৫ ফুট হইবে। ইহাতে দিবালোক প্রবেশ করিলে হয়ত এমন কিছুই আবিষ্কার হইয়া পড়িবে যাহার দ্বারা বাঙ্গালীর অসম্পূর্ণ ইতিহাস সুসম্পূর্ণ হইবে। পালবংশের শেষ রাজধানী রামাবতীরও সমস্যা দূরীভূত হইয়া যাইবে এবং ইতিহাসানুরাগী পাঠক বৃন্দের কৌতুহল নিবৃত্ত হইবে এমন ভরসা করি।

রাজশাহী শহরের ৯ মাইল পশ্চিমে গোদাগারী রাস্তার উত্তর পার্শ্বে (বর্তমান) পদ্মার তীরে ইহা একটি প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত স্থান। পূর্বোক্ত নওদা এবং রাজশাহী শহরের হজরত মখদুম শাহ্ প্রসঙ্গে ও মকর্রম পুর ইহার উল্লেখ করিয়াছি। কুমারপুর পূর্বে হিন্দু প্রধান ছিল। পরে মুসলমান আমলে ইহা সংকৃত হইয়া* মুসলমানী প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই কুমারপুরের উত্তর পার্শ্বে আর একটি চকমেলান বাড়ীর ধ্বংশবেশেষ রাজা বিজয় সেনের রাজধানী–'বিজয়পুর' নামে বিবেচিত হইয়া থাকে। সাধারণত: তাহা বিজয়নগর নামে পরিচিত। উক্ত ভগ্নাবশেষে একটু দক্ষিণে পতিত ভিটাটি 'কুমার রাজার বাড়ী' নামে কথিত। কুমারপুর নামটি বোধ হয় তাহারই স্মৃতি বহন করিতেছে। কিন্তু. এই কুমার রাজা কে এবং কোন শতাব্দীর লোক তাহা আমরা অবগত হইতে পারি নাই। হয়ত নরোত্তম ঠাকুরের পিতা কৃষ্ণান্দ দত্ত হইলেও হইতে পারেন অথবা রাজা বিজয় সেনেই যৌবনকালে 'কুমার রাজা বা রাজাকুমার' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। খেতুরের নরোত্তম ঠাকুরের আদি নিবাস এই কুমারপুরেই ছিল। –এখনও তাঁহার বাড়ীর চত্বরে কয়েকটি আম ও কাঠালের গাছ নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।

কুমারপুব ও মকর্বম পুর

এই কুমারপুরের সর্ব দক্ষিণে চতুষ্কোণ বিশিষ্ট ইষ্টক নির্মিত একটি গৃহে একজন দরবেশের সমাধি রহিয়াছে। তাহা মকর্রম শাহ্ দরবেশের সমাধি নামে পরিচিত। এই সমাধিটি ৬।৭টি (কৃষ্ণ) প্রস্তর (কষ্টি পাথর) খণ্ড দ্বারা আবৃত্ত। এই প্রস্থর খণ্ডের শীর্ষ দেশে (উত্তর পার্শ্বে) একটি এবং দুই পার্শ্বে দুইটি--এই তিনটি লিপি উৎকীর্ণ আছে।

---

রামাবতী ও নওদা প্রভৃতি বিষয়ের নূতনতর আলোচনা ও তথ্যের জন্য কলিকাতায় পরম শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও ডঃ নীহাবরঞ্জন রায় প্রমুখ মনীষা বৃন্দের সহিত সংযোগ স্থাপন কবিয়াছি। নূতন তথ্য পাইলে এ বিষয়ে উত্তব বঙ্গেষ ইতিহাসে বিস্তৃত আলোচনার আশা রাখি।

উহার একটি আয়েতের অর্থাৎ = "পৃথিবীস্থিত সমস্ত কিছুই লয়প্রাপ্ত হইয়া যাইবে কেবল 'পরম সৌভাগ্য শালী আল্লাহ্‌তালার মহিমা' "সম্মান ও বদান্যতা অক্ষুন্ন থাকিবে[৯৪]।" অপরটি পারসী–; অর্থ "যদি কেহ এই ঘর হইতে (কবরের) এক খণ্ড প্রস্তর খণ্ড স্তানান্ত রিত করে–তাহা হইলে ইহকাল ও পরকালের জন্য পবিত্র কোরাণ তাহার দুশমন্ হইবে; তাহার উপর হাজার হাজার অভিশাপ (গজব) বর্ষিত হইবে এবং সে দোজখানলে দগ্ধীভূত হইবে।" এতটুকু ব্যতীত শাহ মকরম সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় নাই। শাহ মকর্রমের সমাধি সৌধের গঠনরীতি অভিনব এবং উপরে একটি গোল গম্বুজ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বোধ হয় ইহা সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝিতে (মোঘল আমলে) বির্নিমিত। এখানকার ব্যবহৃত প্রস্তরগুলির (কষ্টি পাথর) অনুরূপ প্রস্তরখণ্ড বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে দিল্লী ও আগ্রাতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

গৌলের ৪ মাইল উত্তরে ইহা অবস্থিত। এখানে একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে। অনেকে 'কালাপাহাড়ের' বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দেশ করেন। এখানকার রাজগড়

**নীম দীঘি**

দীঘি প্রভৃতি কয়েকটি দীঘি আছে। ইহা পাল রাজাদের কীর্তি বলিয়া অনুমান করা যায়। এখানে কতকগুলি মূর্তি ছিল। তাহার কয়েকটি বরেন্দ্র মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। সেখানকার প্রস্তরখণ্ড গুলির কয়েকটি মান্দার খাঁ বংশীয় জমিদারদের বাড়ীতে নীত হইয়াছে। ইহা মান্দা থানার অন্তর্ভূক্ত।

**সোনাপুরা ও ফেটগ্রাম**

কলিকাপুরের নিকটে সোনাপুরা গ্রামের একটি দীঘির পাহাড়ে নাককাটি নামে একটি সুচারু মূর্তি ছিল। সোনাপুরা প্রাচীন গ্রাম। ফেট গ্রামে গুপ্ত আমলের কয়েকটি সুবর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ফেট গ্রামও একটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রাম।

**বিহারৈল ও মাদারীপুর**

মাদারীপুরের (তানোর থানা) উত্তরে ইহা অবস্থিত। বিহারৈলের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত (পঞ্চম শতকের?) দ্বিভূজ অর্দ্ধ ভগ্ন বুদ্ধ মূর্তিটি বরেন্দ্র মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এখানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সেখানে কয়েক ঘর মৎস্যোপজীবি মুসলমানের বাস আছে। মাদারীপুর গ্রামে ঘৃত বিখ্যাত কিশোরী মোহন চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ী। ধানোরাতে একটি ধ্বংশাবশেষ রহিয়াছে। ইহাকে বৌদ্ধ-বিহার বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। এই ভগ্নস্তূপের মূর্তিগুলি বর্তমানে দেখা যায় না। পাড়িশোঁ গ্রামে কয়েকটি দীঘি ও পরিখা বেষ্টিত একটি ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন রহিয়াছে। এই গ্রামের রাস্তাঘাট গুলি ইষ্টক নির্মিত ছিল। এখানে প্রস্তর খন্ডের এক পিঠে বামন বরাহ প্রভৃতি অপর পিঠে কয়েকটি মহাবিদ্যার মূর্তি উৎকীর্ণ আছে।

**মাড়োইল**

ইহা একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে বহু প্রত্ন-সম্পদ পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি এখন বরেন্দ্র মিউজিয়মে রক্ষিত। গোদাগাড়ী থানার খেতুর রেল-ষ্টেশনের সন্নিকট ইহা অবস্থিত।

**শাহনা পীরপুর**

নাচোল থানার উত্তরে ইহা অবস্থিত। এখানে একটি ধ্বংসাবশেষের দুইধারে দুইটি বৃহৎ দীঘি আছে। এখন সেখানে বহু মুসলমানের বাস। ধ্বংস্তূপের মোট উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট হইবে। স্থানীয় লোকের নিকট জনশ্রুতি মূলে

৯৪. কোরান : সুরা ১২; আয়াত ২৭।

ইহা 'পীর পুকুর' নামে পরিচিত। কিন্তু, কোন পীরের স্মৃতি চিহ্ন এখানে বর্তমান নাই।

বান্দাইখারা

ইহা একটি প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ। আত্রাই নদীর তীরে (অদূরে) অবস্থিত। এখানেও কিছু প্রত্নসম্পদ পাওয়া গিয়াছে।

বরেন্দ্রপুরা কীর্তি ও প্রকারভেদ

বরেন্দ্রভূমি :- রাজশাহী জেলার ভূমিভাগে পুরা কীর্তির যতগুলি ধ্বংসাবশিষ্ট স্থান আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি স্থানাভাবে তাহার সবগুলির কথা এখানে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নাই। উহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করিয়া এ বিষয়ের পরিসমাপ্তি করিব।

(১) সদলপুর, বাতাসপুর, দুর্গাপুর, মান্দা, তালন্দ, গোল্লাপাড়া, থিকটা, নান্দাই, কলমা, সাতঘরা, কুরমাইল (বলিহার), কসবা, সতীর হাটা গণেশপুর, শিকারপুর, আদ্যাবাড়ী, মথুরাপুর, দেবীপুর, দেউলা, বালুওরা, কোমরপুর, প্রধানকুণ্ডী, কুমারমুড়ী, কোঁচড়া, নবগ্রাম, কামারকুড়ী, পারইল, কলাসিং নিমবাড়িয়া, চামবড়া, ডিবা-ভাবিচা, ছাতড়া, দারাজপুর, শালবাড়ী, জয়কালী, ভাতরণ্ড, গৈল, জামালনগর, ভীমপুর, ছাতমা, আগর, আমগাঁ, শাবৈল, নরসিংহপুর, কালীগ্রাম, দেলুয়াবাড়ী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রামগুলির কোন কোনটিতে এখনও মণ্ডপাদি আছে। এইসব মণ্ডপাদিতে এখনও হিন্দু তিথি পরবে রীতিমত পূজা-পার্বন হইয়া থাকে। গ্রাম্য প্রাচীন প্রথানুসারে নৃত্যগীত ও নানা দেবদেবীর উপাসনা হয়। কোথাও ৮ দিন, ৭ দিন, ৫ দিন, অভাব পক্ষে ৩ দিন ধরিয়া পুজার অনুষ্ঠানাদি হয়। গ্রাম্যপীঠে যে সমস্ত মূর্তি আছে তাহার অধিকাংশই দারুময় বা প্রস্তরময়। এইসব মূর্তি সকলের নিকট সুপরিচিত নয়। গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকদের নিকট ইহার কোনটি 'বাশুলী' 'মাসনা' উত্তরকালী' 'বুড়াকালী' 'ছাওয়াল কালী' প্রভৃতি নানাবিধ অদ্ভুত নামে কথিত হইয়া থাকে। এবং সেই নামেই পূজাদি হইতেছে। অথচ এইগুলির কোনটি বামন্ কোনটি বাভ্রবী কায়া, সুর্য্য, বুদ্ধ ইত্যাদি*। কোন শ্রীমূর্তির হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্য থাকিলেই তাহা কেশব নারায়ণ গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষিকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম, নৃসিংহ, অচ্যুত, জনার্দ্দন, উপেন্দ্র, বিষ্ণু (কৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্তি বিষ্ণুর প্রতিকৃতি নয়। অগ্নিপুরাণের স্তব অনুসারে এইসব (চতুশ্চত্বাবিংশ অধ্যায়–অগ্নিপুরাণ) মূর্তির প্রকারভেদ করা যায় এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম কাহার কোন হস্তে থাকিবে তাহা নির্ণয় করা যায়। বামন মুর্তির বাম হস্তে ও অধঃ হস্তে শঙ্খ, ঊর্দ্ধ হস্তে চক্র, দক্ষিণ ঊর্দ্ধ হস্তে গদা ও অধঃ হস্তে পদ্ম থাকে।

(২) যে মূর্তিকে আমরা 'বাভ্রবীকায়া বলিতেছি–তাহা হরগৌরীর প্রতিকৃতি। ইহা পার্বতী পরমেশ্বর।

(৩) সূর্য্যের ধ্যানের সহিত যে মূর্তির সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাই সূর্য্য মূর্তি। ধ্যানের অতিরিক্ত পায়ে বুটজুতা তাহা প্রায় হাটু পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। মস্তকে সুদৃশ্য মৌড় আছে। মূর্তির নিম্নে ৭টি অশ্ব। সারথি রথ চালনা করিতেছে। সুন্দর দাড়ী বিশিষ্ট। এগুলি (জুতা, দাড়ি ও টুপি) শিথিয়ান কৃষ্টির প্রভাব বলিয়া অনুমিত হয়।

(৪) সাধারণতঃ ধ্যানী দ্বিভুজ পদ্মাসনস্থ মূর্তিগুলি–বুদ্ধ মূর্তী। পদ্মাসনে দণ্ডায়মান

* আমরা যে মূর্তিকে 'বামন' বলিতেছি–তাহা দশাবতারের অন্তর্ভুক্ত কশ্যপপুত্ররূপী বলিদানকারী বামন নহে। বলিদানকারী বামন বিষ্ণুর অংশ; কিন্তু, আমবা যাহাকে বামন বলিতেছি তাহা বিষ্ণুরই রূপান্তর।

বুদ্ধ মূর্তিও আছে।

(৫) ষাঁড় বাহন–শিব। (৬) মৃতদেহের উপর উপবেশনাবস্থায় কঙ্কাল বিশিষ্ট মূর্তি-চামুণ্ডা। (৭) চণ্ডি–সাধারণত: চারিহস্ত বিশিষ্ট–দুই পার্শ্বে কার্তিক-গণেশ, বাহন গোধা। (৮) কার্তিক-গণেশ সহ বাহন সিংহ চারিহস্ত বিশিষ্ট পার্ববতী। (৯) পাঁচটি ফলাযুক্ত মনসামূর্তি ইত্যাদি। উল্লিখিত মূর্তি ও মণ্ডপাদি দ্বারা আমরা উল্লিখিত স্থানের প্রাচীনত্ব ধরিতে পারি।

রাজশাহীর হিন্দু পুরাকীর্তি ছাড়াও আরও কতকগুলি ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে–যাহা এদেশের অতীত ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। তাহা হইলে –গুপ্ত–পাল– সেন আমলের শাসনলিপি। গুপ্ত রাজবংশের রাজত্বকালে একটি নূতন বর্ষ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল[৯৫]। পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, এই বর্ষ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেককালে অর্থাৎ ৩১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। আপাতত: গুপ্তাব্দের ৬টি শাসন লিপি পাল রাজত্বের ২টি ও সেন আমলের ১টি শিলালিপির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই লিপিগুলিতে বিশেষত: ব্রাহ্মণকে ভূমিদান এবং মন্দির-বিগ্রহ স্থাপন ও তাহার রক্ষন- বেক্ষণ ইত্যাদি কথা উৎকীর্ণ আছে। এই শাসন ও শিলালিপি হইতে আমরা আরও অবগত হইতে পারি যে, এদেশের অতীত যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি বৈবাহিক সম্বন্ধ ইত্যাদি। লিপিগুলির তালিকা নিম্নরূপ।

(১) ধানাইদহ লিপি : ১১৩ গুপ্তাব্দ (খ্রী: ৪৩২-৩৩)[৯৬]।

(২) কলাইকুড়ি (সুলতানপুর) লিপি : ১২১ গুপ্তাব্দ (খ্রীষ্টাব্দ ৪৩৯-৪০)[৯৭]।

(৩) পাহাড়পুর লিপি : ১৫৯ গুপ্তাব্দ (খ্রী:৪৭৮-৭৯)[৯৮]।

(৪) বাইগ্রাম লিপি: ১২৮ গুপ্তাব্দ (খ্রী: ৪৪৭-৪৮)[৯৯]।

(৫) গুণাইঘর লিপি: ১৮৮ গুপ্তাব্দ (খ্রী: ৫০৭-৮)[১০০]।

(৬) জগদিশপুর তাম্রলিপি (দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ৭ ১/২ × ৪ ১১/১৬; ওজন ৩১ ১/২ তোলা) ১২৮ গুপ্তাব্দ (খ্রী: ৪৪৭-৪৮)। এই জগদিশপুর তাম্রশাসনটি আমি 'তে-বাড়িয়া ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আইয়ুব আলীর বাড়ী হইতে উদ্ধার করি। জগদিশপুর জনৈক হিন্দুর বসতবাড়ীতে কূপ খনন কালে প্রায় ২২ ফুট মাটির নীচে উহা আবিস্কৃত হয়। আমি উহার সংবাদ পাইয়া (১৯৬১ সালে) সংগ্রহ করিয়া আনি এবং এখন উহা বরেন্দ্র মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। উহার ভাবার্থ এই: শৈব ভোয়িল ও মহিদাস নামক দুই গ্রাম্য কুটুম্বী কর্তৃক রাজসরকারের নিকট হইতে এক কুল্যবাপভূমি দুই দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা?) দ্বারা ক্রয় করিয়া এক জৈন বিহারের পরিচালনা করিবার জন্য ও সূর্য্য মন্দিরের চারু যাগযজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার কথা উহাতে উৎকীর্ণ আছে।

পাল-পর্বের শাসন লিপির মধ্যে আপাতত: আমরা দুইটির সন্ধান লাভ করিয়াছি।

৯৫. Epigraphica Indica, Vol 11,p 143.

৯৬. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৬ শ ভাগ, পৃষ্ঠা ১১৬; J A S B Vol V, 1909, P 460

৯৭. বঙ্গশ্রী মাসিক পত্র, বৈশাখ, ১৩৫০, পৃঃ১১৫-১২১; Indian quarterly, Vol, 31, pt. 11,1957.

৯৮ Epigraphia Indica, Vol 20, p.61, 1929-30; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। ৪৯ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৩।

৯৯. Epigraphia Indica, Vol XXI, P 78.

১০০. Indian Historical quarterly, Vol VI, P 40

একটি 'খালিমপুর -লিপি' অপরটি 'ভাতুড়িয়া-লিপি'১।

১. খালিমপুর লিপি: এই লিপিটি পালবংশীয় দ্বিতীয় নরপাল, ধর্মপালদেবের রাজত্বের ৩২শ রাজ্যাঙ্ক (অনু: ৭৭০-৮১৫) ভূমিদানের তাম্রশাসন। ভোলাহাট থানার বিল-ভাতিয়ার উত্তর-পূর্ব কোণে খালিমপুর গ্রামে আবিস্কৃত হইয়াছিল বলিয়া উহা 'খালিমপুর-লিপি' নামে পরিচিত২।

২. ভাতুড়িয়া শিলালিপি : পালবংশীয় ৬ষ্ঠ নরপাল, রাজ্যপালদেবের বাজত্বের.২৪শ রাজ্যাঙ্কে ভুমিদান বিষয়ক লিপি। মোহনপুর থানার ভাতুড়িয়া গ্রামে আবিস্কৃত হইয়াছিল বলিয়া উহা 'ভাতুড়িয়া-শিলা-লিপি নামে কথিত হইয়া আসিতেছে৩।

১. দেওপাড়া শিলা-লিপি : রাজা বিজয়সেনের রাজত্বকালে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১০৯৫-১১৫৮ সালে সম্পাদিত হয় (?)[8]।

১-২. গৌড় লেখমালা পৃষ্ঠা ৯-২৮।
Epigraphia Indica Vol IV.P 243

৩. Indian Anti Vol. XLVII, P.111

৪. Inscription of Bengal, Vol III, 1929, P.42

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

# মুসলমান আমলের স্থাপত্য কীর্তি

রাজশাহী জেলার মুসলিম স্থাপত্য কীর্তিগুলির কথা বলিতে গেলে বিশ্বের সর্ব প্রথম 'মসজিদে নববীর' কথা কিছু বলা দরকাব। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ হিজরীর প্রথম বর্ষে হজরত রসুলে করিম (স:) মক্কা হইতে মদিনায় হিজরত করিয়া যে দিন মদিনায় প্রথম মসজিদ [মসজিদে-নববী] প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিলেন প্রকৃত পক্ষে সেই দিন হইতেই বিশ্বে মুসলিম স্থাপত্যের গোড়া পত্তন হইয়াছিল[৫]।

সপ্তম শতকের গোড়াতে মক্কার মরুপ্রান্তে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনের যে সূত্রপাত হইয়াছিল এবং যাহার ফলে ইসলামের সুমহান শক্তি সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া ইরাণ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। হিজরীর প্রথম শতকের ৯০ বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ ছাড়িয়া পাক-ভারত উপমাহাদেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী বিস্তৃত অঞ্চর ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইয়া পড়িয়াছিল (তৎপূর্বে ইসলামের প্রথম কেন্দ্র কেরালা (?) ও সিংহল। এই সিংহলের রাজার (হিজরী ৪০ সালে); ইসলাম গ্রহণ: ইসলামের দ্বিতীয় কেন্দ্র মালাবার; তৃতীয় কেন্দ্র মেকরাণ (অধুনা বালুচিস্তান) প্রভৃতি স্থানে মুসলিমগণের জয়-জয়কার সুবিদিত[৬]। ইসলামেব আবির্ভাবের আগেও এই উপমহাদেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলের সহিত আরবী ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক তো ছিলই। পরে মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিজয়াভিযানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিজস্ব স্থাপত্য রীতি বিজিত বিভিন্ন দেশের স্থানীয় পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নব বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা হইতেই মুসলমানগণের নিজস্ব আদর্শের সঙ্গতি রাখিয়া যে একটি স্বতন্ত্র বিশেষ নির্মান পদ্ধতির প্রবর্তন হয়–তাহাই মুসলিম স্থাপত্য শিল্প নামে পরিচিত।

দ্বাদশ শতকের শেষার্দ্ধে পাক-ভারতের প্রায় সর্বত্র মুসলিম শক্তির অধিকার ভুক্ত হয়। বখতিয়ার খিলিজির বঙ্গাভিযানের সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে বঙ্গে স্থানীয় স্থাপত্য শিল্পে মুসলিম প্রভাব সূচিত হয়।

বর্তমান পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত মুসলমান আমলের স্থাপত্য কীর্তিগুলি তাঁহার গঠন রীতির কাল হিসাবে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। খ্রীষ্টীয় ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সুবাদার ও স্বাধীন সুলতানদের কীর্তিগুলি প্রথম পর্য্যায়ের মুসলিম স্থাপত্য-কীর্তি; আর ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬১২ শতকে ঢাকায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পর্য্যায় এবং ১৬১২ হইতে ১৭০৭ শতক পর্য্যন্ত তৃতীয় পর্য্যায়ের স্থাপত্য কীর্তি বিবেচনা করা যাইতে পারে। মিঃ হুইলার প্রমুখের ইতিহাসেও ইহার ইঙ্গিত আছে[৭]। উল্লিখিত হিসাবের মধ্যে

৫. History of Saraens, P. 10 and 11

৬. তারিখি-ই-ফিরিস্তা, পৃষ্ঠা-৩১১। Cyclopaedia of India, 11.P.983

৭. Five thousand years of Pakistan P. 109.

যে সব স্থাপত্য কীর্তি রাজশাহী জেলাতে বর্তমান রহিয়াছে তাহা দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন ফিরোজপুরস্থিত ছোট সোনা মসজিদ; মাহিসন্তোষের শাহী মসজিদ; বাঘা ও কুশুম্বা মসজিদ, খানিয়াদীঘি ও ভোলাহাট। এই সব বাঙ্লার সুবাদার ও স্বাধীন আমলের প্রথম যুগীয় স্থাপত্য কীর্তি। মাহিসন্তোষের মসজিদটি বর্তমানে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। আছিন ঘাটের মসজিদটিও বোধ হয় এই যুগের একটি কীর্তি ছিল।

আর অবশিষ্ট কীর্তিগুলির মধ্যে যেমন–নাটোর মহকুমার কলমের সন্নিকট জগৎপুরের তিন গম্বুজ ভাঙ্গা মসজিদ; বড়াইগ্রাম থানার চাঁপিলার তিন গম্বুজ মসজিদ। তাহ্খানার 'তাপ নিয়ন্ত্রণ' ভগ্ন এমারত ও শাহ নেয়ামতুল্লা প্রতিষ্ঠিত তিন গম্বুজ মসজিদটি মোগল আমলের স্থাপত্য কীর্তি। ইহা ছাড়া আরও প্রায় ৫০টির অধিক প্রাচীন মসজিদ আছে। যেমন নাটোর টাউনের কাজী সাহেবের বাড়ীর সন্নিকট 'জুম্মা মসজিদ', গোমস্তাপুর থানায় চাঁপায়ের 'ভগ্ন তিন গম্বুজ মসজিদ', লালপুর থানায় ভেন্না বাড়ীর মসজিদ ও বাগমারা থানার আছিন ঘাট গ্রামের এক গম্বুজ মসজিদদ্বয়, পুঁঠিয়া থানার বিড়ালদহের সন্নিকট দুইটি তিন গম্বুজ মসজিদ, চারঘাট থানার বাঘার তিন গম্বুজ অপর একটি মসজিদ প্রভৃতি 'মোগল আমলের' শেষ পর্য্যায়ের মসজিদ বলিয়া ধরিতে পারি। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মসজিদ গুলির প্রামাণ্য কোন সন তারিখ সম্বলিত শিলালিপি ও দলিল-দস্তাবেজ উদ্ধার করিতে না পারিলেও গঠনরীতি ও স্থানীয় জনশ্রুতি মূলে এই গুলিকে বাঙ্লার নওয়াব মুর্শিদকুলী খাঁর সময় হইতে নওয়াব সিরাজ-উদদৌলার আমলের স্থাপত্য কীর্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই মসজিদগুলির গঠন রীতি মোগলাই প্যাটার্ণের। দরওয়াজাগুলি প্রায় সম মাপের। প্রায় মসজিদে তিনটি দরওয়াজা ও তিনটি করিয়া গোলাকার গম্বুজ আছে। বিশেষ কোন কারুকার্য্য নাই। সামনের দেওয়ালে ও কোন কোনটির ভিতরে মেহরাবের কার্নিশের উপর লতাপাতা অঙ্কিত। প্রস্তরের কোন চিহ্ন বিশেষ দৃষ্ট হয় না। কেবলই ইষ্টক দ্বারা নির্মিত। উত্তর দক্ষিণে জানালাদ্বয় খুব ছোট উচ্চতা ১৬ হইতে ১৭/১৮ ফুট হইতে পারে। দেওয়ালের ভিত তিন ফুটের অধিক নয়। মসজিদগুলির বয়স আজ থেকে দুই হইতে আড়াই শত, পৌনে তিন শত বৎসর হইলেও এখনও কোন কোনটি সাধারণে ব্যবহৃত হইতেছে। এই সব মসজিদের সম্মুখের প্রাঙ্গনে প্রাচীর বেষ্টিত প্রবেশ পথের উপর 'বাংলাঘরের' প্যাটার্ণে নির্মিত একটি করিয়া সমসাময়িক তোরণ ছিল। বিড়ালদহ ও আছিনঘাট মসজিদে এইরূপ তোরণ দৃষ্ট হয়।

প্রাগুক্ত সুলতানী আমলের প্রথম যুগের মুসলিম স্থাপত্য কীর্তির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল– ক্ষুদ্রাকার গম্বুজ শোভিত মিনার ও পদ্ম চিত্রিত বিশেষ লক্ষণীয় রীতি। সে যুগের স্থপতি-শিল্পীদের নির্মাণ কৌশলের আর একটি বিশেষ রীতি হইল--স্থানীয় মসজিদের সহিত বাঙ্লার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা। উচ্চতর খিলানের পরিবর্তে বাঁকা কার্নিশ এবং বাহিরের দেওয়ালে বাঁশের বেড়ার মত নকশা দ্বারা স্থানীয় বৈশিষ্ট্রকে ফুটাইয়া তোলার প্রয়াস। প্রস্তর অথবা ইষ্টক দ্বারা নির্মিত অষ্টকোন অথবা চতুষ্কোন স্তম্ভ দ্বারা মসজিদের উপরিস্থিত গম্বুজ ধারণের ব্যবস্থা এখানকার নির্মাণ পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এতদব্যতীত লতাপাতার নকশা এবং ফুলের টবে নানা প্রকার ফুলের চারা, অঙ্কিতাবস্থায়–স্থানীয় মসজিদগুলির সৌন্দর্য্য

বাঘার মসজিদ

বর্দ্ধিত করিয়াছে। এই নির্মাণ কৌশলের সহিত রাজশাহীর বাঘা মসজিদটির অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহার গঠন রীতি সম্পূর্ণ বাঙ্গালী কায়দায় হইলেও রচনা কৌশলে নানা বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। গৌড়ের তাঁতীপাড়া মসজিদের সহিত ইহার অনেকটা মিল আছে। মসজিদ সংশ্লিষ্ট চারিকোনে চারিটি বহুতল বিশিষ্ট স্তম্ভের চূড়ায় ধনুকের ন্যায় গম্বুজ শোভা পাইত। মসজিদের মধ্যস্থল দিয়া লম্বালম্বি সারিবদ্ধ ভাবে কৃষ্ণপ্রস্তরের (ব্যাসাল্ট) কারুময় ছয়টি স্তম্ভ রহিয়াছে। সেগুলির উপর গম্বুজের খিলান ছিল। সম্ভবত কোন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে সেই স্তম্ভগুলি আহৃত। বাঘার এই মসজিদটি বঙ্গের তৎকালীন সুলতানী আমলের একটি গৌরবময় কীর্তি। ইহার গঠন ভঙ্গীর মাধ্যমে ফুটিয়া উঠিয়াছে সেকালের বাঙ্গালী প্রাণের শিল্প চাতুর্য্যের মনোরম প্রতিচ্ছবি। ইষ্টক নির্মিত অথচ নানাপ্রকার লতাপাতার কারুকার্য্য খচিত ইহাই শাহী মসজিদটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রায় ১২ ফুট উঁচুতে অভ্যন্তরে চারিদেওয়ালের গাত্রে কৃষ্ণ প্রস্তরে রেখার মত কার্নিশ করা রহিয়াছে। দুই দেওয়ালের সংযোগস্থলে কৃষ্ণপ্রস্তর সংযোজিত। সমস্ত দেওয়ালে খিলান করা সমমাপের পাঁচটি প্রবেশ পথ; অভ্যন্তরে পাঁচটি মেহরাব। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ৮০ × ৩৬ ফুট। এই মসজিদের ছাদসহ ১০টি গম্বুজ বিগত ১৩০৪ সালের সর্বনাশা ভূমিকম্পে (খ্রীঃ ১৮৯৭) ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। গম্বুজগুলি নাকি ইষৎ কুঞ্জাকৃতি ছিল। মসজিদ গাত্রে ভিতর ও বাহির দেওয়ালে ক্ষুদ্র বৃহৎ পদ্ম অঙ্কিত। প্রবেশ পথের উপর পদ্মগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। মসজিদের ইষ্টকগুলি এত পালিশ যে, কোথাও কোন খুঁত নাই। পদ্মা বাহিয়া রাজ মহলের পাহাড় হইতে প্রস্তরাদি আনয়নের সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালী মনের শিল্প কলার উৎকৃষ্টতম নিদর্শন স্বরূপে বিরচিত করিতে বোধ হয় ইষ্টক দ্বারাই এই মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। মসজিদ প্রাঙ্গণের প্রবেশ পথে উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে গগনচুম্বী গোলাকৃতি গম্বুজসহ দুইটি তোরণ। উত্তর পার্শ্বেরটি বিগত ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। ইং ১৮৭২ সালে রাজশাহীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিভাগীয় কমিশনারের নিকট একটি বিবরণে সর্ব প্রথম এই মসজিদটির কথা পেশ করিলে–সুধী সমাজে ইহা প্রচারিত হয়। পরবর্তী কালে ১৯০৪ সালে রাজশাহীর উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী জনৈক মৌঃ আবদুল ওয়ালী বাঘার এই মসজিদ সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ সুন্দর বিবরণী প্রস্তুত করেন৮। এই বিবরণীতে লিখিত আছে যে, এই মসজিদের মধ্যবর্তী প্রবেশ পথের উপরে তিন লাইন বিশিষ্ট সুন্দর তোগরা অক্ষরে উৎকীর্ণ কৃষ্ণ প্রস্তরের একটি আরবী শিলালিপি (২৪′ ৫।৮′′ × ৫′ ১।৮′′ ইঞ্চি) আছে; উহাতে লিখিত আছে ৯৩০ হিজরীতে (১৫১৩-২৪ সালে) সুলতান নাছির-উদ-দীন নশরৎ শাহের রাজত্বকালে (তাঁহার আদেশে) এই মসজিদটি নির্মিত হয়।" উক্ত লিপিটি কিছুদিন আগে করাচীর জাতীয় মিউজিয়মে প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। বর্তমানে মসজিদটি পাকিস্তান পুরাতত্ব বিভাগের কর্তৃতাধীন রহিয়াছে।

গৌড়ের নিকটবর্তী (মালদহ) রাজশাহী জেলার পশ্চিম সীমান্তে ফিরোজপুর মৌজাস্থিত ছোট সোনা মসজিদটি-সুলতানী আমলের স্থাপত্য কীর্তিগুলির মধ্যে শিল্প ভাস্কর্য্যের অন্যতম বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন। ইহার কারুকার্য্য অপরূপ। গঠনভঙ্গী নানা বৈচিত্র্যময়। ইহার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার

৮. J. A. S B, Pt. I. PP 108-113, 1904

গম্বুজগুলির মধ্যস্থলে কেন্দ্রীয় গম্বুজ হিসাবে বাঙলা দেশে প্রচলিত চৌচালা গৃহের চালের মত পরস্পর তিনটি গম্বুজ সংযোজিত করা হইয়াছে এবং দুই সারিতে তিনটি করিয়া দুই পার্শ্বে আরও ১২টি গোলাকৃতি গম্বুজ;– মোট ১৫টি গম্বুজ মসজিদের উপরে অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। গম্বুজগুলির তলদেশে বিচিত্র ফুলফলের গুচ্ছ লতাপাতা প্রভৃতি নকশার দ্বারা অলঙ্কৃত। এই মসজিদের অভ্যন্তর গৌড়ের আদিনা মসজিদের কক্ষের অনুরূপ। উত্তর-পশ্চিম কোণে মহিলাদের নামাজ পড়িবার একটি সতন্ত্র মাচান প্রস্তর স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। উহার একটি প্রস্তরখণ্ড স্থানান্তরিত হইয়া নিকটস্থ শাহ নেয়ামতুল্লার সমাধি প্রাঙ্গনে নীত হইয়াছে। কারুকার্য্যখচিত একটি মাত্র মেহরাব আছে। পর্দ্দানশীন মহিলাদের গমনাগমনের জন্য উওর দেওয়ালে মাচান বরাবর একটি সুপ্রশস্ত সিঁড়ি এবং এই সিঁড়ির সংলগ্ন আজান দিবার একটি সুউচ্চ মিণার বর্তমান রহিয়াছে। এই মসজিদটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ৮২ × ৫২ ফুট[৯]; উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট এবং ইহার চারিপার্শ্বে অষ্টকোণ বিশিষ্ট সুউচ্চ চারটি বুরুজ আছে। মূলত: ইহা একটি ইষ্টক নির্মিত ইমারত হইলেও দেওয়ালের বর্হিভাগের অংশ প্রস্তর দ্বারা আবৃত। ভিতরের দিকেও দেওয়াল গাত্রের বহুলাংশ প্রস্তর দ্বারা আবৃত। সম্মুখের দেওয়ালের সমমাপের পাঁচটি দরওয়াজা। মধ্যবর্তী দরওয়াজার চারি পার্শ্বের কারুকার্য্য বৈচিত্র্যময়। এতদব্যতীত মসজিদ গাত্রে নানা প্রকার লতাপাতার কারুকার্য্য তো আছেই। তাহা অধিকাংশই প্রস্তরে খোদিত।

ছোট সোনা মসজিদ

স্থানীয় লোকেরা গৌড়ের বড় সোনা মসজিদের সহিত তুলনা করিয়া ইহাকে 'ছোট সোনা মসজিদ' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। সেই হিসাবে ইহা 'ছোট সোনা মসজিদ' নামে প্রসিদ্ধ। জেনারেল কানিংহামের মতে কিছু সংখ্যক স্বর্ণ শিল্পী ইহার সাজ সজ্জার পরিকল্পনা বা নকশা প্রস্তুত করিয়াছিলেন[১০]। পরে ইহার গম্বুজ গুলি সোনালী রঙ্গে গিল্ট করা হইলে সোনামসজিদ নামে অভিহিত হয়। বিভারিজ সাহেবেরও এই একই মত[১১]। খান সাহেব আবেদ আলী ও ষ্টেপেলষ্টোন সাহেব প্রমুখ পন্ডিতগণ নূতন কোন মত প্রকাশ করেন নাই[১২]। বঙ্গের গৌরবময় রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান আলউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্ব কালে (খ্রী: ১৪৯৩-১৫১৯) ৮৯৯ হইতে ৯২৫ হিজরীর মধ্যে জনৈক আলীর পুত্র ওয়ালী মুহম্মদ কর্তক রজব মাসের ১৪ই তাবিখে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়; মসজিদের সম্মুখস্থ মধ্যবর্তী কারুকার্য্য খচিত দরওয়াজার উপরিস্থিত একটি শ্বেতপ্রস্তরে উৎকীর্ণ আরবী শিলালিপি হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়[১৩]। মসজিদের অভ্যন্তরের আয়তন ৭১ফুট ৯ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং ৪০ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রস্থ। তিন সারিতে বিভক্ত। প্রত্যেক সারিতে পাঁচটি করিয়া প্রস্তর স্তম্ভ আছে। কতকটা গোলাকৃত অথচ একটু লম্বা পাঁচটি মেহরাব আছে[১৪]। কিন্তু মেহরাবের কারুকার্য্য খচিত শ্বেত প্রস্তরগুলি বর্তমানে নাই। স্থানীয় জনশ্রুতি ও কয়েকটি

---

৯. Muslim Architeture in Bengal, P. 136, and also vide Cunningham's. XV. Chota Sona Masjid.

১০. Cunningham's Servey Report, Vol. XV, PP. 75-76.

১১. J. A S B. Vol. LXIV, 1875 PP 224-225

১২. Memoirs of Gour and Pandua, PP. 79-82.

১৩. Inscriptions of Bengal, Vol. IV, P 199-202.

১৪. Muslim Architecture in Bengal, P -139

বিবরণীতে অবগত হওয়া যায় যে, ১৩০৪ (খ্রী:১৮৯৭) সালের ভূমিকম্পে পশ্চিম দেওয়ালের বহুলাংশ ভাঙ্গিয়া পড়ে[১৫]। ১৯০০ সালে তাহা কেবল মাত্র ইষ্টক দ্বারা মেরামত করা হয়। এই সময় মধ্যবর্তী মেহরাবের উপরে স্বতন্ত্র একটি শ্বেত প্রস্তরে একখণ্ড উজ্জ্বল বস্তু ও আরও কয়েক টুকরা মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড ইংরেজগণ বিলাতে লইয়া গিয়াছেন[১৬]। এমনকি পশ্চিম দেওয়ালের কারুকার্য্য পূর্ণ কতকগুলি দুস্প্রাপ্র ও বহু মূল্যবান শিল্প-নিদর্শনও স্থানান্তরিত হইয়া বিলাতের যাদুঘরে নীত হইয়াছে[১৭]। জনশ্রুতি মূলে এই মসজিদ সম্পর্কে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষ লক্ষনীয়। যেমন :-

(১) জনৈক খোজা-(নপুংসক) কর্তৃক এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য ইহার আর একটি নাম "খোজা-কি-মসজিদ।"

(২) মালদহের জনৈক জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মতে সুলতানের রাজকীয় পরিবারের খাজাঞ্চি কর্তৃক ইহা বিনির্মিত।

(৩) বড় ভূমিকম্পের পরে ১৯০০ সালে সরকার কর্তৃক এই মসজিদের পশ্চিম দেয়াল মেরামত করা কালে ইহার ছাদের ঝোপ-ঝাড়ে ছোট ছোট বৃক্ষ উৎপাটিত করা হয়।

(৪) ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে পশ্চিম দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িলে কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি আবিস্কৃত হইয়া পড়ে। মূর্তিগুলি নাকি কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এইসব শিব, ভবানী ও সরস্বর্তীর মূর্তি বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

(৫) পশ্চিম দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িলে বহু মূল্যবান শ্বেত প্রস্তর ও কারুকার্য্য খচিত কতকগুলি শিল্প-নিদর্শন বিলাতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

(৬) মসজিদের সম্মুখের প্রবেশ পথে যে একটি বিরাট ইষ্টক নির্মিত তোরণের অবশিষ্টাংশ রহিয়াছে; ভূমিকম্পের আগে তাহার সর্বাঙ্গে বিবিধ রঙ্গের প্রস্তর খন্ডে অলংকৃত ছিল।

(৭) মসজিদের দক্ষিণে (বাংলার পাশ্বে যে রাশি রাশি প্রস্তর খন্ড ইত্যাদি ইতঃস্তত পড়িয়া রহিয়াছে); তাহা এই মসজিদের পশ্চিম দেওয়াল ও তোরণের ব্যবহৃত প্রস্তর খন্ড।

(৮) বেণারস (ভারত) হইতে আনিত শিল্পীদ্বারা এই মসজিদের কারুকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল।

(৯) এই মসজিদের পূর্ব-উত্তর কোণে মঞ্চস্থাবস্থায় পরস্পর সন্নিহিত যে দুইটি প্রস্ত র নির্মিত অজ্ঞাত সমাধি (দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট প্রস্থ ১০ ১/২ ফুট) রহিয়াছে তাহার একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠাতা ও আর একটি নাকি প্রতিষ্ঠাতার কুটুম্বের সমাধি। মতান্তরে এই দুইটি কাল্পনিক কবর বরং সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠাতার কিছু গুপ্তধন রক্ষিত হইয়াছে। আরও মজার ব্যাপার এই যে, এই দুইটি সমাধির সমাধির শিয়রে আল্লার নাম ও কালেমা উৎকীর্ণ আছে। বিষয়টি বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য।

(১০) "এক পহর বেলা পর্য্যন্ত সোনা বর্ষিত হইয়াছিল মতান্তরে প্রচুর সোনা পাওয়া গিয়াছিল-সেইজন্য স্বর্ণপ্রাপ্তি ব্যক্তি কর্তৃক এখানে দীঘি খনন ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া 'সোনা মসজিদ' নামকরণ হইয়াছে।" দীঘিটি মসজিদের উত্তরে অবস্থিত। দীঘি হইতে

---

১৫. Memoirs of Gour and Pandua. P. 79.

১৬. Memoirs of Gour and Pandua. P. 82

১৭. Inscriptions of Bengal, Vol IV, P 200



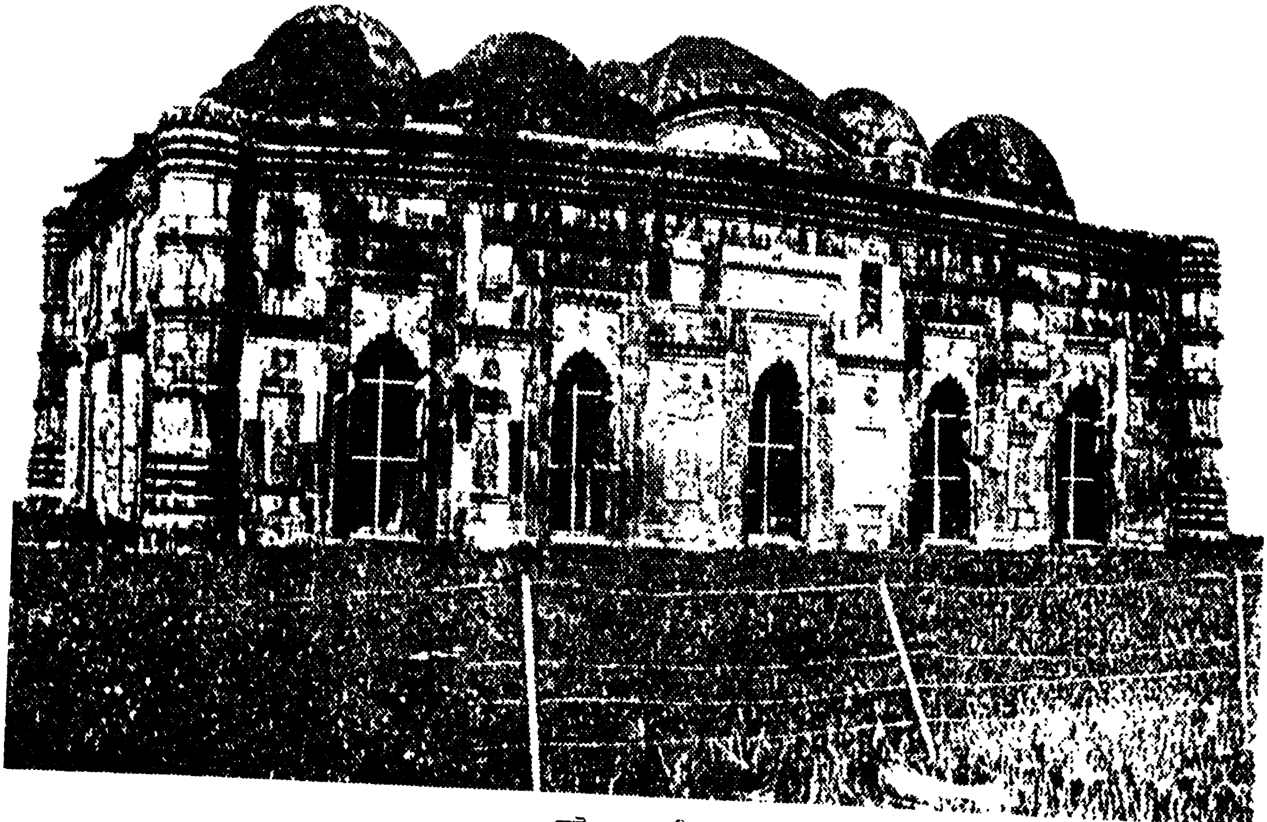
ছোট সোনা মসজিদেব মেহরাব

মসজিদ বরাবর একটি চওড়া সিঁড়ির চিহ্নাবশেষ রহিয়াছে।

রাজশাহীতে সুলতানী আমলের আরও কতকগুলি মসজিদ বা ইমারত রহিয়াছে। পুঁঠিয়ার (পুঁঠিয়া থানা) সন্নিকট বিড়ালদহ নামক স্থানে নাটোর পথের উত্তর পার্শ্বে

বিড়ালদহ বাংলোঘর ও বাজাবিবি মসজিদ

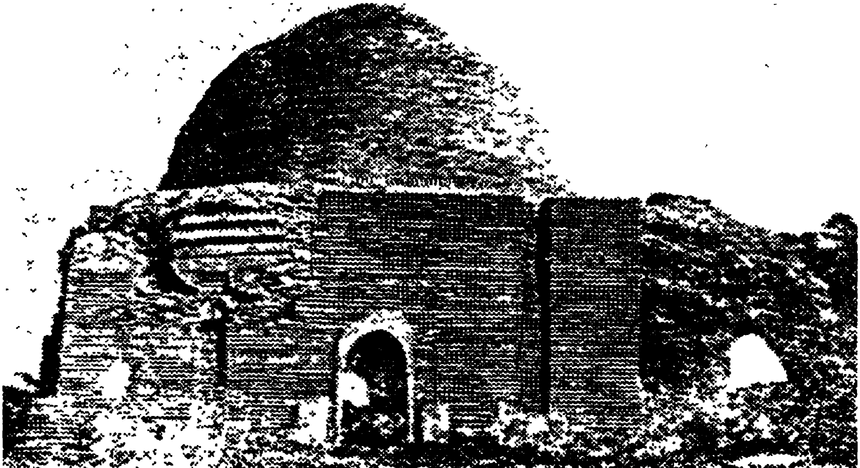
বাংলোঘরটি প্রথম মুসলিম যুগের স্থাপত্য নিদর্শন বলিয়া, মনে করা যাইতে পার। কারন প্রথম মুসলিম যুগের স্থাপত্যগুলির মধ্যে চন্দ্রাতপ সদৃশ ইমারত, ঘরের চালের মত গম্বুজ রহিয়াছে। গৌড়ের কদম রসুলের ইমারতটির সন্নিকট ফতেখানের সমাধি গৃহের অনুকরণে বিড়ালদহের এই 'বাংলো ঘরটি' আর একটি নিদর্শন বটে। পাকিস্তান চেকপোষ্টের সন্নিকট 'মালদহ-নওয়াবগঞ্জ' রাস্তার পূর্বপার্শ্বে খানা বা খানিয়া দীঘির এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি প্রথম মুসলিম যুগের কীতি। পরস্পর সংলগ্ন বালুয়া দীঘির ও খানিয়া দীঘি মধ্যস্থলের ভূমিভাগে আম্রকাননে পরিবেষ্টিত এই মসজিদটি অবস্থিত। আগে এখানে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আবৃত ছিল। তখন বৃহৎ অজগর সর্পাদি এখান হইতে বাহির হইয়া পশ্বাদির পিছনে ধাওয়া করিত। বাগে পাইলে মানুষকেও ছাড়িতনা। পাকিস্তান আমলে



ছোট সোনা মসজিদ



দাবস বাড়ি মসজিদ



রাজা বিবি মসজিদ

জঙ্গলাদি পরিস্কৃত হইয়াছে। ধানীচ্ অথবা রাজাবিবি মসজিদ নামে ইহা কথিত। মসজিদটির পূর্বপার্শ্বে একটি বারান্দা ছিল। কৃষ্ণপ্রস্তরের স্তম্ভের উপরে ক্ষুদ্রাকৃতি গোলাকার তিনটি গম্বুজ ছিল। স্তম্ভ গুলির মূলদেশ এখনও বিদ্যমান আছে। পূর্ব দেওয়ালে তিনটি প্রবেশ পথ ও অভ্যন্তরে তিনটি মেহরাব এবং মধ্যবর্তীটি অপেক্ষাকৃত বড় ও কারুকার্য্য পূর্ণ। এই মেহরাবের উপরে একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের লিপি আছে। একটু অসুবিধার দরুণ লিপিটি পাঠোদ্ধার সম্ভবপর হয় নাই।

সম্ভবত: সুলতান হোসেন শাহ কর্তৃক এই মসজিদটি নির্মিত হয়। দেওয়াল গাত্রে বিচিত্র ধরণের শিল্প নিদর্শন সেকালের গৌরবময় যুগের পরিচায়ক। মসজিদটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৬২ × ৪২ ফুট। কক্ষ পরিধি ২৮ ফুট স্কোয়ার[১৮]। ইহা গৌড়ের লোটন বা চামকাটি মসজিদেব অনুকরণীয় নকশায় স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়।

ছোট সোনা মসজিদ ও কোতওয়ালী দরওয়াজার মধ্যবর্তী স্থানে ওমরপুরের সন্নিকটে দারসবাড়ী অবস্থিত। পুরুষানুক্রমে স্থানীয় জনসাধারণ এই স্থানকে 'দসবাড়ী' বলিয়া থাকে। বর্তমানে এই স্থান জনশূন্য। দর্সের কোন ব্যবস্থা নাই। অথচ দর্সবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। দর্স অর্থ-পাঠ। বোধহয় মসজিদ সংলগ্ন একটি মাদ্রাসা ছিল। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের সময় মুনসী এলাহী বখশ কর্তৃক[১৯] আবিস্কৃত একটি আরবী শিলালিপি অনুযায়ী (লিপি-দৈর্ঘ্য ১১ ফুট ৩ ইঞ্চি প্রস্থ ২ ফুট ১ ইঞ্চি) ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে (হিজরী ৮৮৪) সুলতান সমসউদ-দীন ইউসুফ শাহে'র রাজত্বকালে (তাঁহার আদেশক্রমে) এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়[২০]। ইষ্টক নির্মিত এই মসজিদের অভ্যন্তরের আয়তক্ষেত্র দুই অংশে বিভক্ত; উহার আয়তন ৯৯ ফুট ৫ ইঞ্চি × ৩৪ ফুট ৯ ইঞ্চি। পূর্বপার্শ্বে একটি বারান্দা। উহা ১০ ফুট ৭ ইঞ্চি চওড়া। বারান্দার খিলানে ৭ টি প্রস্তর স্তম্ভের উপরের ৬ টি ক্ষুদ্রাকৃতি গম্বুজ এবং মধ্যবর্তীটি অপেক্ষাকৃত বড় ছিল উপরে ৯ টি গম্বুজ থাকার চিহ্নাবশেষ রহিয়াছে। উত্তব-দক্ষিণে তিনটি করিয়া জানালা ছিল। উত্তর-পশ্চিম কোণে পুর-মহিলাদের নামাজ পড়িবার জন্য প্রস্তর স্তম্ভের উপরে একটি মাচান ছিল। উহার পরিচয় স্বরূপ এখনও একটী মেহরাব রহিয়াছে। এতদব্যতীত পশ্চিম দেওয়ালে পাশাপাশি তিনটি করিয়া ৯ টি কারুকার্য্য খচিত মেহরাব বর্তমান রহিয়াছে। এই মসজিদের চারিপার্শ্বে দেওয়াল ও কয়েকটী প্রস্তব স্তম্ভেব মূলদেশ ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। এই মসজিদটিও বাঙলার প্রথম যুগীয় মুসলিম স্থাপত্য কীতির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এখানে প্রাপ্ত তোগরা অক্ষরে উৎকীর্ণ ইউসুফ শাহী লিপিটী এখন কলিকাতা ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে[২২]। জেনারেল কানিংহাম তাঁহার নিজের ভাষায় ইহাকে দারসবাড়ী অথবা কলেজ বলিয়াছেন[২৩]। এই ঐতিহাসিক কীতিটীর মাত্র কয়েকগজ দূরে পাক সীমান্ত 'পিলার' অবস্থিত।

দারসবাড়ী মসজিদ

---

১৮. Muslim Architecture in Bengal, P.122 Memoirs of Gour and Pandua, P 76

১৯. Beveridge's translation of the khurahid-i-jahan Nama Published in the J A S B Vol LXIV, PP 222-23, 1895

২০ Abid Ali and Stapleton's Memoirs of Gour and Pandua PP 76-77

২১. Muslim Architecture in Bengal, P 109

২২. Inscriptions of Bengal, IV.P. 105

২৩. Cunningham's Vol XV P 76

রাজশাহী জেলার পশ্চিম সীমান্ত বালিয়া-দীঘির প্রায় সন্নিকট পাকিস্তান চেক-পোষ্টে অবস্থিত কোতয়ালী দরওয়াজা প্রথম যুগীয় মুসলিম স্থাপত্য কীতির আর একটী অন্যতম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মালদহ জেলার গমন করিতে হইলে রাজশাহীর অধিবাসী দিগকে এই তোরণ অতিক্রম করিতে হয়। প্রাচীন গৌড় রাজধানী নগরের দক্ষিণ প্রাচীরে ইহা সদর তোরণ ছিল। অতীতে গৌড় রাজধানী নগরে প্রবেশ করিতে হইলে দক্ষিন 'নগর - উপকণ্ঠের' অধিবাসীবৃন্দকে এই তোরণ অতিক্রম করিতে হইত। নগরদ্বার রক্ষার জন্য এখানে কোতয়ালী স্থাপিত ছিল। সেই নামে আজও এই তোরণ কোতয়ালী দরওয়াজা বা কোতয়ালী গেট নামে প্রসিদ্ধ। নগর-দুর্গের অধিবাসীবৃন্দের দক্ষিণমুখী পথও ছিল ইহাই। ইহার উপরের খিলান বহুদিন আগে পড়িয়া গিয়াছে। এই তোরণটীর উচ্চতা ৩১ ফুট, বিস্তার ১৬ ফুট; প্রবেশ পথের দৈর্ঘ্য ১৭ ফুট ৪ ইঞ্চি ২৪। জেনারেল কানিংহাম লিখিয়াছেন যে, 'ইহা প্রাচীন মুসলিম স্থাপত্য কীর্তির অন্যতম নিদর্শন' সুলতান আলা-উদ-দীন খিলিজির সমসাময়িক স্থাপত্য-নিদর্শন বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন। তিনি আরও অনুমান করিয়াছেন যে, 'সুলতান আলা-উদ-দীন খিলিজির মৃত্যুর পর লখনৌতিতে দিল্লীর আধিপত্য বত্তিলে সেই সময় এই সুদৃশ্য নগর বেষ্টনী প্রাচীরে এই তোরনটী নির্মিত হয়।' এই মত মানিয়া লইলে ১২২৯ (হিজরী ৬২৭) খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরেই ইহা নির্মিত হইয়াছিল, বলিতে হয়। ডাঃ দানী বলিয়াছেন যে, 'বঙ্গের সুলতান নাছিরউদ্দীন মুহম্মদ শাহ'র (১ম) আমলে (পাড়ুয়া হইতে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার পর) রাজধানী নগর-দ্বার হিসাবে ইহা বিনির্মিত২৫। এই তোরণের উভয় পার্শে ৬ ফুট বিশিষ্ট বৃত্তাকার দুইটী শাস্ত্রিগৃহ (Tower) ছিল। সেখানে আগ্নেয়াস্ত্রধারী পাহারারত রক্ষী থাকিত। এই তোরণ ও শাস্ত্রি গৃহদ্বয় নানা প্রকার লতাপাতার কারুকার্য্যে বেশ জাকজমক ছিল[২৬]।

কোতয়ালী দরওয়াজা

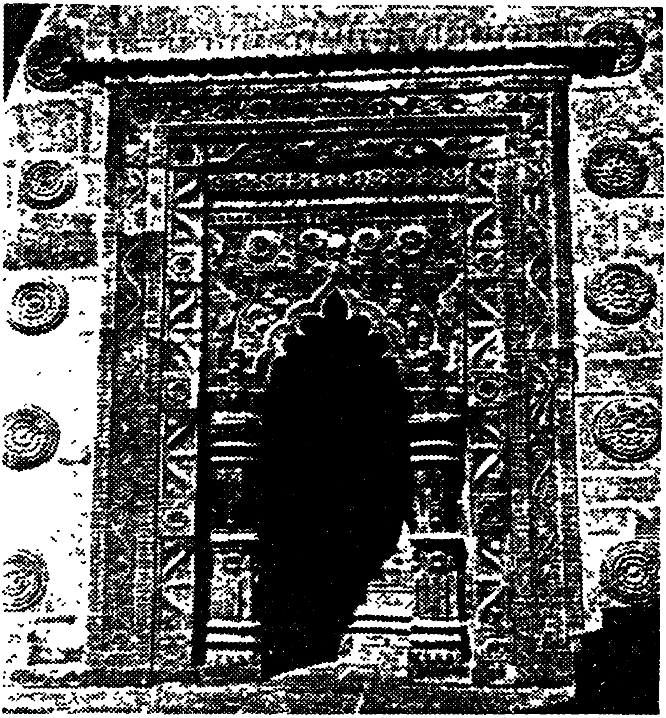
বাঙলার প্রথম মুসলিম যুগের আর একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীতি হইল কুশুম্বার শাহী যুগের তিন গম্বুজ মসজিদ। মূলতঃ ইহা একটি ইষ্টক নির্মিত মসজিদ। কিন্তু, ইহার দেওয়াল চতুষ্টয়ের ভিতর ও বাহির ধূসর বর্ণের প্রস্তর দ্বারা আবৃত। আনুমানিক ১৮ ইঞ্চি হাতের মাপে ইহার দৈর্ঘ্য ৪০ হাত প্রস্থ ৩০ হাত। দেওয়ালের স্থুলতা ৪ হাত। মসজিদের অভ্যন্তরে কালো কষ্টি প্রস্তরে তিনটি মেহরাবের দুইটি অপেক্ষাকৃত বড় ও কারুকার্য্য খচিত। অপরটি ক্ষুদ্র। তাহাও বেশ কারুকার্য্যপূর্ণ। দেওয়াল গাত্রের স্থানে স্থানে প্রস্তরে লতাপাতা অঙ্কিত। এই মসজিদ বাঘার মসজিদের অনুরূপ। পরিকল্পনায় বাঙ্গালী কায়দায় নির্মিত হইলেও আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট। মহিলাদের নামাজ পড়িবার জন্য উত্তর পশ্চিম কোণে প্রস্তর স্তম্ভের উপরে একটি মঞ্চ ছিল। এবং দুইটি প্রস্তর স্তম্ভের উপরে একটি মঞ্চ ছিল। এবং দুইটি প্রস্তর স্তম্ভের উপরে ৬ টি গোলাকার গম্বুজ শোভা পাইত। ১৩০৪ সালের (খ্রীঃ ১৮৯৭) ভুমিকম্পে উহার একটি স্তম্ভসহ তিনটি গম্বুজ পড়িয়া যায়। আর একটি বর্তমান শতকের গোড়াতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। এক্ষণে দুইটি গম্বুজ বর্তমান রহিয়াছে। তিনটি প্রবেশ পথ। মধ্যবর্তী প্রবেশ পথের উপরিস্থিত দুই সারি বিশিষ্ট প্রস্তরখন্ডে উৎকীর্ণ আরবী শিলালিপি (২৭' × ৮'')

---

২৪ Muslim Architecture in Bengal P 94.

২৫. Muslim Architecture in Bengal, P 94

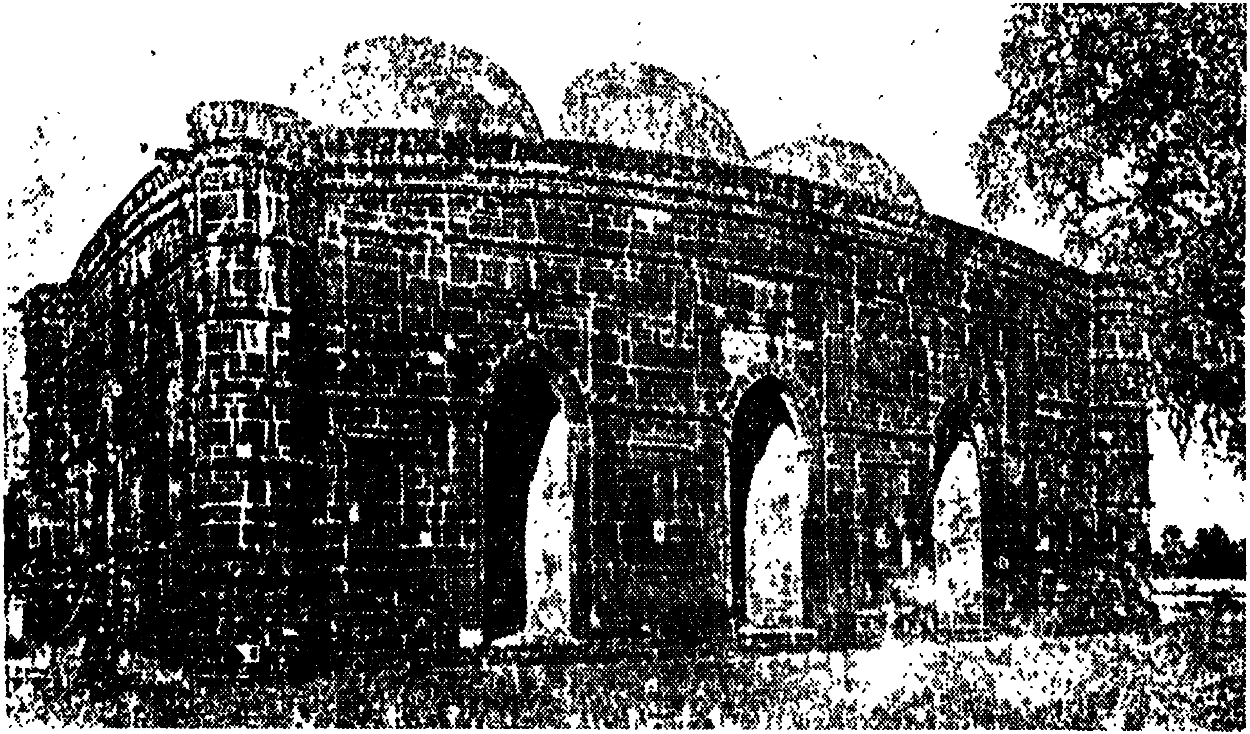
২৬. Memoirs of Gour and pandua, P 76



কুসুম্বা মসজিদের মেহ্‌রাব

হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর শাহ'র রাজত্বকালে জনৈক সোলায়মান কর্তৃক ৯৯৬ হিজরীতে (খ্রীঃ ১৫৫৮)[২৭] ইহা বিনির্মিত। মসজিদের অভ্যন্তরে পশ্চিম দেওয়ালে মেহরাবের উপরে আর একটি সবুজ রঙের ক্ষুদ্র লিপিতে ৯১০ হিজরীর উৎকীর্ণ কলেমাসহ হোসেন শাহী রাজত্বের মঙ্গল কামনা সূচক কয়েকপংক্তি বর্নিত আছে। মনে হয় এই লিপিটি অন্য কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া সেখানে পরে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুলতানী আমলের গৌড়ীয় রীতির গঠন ভঙ্গীর এই মসজিদটি কেন এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার বিশেষ কোন কারণ জানা যায় না। তবে, এই মসজিদ সর্ম্পকে হিন্দু পরিবেষ্টিত[২৮] এইরূপ একটি জনশ্রুতি আছে যে, 'জনৈক চিলমন মজুমদার স্বীয় 'কালীগাও' জমিদারীর রাজস্ব পরিশোধ করিতে না পারিয়া তিনি কারাগারে নীত হইয়াছিলেন। পরে তিনি 'সোলায়মান খান' নামে সপরিবারে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহন করিয়া সেই দায় হইতে মুক্ত হন এবং তদীয় মন্দিরাদির মালমশলা দ্বারা উক্ত মসজিদ প্রতিষ্ঠা করাইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই জনশ্রুতি সত্য হইলেও হইতে পারে কারণ-১ এই মসজিদ প্রতিষ্ঠাতার নাম জনৈক

২৭. Inscriptions of Bengal, PP 242-44, J A.S B Vol. LXXIII, 1904 P-P 108-117
২৮. V.R.S. Monography-No 6, P 20



কুশুম্বা মসজিদ

'সোলায়মান'। হয়ত এই সোলায়মানই অপভ্রষ্ট জনশ্রুতির সারের খান নামে গেজেটিয়ারে বর্ণিত হইয়াছে[২৯]। (২) কুশুম্বার যে বিরাট দীঘির পাহাড়ে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত সেই দীঘিটি উত্তর-দক্ষিণ দীর্ঘ (১,২৫০ ফুট x ৯০০ ফুট) দেখিয়া স্বভাবত:ই মনে হয়, ইহা হিন্দুর কীর্তি। (৩) মুসলমান আমলের দীর্ঘ-পুষ্করিণীগুলি সাধারণত: উত্তর-দক্ষিণ দৃষ্ট হয় না। (৪) মুসলমান সুলতানগণের আমলে রাষ্ট্রীয় কারণে সেখানে কোন কাচারী বা দুর্গ থাকিলে পরবর্তীকালের বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসে নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ থাকিত।

**কুশুম্বা মসজিদে**

কুশুম্বা মসজিদের অদূরে উত্তর-পশ্চিম কোণে ইষ্টক নির্মিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ ও পরিখা বেষ্টিত আর একটি বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে। কথিত আছে যে, ইহাই সোলায়মান মজুমদারের বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। এই ভগ্নাবশেষের উত্তর-দক্ষিণে প্রায় সংলগ্ন উত্তর-দক্ষিণ দীর্ঘ পরস্পর যে দুইটি দীর্ঘ রহিয়াছে–উহার একটি মজুমদারের একজন স্ত্রী সোনাবিবির নামানুসারে সোনা দীঘি নামে পরিচিত। বর্তমানে এই দুইটি দীঘি ভরাট হইয়া উঠিয়াছে[৩০]। এখানে আর একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয় যে, এই ঐতিহাসিক কীর্তিটি ২।১ পুরুষের মধ্যেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বহুদিন স্থায়ী থাকা এবং উক্ত সোলায়মানের পরবর্তী বংশাবলীর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হয়ত উক্ত সোলায়মানের মৃত্যুর পর এই স্থানটি অরক্ষিত ও জনশূন্য হইয়া পড়ে।

কুশুম্বা মসজিদ সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নরূপ :

(১)–১৩০৪ সালের ভূমিকম্পের দিনে তাজিয়া শোভাযাত্রার কিছু লোক সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিলে তখন ছাদ বা গম্বুজ পড়িয়া দুইজন লোকের মৃত্যু হয়।

(২)– সোলায়মানের পূর্ব নিবাস ছিল কুশুম্বার সন্নিকট কালীসভা নামক গ্রামে। মুসলমান হইবার পর তিনি বর্তমান কুশুম্বা ও কালীসভা পর্য্যন্ত যে একটি সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা আজও বর্তমান রহিয়াছে।

(৩)–কুশুম্বা দীঘির পাহাড়ে অবস্থিত বংশানুক্রমিক কুশুম্বা মসজিদের ইমাম মৌঃ ইয়াদ আলী মুনশীর বাড়ীর সম্মুখে কয়েক পংক্তি উৎকীর্ণ লিপিসহ যে একটি প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে–তাহা কোন একটি কবরের আবরণ বলিয়া মনে হয়। প্রস্তরখণ্ডটি কতকটা হাতীর পিঠের মত কুঞ্জাকৃতি। কিন্তু, রাজশাহীর একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীজগদীশ্বর বিশ্বাস ১৯০১ সালে ১১ই ডিসেম্বর এই মসজিদটি পরিদর্শনকালে মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'এই প্রস্থর স্তম্ভটি দ্বারা মসজিদের ভিত্তি দেওয়া হইয়াছিল, ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পের পর উহা স্থানান্তরিত হইয়াছে। তৎপূর্বে উহা মসজিদের একটি খিলানে স্থাপিত ছিল[৩১]।

(৪)–কুশুম্বা দীঘির পাহাড়ে একজন অজ্ঞাত জবরদস্ত সাধকের সমাধি আছে। উহা এখনও জঙ্গলাবৃত।

(৫)– মসজিদ প্রাঙ্গনের নীচে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ডে বিষ্ণু ও গনেশ মূর্তি খোদিত আছে।

২৯. Rajshahi Gagetteer, P 165
৩০. Rajshahi District Gazetteer, P. 65
৩১. Inscriptions of Bengal, P. 243.

পরগণে ধামীনে (বাগমারা থানা) বারানই নদীর তীরে আছিনঘাট নামে একটি প্রাচীন মৌজা আছে। এই মৌজায় পুরুষানুক্রমিক কয়েকঘর সম্ভ্রান্ত লোকের বাস আছে। এতদ্ব্যতীত বহু পীর অলির সমাধি ইতঃস্তত থাকিয়া এই স্থানের মুসলিম অধ্যুষিত প্রাচীনত্বের নানা কাহিনী ঘোষনা করিতেছে। আছিনঘাট সদরে বর্তমানে একটি ক্ষুদ্র বাজারের অস্তিত্ব রহিয়াছে। এই বাজার সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে একটি শাহী মসজিদের আকৃতি আবিস্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। মসজিদের পূর্ব দেওয়াল ছাড়া অপর তিন দেওয়ালের আংশিক গাঁথুনী ও কতকগুলি প্রস্তর স্তম্ভের মূলদেশ প্রোথিত রহিয়াছে। সম্ভবত: এইসব প্রস্তর: স্তম্ভের উপরে মসজিদের গম্বুজ সমূহ শোভা পাইত। পাঁচ দরওয়াজা, পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি কবে কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইযাছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। কেবলই জনরব--'শাহী মসজিদ'। এখানে নাকি কিছুদিন আগে একটি শিলালিপি পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। স্থানীয় গ্রাম্যকর্মীবৃন্দের সাহায্যে এই স্থানটি ১৯৬৩ সালের মাঘ মাসে আমরা সংস্কার করিয়া মসজিদের আকার সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছি। এই মসজিদ সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে মগ্নস্থাবস্থায় দুইটি বাঁধান সমাধি 'পাঁচ পীরের সমাধি' নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। রাজশাহীর সিন্দুর কুশুম্বী নিবাসী প্রাচীন পুঁথি লেখক শুকুর মামুদ স্বীয় রচিত গোপীচন্দ্রের পুঁথিতে আছিনঘাটের পূর্ব নাম মৃগুল শহর নামে বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে আবিস্কৃত উক্ত মসজিদের অস্তিত্ব ও স্থানীয় কাজী পরিবারে একটি বাদশাহী ফরমাণের (রাজশাহী মহফেজ খানায় রক্ষিত) নকল দৃষ্টে এই স্থানকে আমরা পাঠান আমলের স্মৃতি বলিয়া ধরিতে পারি। এখানে পুকুর-পুষ্করিণী বর্তমান রহিয়াছে। এই প্রাচীন স্থানের, ভিটাগুলি ইষ্টকময়, পাকা বাঁধা রাস্তা–পথের চিহ্নাবশেষ ও কতকগুলি চণ্ডী-বিষ্ণু মূর্তির অংশ বিশেষ দেখিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে, এখানে এককালে সমৃদ্ধশালী নগর-বন্দর বা নগর দুর্গ ছিল। হিন্দু কৃষ্টির নিদর্শনগুলিকে একাদশ-দ্বাদশ শতকের মনে করিলে হিন্দু কৃষ্টি সংস্কৃতির উপর (পরে) মুসলমান আধিপত্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

আছিনঘাট

রাজশাহী জেলায় মোঘল শাসনামলের স্থাপত্য কৃতিগুলি পাঠান শাসনামলের কীর্তিগুলির তুলনায় নিস্প্রভ। গঠনরীতিতেও অনেক তারতম্য রহিয়াছে। বোধহয় ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, মোঘল অধিকার কালে গৌড় তথা বাঙ্লার পূর্বাঞ্চলের পাঠান শাসকবর্গের সহিত মোঘলদের প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত, নানা গোলযোগ অশান্তি বিরাজ করিত– সেইজন্য হয়ত মসজিদ বা কোন এমরতাদি নির্মানকালে মনোযোগ দিবার সুযোগ অনেক লোকের পক্ষেই সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। এতদ্ব্যতীত আর একটি বিষয় বিশেষ লক্ষনীয় যে, এই সময়ের মসজিদগুলিতে সাধারণতঃ তিনটি দরওয়াজা পরিলক্ষিত হয়। বোধহয় উক্ত কারণেই মোঘল যুগে মসজিদে বা এমারতাদি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সংক্ষেপ রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই রীতি পরবর্তী যুগেও প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য, আধুনিক যুগের তিন গম্বুজ সাত গম্বুজ ও পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদগুলি মোঘল যুগের অনুকরণে নির্মিত; এইগুলি মোঘল বা পাঠান আমলের মত সুদৃঢ় নয়। রাজশাহী শহরের 'সাহেব বাজার মসজিদ, পাবনার সিরাজগঞ্জ 'সালেহা ইছাহাক বিদ্যালয় এমারত' ও এনায়েতপুর তিন গম্বুজ মসজিদটি মোঘলাই রীতির বাহক, বলা চলে।



আছিন ঘাট পাঁচ পীরেব সমাধি

প্রাগুক্ত ফিরোজপুরস্থিত (শিবগঞ্জ থানা) হজরত শাহ নেয়ামতুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত তদীয় সমাধি সংশ্লিষ্ট তিন গম্বুজ জুম্বা মসজিদটি মোঘল যুগের একটি বিশিষ্ট কীর্তি। ইহাতে তিনটি প্রবেশ পথ এবং ভিতরে তিনটি মেহরাব রহিয়াছে। মসজিদের ভিতর ও বাহিরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কারুকার্য নাই। দেওয়ালে কয়েকটি তাক আছে। স্থানীয় জনসাধারণ হইতে নিয়মিতভাবে জুম্মা-জামাতে নামাজ আদায় করিয়া থাকে।

উক্ত মসজিদ সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে সুলতান শাহ সুজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বিতল এমারতটির ভগ্নাবশেষ মোগল যুগের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এই ইষ্টক নির্মিত এমারতটি "তাহ্‌খানা" নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে, বঙ্গ সুলতান শাহ সুজা তাঁহার মোরশেদ শাহ নেয়ামতুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে (রাজত্বকাল ১৬৩৯-১৬৫৮ খ্রীঃ) শীতকালীন বাসের জন্য ফিরোজপুরে 'তাপ নিয়ন্ত্রণ' এমারত হিসাবে এমারতটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে সুলতান সুজাও এখানে আসিয়া বাস করিতেন। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ১২৬ ফুট এবং প্রস্থ ৩৮ ফুট। ইঁহাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃহৎ কামরা ও উভয় পার্শ্বে বারান্দা ছিল। জনশ্রুতি এইরূপ : শাহ সুজা যখন ফিরোজপুর উপশহরে মোরশেদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তখন উক্ত এমারতের মধ্যবর্তী সুপ্রশস্ত কামরাটিতে বাস করিতেন। গৌড়ের প্রাচীন কীর্তির মধ্যে এই শ্রেণীর এমারত এই একটিই পরিলক্ষিত হয়। করিকাঠের উপরে খোয়া ঢালাই করিয়া যাহার ছাদ ও কোঠা জমাট করা হইয়াছিল।[৩১]

৩১. (A) Memoris of Gaur and Pandua, P 84



মুকারম শাহের সমাধি সৌধ

উল্লিখিত মসজিদ ও 'তাহ্খানা' নিকটস্থ সরোবরের পশ্চিম তীবে অবস্থিত। এই দুইটি ইমারত হইতে দুইটি সিঁড়ি সরোবরের তলদেশ পর্য্যন্ত বিন্যস্ত। পূর্ব তীর হইতে উক্ত এমারত দ্বয়ের দৃশ্যাবলী অতীব মনোরম। সরোবরের জল অতি স্বচ্ছ। সাধারণরা ইহাকে "পীরের পুকুর" মনে করিয়া ইহার জলকে পবিত্র জ্ঞানে ব্যবহার করে। এই কীর্তি দুইটি পাকিস্তানের পুরাতত্ব বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের বাজত্বকালে (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রী:) চাঁপিলা ও জগৎপুরেব এই দুইটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, রাজশাহী মহফেজ খানায় রক্ষিত ১৮৪৯-৫০ সালের ভূমি নকশাগুলিতে বর্তমান রাজশাহী ভূমিভাগে তিন শতাধিক তিন গম্বুজ ও পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট প্রাচীন মসজিদ দৃষ্ট হয়। পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদগুলিতে সাধাবণত: একসারি লোক নামাজ পড়িতে পারে। গম্বুজগুলি মধ্যমাকৃতি ও ছোট। তিন গম্বুজ মসজিদগুলিতে সাধারণত: দুই সারি লোক নামাজ পড়িতে পারে। প্রবেশ পথ তিন হইতে পাঁচ এবং কোনটীতে ৭টী পর্য্যন্ত পথও আছে। আলোচ্য মসজিদগুলি। এখন প্রায়ই অব্যবস্থায় জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও এইসব মসজিদের ২।১ টিরও সন তারিখ সম্বলিত কোন সঠিক তথ্য উদ্ধার করিতে পারি নাই। মসজিদগুলি এতই জীর্ণ যে, নিকটে যাইতেও প্রাণনাশের ভয় থাকে। নাটোর মহকুমায় এই শ্রেণীর প্রায় ৫০টির বেশী মসজিদ রহিয়াছে। আলোচ্য মসজিদগুলি মোগল আমলের শেষ পর্য্যায়ের অর্থাৎ নওয়াবী আমলে নির্মিত বলিয়া ধরিতে পারা যায়।

## ॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

# ইতিহাস বিভাগ : হিন্দু শাসন

আজাদী পূর্বকালে যে ভূখণ্ড বাঙ্লা দেশ নামে পরিচিত, প্রাচীন কালে তাহা বহুজন পদে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক জনপদেরই একেকটী পৃথক পৃথক নাম ছিল। তখনও অখণ্ড বাঙ্লা দেশ গড়িয়া উঠে নাই। এক নাম ও এক ভাষার ভিত্তিতে অখণ্ড বাঙ্লা দেশ গড়িয়া উঠিয়াছে মধ্যযুগে মুসলমান অধিকারের পর। যে সমস্ত ঘটনা পরম্পরায় বহুজন বা জনপদ একত্র সংহত হইয়া অখণ্ড বাঙালী জাতি ও বাঙ্লা দেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার বিবরণই হইল বাঙ্লার প্রাচীন ইতিহাসের আদি কথা। সেই ইতিহাসের ক্রম বিবর্তনের ধারা অনুস্মরণ করিতে হইলে প্রাচীনজন (নর গোষ্ঠি Tribe) ও জনপদগুলির ভৌগলিক সংস্থান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। কিন্তু, বর্তমান প্রবন্ধে তাহার অবলোচনা সম্ভব নয় হেতু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সুবিধার জন্য কেবল মাত্র প্রাচীন বাঙ্লার প্রধান প্রধান জনপদগুলির নাম উল্লেখ করিব। 'বঙ্গ', 'গৌড়', 'পৌণ্ড্র', 'রাঢ়', 'হরিকেল', 'সমতট', 'সুহ্ম', 'বজ্রভূমি', 'বর্ধমান-কঙ্কগ্রাম' তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি জনপদগুলি প্রাচীন কালের বঙ্গ-বিভাগের এক একটী ভৌগলিক সংস্থান। প্রাচীন কালের যাযাবর বৃত্তির ফলে এই জন সমূহ সব সময় একস্থানে অবস্থান করিত না। নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িত। প্রত্যেক জনেরই নানা উপবিভাগ থাকিত। জনপদগুলির মধ্যে রাষ্ট্রিয় কারণে সব সময় যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত এবং এক জনপদের উপর অন্য জনপদের আধিপত্য ঘটিত। তাহার দরুণ জনপদগুলির ভৌগলিক সংকোচন-সম্প্রসারণ হইত। সময় সময় এই জনপদগুলির সীমা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নামেরও পরিবর্তন হইত।

মুঙ্গের জেলার (মুদগগিরি) পূর্ব দিকে পৌণ্ড্র জনপদ অবস্থিত। 'অঙ্গ' 'বঙ্গ' এবং সুহ্ম জনপদের প্রতিবেশী দেশ পৌণ্ড্র। খ্রীষ্ট্রীয় তৃতীয় দ্বিতীয়[৩২] শতকের একটী (ব্রাহ্মী লিপি) লিপি অনুসারে যে 'পন্দনগলের' উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাই ছিল সেই সময়ের পুণ্ড্রের রাজধানী, অধুনা বগুড়ার 'মহাস্থান।' যাহার পূর্ব পার্শ্বে করতোয়া এখন ক্ষীণ স্রোতা। পুণ্ড্রের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম ষষ্ঠ শতকে ইহা পৌণ্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হইয়া গুপ্তরাষ্ট্রের একটী প্রধান ভুক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। সেই সময়ের পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি ইংরেজ আমলের বগুড়া দিনাজপুর রাজশাহী মালদহের পূর্ব উত্তর অঞ্চল এবং রংপুরের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল ও পাবনার বর্তমান নিমগাছি পর্য্যন্ত বোধ হয় বিস্তৃত ছিল। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে রাজমহলের নিকট গঙ্গা হইতে করতোয়া পর্য্যন্ত ভূভাগ অর্থাৎ পাকিস্তান আমলের উত্তরবঙ্গ (রাজশাহী বিভাগই) সে কালের পৌণ্ড্রবর্ধনের অন্তরভুক্ত ছিল। পরবর্তী কালে ইহার রাষ্ট্রীয় সীমা কখন কখন বৃদ্ধি পাইয়া ছিল। সেন আমলে পৌণ্ড্রবর্ধনের দক্ষিণতম সীমা একদিকে 'খাড়ী বিষয়' (বর্তমান ২৪ পরগণার

৩২. বগুড়াব ইতিকাহিনী, ৪৪৯ পঃ মূল লিপি এবং গ্রন্থ শেষে অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

'খাড়ী পরগণা') এবং অন্যদিকে ঢাকা ও বরিশালের সমুদ্রোপকুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পৌণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্রস্থল ছিল বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী। পূর্বে করতোয়া নদী, পশ্চিমে মহানন্দা ও গঙ্গা-পদ্মা; দক্ষিণে পদ্মা; উত্তরে হিমালয় পাদদেশের টেরাই ভূমি; এই চতুঃসীমা বেষ্টিত ভূমি ভাগই বরেন্দ্রী[৩৩]। এই বরেন্দ্রী ভূখণ্ডই মধ্যযুগের মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বরিন্দ্র। আইন-ই-আকবরীতে উহার উল্লেখ সুস্পষ্ট। তবে মুসলমানের বরিন্দ্রের চেয়ে প্রাচীন বরেন্দ্রীর আয়তন খুব ছোট ছিল; প্রায় ৩,৬০০ বর্গমাইল (?)। বৈদ্য দেবের তাম্রশাসন, রামচরিতম কাব্যে, তিব্বতীয় গ্রন্থ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে বরেন্দ্রী খুবই সুস্পষ্ট[৩৪]। বিজয় সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে বরেন্দ্রী বা বারিন্দ্রিক শিল্পী গোষ্টি চুড়ামণি রাণক শূলপানির[৩৫] কথা উল্লিখিত। বগুড়ার বালগ্রাম লিপিতে বরেন্দ্রী মন্ডনং গ্রাম্যে বালগ্রাম[৩৬] ইতিশ্রুতঃ। এই বরেন্দ্রীর প্রাচীনতম নামই পৌণ্ড্র বা পৌণ্ড্রবর্ধন। এই পৌণ্ড্র–বরেন্দ্রী–বরিন্দ্রের দক্ষিণাংশের সীমান্তস্থিত ভূমিভাগই হইল রাজশাহী জেলা।

প্রাচীন বাঙলার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কোন ইতিহাস জানা যায় না। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ শতকে আলেকজাণ্ডারের পাক-ভারত অভিযান সম্পর্কে মৌর্য্য সম্রাট বা চন্দ্রগুপ্তের রাজ সভায় আগত গ্রীক্ দুত মেগাস্থিনিসের (Indica) অনুস্মরণে 'এবিয়ান ডিও ডোরাস' ও টলেমী প্রমুখের গ্রন্থে বাঙলা দেশের যে প্রাচীন গঙ্গারাষ্ট্রের বিবরণ আছে তাহা বাঙলার প্রাচীন ইতিহাসের রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রথম সংবাদ হিসাবে গণ্য হইতে পারে। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্বন্ধে অগ্রবর্তী ঐতিহাসিক মহোদয়গণ বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন[৩৭]। আনুমানিক দ্বিতীয় তৃতীয় শতকের একটি মৌর্য্য লিপি অনুসারে উত্তর বঙ্গ বা পৌণ্ড্র বর্ধন মৌর্য্য-সাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল এবং বগুড়া শহর হইতে ৭ মাইল উত্তরে মহাস্থানে (পুণ্ড্র নগরে বা পুড় নগলে) এই মৌর্য্য শাসনের কর্মকেন্দ্র ছিল। উক্ত অনুসাশনে পুণ্ড্রনগরে (পুড় নগলেতে) দুর্ভিক্ষের সময় (একদা দুর্ভিক্ষ হইলে) এই শাসন কেন্দ্রের রাজপ্রতিনিধি কর্তৃক প্রজাদের ধান্য ও অর্থ ঋণ দেওয়ার বিষয় উল্লেখ আছে[৩৮]। বগুড়ার রায়কালী গ্রামে কুষাণ-সম্রাট বাসুদেবের নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে[৩৯]।

এই কুষাণ সাম্রাজের সহিত পুণ্ড্রের কোন সম্পর্ক ছিল কি না আজ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে আর কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমার গুপ্তের রাজত্ব কাল হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বাঙলার গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধানতম কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন। তখনও রাজশাহী জেলা এই পুণ্ড্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুপ্ত রাজত্ব কালের ভূমিদান বিষয়ক ৬ খানি গুপ্ত লিপি এই জেলায় আবিস্কৃত হইয়াছে*।

গুপ্ত রাজ বংশ শিথিলমূল হইলে পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিতে ধর্মাদিত্য (৫৫০-৫৬৫ খ্রী:?)

---

৩৩. রামচরিতমে বরেন্দ্রীকে "অপ্যভিতো গঙ্গা করতোয়াণম প্রবাহ পুণ্যতমাং" (৩।১০।) অর্থাৎ "একদিকে গঙ্গা অন্যদিকে করতোয়া এই উভয় নদীর অমূল্য প্রবাহ দ্বারা পুন্যতমা" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

৩৪. J A S B New series Vol. XII No 6. PP 291-295. লেখমালা–পৃঃ ১২৭ (২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৩৫. Inscriptions of Bengal, Vol, III, PP 49, 56 and 44

৩৬. ভারতবর্ষ–১৩২২, অগ্রহায়ণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৭. রাখাল দাস 'বাঙলার ইতিহাস' অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় কৃত 'গৌড় লেখ মালা; History of Bengal, Vol I প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

৩৮. বগুড়ার ইতিকাহিনী, ৪৪৯ পৃষ্ঠায় লিপি ও শেষ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৯. গৌড় লেখমালা পৃষ্ঠা ৪।

* অত্রগ্রন্থের ঐতিহাসিক বিবরণ দ্রষ্টব্য।

সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া উঠেন। তৎপর যথাক্রমে রাজা গোপ চন্দ্র (৫৬৫-৫৮৫? খ্রী:); রাজা সমাচার দেব (৫৮৫-৬০২ ? খ্রী:) গৌড় বঙ্গের স্বাধীন নরপতি হন এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। ইহাদেরও রাজত্বকালের তাম্র শাসনাধি পাওয়া গিয়াছে[৪০]।

সম্ভবত: সমাচার দেবের রাজ্য-শাসনের পরই শশাঙ্কদেব গৌড়পতি হন[৪১]। এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন[৪২]। কাণ্যকুব্জ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত করেন। শশাঙ্ক প্রথম জীবনে বোধ হয় গুপ্ত রাজ্যের মহাসামন্ত ছিলেন। রোটার্স গড়ের আবিস্কৃত লিপিতে তিনি "শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক দেবস্য" নামে উল্লিখিত। ভাস্কর বর্মা ও হর্ষ বর্ধনের সহিত যুদ্ধে তিনি মগধ ও গৌড় (পৌণ্ড্র বর্ধন) হারাইয়া রাঢ় দেশের কর্ণ সুবর্ণে (মুর্শিদাবাদ) আশ্রয় লন। শশাঙ্ক (৬১৯-২০) কর্ণ সুবর্ণেই দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার শেষ জীবন খুব ক্লেশে কাটিয়াছিল। তিনি বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন[৪৩]।

হর্ষ বর্ধনের রাজত্বকালে বিখ্যাত চীন দেশীয় পর্য্যটক 'হিয়েন সিয়াং (৬২৯-৬৪৫ খ্রী:) 'পাক-ভারত ভ্রমণ করেন[৪৪]। তিনি রাজা শশাঙ্ককে কর্ণ সুবর্ণের অধিপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রী: অঃ ৬৪২-৬৪৩ শতকে তিনি পুণ্ড্রবর্ধন (মহাস্থান) পর্য্যটন করেন। তিনি তখন পুণ্ড্রবর্ধনে ২০টি সংঙ্ঘারাম ও শতাধিক দেবালয় প্রত্যক্ষ করেন[৪৫]।

সম্ভবত: তখন রাজশাহী জেলাতেও বৌদ্ধ বিহার ও অন্যান্য দেব মন্দিরাদি ছিল। তানোর থানার বিহারৈলও ধানোরা প্রভৃতি এই সময়ের বৌদ্ধ-বিহার হইলেও হইতে পারে। কেন না এই স্থানদ্বয়ের (বিহারদ্বয়) জনশ্রুতি এখনও প্রবল। কিছুদিন আগে বিহারৈল স্তূপ হইতে একটি প্রস্তর নির্মিত বৌদ্ধ মূর্তি (ষষ্ঠ বা সপ্তম শতক?) সংগৃহীত হইয়া রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়াছে। এতদব্যতীত সপ্তম অষ্টম শতকের প্রস্তর নির্মিত মূর্তি এই অঞ্চলে বহু পাওয়া গিয়াছে। এই সব প্রত্নসম্পদ স্থানীয় মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। পরিব্রাজক 'হিয়েন সিয়াং' রাজশাহীর দক্ষিণতম সীমান্তে গোদাগাড়ী নওয়াবগঞ্জের মধ্যবর্তী কোন এক স্থানে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া পুন্ড্রবর্ধনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অত্র গ্রন্থের প্রাচীন পথঘাট ও ঐতিহাসিক বিববণে তাহার আলোচনা করিয়াছি।

রাজা শশাঙ্কের পরের ইতিহাস দুর্যোগপূর্ণ ও অরাজকতার ইতিহাস। মৎসন্যায়ের শত বৎসর নৈবাজ্য কাল। তখন গৌড় বঙ্গে সমতটে কোন রাজার আধিপত্য ছিলনা, সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, রাষ্ট্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন রাজা নাই, রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের দাবীদার অনেক[৪৬]। আজ যিনি রাজা হন, কাল তাঁহার ছিন্ন মস্তক ভূতলে লুটাইয়া পড়ে। মোট কথা, বৃহৎ মৎস্যের দ্বারা ক্ষুদ্র মৎস্য গ্রাসের যে ন্যায় বা যুক্তি সেই ন্যায়ের রাজত্ব গৌড় বঙ্গে চলিতেছিল।

যখন এই উৎপীড়ন অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন গৌড় বঙ্গের কতিপয় সামন্ত নায়কেরা একত্র হইয়া 'মৎস্যন্যায়' দূর করিবার জন্য বপ্যট-তনয় গোপালকে অধিরাজ নির্বাচিত করেন। গোপালের পুত্র ধর্মপালের খালিম পুর লিপিতে তাহার উল্লেখ

৪০. G A S B, 1911, Ang, P 495-96; the ghugrahati copper Palet, The Dacca Review, 1920, P 39-57

৪১. বানভট্ট রচিত 'হষচরিত' ষষ্ঠ-উচ্ছ্বাস।

৪২. Epigraphia Indica, Vol VI.P 143. Fleet's gupta . . .P. 284

৪৩. গৌড় রাজমালা ১২ পৃঃ

৪৪. Watters on young chuong's Travels in India 629-645 V S (Londonn), 1904.

৪৫. Vide-Beals translation of the life of Hiuen Tsang;

৪৬. The Indian antiquary, Vol, IV pp 363-366

আছে[৪৭]। গোপালের রাজ্যাভিষেকের কথা তারনাথ বা তারানাথ (১৬০৮ খ্রী:) উল্লেখ করিয়াছেন। গোপাল প্রথমে বাঙলা দেশের রাজ্যপদে নির্বাচিত হন। পরে মগধাদি বশীভূত করেন৪৮। খ্রীষ্ট্রীয় ৭৫০-১১৬০ শতক পর্য্যন্ত পাল রাজ বংশ রাজত্ব করেন। আপাততঃ আমরা সেই পাল বংশের ১৮ জন রাজার নাম জানিতে পারি। রাজা গোপালদেব পাল রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম রাজা।

গোপালদেব (১)–ধর্মপাল (১) দেবপাল বিগ্রহপাল (১) বা শুরপাল–নারায়ণপাল–রাজ্যপাল– গোপাল (২)– বিগ্রহপাল (২) মহীপাল– মহীপাল (১)– নয়পাল– বিগ্রহপাল (৩)–মহীপাল (২)– শূরপাল (২)–রামপাল– কুমারপাল– গোপাল (৩)–মদনপাল- গোবিন্দপাল। এই পাল রাজাদের পূণ্য কীর্তির বহু নিদর্শন রাজশাহী জেলাতে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। পাহাড়পুর স্তূপ, বামাবতী, মহীসন্তোষ, জগদ্দল মহাবিহার, হলুদ বিহার ও গরুড়স্তম্ভ তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

পাল রাজবংশের শাসন লিপির মধ্যে আপাততঃ আমরা রাজশাহী জেলাতে তিনটির সন্ধান লাভ করিয়াছি। রাজা ধর্মপাল দেবের খালিমপুর 'তাম্রশাসন' নারায়ণ পালদেবের 'মঙ্গলবাড়ীর' গরুড়স্তম্ভ লিপি ও রাজ্যপাল দেবের 'ভাতুড়িয়া প্রস্তব শিলা লিপি'। অত্র গ্রন্থে ঐতিহাসিক বিবরণে এই সবের উল্লেখ আছে।

বঙ্গে সেন আমলে দেখিতেছি দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশীয় চন্দ্রবংশীয় সামন্ত সেন বৃদ্ধ বয়সে রাঢ় দেশে গঙ্গা তীরে (?) উপনিবিষ্ট হন। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন। এই বিজয় সেনই সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বপ্রথম রাজা। ইনিই মদন পাল দেবকে বিতারিত করিয়া গৌড়েশ্বর হন৪৯। রাজা বিজয় সেন প্রথমতঃ বরেন্দ্র ভূমির দক্ষিণ পশ্চিমাংশে আবির্ভূত হইয়া আধিপত্য স্থাপন করেন।

বিজয় সেনের পর তৎপুত্র বল্লালসেনের এবং তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন যথাক্রমে ১০৯৫-১২০৩ শতক (?) পর্য্যন্ত গৌড় বঙ্গে রাজত্ব করেন। বল্লালসেন 'দান সাগর' 'অদ্ভুত-সাগর' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা এবং গৌড় বঙ্গের ব্রামণ-কায়স্থগণের কুল প্রথা প্রবর্তন করেন। লক্ষ্মনসেন পাল বংশের শেষ রাজা গোবিন্দ পালকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া মগধাদি অধিকার করেন। সেন বংশের লক্ষ্মনসেন একজন বিদ্যোৎসাহী ও দানশীল রাজা ছিলেন।

রাজশাহী জেলায় সেন বংশের পুণ্যকীর্তির মধ্যে (শহর হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে) রাজা বিজয় সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেওপাড়া গ্রামের প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবলিঙ্গ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও তৎসন্নিহিত দীঘিটি বিদ্যমান রহিযাছে। এই দেওপাড়ার অদূরে কবি উমাপতি ধর রচিত সেন বংশের পরিচয় সূচক একটি প্রস্তর শিলালিপি আবিস্কৃত হইয়াছে। উক্ত প্রশস্তি লিপিতে দীঘি খনন এবং প্রদুম্নেশ্বরের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কথার উল্লেখ আছে[৫০]। এতদব্যতীত রাজশাহী শহরের ৯ মাইল পশ্চিমে কুমারপুর ধ্বংসাবশেষের সন্নিকট বিজয় নগরের ভগ্নাবশেষটিতে রাজা বিজয় সেনের রাজধানী নির্দেশিত হইয়া থাকে। অত্রগ্রন্থের ঐতিহাসিক বিবরণে তাহার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৪৭. গৌড় লেখমালা, ৯–২৮ পৃঃ।

৪৮. The Indian antiquaiy, Vol. IV, p 366

৪৯. Ephigraphia indica, Vol I, P 309

৫০. Ibid, P 311, Inscriptions of Bengal, Vol III, PP 42-56.

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

# সুলতানী আমল

ইখতিয়ার উদ দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলিজি কর্তৃক মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী সমভিব্যাবহারে বঙ্গ বিজয় পাক-ভারতের ইতিহাসের এক বিরাট বিস্ময়। কেবল তাই নয়, কি ভাবে হিন্দু বর্ণেতর শুদ্র শঙ্কর প্রভৃতি জাতি অধ্যুষিত বাঙলায় ইসলামের শান্তি ও সাম্যেব বাহক সূফী-দরবেশ ধর্মযোদ্ধাদের আগমনে মুসলিম উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং প্রাচীন বাঙলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি একত্র সুসংহত হইয়া মুসলিম বাংলার গৌরব লাভ করে। খৃ: অঃ ১২০৩ হইতে ১৭৫৭ শতক পর্য্যন্ত নওয়াব বাদশাহ সুলতান কর্তৃক এই দেশ শাসিত হয়; বাঙলার সেই ইতিহাসই হইল মুসলিম বাঙলার মূল ইতিহাস। কিন্তু, এখানে আমরা সেই সুদীর্ঘ ইতিহাসের অবতারণা করিব না। মুসলমানদের শাসন আমলে রাজশাহীর ভূমিভাগে আমরা কি পাইয়াছি তাহাই হইল আমাদের বক্তব্য বিষয়।

ইং ১২০৩ সালে বখতিয়ার খিলিজি সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ জন বীর সওয়াব (অশ্বারোহী) সমভিব্যাহারে বাংলার রাজধানী নুদিয়া (নবদ্বীপ বা নোদিয়াহ) জয় করেন। এই নুদিয়া বিজয় ব্যাপাবে তাবাকাৎ ই-নাছিরীতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, যখন বখতিয়ার কর্তৃক বিহার বিজয়ের খবর বাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যে পৌছে, তখন একদল জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ রাজ-মন্ত্রী রাজাকে বলেন যে, "শাস্ত্রে লেখা আছে আজানুলম্বিত বাহু বিশিষ্ট তুর্কী কর্তৃক এই দেশ অধিকৃত হইবে সুতরাং রাজধানী ও এতদসহ স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রভৃতি অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়া উচিত।" ফলে হইয়াও ছিল তাহাই কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রাজা তাঁহার রাজধানী স্থানান্তবিত করেন নাই। পরে, যেদিন সত্যি সত্যিই বখতিয়ার ১৮ অথবা ১৭ জন সওয়ার সমভিব্যাহারে (পবে দুই শতাধিক দিগব লস্কর আসিতেছিল) অশ্ববিক্রেতা রূপে নগর তোরণ অতিক্রম করিয়া রাজা লক্ষ্মণ সেনের বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হিন্দুদিগকে আক্রমণ করেন তখন "রায় লখমনিয়া" আহারে উপবিষ্ট; তাঁহাব নিকট সঠিক সংবাদ পৌছিবার আগেই বৃদ্ধ রায় নগ্নপদে বাড়ীর পশ্চাদ্বার দিয়া গঙ্গায় ভাসমান তবনী যোগে (শঙ্খনাথে?) বঙ্গে পলায়ন করেন[৫১]। এই হইল 'নোদিয়হ বিজয়ের প্রকৃত ঘটনা।

বঙ্গ বিজয়

বখতিয়ার খিলিজি কর্তৃক নোদিয়হ্ বিজিত হইলে লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) মনোমত সংস্থার করিয়া তিনি তথায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং নাম রাখেন "লখনৌতি"। তিনি কুতুব-উদ-দীন আইবেক কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া 'বিহার' ও 'নোদিয়হ' ফতেহ করেন। সেইজন্য রাজধানী স্থাপিত হইলে কুতুব-উদ-দীনের নামে খুতবা পাঠ করেন এবং তাহারই নামে রাজমুদ্রা প্রচার করেন।

রাজধানী স্থাপন

বঙ্গ বিজয়ের পর বখতিয়ার জানিতে পারেন যে, ভোট জাতি কর্তৃক উত্তর বঙ্গের লোকেরা প্রায়ই প্রপীড়িত হইত। সেই জন্য বখতিয়ার ভোটদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে (১২০৫-৬ খ্রী:) তিব্বত ও কামরূপে অভিযান চালান[৫২]।

৫১. Ravarty's Tabakat-I Nasiri, PP 506-558

৫২ History of Assam by E A Gait P 34.

বিজিত রাজ্যে শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য বখতিয়ার রাজমধ্যে দুইটী জয়স্কন্ধাকার স্থাপন করিয়া বাগড়ীর কতকাংশ ও বরেন্দ্র ভূমি লইয়া একভাগ ইহার রাজধানী দেবী কোট বা দেব কোট:-(বর্তমানে পশ্চিম দিনাজপুরে) এবং রাঢ় মিথিলার কিয়দংশ লইয়া একভাগ:- লাখনৌতিতে ইহার রাজধানী স্থাপিত হয়।

তৎপর রাজধানীতে মসজিদ, মাদ্রাসা বিশ্রাম স্থল প্রভৃতি স্থাপন করেন। সম্ভবত: তখন বরেন্দ্রভূমির অংশ হিসাবে এই রাজশাহী ভূমিভাগের বহুলাংশ দেবী কোট- শাসন কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বঙ্গ বিজয়ের পর প্রায় শত বৎসর কাল বাঙলা দেশ দিল্লীর সম্রাটগণের অধীনে থাকে। আবার স্বাধীন হয়। আবার অধীনে চলিয়া যায়। এইভাবে তুর্কী-পাঠান মোঘল ও ইংরেজগণ বাঙলাদেশ শাসন করেন। ১৩৩৮ সালে ফকর উদ-দীন মোবারক শাহেব স্বাধীনতা ঘোষনা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫৩৮ সালের গিয়াস উদ-দীন মাহমুদ শাহের উচ্ছেদ পর্য্যন্ত এই দুই শত বৎসর বাঙলার স্বাধীন সুলতানদের আমল। এই দুইশত বৎসর বাঙলা অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্বাধীনতা ভোগ করে। মুসলিম বাঙলার এই যুগ গৌরবময় যুগ। এই যুগের কত বিচিত্র সমারোহে, কত জয়ের, কত কীর্তিব, কত গৌরবের কাহিনী বাঙলার পথে ঘাটে ছড়াইয়া আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দুঃসাহসী ফকব উদ-দীন মোবারক শাহ, স্বাধীনতা প্রিয় সিংহ প্রতীম সমস্-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ, গৌড়ের বিখ্যাত আদিনা মসজিদেব প্রতিষ্ঠাতা সেকেন্দার শাহ, বুলবুলে বাঙলা গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ, রাজা গণেশেব পুত্র যদু বা জালাল উদ-দীন, বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠ পোষক রুকন-উদ-দীন বারবাক্ শাহ, এবং লৌহ কঠিন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ তৎপুত্র নশরৎ শাহ। এই সমস্ত সুলতানগণের আবির্ভাবে এই যুগ সমৃদ্ধ। এই বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত যুগের সুলতানগণ নিজেদের যোগ্যতা শক্তি ও ঐশ্বর্য্যেব মধ্যে দিয়া মুসলিম ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাটগণের অন্যতম হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাঙলার প্রায় জেলা তাঁহাদের নানা কীর্তি সেই স্বর্ণ যুগের স্বাক্ষর বহণ করিতেছে। কেবল তাই নয়, এই যুগের ধর্ম যোদ্ধাদেরও নানা কথা ও অলৌকিক কাহিনী মুসলিম বাঙলাব ইহিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই যুগ এবং পরবর্তী যুগের যে সব স্থাপত্য শিল্প নিদর্শন রাজশাহী ভূখণ্ডে রহিয়াছে তাহা আজও রাজশাহী বাসীর মনে প্রানে প্রতি পদে পদে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। আগের অধ্যায়ে আমরা তাহা আলোচনা করিয়াছি। এখন প্রাগুক্ত ধর্মাচার্য্য বা সূফী সাধনা বিষয়ে কিছু আলোকপাত করিব। তাহার আগে মুসলিম বাঙলার কৃষ্টি সভ্যতার পবিত্রতম ভিত্তি ভূমি গৌড়ের কথা কিছু বলিয়া লইব।

গৌড় পরিচয়

যতদূর অবগত হওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকেব পর হইতে বিভিন্ন সময়ের সংস্কৃত সাহিত্য ও বিবরণে এবং বর্তমান যুগে নানা গ্রন্থে গৌড়ের নাম পাওয়া যায়। মধ্যযুগে গৌড় দেশ খুবই প্রসিদ্ধ। প্রাচীন বাঙলার কোন অংশের সহিত গৌড়ের কতটুকু সম্বন্ধ এবং কোথায় কিভাবে এই গৌড় নামের উৎপত্তি, আয়তনই বা কত ছিল তাহার সঠিক কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। অথচ বাঙলাব ইতিহাসে মালদহ ও রাজশাহীর একাংশ এখনও গৌড় নামে সুবিদিত।

গঙ্গা পদ্মার উত্তরে পুরাতন মালদহের পূর্ব-উত্তরাংশ ও রাজশাহী জেলার পশ্চিম সীমান্তে শিবগঞ্জ ও ভোলাহাট থানার কতকাংশ লইয়া সাধারণত: বর্তমানে এই গৌড়ের

আয়তন ধরা হইয়া থাকে। এই অঞ্চলই গৌড় নামে প্রসিদ্ধ। এই গৌড়ের উত্তরে বল্লালবাড়ী হইতে দক্ষিণে পিরোজপুর পর্য্যন্ত পুরাতন গঙ্গার পূর্বতীর ধরিয়া গৌড়ের মূল ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে যুগে যুগে বাঙলার পাল সেন রাজাদের নগর-দুর্গ-রাজধানী বাজার বন্দর প্রভৃতি নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। প্রাগুক্ত বল্লাল বাড়ীর সন্নিকট কথিত লক্ষ্মনাবতী লক্ষ্মন সেনের রাজধানী; তাহাও সুবিদিত।

বখতিয়ার খিলিজি হইতে কদর খান পর্য্যন্ত লাখনৌতিতে বাঙলার রাজধানী স্থাপিত ছিল। তারপর বাঙলার স্বাধীন সুলতানগণ গৌড় হইতে ২০ মাইল উত্তরে এবং ইংরেজ বাজার হইতে ১১ মাইল দুরত্বে ফিরোজাবাদ নামক স্থানে পাঁরুয়া শরীফ বা পান্ডুয়াতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া রাজত্ব করেন। লাখনৌতি খুব পুরাতন শহর। অধিকন্তু, বার বার নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে লাখনৌতি অস্বাস্থ্যকর হয় এবং বাসের অযোগ্য হইয়া নগর পুনসংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এমতাবস্থায় লাখনৌতি হইতে 'রাজধানী' পান্ডুয়াতে স্থানান্তরিত হয়।

লাখনৌতি (খ্রীঃ ১২০৩ - ৪ রাজধানী স্থাপিত) ও পান্ডুয়াতে দীর্ঘ দিন ধরিয়া মুসলিম বাঙলার রাজধানী অবস্থিত ছিল। এই রাজধানী নগর রক্ষার্থে ছাউনি, গড়, সামরিক প্রয়োজনে পথ ঘাট ও সেতু নির্মান, মক্তব,মাদ্রাসা সারাইখানা মসজিদ মন্দির হাট-বাজার; দীঘি-পুষ্করিণী প্রভৃতি সব কিছুই স্থাপিত ছিল। এখানে সেই সব প্রাচীন কীতির বহু নিদর্শন সেই স্বর্ণযুগের বিজয় ঘোষণা করিতেছে। ইহার মধ্যে গৌড়ের 'বড় সোনা মসজিদ' (সুলতান নশরৎশাহ কর্তৃক ১৫২৬ খ্রীঃ স্থাপিত), 'বড় সোনা মসজিদের' অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত 'দাখেল দরওয়াজা' (দুর্গের প্রধান তোরণ) (পঞ্চদশ শতকেব প্রথমার্দ্ধে নিমিত-; ১৪৫৯ -৭৫ রুকুন-উদ-দীন বারবাক শাহ, হোসেন শাহ ও নশরৎ শাহ কর্তৃক পর্য্যায় ক্রমে পুনঃ সংস্কার), চাঁদ দরওয়াজা' ও 'নিম দরওয়াজা' (সম্ভবতঃ ১৪৬৬ খ্রীঃ নির্মিত), 'বড় সোনা মসজিদের' প্রায় ১ মাইল দক্ষিণে 'ফিরোজমিনার' (পঞ্চদশ শতকে বোধ হয় ১৪১২ খ্রীঃ) সৈয়ইফ উদ-দীন হামজা শাহ কতৃক ভিত্তি স্থাপিত এবং ১৪৮৬ খ্রীঃ সৈয়ইফ-উদ-দীন ফিরোজ শাহ কর্তৃক নির্মাণ ও সুসম্পন্ন), ২২ গজি দেওয়াল, খাজাঞ্চী খানা; হোসেন শাহ সমাধি (১৫১৯ খ্রীঃ নির্মিত-বর্তমানে ভগ্নাবস্থায়), 'কদম রসুল' (১৫৩১ খ্রী.), গো-মতি মসজিদ (সম্ভবতঃ ১৫১২ খ্রীঃ হোসেন শাহ কর্তৃক নির্মিত), কদম রসুলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ত্রিতল লোকচুরি তোরণ (শাহশুজা কর্তৃক ১৬৫৫ নিমিত), লোকচুরির পূর্বে 'চামকাটি মসজিদ' (সম্ভবতঃ ১৪৮০ খ্রীঃ নির্মিত), লোটন মসজিদ' (সম্ভবতঃ ১৪৭৫ খ্রীঃ সুলতান ইউসুফ শাহ নিমিত), 'পাঁচ খিলান বিশিষ্ট সেতু (নাসিরুদ্দীন মাহমুদ কর্তৃক -১৪৫৭ নির্মিত), কোতয়ালী হইতে উত্তর পশ্চিমে কিছুদূরে মসজিদের ভগ্নাবশেষ ও কোতয়ালী তোরণ বা গেট' (১২৩৫ অথবা ১৩১৫ খ্রীঃ নিমিত), 'রাজাবিবি মসজিদ' (বালিয়াদীঘির তীরে হোসেন শাহ অথবা ইউসুফ শাহ কর্তৃক নির্মিত), 'দারসবাড়ী মসজিদ' (১৪৭৯ খ্রীঃ ইউসুফ শাহ কর্তৃক ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ নির্মিত), 'শাহ নেয়ামতুল্লাহ ওলীর সমাধি ও 'জুম্মা মসজিদ' (তিনি সমাধিস্থ হন ১৬৬৯ অথবা ১৬৬৪ খ্রীঃ), 'তাহখানা' (সুলতান সুজা কর্তৃক নির্মিত;), লোটন মসজিদের সন্নিকট ভগ্ন গানমতি মসজিদ' (সম্ভবতঃ ১৫৮৪ খ্রীঃ), 'ছোট সাগর দীঘি' 'বিলবাড়ী মাদ্রাসা', কুন্তীব পীরের দীঘি (?), পাশ বাড়ীর দীঘি;

তমালতলা, সাগর দীঘির তীরে হজরত ওসমানী সিরাজ-উদ-দীন আখির সমাধি' (আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ কর্তৃক ১৫১০ খ্রীঃ নির্মিত), 'ঝনঝনিয়া অথবা জাহ্নানিয়া মসজিদ' (গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে -১৫৩৮ খ্রীঃ নির্মিত), প্রভৃতি সমাধিক উল্লেখযোগ্য। -পান্ডুয়া শরীফ বা হজরত পান্ডুয়ার উল্লেখযোগ্য কীর্তিগুলির মধ্যে 'বড় দরগাহ' (হজরত মখদুম শাহ জালাল-উদ-দীন তাবরেজির সমাধি-সুলতান আলা-উদ-দীন আলী শাহ কর্তৃক ১৩৪২ খ্রীঃ নির্মিত) এতদসহ 'জমী মসজিদ' (সুলতান আলা-উদ-দীন আলী শাহ কর্তৃক ১৩৪২ খ্রীঃ নির্মিত), 'ভান্ডার খানা (জনৈক চাঁদ খাঁ কর্তৃক ১৬৭৩ খ্রীঃ নির্মিত), ভান্ডার খানার বিপরীত দিকে 'লক্ষ্মণ সেনী দালান' (হজরত শাহ মখদুমের সাধন পীঠ বা প্রথম আস্তানা, ১৬৮২ খ্রীঃ নির্মিত), প্রভৃতি; 'রন্ধন শালা' হজরত মখদুহ শাহ জালাল-উদ-দীন তাবরেজির সমাধির অদূরে 'ছোট দরগা' (হজরত নূর কুতুব-ই-আলমের সমাধি) এতদসহ নূর কুতুব-ই-আলমের চিল্লাখানা, সেখ আলা-উল হকের সমাধি, মিঠাপুকুর; বেহেস্ত কা-দরওয়াজা, কালাপাথর, শেরখানের সমাধি, শেয়খ্ আফকা ও শেয়খ্ আনোয়ার, শেয়খ্ জাহিদের সমাধি, বিবি মহল, নূর-ই-আলমের গোসলখানা, মুসাফির খানা, তামার ড্যাগ প্রভৃতি এবং কুতুব শাহী মসজিদ (১৫৮২ খ্রীঃ নির্মিত), 'একলাখী সমাধি' (সম্ভবতঃ ১৪১২-১৫ খ্রীঃ নির্মিত-যদু বা সুলতান জালাল-উদ-দীনের সমাধি), 'আদিনা মসজিদ' (সুলতান সেকেন্দার শাহ কর্তৃক ১৩৬৪-১৩৭৪ খ্রীঃ নির্মিত), সেকেন্দার শাহের 'রাজ প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ, 'নাছির শাহ দীঘি', 'শুকান দীঘি,' 'নূর কুতুব-ই-আলমের ভূমিষ্ট স্থান,' 'পাণ্ডব রাজার দালান প্রভৃতি; পুরাতন মালদহে 'কাটরা', (সম্ভবতঃ ১৩৫৩ খ্রীঃ নির্মিত), 'শাহগোদার দরগাহ,' (খ্রীঃ ১৫০৫), ফুটি মসজিদ, (১৪৯৫ খ্রীঃ নির্মিত), 'জামী মসজিদ' (১৫৯৬ খ্রীঃ), 'নিমা সরাইয়ের মিনার' (সম্ভবতঃ সম্রাট আকবরের আমলে প্রতিষ্ঠিত), 'কুঠিতলা মসজিদ' (ইংরেজ-বাজার-১৪৪১ খ্রীঃ), 'তুরকান শহিদ' বা গোরা শহিদের সমাধি, (ইংরেজ বাজার, 'বল্লাল বাড়ী' (ইংরেজ বাজারের অদূরে), রামকেলীর প্রায় ১ মাইল পশ্চিমে ভাগীরথীর পূর্ব তীরে গৌড়ের শেষ রাজধানী টাঁড়া বা টাঁণ্ডার ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত, দেওতলা অথবা কসবে-তাবরেজাবাদ (পাণ্ডুয়া শরীফ হইতে ১৫ মাইল উত্তরে দেবীকোট গামী তুরক শাহী পথের ধারে হজরত তাবরেজির সর্ব প্রথম সাধন পীঠ; বাহড়াল (এই স্থানে ঘাতক দানাশাহ কর্তৃক বাঙলার শেষ স্বাধীন নওয়াব সিরাজদ্দৌলার সংবাদ প্রেরণ এবং বিশ্বাস ঘাতক মীর জাফরের দল কর্তৃক ধৃত হইয়া সপরিবারে মুর্শিদাবাদে প্রেরিত:-ইংরেজ বাজার হইতে ২১ মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে কালিন্দী নদীর তীরে এই বাহড়াল অবস্থিত); প্রভৃতি প্রধানতঃ গৌড় পাণ্ডুয়া ও পুরাতন মালদহের মুসলিম কীর্তি*।

রাজশাহীর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত গৌড়ের ফিরোজপুর ব্যতীত উপরোক্ত স্থাপত্য কীর্তি বিজড়িত সমগ্র গৌড়-পাণ্ডুয়া ও পুরাতন মালদহ বর্তমানে ভারতের অন্তর্ভুক্ত। বঙ্গের স্বাধীন সুলতানদের আমলে অথবা তৎপূর্বে স্থাপিত "ফিরোজপুর" গৌড় নগরের

* পশ্চিম বঙ্গ ভ্রমণ কালে ১৯৫২-৫৩ সালে মাত্র একবার গৌড় পর্য্যটন করি। অত্র গ্রন্থ প্রণয়ন কালে আর একবার পর্য্যটন করার প্রয়োজন ছিল কিন্তু, যথাসময়ে ভিসা না পাওয়ায় তাহা সম্ভবপর হয় নাই। সুতরাং বর্ণিত বিষয়ে ভুলত্রুটি থাকিলে ক্ষমা করিবেন। গ্রন্থকার।

প্রসিদ্ধ স্থান ছিল৫৩। সুলতান ইউসুফ শাহ ও সুলতান হোসেন শাহের রাজত্ব কালে এই ফিরোজপুর খুবই উল্লেখযোগ্য ও বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ছিল। পরবর্তীকালে সুলতান শুজার রাজত্বকালেও ইহার গৌরব অক্ষুন্ন ছিল। ফিরোজপুর গৌড় নগরের উপশহর হিসাবে গড়িয়া উঠিলেও অনেক সময় বোধ হয় এখানে সেনানিবাস স্থাপিত ছিল। গৌড় নগর রক্ষার্থে এখানেও সৈন্য গড়; এবং সুলতানদের বাস ভবন, নেজামত খানা, অন্যান্য অফিসাদি; হাটবাজার, পথঘাট, সরাইখানা প্রভৃতি নগর জীবনের সব কিছুরই ব্যবস্থা ছিল। এক সময় ইহার নীচে দিয়া ভাগীরথী তাহার প্রবাহ বহন করিত। বর্তমানে ভাগীরথী "পুরাতন ভাগীরথী" নামে কথিত এবং তাহা প্রায় ১ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। গৌড় রাজধানীর দুর্দ্দিন ও ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই নগর উপকণ্ঠ ফিরোজপুরের সমৃদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবল মাত্র কতকগুলি বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ ও কয়েকটি স্থাপত্য কীর্তি সুলতানী শাসনের যশগৌরব ঘোষণা করিতেছে।

নওয়াবগঞ্জ মহকুমার শিবগঞ্জ ও কানসাটের নীচে দিয়া প্রবাহিত পাগলা নদীর পশ্চিমাঞ্চলের ভূমি এই গৌড়ের সহিত সম্প্রসারিত। বাঙলার মুসলিম শাসন কৃষ্টি-সভ্যতাব ভিত্তি ভূমি এই গৌড়। এই গৌড়ের সহিত রাজশাহীর সংযোগ থাকায় গৌড়ের মুসলিম কৃষ্টি সভ্যতার আলোকে রাজশাহী যুগে যুগে আলোকিত হইয়াছিল। এই গৌড়, হইতে সুলতানী আমলের কয়েকটি স্থলপথ উত্তর বঙ্গের নানা স্থানের সংযোগ রক্ষা করিত। ইহিপূর্বেও আমরা সুলতানী আমলের দুইটি পথের কথা উল্লেখ করিয়াছি। উহার একটী পথ গৌড়ের ফিরোজপুর হইয়া রাজশাহীর রামপুর বুয়ালিয়া- বাঘা ও পাবনার চাটমোহর-মির্জাপুর স্পর্শ করত: বগুড়ার শেরপুর অতিক্রম করিয়াছে। আর একটী পথ গৌড় হইয়া পোরশার উত্তরে (হাপুনিয়ার আইল) দুয়ারপাল- মাহীগঞ্জ-জয়পুরহাট শিবগঞ্জ ছাউনি অতিক্রম করিয়া বগুড়ার পূর্বে গাবতলী থানার গড়ফতেপুর ও গড়দুর্গ হাটার দিকে গমন করিয়াছে। জনপ্রবাদে এই পথটি হোসেন শাহী পথ বলিয়া কথিত। গ্রীষ্ম প্রধান নদী মাতৃক এই জেলার প্রাকৃতিক ক্ষয় জনিত কারণে হিন্দুযুগের অট্টালিকাদির নিখুঁত কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তথাপি ইহার বরেন্দ্র অঞ্চলে হিন্দু শাসনের কিছু কিছু প্রাচীন নিদর্শনও রহিয়াছে। তাহা আগের অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখন আমরা প্রাগুক্ত সূফী সাধনা অধ্যায়ে প্রবেশ করিব।

সুলতানী আমলেব যোগাযোগ ব্যবস্থা

৫৩. Cunningham's, Vol XV

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

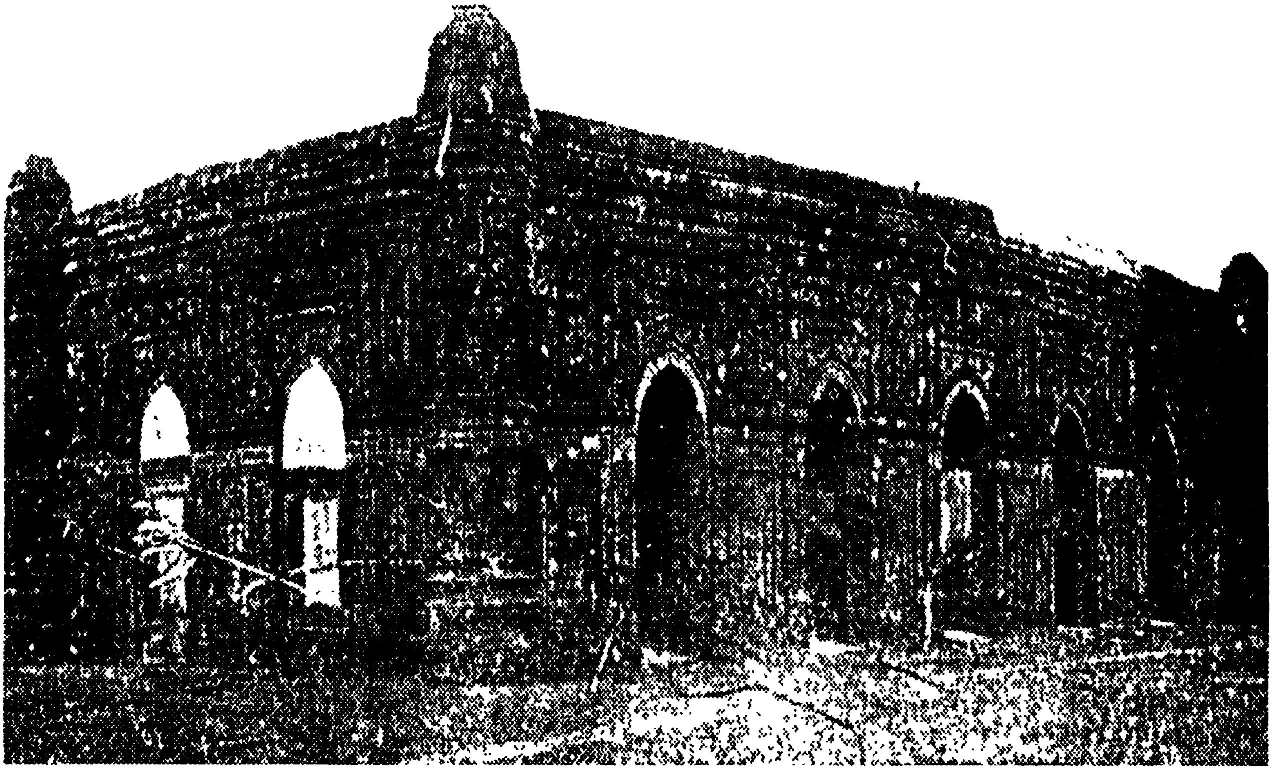
# সূফী সাধনা

এই যুগে পূর্ব্বে পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে ইসলাম প্রচারের প্রাচীনতম প্রচেষ্টার মধ্যে প্রথম পর্য্যয়ে আমরা বুয়ালিয়ার হজরত শাহ মখদুম রুহ্ পোষের কথা প্রসঙ্গে সুলতান বলখী মাহী সাওয়ারের উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচারের প্রাচীনতম প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে রাজশাহী সূফী সাধনার কাল হিসাবে ধরিতে গেলে মুসলিম বাঙলার স্বাধীন সুলতানদের আশ্রয়ে রাজশাহীতে যাঁহারা ইসলাম প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাঘার হজরত শাহ মৌলানা মোয়াজ্জিম দ্দৌল্লা দানিশ মন্দ্ নিঃসন্দে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। ইঁনি কেবল রাজশাহীতে নীরবে ইসলাম প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; বাজশাহীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এখনও যাঁহার জন্য রাজশাহীবাসী গৌরবান্বিত। ইঁনি কোন রাজা বাদশাহ্ ছিলেন না। দক্ষিণ হস্তে তরবারী বামহস্তে কোরাণ করিয়া রাজশাহীতে প্রবেশ করেন নাই। তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন ইসলামের বৈজয়ন্তী বাহকরূপে। ইঁনি ছিলেন একজন সংসার ত্যাগী ধর্মপ্রাণগত সিদ্ধ পুরুষ। ইঁনি স্বীয় গুরুর আদেশে সিদ্ধিলাভ মানসে আর্য্য অধ্যুষিত জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বঙ্গে শুভাগমন করেন। তারপর নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে গঙ্গা-পদ্মা-পুর্ণভবা -মহানন্দা-আত্রাই বিধৌত রাজশাহীর এই উষর ভুমিতে পদার্পন করিয়াছিলেন। মৌলানা সাহেবের ইসলাম প্রচারের প্রধান কেন্দ্র ছিল বাঘা। ইং ১৫২৩-২৪ সালে (হিজরী ৯৩০) সুলতান নশরৎ শাহর রাজত্বকালে (১৫১৯-'৩২ খ্রীঃ) নির্মিত বাঘার প্রাচীন শাহী মসজিদটি এখনও এতদাঞ্চলে তাঁহার ইসলাম প্রচারের কাহিনী ঘোষণা করিতেছে[৫৪]।

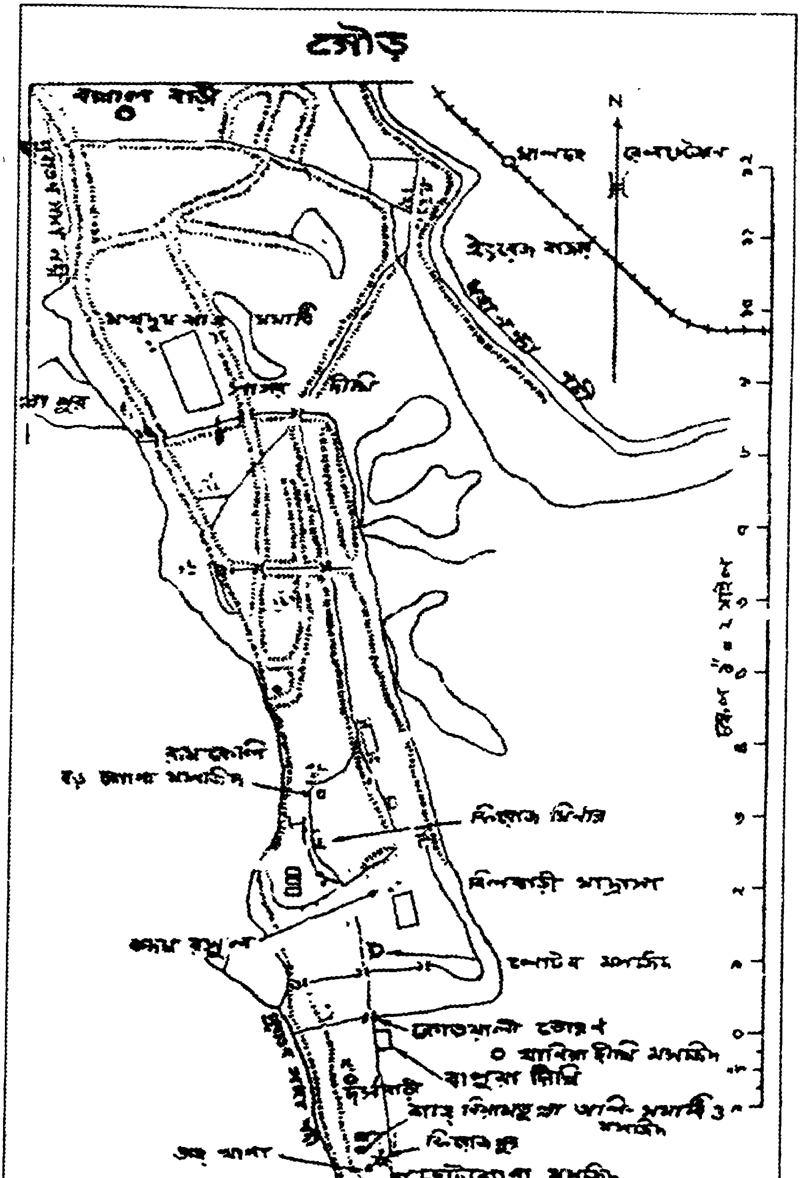
মৌলানা সাহেবের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মৌলানা শাহ হযরত হামিদ দানিশ মান্দ পিতার শূন্যস্থান পূর্ণ করেন। এবং তৎপুত্র মৌলানা শাহ আবদুল ওয়াহাব বংশ পরস্পরায় ইসলাম ও মুসলমানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া মুঘল বাদশাহ শাহজাহান কর্তৃক পরগণে ভাতুড়িয়া ও লস্করপুরে (বর্তমান লালপুর, চারঘাট নাটোর প্রভৃতি থানা) ১৯শে শাবাণ ১০৩৩ হিজরীতে (১৬২৩-২৪) মোট আট হাজার টাকা আয়ের বিয়াল্লিশটি মৌজা পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য মদদমাস লাভ করেন[৫৫]। মৌলানা আবদুল ওয়াহাবের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র মৌলানা মোহম্মদ রফিক ও শাহ নুরুল আরেফিনের মধ্যে পৈতৃক ভূ-সম্পত্তি বন্টন হয়। কনিষ্ঠ মৌলানা রফিক নিজ অংশ "রফিক-ই-ওয়াকফ্" নামে ১০৩৭ হিজরীতে (১৬২৭ খ্রীঃ ১ লা সেপ্টেম্বর) ওয়াকফ্ করেন। এই বংশই পুরুষানুক্রমে 'রইস-ই-বাঘার, পদ মর্য্যাদা পাইয়া আসিতেছিলেন। পাকিস্তান আমলে জমিদারী উচ্ছেদের ফলে ১৯৬১ সালে বর্তমান গদিনেশীন 'রইস'

৫৪. Inscriptions of Bengal, Vol IV PP 212 - 214

৫৫. রাজশাহী কালেকটারীতে মাহফুজ খানায় তায়েদাদের নকল দ্রষ্টব্য।



বাঘা মসজিদ




নকশাতে গৌড় পরিচয়

মোহম্মদ মণিরুল ইসলামের নিকট হইতে এই ওয়াকফ্ সম্পত্তি বেদখল হইয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ শাহ্ মোহম্মদ নূরুল আরেফিনের বংশধর বাঘার 'আয়মাদার' নামে খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু ভ্রাতৃ-কলহে এই 'আয়মাদার' বংশের পৈতৃক ভূ-সম্পত্তি অধিক দিন টিকিয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই।

**বাঘার প্রাচীনত্ব**

পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে ইসলাম ও মুসলমানের সেবক বঙ্গের স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩ - ১৫১৯ খ্রী:) বাঘার নিকট আলাইপুর ও মখদুমপুর আলাবখশ বরখুদার লস্করী নামক এক পাঠান জায়গীরদার সুলতান হোসেন শাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা আয়ের জায়গীর ভোগ করিতেছিলেন[৫৬]।

এই সময়ে মখদুম পুরের পশ্চিমাঞ্চলে পদ্মার তীর ধরিয়া জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে বাঘা বলিয়া কোন স্থান ছিল না। কেবলই শ্বাপদ সঙ্কুল জঙ্গলাকীর্ণ পদ্মা বিধৌত অঞ্চল। জন মানব শূন্য। হিংস্র জন্তু জানোয়ারের লীলাক্ষেত্র। ব্যঘ্র গর্জনে দিবারাত্র পথিক সর্বদায় শঙ্কিত থাকিত। এই অরক্ষিত অরন্য পশুপক্ষীর আবাস ভূমি কালে যে বঙ্গ দেশে একটি গৌরবময় স্থানে পরিণত হইয়া উঠিবে তাহা কে জানিত?

**মৌলানা শাহ দৌলার আগমন**

হোসেন শাহের রাজত্বে একদিকে যেমন শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্য সদানুষ্ঠানে প্রজাকুলের সুখ শান্তিতে এক নূতন পরিবেশে গৌড় বঙ্গে কর্ম কোলাহলের বাণ ডাকিয়াছিল অন্যদিকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ। ঠিক এই যুগ সন্ধিক্ষণে ৯২৪-২৫ হিজরীতে (১৫১৮-১৯ খ্রী:) বাগদাদ হইতে আগত একজন অজ্ঞাত ফকির পাঁচজন সঙ্গীসহ বাঘার দুর্ভেদ্য জঙ্গলে প্রবেশ করেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, যে জঙ্গলের নাম শুনিলে হৃদয় প্রকম্পিত হইত, সেই জন শূন্য অরণ্যে মানুষের প্রবেশ একথা প্রথমত: কেহই বিশ্বাস করিলনা। অবিশ্বাসীগণ কৌতূহল বশত: জঙ্গলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল; যাহারা হিংস্র জন্তু জানোয়ার পরিবেষ্টিত ফকিরের সাক্ষাৎ লাভ করিল তাহারা ধন্য হইয়া ফকিরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। অল্প সময়ের মধ্যে ভক্তবৃন্দের দ্বারা ফকিরের আস্তানা সরগম হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে জঙ্গল পরিষ্কার হইয়া জন বসতি গড়িয়া উঠিল। বাজার-বন্দর শিক্ষা-সংস্কৃতিতে এক নূতন পরিবেশে স্থানটির সুখবর দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িল, এইভাবে বাঘের আড়া বা হিংস্র জন্তু জানোয়ারের লীলাভূমি বাঘা বা কসবে বাঘার গৌরব লাভ করিল।

**বাঘা নামকবণ**

**আদিবংশ**

কথিত যে, এই বিখ্যাত ধর্মাচার্য্য ফকির হজরত শাহ মৌলানা মুয়াজ্জেম দৌল্লা দানিশ মান্দ বাগদাদের আব্বাসিয়া খেলাফতের মুকুট মণি হারুন-অল-রশীদের বংশক্রম। তাঁহার পিতা শাহ্ মুহাম্মদ আব্বাস একজন জবরদস্ত আলেম ও বুজর্গ ছিলেন[৫৭]।

প্রাগুক্ত মখদুমপুরের লস্করী আলাবখশ বরখুদারের অনূঢ়া অনিন্দ সুন্দরী জেব-উন-নেছা নাম্নী এক কন্যা ছিল। মৌলানা সাহেবকে শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত ও কামেল দরবেশ জানিয়া জেব-উন- নেছা তাঁহার সহিত পরিণয়ে আবদ্ধ হন[৫৮]। শাহজাদী জেব-উন-

৫৬. J A. S. B M I. P 108. 1904.

৫৭. J A S. B. Pt I, No, I, 1904-P 108.

নেছার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আর্থিক অবস্থার প্রভূত উন্নতির আশা থাকিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। ফকিরীবেশে ইসলাম ও মুসলমানের সেবাই তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল।

মৌলানা সাহেবের ঔরসে জেব-উন- নেছার গর্ভে পর পর চারি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। মৌলানা হামিদ দানিশ মান্দ তাঁহাদের অন্যতম। হজরত শাহ দৌল্লা ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি একটি মক্তব ও খানকা প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। শাহদৌল্লার জীবদ্দশায় বাগদাদ হইতে আগত মৌলানা শের আলীকে উক্ত মক্তবের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হজরত মৌলানা হামিদ দানিশ মান্দ পিতার উপযুক্ত পুত্র। তাঁহার নানা অলৌকিক ক্রিয়া কলাপের কথা শুনিয়া গৌড়ের সুলতান নশরৎ শাহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সেখানে দীন ইসলাম প্রচারার্থে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনা (হিজরী ৯৩০) করেন। মৌলানা হামিদ দানিশ মান্দ বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত জড়িত ছিলেন। তিনি পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মক্তবকে কলেজে (মাদ্রাসায়) পরিণত করিয়াছিলেন। বিভিন্নস্থানে ইসলাম প্রচারক প্রেরণ করিয়া ইসলাম বিস্তারে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার বুজর্গীতে বহু হিন্দু মুসলমান হইয়াছিল। শতাধিক আয়ু ভোগ করিয়া তিনি পরলোক গমন করেন[৫৯]।

বাঘার মদদ মাস প্রাপ্তির ব্যাপারে নানা গল্প প্রচলিত আছে। বাঙলা দেশে মদদ মাসগুলির সংখ্যায় দেখা যায়, বাদশাহ শাহজাহান কর্তৃক প্রদত্ত মদদ মাসের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী।

জনশ্রুতির একটি গল্প এইরূপ, যুবরাজ শাহজাহান (পরে বাদশাহ শাহজান) পদ্মা বাহিয়া ঢাকা গমনের পথে পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং পথি মধ্যে একজন ফকিরের খ্যাতির কথা জানিতে পারিয়া বাঘার নিকট নোঙ্গর করেন। তারপব তিনি

মদদ মাস ও লাইব্রেরী

ফকিরের আস্তানায় গমন করিয়া তাহার পীড়ার কথা ফকিরকে বলেন। অত:পর ফকির অর্থাৎ হামিদ দানিশ মান্দের দোয়ায় তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। ইহাতে যুবরাজ খুশী হইয়া তাঁহার ভরণ পোষণ নিমিত্তে কিছু ভূ-সম্পত্তি দান করিতে চাহিলে তিনি নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার তৃতীয় পুত্র এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিলে যুবরাজ তাঁহার নামে (মৌলানা আবদুল ওয়াহাবকে) বিয়াল্লিশটি মৌজা মদদ মাস স্বরূপ ঘোষণা করেন। পরে তিনি দিল্লীর বাদশাহরূপে সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর উপযুক্ত সনদ প্রদান করেন[৬০]।

প্রাগুক্ত মক্তব মাদ্রাসা মৌলানা হামিদ দানিশ মান্দের সময়ে খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বহু ছাত্র দেশ বিদেশ হইতে সেখানে আসিয়া দারসে নিজামি নেছাবে আরবী, ফারসী, কোরাণ, হাদিস, ফেকাহ, ওসুল প্রভৃতি শিক্ষা করিত। সম্ভবত: তখন বাঘার এই মদদ মাস হইতে মাদ্রাসা ও শিক্ষার্থীদের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হইত[৬১]। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে আসিয়া এই মদ্রাসার অগ্রগতির অবনতি ঘটিতে থাকে। বাঙলা ১৩০৪ সালের (১৮৯৭ খ্রী:) ভূকম্পনে মাদ্রাসা গৃহ ধ্বসিয়া পড়িয়া গেলে

৫৮. Five thousand years of Pakistan, P 118

৫৯. Bengal Past and Present, 1928 p 143

৬০. Rajshahi Gazetteer, PP 155-156

৬১. Bengal past and present, Vol XXXV, pt. 11. Serial No 70.

চিরতরে সেখানকার দর্স বন্দ হইয়া যায়। ১৮৩০ সালে বাঙলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের একটি সরকারী বিবরণে বাঘার মাদ্রাসার উল্লেখ আছে। তখন সেখানে পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্য ৪৮ জন ছাত্র এবং আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য মাত্র ৭ জন ছাত্র অধ্যয়নে রত ছিলেন। পারস্য ভাষা শিক্ষাদানের জন্য অধ্যাপকের মাসিক বেতন ৮ টাকা এবং আরবী ভাষার জন্য একজন মৌলানার মাসিক বেতন ধার্য্য ছিল ৪৫ টাকা। ইহাতে অনুমতি হয়, তখন মাদ্রাসার অবস্থা অবনতির দিকে যাইতেছিল। বিজাতীয় শিক্ষা বিভাগীয় পরিচালক মিঃ য়্যাডামের মন্তব্যে মাদ্রাসার উন্নতি হয় নাই। বরং ক্ষতি হইয়াছিল[৬২]। শোনা যায় বাঘার রইস খোন্দকার ফয়জুল ইসলামের প্রচেষ্টায় উক্ত মাদ্রাসার সংলগ্ন একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাতে সহস্রাধিক হস্তলিখিত আরবী ফারসী ও বাঙলা প্রভৃতি দুস্প্রাপ্য কেতাবপত্র ছিল। উক্ত ভূমিকম্প বাঘার অন্যান্য সৌন্দর্য্য বিনষ্টের সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরীটি ও বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই সময় বাঘার রইস মৌলবী আমিরুল ইসলাম বাঘার মায়া ত্যাগ করিয়া রাজশাহী শহরে সিপাইপাড়া (বর্তমান স্থানে) স্বীয় বাড়ী নির্মাণ করেন।

বর্তমানেও বাঘার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অতীব মনোরম। এখানকার ভূমি পদ্মাচরে গঠিত বলিয়া উর্বরা শক্তি খুব বেশী। নানা প্রকার রবিশস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ফলের মধ্যে এখানকার আম, কাঁঠাল ও লিচু বিখ্যাত। আমের ফসলের দ্বারা স্থানীয় কৃষকগণ ৬ মাসের খোরাক সংগ্রহ করে। কিছু কিছু নারিকেলের চাষও আছে। আগে এখানে প্রচুর পরিমাণে তুতের চাষ হইত। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে সবুজ ছায়া ঘেরা বাঘা ধনে ধান্যে জ্ঞানে গর্ভে মহিমা মণ্ডিত ছিল। নানাবিধ ফল ফুলের বৃক্ষাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত বাঘা সরোবরের চারি পাড়ের অপরূপ শোভা বর্দ্ধন করিত। দীঘির চারিপাশে ঘন বসতি ছিল। দেশ বিদেশ হইতে পর্যটক, প্রচারক সেখানে যাতায়াত করিত। এই সময় শত বর্ষ আয়ুষ্কাল ভোগকারী হামিদ দানিশ মান্দ শিষ্যবর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া উত্তর বঙ্গে ইসলাম বিস্তারে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন[৬৩]।

১৬০৯ সালে বাঘা

বাঘার বর্তমান দর্শনীয় দ্রষ্টব্যের মধ্যে সুলতান নশরৎ মসজিদ, রইস পরিবারের পর্দ্দানেশীন মহিলাদের প্রাচীন অন্দর মহলের ধ্বংসস্তূপ, দীঘি, হজরত হামিদ দানিশ মান্দ এবং তদীয় ওয়ালেদ হজরত মুয়াজ্জেম দৌল্লা ও পাঁচজন সঙ্গীর সমাধি, এবং মৌলানা শের আলী সহ আরও বহু পীর আউলিয়ার আস্ত ানা সমাধি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাঘার দর্শনীয় দ্রষ্টব্য

মৌলানা আবদুল ওয়াহাব হইতে বাঘার পীর পরিবারে একটি নিজস্ব বাংলা সন ব্যবহার হইত। প্রতি বৎসরে অগ্রহায়ণ মাস হইতে ইহা আরম্ভ হইত। বাঘা লাখেরাজের খাজনা আদায় ব্যাপারে এই 'মুলকী সনেব' প্রবর্তন হইয়াছিল।

বাঘা সাধারণত: চারিভাগে বিভক্ত ছিল। (১)-কসবে বাঘা, (২)-মুলকী বাঘা, (৩)-ঢাকা বাঘা, (৪)- বাজু বাঘা। আগে প্রতি বৎসর ১লা রমজান হইতে ঈদল ফেতরের দিনে ঔরস পর্য্যন্ত একটি মেলা অনুষ্ঠিত হইত[৬৪]। দেশ বিদেশ হইতে নানা প্রকার সামগ্রী জিনিষ পত্র কেনা কাটা

বিভাগানুসারে বাঘা ও ঔরস

---

৬২. Mr Adam's Report on education in 1830

৬৩ J A. S B, part, I. P 108 1904.

৬৪. Vide-Hunter's statical account of Rajshahi and Rajshahi district gazetteer.

হইত। রাজশাহী জেলায় মুসলমানী পর্বের ইহাই একমাত্র অনুষ্ঠান আজও চলিয়া আসিতেছে। এই সময় স্থানীয় পীর আউলিয়াদের সমাধি জিয়ারতের খুব ভিড় হইত। এখন প্রতি বৎসরান্তে ঈদল ফেতরের দিন হইতে ইহা দুইদিন মাত্র স্থায়ী থাকে এবং ঔরস অনুষ্ঠিত হয়। মৌলানা শাহ মোহাম্মদ রফিক হইতে মৌলবী খন্দকার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম পর্য্যন্ত ১৪ জন বাঘার 'রইস' পদের গৌরব লাভ করেন।

পরিশেষে বাঘা

পরিশেষে বাঘা প্রসঙ্গে এতটুকু না বলিলে সাধারণ্যের সংশয় উপস্থিত হয়। বাঘা পরিবারে মদদ মাস প্রাপ্তি ও ভোগ দখলকারীদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য ইসলাম প্রচাবক দৃষ্ট হয় না। ভ্রাতৃ কলহে বহু সময় বাঘা পরিবারে অশান্তি বিরাজ করিত। মোতয়ালীগণের মধ্যে অনেকেই ত্যাগীর চেয়ে ভোগী ছিলেন। বর্তমান রইস (মৌলবী মনিরুল ইসলাম খান্দকার বি, এ.) বাঘার পূর্ব গৌরব পুণরুদ্ধারের জন্য কিছুদিন যাবৎ প্রাণপন চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছেন।

অন্যান্য সুফী দরবেশ

বাঘার পীর দরবেশকে কেন্দ্র করিয়া বহু সূফি দরবেশ এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের সমাধি এতদঞ্চলে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। তাঁহারা যে নামে খ্যাত ছিলেন আজও সেই নামে কথিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের কাহারও সমাধি ইষ্টক দ্বারা নির্মিত, আর কাহারও বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহাদের মধ্যে (চারঘাট, লালপুর ও বাগমারা প্রভৃতি থানা) কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সাধকের নাম এখানে উল্লেখ করিব।

১. বোগদাদী দরবেশ :- মসজিদ চত্বরের বাহিরে দীঘির সিঁড়ির পূর্ব উত্তর কোণে প্রাচীর বেষ্টিত দুইজন দরবেশ সমাহিত আছেন। ইঁহারা "বোগদাদী" নামে খ্যাত। ২. জহর খাঁকী পীর ও মসজিদ:- এই মসজিদের বারান্দায় সমাহিত পীর সাহেব নাকি চৌদ্দ তোলা জহর (বিষ) পান করিয়া দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন বলিয়া জহর খাকী নামে প্রসিদ্ধ। ৩. মস্তান শাহ:- বাঘার চকে ইহার সমাধি আছে। ইঁনি একজন জবরদস্ত কামেল ফকীর ছিলেন। ৪. লোহা শাহ :- ইঁনি নাকি অগ্নিদগ্ধ লৌহদন্ড চিবাইয়া হজম করিতেন। বাঘার এক মাইল পূর্বে একটি দোচালা ঘরে ইঁহার সমাধি আছে। ৫. কাজী সাহেব :- চান্দা বাড়ীতে ইঁনি সমাহিত আছেন। ৬. সূফী বাগু দেওয়ান :- বিনোদ পুরে ইহার সমাধি আছে। ৭. সেখ লবুদেওয়ান :- ইঁনি বাঘার সংস্পর্শে থাকিয়া পরবতীকালে একজন

বাঘার চারিপার্শ্বের পীর দরবেশ

জবরদস্ত সাধক হইয়া উঠিয়াছিলেন। আড়ানীর অদুরে ইহার সমাধি রহিয়াছে। ৮. বদর শাহ পীর :- ইঁনি 'বদর' নামে খ্যাত ছিলেন। রাধাকৃষ্ণপুরে ইঁহার সমাধি রহিয়াছে। ৯. গাঁজাপীর :- ইঁনি অত্যন্ত গাঁজাপায়ী ছিলেন। নওয়াবী আমলে ইঁহার আবির্ভাব কাল ধরা হইয়া থাকে। স্থানীয় লোকেরা ইঁহাকে কল্কী অবতার বলিত। এখনও তাঁহার করবে অশিক্ষিত লোকেরা গাঁজার চিলুম দিয়া থাকে। ১০. পাগল মা :- ইঁনিও নাকি উক্ত কল্কী অবতারের সমসাময়িক ছিলেন। ইঁনি জানানা পীর কিন্তু সাধারণ্যে পাগল মা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। পাকুড়িয়া গ্রামের এক নির্জন স্থানে বৃক্ষাদি পরিবেষ্টিত তাঁহার সমাধি রহিয়াছে। এতদঞ্চলে তাঁহার নানা কিরামতির জনশ্রুতি প্রচলিত। প্রতিদিন তাঁহার কবরে ভোগ ও শিল্পী পড়িয়া থাকে। ১১. ন্যাংশা :- উনি ঘোড়া পীর নামে পরিচিত। ইঁহার সমাধিতে একরাশ পোড়া মাটির ঘোড়া রহিয়াছে। ইঁনি নাকি ল্যাংড়া ছিলেন। এতদব্যতীত কথিত অঞ্চলে আরও পীর আউলিয়ার সমাধি রহিয়াছে। কিন্তু এই সবের প্রবল জনশ্রুতির অভাব।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

# চৈতন্যযুগের রাজশাহীতে ইসলাম প্রচার ও তাহার রূপ

## (ষোড়শ হইতে সপ্তদশ শতক)

বাঙলা দেশে হোসেন শাহী যুগে শ্রীচৈতন্য দেবের (১৪৮৬ - ১৫৩৩ খ্রী:) আবিভাব। চৈতন্য দেবের আবির্ভাবে উত্তর বঙ্গে বৈষ্ণব প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে ইসলাম ধর্মে বিশেষত: নব দীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে বহু মুসলমান বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আবার সূফীদের পাল্টা অভিযানে বহু বৈষ্ণব এবং হিন্দু মুসলমান হইয়াছিল। ইসলামের সুমহান শক্তি দিকে দিকে বিস্তৃত হইলে এতদঞ্চলের বৈষ্ণব প্রচার কেন্দ্র চিরতরে নিভিয়া যায়।

গৌড় দেশে ইসলাম বিস্তারের প্রতিক্রিয়ারূপে বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা ঐতিহাসিক সত্য। গৌড়ের কেন্দ্র রামকেলীর প্রচারকগণ যথা–নিত্যনন্দ, অদ্বৈতাচার্য, নরহরি সরকার প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ এবং পরবর্তী কালে রাজশাহীর খেতুরী গ্রামে (পদ্মা তীরস্থ প্রেমতলীর সন্নিকট) নরোত্তম দাস দত্ত প্রমুখের (১৫৩১-১৬১১ খ্রী:) আবির্ভাব। তাঁহাদের দ্বারা উত্তর বঙ্গে বৈষ্ণব মতের ক্রমোন্নতি হইতে থাকিরে মুসলমানদের মধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বলাবাহুল্য এই যুগে রাজশাহী নিবাসী পরম বৈষ্ণব কালা পাহাড়ের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও তাহার প্রতিক্রিয়ায় তাবৎ হিন্দু দেব দেবীর মূর্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল। বৈষ্ণব ভক্ত ও ব্রাহ্মণগণ নানাভাবে নির্য্যাতিত ও উৎখাত হইয়াছিল। ধর্মভীরু মুসলমানগণ অনেক সময় বৈষ্ণব সাধুদের তাড়া করিয়া গাঁ ছাড়া করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাহাদের প্রতিমা, ভাগবৎ, তুলসী ও সাধুগণকে কোন ক্রমেই আমল দিতেন না। সমসাময়িক বিভিন্ন সাহিত্যে তাহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। সূফী প্রভাবের ডক্টর বিখ্যাত মুহম্মদ এন্-আ-মূল হক তাঁহার রচিত কয়েকখানি গ্রন্থে এতদবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিয়াছেন। আজিকার মুসলমান সমাজে তাহা অতি উপাদেয় সামগ্রী।

যেহেতু কালাপাহাড়ের মত বীর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দু ধর্মের অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। সেই হেতু হিন্দু লেখকগণ কর্তৃক তাঁহার চরিত্র বিকৃত হওয়া স্বাভাবিক। তাই, আমরা দেখিতে পাই, কোন কোন হিন্দু ঐতিহাসিক জাতি ক্রোধের শ্লেষের অনুরোধেই হউক, আর স্বইচ্ছায়ই হউক, কালাপাহাড়ের জীবনেতিহাস নানাভাবে বিকৃত করিয়াছেন। প্রকৃত তথ্য যাচাই করেন নাই। তাহাদের মতে সুলায়মান কররানীর অনুঢ়া অনিন্দ সুন্দরী এক কন্যা ছিল। সে কালাপাহাড়ের রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া প্রেমাসক্ত হইয়া পড়ে। কালাপাহাড় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া তাহাকে বিবাহ করেন ইত্যাদি। অথচ কালাপাহাড়ের চরিত্রে অনুরূপ কোন কলঙ্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি ইসলামের দর্শন তত্ত্বে প্রবেশ করিয়া হিন্দু ধর্মের 'মূক প্রতিমা পূজা' নিষ্ফল জ্ঞান করিয়া পাক-ভারতে ইহার উচ্ছেদ সাধনার্থে ধ্বংস অভিযান চালাইয়াছিলেন।

রাজশাহী জেলার তানোর থানার অন্তর্গত বীরজোয়ান গ্রামে কালা পাহাড়ের আদি

নিবাস। পরগণে ভাতুড়িয়ার এক ক্ষুদ্র জমিদার প্রাণকৃষ্ণ ভাদুড়ী। তাহার চারিপুত্র। জগানন্দ তন্মধ্যে একজন। কালাপাহাড় এই জগানন্দের বংশক্রম। কালাপাহাড়ের বাস্তুভিঁটার এই ধ্বংস স্তূপে এখনও একটি শিবলিঙ্গ বাঁশের ঝাড়ে জীর্ণাবস্থায় পড়িয়া আছে। এই শিবলিঙ্গ গৌড়ী পাঠের গায়ে সংস্কৃত ভাষায় 'শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভাদুড়ী' কথা লিখিত আছে। হোসেন শাহের রাজকর্মচারী বা "গৌড় অধিকারী" সুবুদ্দিখাঁ কালাপাহাড়ের পূর্ব পুরুষ। রাজশাহী খাঁজুরা নিবাসী খাঁ গণ কালাপাহাড়[৬৫] ও সুবুদ্দি খাঁর-উত্তর পুরুষ বলিয়া দাবী করেন। এই বংশের শ্রী সচীন খাঁর* নিকট হইতে আমরা কালাপাহাড়ের বিষয়ে আরও কিছু তথ্য অবগত হইয়াছি। অকালে পিতৃ বিয়োগ হইলে কালাপাহাড় বাঁকুড়া জেলার সোনামতি গ্রামে মাতামহের নিকট লালিত পালিত হন।

কাঁলাচাঁদপাঁড়ে বা কালাপাহাড় তাঁহার পরবর্তী নাম। তিনি যুদ্ধ বিদ্যার সুযোগ লাভ করিয়া সামান্যাবস্থা হইতে সুলায়মান কররাণির সেনাপতির পদ লাভ করিয়াছিলেন। সুলায়মান্ কররাণি (১৫৬৪-১৫৭২ খ্রীঃ) ও দাউদ শাহের (১৫৭২-১৫৭৬ খ্রীঃ) রাজত্ব কালে তিনি বীর্য্যবর্তায় খুব খ্যাতি অর্জন করেন। কালাপাহাড় সেনাপতি হিসাবে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, গৌড় ও আসামের কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ কবিয়াছিলেন[৬৬]। 'লঘু ভারত'[৬৭] হইতে আমরা অবগত হইতে পারি যে, কালাপাহাড় হিন্দু প্রতিমাদি ও ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া পাক-ভারতের নানা স্থানে বহু দেবমন্দির ধ্বংস করত: তদস্থ মূর্তি গুলি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, বাঙ্লা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের একটি মন্দিরও অক্ষতাবস্থায় ছিল না। বৈদ্যনাথ, কাশীর বিশ্বনাথ ও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের কাষ্ঠ নির্মিত মূর্তিও অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল।

এই যুগে বৈষ্ণব বিরোধী বহু সূফী দরবেশ রাজশাহী জেলার শুভাগমন করেন এবং বৈষ্ণবদের কবল হইতে মুসলমানগণকে উদ্ধার করিয়া ইসলামী ভাবধারায় ফিরিয়া আনিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। যাঁহারা বৈষ্ণব মতের বিরুদ্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা নগন্য ছিল না। জনশ্রুতির আশ্রয়ে আমরা এখানে তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জনের একটি তালিকা পেশ করিব।

মোকাররম শাহ :--ইনি নরোত্তমের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আবির্ভূত হইয়া নরোত্তম বা নিমাইয়ের সাধন পীঠ খেতুরের দেড়মাইল পূর্বে নরোত্তমের পৈতৃক বাড়ীর বাস্তুভিটার সন্নিকট কুমারপুরে আস্তানা করেন। এবং এখানেই তিনি সমাহিত হন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সমসাময়িক কালে বহু সুফী দরবেশের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে পদ্মার তীরে আঁধার কোঠার (খোলাবনা), বুড়াপীর; দামকুড়া হাটের নিকট আজগবী তলায় খাড়ী নদীর তীরে সমাহিত 'জংলী পীর' অন্যতম। ইঁহাদের নামে কিছু লাখেরাজ আছে।

পীর গহর উদ-দীন ও পীর সদর উদ-দীন :- পত্নীতলা থানার সন্নিকট নজীপুর নদী বন্দর। এই নজীপুর বন্দর হইতে দক্ষিণে দেড় মাইল দূরে কাঞ্চনে-পীর গহর-উদ-দীনের সমাধি এবং ইহার অদূরে কাঁটাবাড়ী বন্দরে তদীয় ভ্রাতা পীর সদর-উদ-দীনের

---

৬৫. গৌড়ের ইতিহাস (মুসলমান পর্বব), পৃঃ-১২২-১২৩।

* ১৩৭১ সালে শ্রাবণ মাসে ২৬শে তারিখে খাঁ মহাশয় পরলোক গমন করেন।

৬৬. J. A. s B. old series, Vol LXIX. P. 189. 1900, Gait History of Assam, p p. 52-53

৬৭. 'লঘুভারত, ১৭২-৭৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য (তৃতীয় পবর্ব)।

সমাধি অবস্থিত...। এই ভ্রাতৃদ্বয় এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচারার্থে আগমম করিয়া বহু কাফেরকে ইসলামে দীক্ষিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, এই যুগল ভ্রাতাদের আগমনের পরের দিনে–পত্নী তলাস্থিত একটি বৈষ্ণব কেন্দ্রের প্রচারকগণকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এখনও তাঁহাদের খোল-করতালের জনশ্রুতি মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়। পীর গহর উদ-দীনের নামে কাঞ্চন গ্রামে বহু ভূ-সম্পত্তি লাখেরাজ আছে। এই পীরের সেবাইত বংশধরগণ কাঞ্চনের দীঘির পাড়ে বসবাস করেন। গহর পীরের সমাধিতে প্রতি বৎসর একটি ঔরস অনুষ্ঠিত হয়।

'পীর মুল্লক্ জাহান :–ইনি সাধারণে 'মুল্লক্জান' নামে খ্যাত। শোনা যায়, পোরশা থানার অদূরে-বিষ্টুপুরে অবস্থিত এই পীরের সমাধির সন্নিকটি একটি বৈষ্ণব প্রচার কেন্দ্র ছিল। এই কেন্দ্রের প্রচারকগণ পীর সাহেবের সহিত ধর্ম শাস্ত্রে তর্কে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। এই ঘটনার পর স্থানীয় বহু রাজবংশী ও হিন্দু তাঁহার হাতে বায়াত হইয়া মুসলমান হয়। তাঁহার সমাধি সৌধের প্রবেশ দ্বারের শিলালিপিটি উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই।– বহু প্রস্তর খণ্ড ইতস্তত: পড়িয়া আছে। এখানেও কিছু পীরপাল রহিয়াছে। এখানে বৎসরান্তরে একটি 'ঔরস' অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় চারুচন্দ্র বর্মন নামে জনৈক রাজবংশী ইঁহার বর্তমান সেবাইত।

মোল্লা আতা (?) :- ইঁনি একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব বিরোধী ছিলেন। ইঁহার সমাধি প্রাঙ্গনে বিরাট 'ঔরস' অনুষ্ঠিত হয়। নজীপুর বন্দরের কয়েক মাইল পশ্চিমে গগনপুরে মোল্লা আতা অথবা মৌলনা আতার সমাধি অবস্থিত। পশ্চিম দিনাজপুরাধীন গঙ্গারাম-পুর-দমদমার মৌলানা আতার সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা অনুসন্ধান যোগ্য।

মাহিসন্তোষ :–এখানকার মা ও তদীয় কন্যার সমাধি বিখ্যাত। এখানে প্রতি বৎসরে একটি 'ঔরস' অনুষ্ঠিত হয়। ধামৈর হাট থানা হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে ইহা অবস্থিত।

সুলতান সাহেব ও ঝন্‌ঝনিয়ার পীর সাহেব :–স্থানীয় লোকেরা এই সূফীদ্বয়ের নানা কিরামতির কথা বর্ণনা করিয়া থাকে। সুলতান সাহেবের মাজারে প্রতি বৎসরে 'ঔরস' ও মেলার অনুষ্ঠান হয়। গোদাগাড়ী থানার পশ্চিমে সুলতানগঞ্জে এই পীরদ্বয়ের সমাধি রহিয়াছে। সুলতান সাহেবের নামানুসারে এই স্থানের নাম সুলতানগঞ্জ হইয়াছে।

বড়পীর :– ইঁনি আমনুরা অঞ্চলে ধর্ম প্রচার করিয়া এখানেই সমাধিস্থ হইয়াছেন; এখানকার দরগা পুকুরের তীরে তাঁহার সমাধি রহিয়াছে।

বিড়ালদহের পীর :–ইঁনি নাকি একজন জবরদস্ত আউলিয়া ছিলেন। এতদঞ্চলে নানা কিরামৎ দেখাইয়া তিনি ইসলাম প্রচার করিতেন। তাঁহার সাধন পীঠাটি এখনও অভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। পরবর্তীকালে সেখানে একটি মসজিদ বিনির্মিত হয়; তাহা বর্তমান আছে।

সদাই ফকির :–কথিত আছে যে, ইঁনি রহনপুর অঞ্চলে বহু বৈষ্ণব ভজাকে মুসলমান করিয়া স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রহনপুরের বাজারে তাঁহার সমাধি রহিয়াছে। তিনি নাকি একজন সওদাগর ছিলেন।

বদলগাছি থানার বিখ্যাত 'শাবুদশাহ' একজন কামেল দরবেশ ছিলেন। কথিত আছে যে, ইঁনি সুলতান নশবৎ শাহের রাজত্বকালে এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে ব্রতী

হইয়া কয়েকটি ব্রাহ্মণ পরিবারকে ইসলামে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। স্থানীয় হিন্দু জমিদারগণ তাঁহার সম্মানার্থে সমাধিতে চেরাগদান ইত্যাদি ব্যাপারে বহু ভূ-সম্পত্তি লাখেরাজ দিয়াছিলেন। বদলগাছির বাজারে তাঁহার সমাধি আছে।

পাঁচ পীর :–বাগমারা থানায় আছিন ঘাট মৌজায় কয়েক জন পীর আউলিয়ার কথা শোনা যায়। হাস্‌নিপুনের পাঁচপীর তাঁহাদের অন্যতম। এরূপ 'পাঁচপীরের' দরগা পূর্ব্ব পাকিস্তানে আরও কয়েক স্থানে আছে। রাজশাহী জেলাতে কুমারপুরের নিকট আর এক 'পাঁচপীরের' দরগা পদ্মাগর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। আছিন ঘাটের 'পাঁচপীর'– যথাক্রমে গিয়াস উদ-দীন, সামসুদ্দীন, সিকেন্দার, কালু ও গাজী নামে পরিচিত। ইঁহাদের নানা মাহাত্ম্যের কথা শোনা যায়। কিন্তু, প্রকৃতই ইঁহারা 'পাঁচপীর' কিনা কে তাহার উত্তর দিবে? তবে আছিনঘাট যে এককালে একটি নগর দুর্গ ছিল তাহা আমরা অন্যত্র দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এখানকার 'পাঁচপীরের' মধ্যে মাত্র দুইটি সমাধি দৃষ্ট হয়।

বলিয়া সাহেব :–নওয়াবগঞ্জ টাউনের পশ্চিমে (মহানন্দার তীবে) 'বলিয়া সাহেব' নামক একজন দরবেশের নানা মাহাত্মের কথা শোনা যায়। বোধ হয় ইঁনিও একজন সাধু তাড়াণ ফকির ছিলেন।

আলোচ্য সূফীদরবেশদের সমাধি গুলির কোন কোনটি প্রস্তর নির্মিত, কোনটি ইষ্টকাবৃত্ত সৌধে অবস্থিত। জনশ্রুতি মূলে ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ফলে আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, আনুমানিক ষোড়শ হইতে সপ্তদশ শতকের মধ্যে আলোচ্য ইসলাম প্রচাবকদের কাল নির্ণয় করা যায়। গৌড় দেশের অন্যান্য স্থানের মত রাজশাহীতে যদিও তেমন কোন ঘটনা ঘটে নাই তথাপি ভাবাবিষ্ট হইয়া যে দুই চাবিজন মুসলমান পরিবার বংশ পরম্পরায় কিছুদিন আগেও বৈষ্ণব ভজা ছিল, পাকিস্তান যুগে তাহাদের বংশধরগণ খাঁটি মুসলমানের দাবীদার রূপে পরিচিত হইবাব চেষ্টা পাইতেছে। একটু পরেই সেই গৌরাঙ্গ ভক্ত মুসলমানদের সম্বন্ধে ২।১টি কথা পেশ করিব।

আলোচ্য সূফী দরবেশদের পরিচিত মূলক কোন তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব না হইলেও তাহাদের সম্পর্কে যে সব জনশ্রুতি রহিয়াছে তাহা অনেকাংশে ঐতিহাসিক তথ্যের মতই অকাট্য। প্রাগুক্ত মোকরারম শাহের সমাধিতে, সুলতান সাহেবের আস্তানায়, ঝনঝনিয়া পীরের সমাধিতে তিনটি আরবী শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এই লিপি তিনটির সহিত উক্ত দরবেশদের কোন সম্পর্ক নাই। সম্ভবত: অন্যত্র হইতে আনিয়া তাঁহাদের সমাধিতে স্থাপন করা হইয়াছিল। এই লিপি এর স্থানীয় বরেন্দ্র মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

সুলতানগঞ্জের লিপিটিতে সুলতান সামস্ উদ-দীন ইউসুফ শাহের রাজ্য কালে জনৈক খান মুয়াজ্জেম উলুগ সূফী খান কর্তৃক (১৪৭৪ খ্রী:) একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার তারিখ উৎকীর্ণ আছে। অপর একটি লিপি সুলতান জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহের রাজ্যকালের। ইহা বোধ হয় সুলতান গঞ্জের অদূরে (পূর্বধারে) উল্লিখিত ঝনঝনিয়া পীরের সমাধি সৌধ হইতে খুলিয়া আনা হইয়াছিল। এই সমাধিটিও বেশ সমৃদ্ধ। কিন্তু তাহা একটি কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে অরক্ষিত রহিয়াছে। মোকাররম সাহের লিপিটির কথা তো আগেই উল্লেখ করিয়াছি[৬৮]।

রাজশাহী জেলার খেতুরী নিবাসী নরোত্তম ঠাকুরের 'পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্ত' সরকার বাজুহার অন্তর্গত গড়েরহাট পরগণার জমিদার ছিলেন। কৃষ্ণানন্দের সহিত গৌড়ের

৬৮. Inscription of Bengal, Vol. IV, P P. 94-96.

সুলতানের অন্তরঙ্গতা ছিল। নরোত্তম পিতার একমাত্র সন্তান। আজন্ম মুসলিম প্রভাবের মধ্যে প্রতি পালিত হন। তাই হয়ত তিনি পরম বৈষ্ণব হইয়াও মুসলমানদের কথা ভুলিতে পারিয়াছিলেন না। খেতুরীতে অবস্থান কালে তিনি স্থানীয় কোন এক বাড়ীতে সর্প তাড়াইয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এই সময় খেতুরীতে সংকীর্তনাদি হইত। তখন হয়ত তাহার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কিছু সংখ্যক মুসলমান বৈষ্ণব মত গ্রহণ করিয়া থাকিবে[৬৯]। তাহারা নামে মুসলমান হইলেও ভাবে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিল। বড়াই গ্রাম, চারঘাট ও তানোর থানার কর্ত্তাভজা ও গুরুসত্য ফকির বা পীর নামে কথিত গেরুয়া বেশাধারী কতিপয় মুসলমান পরিবার বোধ হয় এই শ্রেণী ভুক্ত ছিল। ইহারা মুসলমান বটে, মুসলমানী আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির বিপরীত কার্য্যকলাপ করিয়া থাকে। হাতে কুশা বা কিস্তি, চিমটা, লইয়া যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। হাটে বাজারে একতারা বাজাইয়া গান করে। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে নানা কিরামতির কথা শুনাইয়া শিষ্যবৃত্তি করিয়া বেড়ায়। বদ্ধঘরে দলবদ্ধ হইয়া গুরুশিষ্য ও শিষ্য পরিবেষ্টিত থাকিয়া নানা প্রকার নৃত্য ও গীত গান করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বসন চুরি এবং লীলাও হয়। বয়স্কদের মধ্যে নাকি নিজেদের প্রস্রাব পানীয় রূপে পান করে। মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় সমাধি রচনা করিয়া থাকে। ইহারা পরিণত বয়সে সাধারণতঃ গেরুয়ার খিলকা ব্যবহার করে। মাথায় জট বা লম্বা চুল রাখে। ভিক্ষাবৃত্তি ইহাদের জীবিকা নির্বাহের এক মাত্র অবলম্বন।

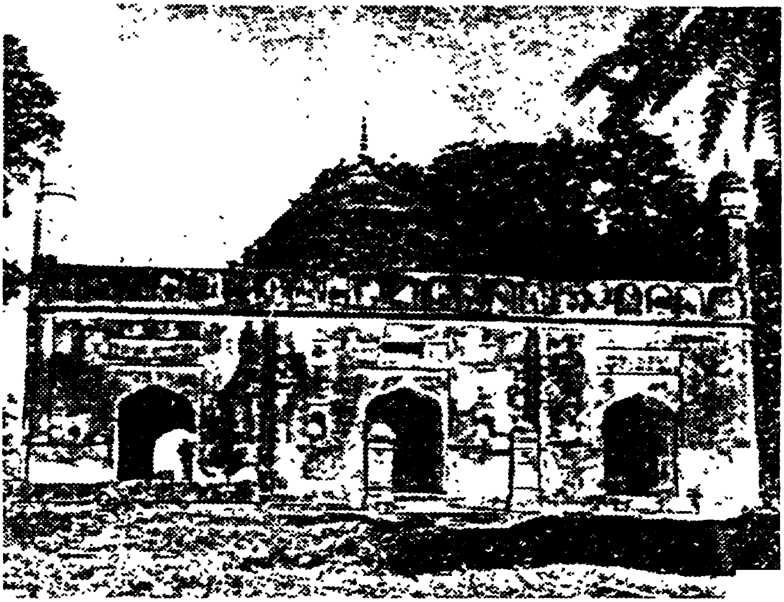
নরোত্তম ঠাকুর

কর্ত্তাভজা গুরুসত্য পীর ও ইহাদের স্বরূপ

হজরত শাহ নেয়ামতুল্লাহ :–আলোচ্য যুগের শেষ অধ্যায়ে আর যাঁহারা গৌড়ের পূর্বাঞ্চলে ইসলাম বিস্তৃতির দায়িত্ব বহন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বনাম খ্যাত সাধক হজরত শাহ সৈয়দ নেয়ামতুল্লাহ ওলী অন্যতম শ্রেষ্ঠ। সুলতান শাহ সুজার রাজত্বকালে তিনি (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রীঃ) দিল্লী প্রদেশের করোনিয়াল নামক স্থান হইতে ধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া রাজমহলে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার আগমন বার্তা জানিতে পারিয়া সুলতান সুজা তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁহার হাতে তিনি বায়াত হন। পরে তিনি গৌড়ের উপকণ্ঠে প্রাগুক্ত ফিরোজপুরে স্থায়ী ভাবে আস্তানা স্থাপন করেন। দীর্ঘ দিন এতদঞ্চলে তিনি সুনামের সহিত ইসলাম প্রচার করিয়া ফিরোজপুরেই ১০৭৫ হিজরী (১৬৬৪ খ্রীঃ) মতান্তরে ১০৮০ হিজরীতে (১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে) সমাধিস্থ হন। পারস্য দেশীয় একটি বিবরণীতে হজরত শাহ নেয়ামতুল্লাহ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত রহিয়াছে। তিনি একজন জবরদস্ত আলেম ও আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন। ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ আউলিয়াগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। কথিত আছে যে, 'টাণ্ডার' নিকট একযুদ্ধে আহত 'শরীফখান' অনুচর বর্গসহ ধৃত হইয়া শাহ সুজার নিকট উপযুক্ত শাস্তির জন্য প্রেরিত হয়। হজরত শাহ নেয়ামতুল্লাহ এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এবং তাঁহার অনুরোধে উক্ত শরীফ খান দলবল সহ মুক্তি পান। শিবগঞ্জ থানার ফিরোজপুরে অবস্থিত তাহ্‌খানা রাজপ্রাসাদটি সুলতান সুজা মুর্শেদ শাহ নেয়ামতুল্লার বাসের জন্য দান করেন। পরে সেখানে শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ একটি তিন গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন। এখনও তাহা অক্ষতাবস্থায় রহিয়াছে। উহাতে স্থানীয় লোকেরা জুম্মা জামাতে নিয়মিত ভাবে নামাজ আদায় করিয়া থাকে। তাহ্‌খানা রাজপ্রাসাদটী

---

৬৯. নরোত্তম বিলাস।



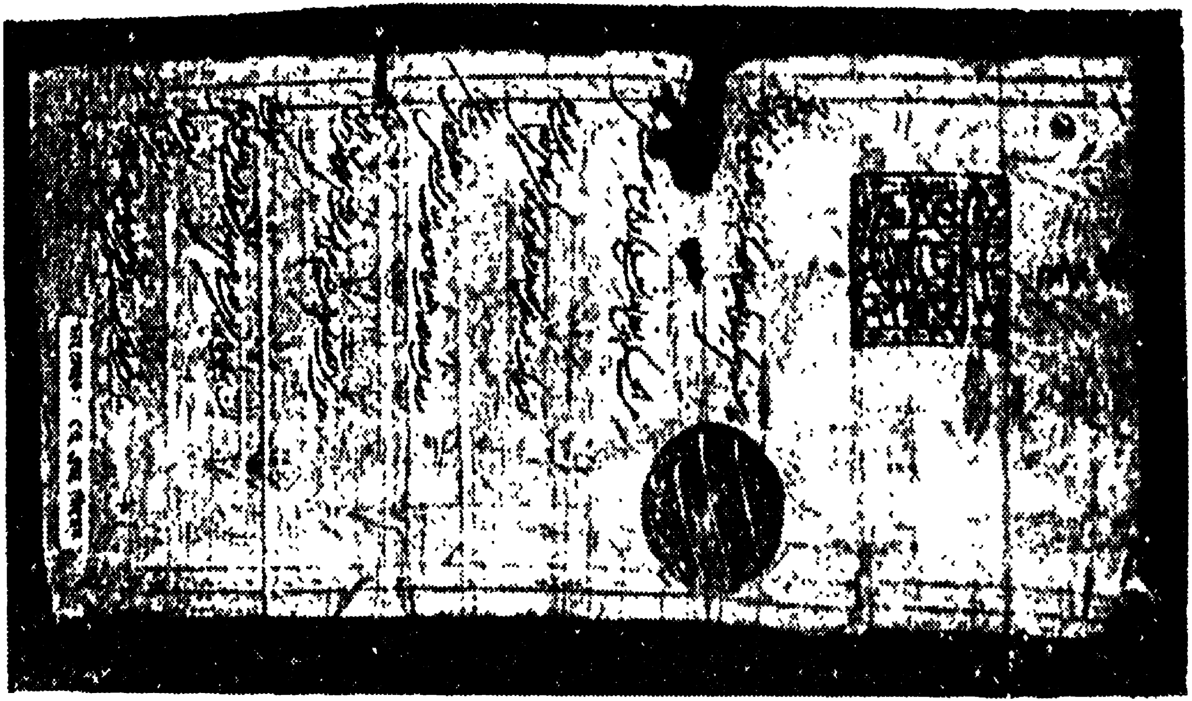
হজরত শাহ নেয়ামতুল্লাহর সমাধি

ভগ্নাবস্থায় বর্তমান রহিয়াছে।

হজবত শাহ নেয়ামতুল্লাহ হজবত মোহাম্মদের (দ:) বংশধর ও পুরুষানুক্রমিক ওলী ছিলেন। তিনি হাকিক ও মারেফাতের শ্রেষ্ঠ কামেল দরবেশ ছিলেন। তাঁহার মত একজন ধর্ম নিষ্ঠ আউলিয়া আজীবন নির্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণ ভাবে ইসলাম ও মুসলমানের সেবা করিতে পারেন এবং উত্তরোত্তর রাজ্যের তরাক্কী কামনা করিতে পারেন; সেই জন্য বাদশাহ আলমগীর মহি-উদ-দীন আওরঙ্গজেব সুবায়ে-বাঙলা সরকার-জান্নাতাবাদে পরগণে 'দারাশাকে' পাঁচ হাজার টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তি মদদমাস স্বরূপ তাঁহার ও তাঁহার বংশাবলীর ভরণপোষণের জন্য দান করেন[৭০]; তিনি প্রায় ৩৩ বৎসর যাবৎ এই সম্পত্তির আয় হইতে মসজিদ ও খানকার যাবতীয় খরচাদি নির্বাহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও বহু দিন পর্য্যন্ত উক্ত সম্পত্তির আয় হইতে খান্‌কা ও মসজিদের

৭০. Memoris oi Gour and Poundua, PP 83-84.

* Memoris of Gour and Poundua, এর লেখক খান সাহেব এম, আবেদ আলী খান তাঁহার গ্রন্থের পাদ টীকায় লিখিয়াছেন যে, আদি বাদশাহী ফরওমানের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু মালদহ কালেক্টরীতে দুইটি ফরমানেব সকল দৃষ্ট হয়। উহার একটির তারিখ ১১ই রবিউল (?) হিঃ ১০৭৭ (১০ই অক্টোবর ১১,–১৬৭৭ খ্রীঃ)। তাহা আগেব অর্থাৎ বাদশা শাহজাহানের একটি অনুলিপি; ১৬ই রবিউল ১০৪৩ হিজরী (৫, অক্টোবর–১৬৩৩ খ্রীঃ) বাদশাহ শাহজাহানের ফরমানে গৌড়েব ফিবোজপুবে ৪০০ শত বিঘা বাজে জমির বিষয় উল্লেখ আছে, যাহা চাষাবাদ করিয়া হজরত শাহ নেযামতুল্লাহ খানকা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যাহা হউক এই দুইটি ফবমানের তারিখ হইতে অবগত হওযা যায় যে, সম্ভবতঃ শাহ নেয়ামতুল্লাহ ৩৩ বৎসর অতিবাহিত করিবার পর ১০৮০ হিজরীতে (১৬৬৯ খ্রীঃ) দেহত্যাগ করেন (Memoris of Gour and Poundua, P 85)।



বাদশাহী ফবমাণের নিদর্শন
বাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়ামে রক্ষিত

বায়াদি হইত। কিন্তু, হজরত শাহ নেয়ামতুল্লাহর ওফাতের পর তাঁহার বংশাবলীর কোন হদীস পাওয়া যায় নাই। উক্ত পাঁচ হাজার টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তির মালিকানা সত্ব কাহার উপর বর্তিয়াছিল তাহাও জানা যায় না*। এতদবিষয়ে নূতন তথ্যের আবিষ্কারের সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা এখন আমাদের হাতের বাহিরে পড়িয়াছে।

মদদ মাস

হজরত শাহ সৈয়দ নেয়ামতুল্লাহ সাহেবের মাজার শরীফ শিবগঞ্জ থানার তাহখানায় অবস্থিত। বারো দরজা বিশিষ্ট চতুষ্কোণায়াতন তাঁহার সমাধিটি "বারো দুয়ারী" নামে প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক ধারে তিনটি করিয়া দরজা আছে। এই বারো দুরারীতে যে লিপিটি আছে তাহা হোসেন শাহী যুগের একটি আরবী লিপি পরবর্তী কালে সেখানে স্থাপন করা হইয়াছে।

শাহ নেয়ামতুল্লাহর সমাধি প্রাঙ্গনে বারবাক শাহের রাজ্য কালের আর একটি শিলালিপি, শিয়ার-উল-মুতাখিরিনের প্রণেতা মীর গোলাম হোসেনের সমাধিতে ভুলক্রমে স্থাপন করা হইযাছে। এই সমাধি প্রাঙ্গনে আরও কয়েক জন সাধক পুরুষের সমাধি রহিয়াছে। হজরত শাহ নেয়ামতুল্লার সমাধি চত্ত্বর প্রাঙ্গন বৃক্ষশোভিত ও ইষ্টক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রতিদিন বহু যাত্রী শাহ নেয়ামতুল্লাহ্ ওলীর মাজার দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। অথচ সেখানে কোন স্থায়ী খাদেমের ব্যবস্থা নাই।

বারো দুয়ারী

রাজশাহীর সূফী সাধনা অধ্যায় শেষ করিবার আগে আর একটি কথা বলিয়া বাখিতে চাই। রাজশাহী জেলার প্রত্যেক থানায় কোন না কোন স্থানে একাধিক পীরের সমাধি বা দবগা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন রাজশাহী ললিত নগর রেল ষ্টেশনেব সন্নিকট ময়েনপুর ও ভুষনাতে পীরের কবর বা দরগা কথিত ও নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। ইহারা কেহ কালু পীর, কেহ তেনা পীর, কেহ্ পাঁচ পীর, কেহ জংলী পীর, কেহ্ বা ঘোড়া পীর ইত্যাদি নামে কথিত হয়। আবার কোন কোন স্থানে বংশানুক্রমিক পূর্ব পুরুষের সমাধি পীরের সমাধির মর্য্যাদা পাইয়া বসিয়াছে। আর অজ্ঞাত পীরের সমাধি যে কত আছে তাহার ইয়াত্তা করা যায় না। কোন কোন স্থানে কল্পিত পীরের সমাধি পার্শ্বে অধুনা ঔরস ও মেলার অনুষ্ঠানাদি হইতে দেখা যাইতেছে।

উপসংহাব

ইঁহাদের মধ্যে হয়ত সত্যিকারের পীর দরবেশের মাজাবও থাকিতে পারে। তাঁহাদের দ্বারা হয়ত একদিন ইসলামের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধুনা লৌকিকতার অতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে এই সবের জনশ্রুতি এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদেব বিষয়ে আস্থা স্থাপক কোন তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব পর হয় নাই। ভবিষ্যতে বিশ্বাস স্থাপক কোন তথ্য আবিস্কৃত হইলে ইঁহাদের বিষয়ে স্বতন্ত্র ইতিহাস রচনা হইতে পারে।

৭১. G A S B, P. 295, 1873

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

# সংস্কার যুগ সৃষ্টির আগে রাজশাহীর সামাজিক চিত্র

বাঙ্লা দেশে বিভিন্ন সময়ে ইসলাম প্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহাদের ইসলাম প্রচারের ইতিহাস সত্যিই অভিনব। যুগের আবর্তন বিবর্তনে যেমন ইসলামের বিবর্তন ঘটিযাছে তেমনি উহার সংস্কারও হইয়াছে। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ মতকের শেয পর্য্যায়ে আসিয়া শরিয়তী ইসলামে যে লৌকিক প্রভাব বিস্তার করে তাহার জের পাকিস্তান আমলেও কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে।

শরিয়তী ইসলাম, লৌকিক ইসলামে পর্য্যবসিত হওয়ার প্রধান কারণ মোগল বাদশাহ আকবরের ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এই ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সাধনার কুফলেই লৌকিক ইসলামের উদ্ভব এবং ফিরিঙ্গী বণিকদের পাক-ভারত অধিকারের পর এই লৌকিকতার পূর্ণরূপ মুসলমান সমাজে আত্মপ্রকাশ করে। রাজশাহীর মুসলমান সমাজেও উহার স্বরূপ প্রায় সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে। মুসলমানদের সম্মুখে কোরাণের চর- সত্য থাকা সত্ত্বেও 'পীর, পরস্তী, পীরের কবর পূজা, ওরস, পীরের নামে শিন্নী মানৎ, ঘোড়া পীর, হটিলা পীর, তেনাপীর প্রভৃতি; পীরের নামে সন্তান সন্ততির মাথায় চৈতণ রাখা, পীরের কবরে চেরাগী দেওয়া, সন্তান আকাঙ্ক্ষী মেয়েদের পীরের পাথরে কোণ দেওয়া, আস্তানার ফুল-ধুলা খাওয়া, সন্তান জন্মিলে জোড়া খাসী মানৎ করা ইত্যাদি। প্রকারান্তরে এই সব নর পূজার সামিল। এক সময় এই দেশের অধিকাংশ মুসলমানই এই শ্রেণীর পীর পরস্তী ছিল। এবং এখনও যেন কোন কোন অশিক্ষিত অজ্ঞ সমাজে ইহার নিঃশেষ রহিয়া গিয়াছে। অথচ শরিয়তী ইসলামে এইসব শেরেক ও বেদায়াত বলিয়া বিঘোষিত। এই পীর-পরস্তীর কোনটি হয় হিন্দু নয় বৌদ্ধের নিকট হইতে মুসলমান সমাজে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এইসব প্রাচীন অনৈসলামিক হিন্দুয়ানী আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে পীরের পরেই নাম করিতে যে 'কদম রসুল', 'দাড়ী মোবারক', পীরের খরম, তাকিয়া, পাগড়ী প্রভৃতি।

কদম রসুল অর্থে- হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পদচিহ্নের স্মারক, হজরতের দাড়ী ও তাকিয়ার বাহুল্য প্রদর্শন; এইসব শরিয়ত বিরুদ্ধ কার্য্য। এইসব শরিয়তে "বেদায়াত" বলিয়া বিঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও এদেশে উহার প্রধান্য ছিল। এখনও যেন রাজশাহী জেলার কোন কোন স্থানে এই সবের বাহুল্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

এজেলার এক শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে এখনও যে সব হিন্দুয়ানী আচার রীতি এবং বৈদেশিক চালচলেনর রীতি প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে তম্মধ্যে বিবাহের পণ প্রথা, হলুদ মাখা, ফুরুল ভরাণ, তেমাথা হইতে পান সুপারী কুড়ান, ঢেঁকি পূজা, চুলা পূজা, খারতাগা, অগ্নিপূজা, বর কনের পাশা খেলা ও আঁচল বাধা,খুড়ি ভাঙ্গা, মেয়েলী গীত গান, হেঁয়ালী ছড়া, ভাদ্রমাসে নববধূর মুখ না দেখা, বৃষ্টি না হইলে রান্নাঘরের পান্তা চুরি করিয়া খাওয়া, ইত্যাদি। এতদব্যতীত পৌষ মাসে সোনারায়ের বর ক'নে সাজা,

চৈত্রমাসে ঢিবি পূজা, ইটা পূজা, ইত্যাদিও ছিল। হিন্দুর পৌষ পার্বন' তখন এতো ফিরিঙ্গী সভ্যতার এক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে 'পিকনিকে" পর্য্যাবসিত হইয়াছে। আবার এই পিকনিক অনেক সময় অনেক অঘটন ঘটায়। হয় তাহা খেতুরের মহোৎসব, না হয় তাহা প্রসাদপুরের হরিবাসর অথবা মান্দার রামনবমী নয়তো কম্পিত নব বৃন্দাবন অথবা কৃষ্ণলীলা। এইভাবে এই হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের রীতিনীতি মুসলমান সমাজে এখনও দৃষ্ট হয়।

অধিকন্তু, নাটোর, নওগাঁ, ও নওয়াবগঞ্জ মহকুমার দূর মফঃস্বলে আশ্বিন সংক্রান্তিতে গারসী পূজা, মঙ্গলঘট, মাদার পূজা, ভোগ দেওয়া ইত্যাদি এবং মররমের চাঁদে গওয়ারা পূজা তো ছিলই। আধুনিক শিক্ষিত এক শ্রেণীর পরিবারে আজকাল হিন্দুয়ানী রীতি নীতিতে নাম রাখার হিড়িক যেন একটু বাড়িয়া চলিযাছে।

মেয়েদের মধ্যে গাভিনীকে সাধ ভক্ষণ, শিশুদের খতনা কালীন উৎসব ও হিন্দুদের পূজা-পার্বনে মুসলমান ছেলেমেয়েদের যোগদান ইত্যাদি এখনও দুরীভূত হয় নাই।

শিয়া সম্প্রদায়ের রীতি নীতি আজও শহরে কোন কোন সুন্নী পরিবারে বেশ মুখর। মহরমের তাজিয়া, চাল্লিশা বা চেহলাম কোথাও কোথাও ব্যাপকতর। অষ্টাদশ হইতে বিংশ শতকের গোড়াতে এইসব শিয়ায়ী মহরমের আখড়া এজেলার প্রায় সর্বত্র জমকাল ছিল। গোদাগাড়ী, শিবগঞ্জ, পত্নীতলা, পোরশা,বুয়ালিয়া, গোমস্তাপুর, নাচোল ও নাটোর থানার এখনও উহার স্মৃতি স্বরূপ ইষ্টক নিমিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট দরগার ধ্বংসাবশেষ প্রায় শতাধিক রহিয়াছে। এই মহরমের ব্যাপারে নাটোর রাজার পুরুষানুক্রমে এক বিরাট অঙ্ক নির্ধারিত ছিল। যেহেতু নাটোরের জমিদারী মুর্শিদকুলী খাঁর অনুগ্রহে অর্জিত হইয়াছিল, সেই হেতু নওয়াবকে খুশি রাখিবার জন্য এই রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। এতদব্যতীত নাটোর রাজের বিভিন্ন স্থানে এই রীতি প্রচলন ছিল। তজ্জন্য পীর পাল, লাখোরাজও নির্দিষ্ট ছিল। নাটোর টাউনে রাজাদের সেই মহরমী পীঠের ১০/১২ টি ভগ্ন স্তূপ এখনও রহিয়াছে। মোট কথা, নওয়াবী আমলে শিয়ায়ী মহরমের যতখানি প্রভাব সমগ্র রাজশাহী জমিদারীতে প্রচলিত ছিল অন্যত্র ততখানি ব্যাপকতা ছিল বলিয়া মনে হয় না।

পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিভাগ পূর্ব কাল পর্য্যন্ত মুসলমান সমাজের আবর্তন বিবর্তনের চিত্র প্রধানত: এই প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে স্মরণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, মুসলমান যুবকবৃন্দ হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া যেরূপ মাতিয়া উঠিত মুসলমানী পর্বে হিন্দুরা[৭২] তাহা কখনও করে নাই এবং এখনও করে না।

---

৭২. বগুড়ার ইতিকাহিনী, ৪২২-৪২৯ পৃঃ।

## ॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

# সংস্কার যুগ

## (১৮০০-১৯৪৭)

শরীয়তী ইসলাম যখন অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে আসিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছিল তখন বাঙলার কতিপয় মোজাহেদ বিশেষ ভাবে চিন্তিত হইয়া পড়েন। কিরূপে ইসলামের সত্যকার প্রাচীন সাবল্য সৌন্দর্য্য ও শিক্ষা বঙ্গে পূর্ণজীবিত করা যায় তজ্জন্য তাঁহারা চিন্তা করিতে থাকেন। এই চিন্তার ফলে বঙ্গে সংস্কার আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। মুসলমানকে মনে প্রাণে কথায় ও কাজে খাঁটি করিয়া তোলায় এই যুগের প্রধানতম লক্ষ্য ছিল। মুসলমানকে খাঁটি মুসলমান করার চেয়ে লৌকিক ইসলামকে তাড়াইয়া তথায় শরিয়তী ইসলাম বা শাস্ত্রীয় ইসলামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অধিক ছিল বলিয়া এই যুগে ইসলামের বিস্তৃতি অপেক্ষা তাহার শোধন ও সংস্কারের আগ্রহ বেশী দেখা যায়।

আরব হইতে যেমন ইসলামের এদেশে আগমনে হইয়াছিল তেমনি ইহার সংস্কারের প্রেরণাও আরব হইতেই আসিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, আববের আবদুল

সংস্কারের সূচনা বঙ্গে ওয়াহাবী মত প্রচাব

ওয়াহাব (১৭০৩ - ১৭৮৭ খ্রীঃ) নজদী' নামে এক অসাধারণ, ধর্মনেতার প্রচেষ্টায় 'ইসলাম সংস্কারীদল' নামক এই সময় একটী দল গঠিত হয়। এই দলটি 'ওয়াহাবী' নামে প্রায় সারা জগতে পরিচিত। উক্ত দলের আন্দোলন সারা দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িলে পাক-ভারতের ন্যায় অন্য কোথাও ইহার তাৎপর্য্য উপলব্দি হয় নাই। এই আন্দোলনের মূল নীতি হইল কোরাণ ও হাদিসের ভিত্তিতে সমগ্র জগতের ইসলাম সমাজকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করন।

পাক-ভারতের ওয়াহাবী মোজাহেদগণের সর্ববিধ সাহায্যের জন্য আহমদ ব্রেলবীর সময় হইতে পাক-ভারতের নানা স্থানে বহু কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার মূল কেন্দ্র ছিল 'আসমাস ও চামারকান্দ'*।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ইং ১৮২০ সালে পাক-ভারতের ইসলামী আন্দোলনের অগ্রদূত হজরত আহমদ ব্রেলবী ওয়াহাবী মত প্রচার উদ্দেশ্যে বাঙলার নানা

রাজশাহীতে ওয়াহাবী প্রচার কেন্দ্র স্থাপন

স্থানে ভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি বর্তমান রাজশাহী শহর পর্য্যাটন করেন। পরবর্তী কালে তাঁহার পদানুস্মরণে (১৮৫০ সাল) মৌলানা বিলায়েত আলীর আগমনে রাজশাহীর (রামপুর বুয়ালিয়া) স্বপুরাতে একটি প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্থানীয় ইংরেজদের সহিত একটি সংঘর্ষও হয়। এই প্রচার আন্দোলনে রাজশাহীর যাঁহারা ইংরেজের কারাগারে নজরবন্দী থাকিয়া নির্যাতন সহ্য করেন তম্মধ্যে স্বপুরা নিবাসী মৌলবী হাজী মনিরুদ্দীন অন্যতম। পরে জামিরার মৌলবী মোহাম্মদ' ইংরেজের কারাগারে নীত হইয়া কিছু দিন বিজাতির নির্য্যাতন সহ্য করেন।

অতঃপর স্বপুরাকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমান্বয়ে 'দুয়ারী' 'কেশর' জামিরা, 'বাদুরীয়া,

* বগুড়ার ইতিকাহিনী পৃঃ ৪৩৬-।

চব্বিশ্ নগর, পাঁচগাছি, 'বাসুদেবপুর' প্রভৃতি স্থানে ওয়াহাবী প্রচারের শাখা-প্রশাখা স্থাপিত হয়।

মৌলানা বিলায়েত আলী রাজশাহীতে আগমন করিলে স্থানীয় বহু লোক তাঁহার হাতে বায়াত হন এবং তখন মরহুম হাজী মনিরুদ্দীন অত্র অঞ্চলের প্রচার কেন্দ্রের গদীনেশীন সরদার বা পীর মৌলবী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাজী মনিরুদ্দীনের অধঃস্তন বংশধর।

শহীদ আহমদ হোসেন ব্রেলবীর একজন খ্যাতনামা মুরিদ ও খলিফা, মৌলানা মোহাম্মদ ইসহাক ঊনবিংশ শতকে সমগ্র উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ওয়াহাবী মত প্রচার করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

উঁনি একজন জবরদস্ত আলেম ও ওয়াহাবী মতের প্রচারক ও পীর ছিলেন। রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন স্থানে তাহার বহু শ্রদ্ধাশীল মুরিদান রহিয়াছে। তিনি বিভাগ পূর্ব বাঙলার নদীয়া জেলার অন্তর্গত রহমতপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন৭৩। তদীয় পুত্র মওলানা আফসার হোসেন জীবিত আছেন। ইঁহার পূর্ব পুরুষ বাজিত কোরেশী মদীনার অধিবাসী ছিলেন।

পাক-ভারতীয় ওয়াহাবী আন্দোলন স্তিমিত হইয়া আসিলে 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের' অনুস্মরণে বাঙালা দেশে সর্বপ্রথম 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার শরীফ ফুরফুরার অধিবাসী স্বনামধন্য পীর মরহুম মৌলানা আবুবকর সিদ্দিকী এইপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন; দেশ হইতে শেরেক্ বেদয়াত ও যাবতীয় গোমরাহীর মূলোৎপাটন করাই এই মিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার সর্বপ্রধান খলিফা মরহুম মৌলানা রুহুল আমীন ইঁহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া বাঙলার বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া এই আন্দোলনকে জোরদার করিয়া তোলেন।

তিনি এই আন্দোলনের মুখ পত্র স্বরূপ 'সুন্নাতুলজামাত" নামক একটি শক্তিশালী মাসিক সম্পাদন করিতেন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে রাজশাহী তথা সারা অবিভক্ত বাঙ্লার শত শত মাদ্রাসা মক্তব প্রতিষ্ঠা হইয়া মুসলমান সমাজ হইতে হিন্দুয়ানী রীতি নীতির উচ্ছেদ সাধন হয়। এই যুগে যে সমস্ত ওলামায়ে কেরামের পাদস্পর্শে রাজশাহী জেলা ধন্য হইয়াছে তন্মধ্যে ফুরপুরার পীর মরহুম মৌলানা আবুবকর সিদ্দিকী, মৌলানা রুহুল আমীন, মরহুম মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৌলবী ইসমাইল হোসেন শিরাজী, বিখ্যাত মুনশী মেহেরুল্লা, মৌলানা আবদুল্লা হেল কাফী দিনাজপুরী, শ্রেষ্ঠ বাগ্মী মরহুম মৌলানা মোজাহার হোসেন নগরী প্রমুখ মনীষি বৃন্দ অন্যতম। ইঁহারা উনবিংশ-বিংশ শতকের ধর্ম প্রচারক ছিলেন।

তৎকালীন সুফী, পীর ও বুজর্গ মোজাহেদগণের কার্য্যের ধারা রাজশাহীর ধর্মীয় জীবনে একটি প্লাবন আনায়ন করে। মুসলমান সমাজের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ইঁহাদের জিহাদ এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এবং এই আলোড়নই পরে পাকিস্তান আন্দোলনকে জোরদার করিয়া তুলিয়াছিল।

---

৭৩. মাসিক মোহাম্মদী। অগ্রহায়ন, ১৩৬৩ সাল পৃষ্ঠা—১৫১-১৫৩।

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥

# মোঘল ও নওয়াবী আমল

গৌড়ের শেষ সুলতান দাউদ শাহ কররাণীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দিল্লীশ্বর বাদশাহ আকবর গৌড়কে মোঘল সাম্রাজ্যের অধীন করিয়া লন। এই যুদ্ধে সম্রাটের সেনাপতি খান-ই-জাহান হোসেন কুলী খাঁ ও রাজা টোডর মল বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইং ১৫৭৮ সালে হোসেন কুলী খাঁ সুবায়ে বাঙ্লার সুবাদার পদে নিযুক্ত হন। দেশপ্রিয় ভৌমিকগণ বহুকাল যাবত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে লড়িয়াও বাঙ্লার সার্বভৌমকত্ব অক্ষুন্ন রাখিতে পারেন নাই। মাঝে শায়েস্তা খান, ইব্রাহিম খান ও মুর্শিদ কুলী খান বাঙ্লার সুবাদার নিযুক্ত হন। মুর্শিদ কুলি খান হইতে মুর্শিদাবাদের নামের উদ্ভব। হোসেন কুলি খাঁর মৃত্যুর পর ঘোড়াঘাটের তুর্কী জাতীয় জায়গীরদার বাবা খাঁ কাঁকশাল, পাটনার জায়গীরদার মাশুম খাঁ কাবলী বিদ্রোহী হন। এই বিদ্রোহী দমনার্থে বাদশাহ আকবর টোডর মলকে (১৫৮০-৮২ খ্রী:) বাঙ্লায় পাঠান। তিনি বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া গৌড় রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং মির্জ্জা কোকাকে (১৫৮২-৪৮ খ্রী:) সুবে বাঙ্লা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার করিয়া পাঠান।

মোঘল অধিকারে বাঙলা

নওয়াব শায়েস্তা খান ও মুর্শিদ কুলি খাঁ

বাঙ্লার এই 'সুবেদারীহ' পরবর্তীকালে 'নওয়াবী আমলে' রূপান্তরিত হয় এবং নওয়াব আলী বর্দ্দী খাঁ বাঙ্লার স্বাধীন নওয়াব বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করেন। আলী বর্দ্দী খাঁ মুর্শিদ কুলি খাঁর পুত্র ও পৌত্র সুজাউদ্দীন ও সরফরাজ খাঁকে উৎখাত করিয়া এই নওয়াবী লাভ করেন।

নওয়াব আলী বর্দ্দী খাঁ

বাদশাহ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রী:) শাসন কার্য্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের উদ্দেশ্যে পূর্ব ব্যবস্থার কিছু রদবদল করিয়া সমগ্র (পাক-ভারত) রাজ্য সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করত: প্রত্যেক সুবায় একজন করিয়া সুবাদার নিযুক্ত করেন। সুবাগুলি নিম্নরূপ যথা :—আগ্রা, আজমীঢ়, বাঙ্লা, বিহার প্রভৃতি।

ইং ১৫৮০ সালে রাজা টোডর মলকে তিনি বাঙ্লার সুবাদারী পদে নিযুক্ত করেন। টোডর মল বাঙ্লা দেশে আসিয়া দেশের রাজস্ব আদায়ের শৃঙ্খলা ও আয় বৃদ্ধির জন্য সমগ্র বাঙ্লা দেশকে প্রধানত: ১৯টি সরকার বিভক্ত করেন। প্রত্যেক সরকারের মধ্যে পরগণা ও মহলের প্রবর্তন করেন। এই সমস্ত পবগণার সংখ্যা ৬৮২টি এবং আয় দাঁড়ায় ১০,৬৮৫৯৫৪৪ দাম। সরকারের সংখ্যা নিম্নরূপ :--(১)--সরকার জান্নাতাবাদ বা গৌড়: ৩৬টি পরগণায় বিভক্ত; রাজস্ব ১৫৭৩১৯৬ দাম ; অশ্বারোহী সৈন্য ৫০০, পদাতিক সৈন্য ১৭০০ সহস্র।

(২)—সরকার টাঁণ্ডা : পরগণা ৫২টি; রাজস্ব ২৪০৭৯৩৯৯ দাম (৩)—সরকার ফতেহাবাদ : পরগণা ৩১টি; রাজস্ব ৭৯৬৯৫৫৭ দাম; অশ্বারোহী ৯০০। পদাতিক ৫০৭০০।

(৪)—সরকার মাহমুদাবাদ :—পবগণা ৮৮টি; রাজস্ব ১১৬১০২৬৬ দাম; অশ্বারোহী

২০০, পদাতিক ২০০০ সহস্র। (৫)– সরকার খালিফাবাদ :–পরগণা ৩৫টি: রাজস্ব ২৪০২১৮০ দাম; অশ্বারোহী ১০০। পদাতিক ১১৫০ জন (৬)–সরকার বাকলা :– পরগণা ৪টি; রাজস্ব ৭১৩০৬৪৫ দাম; অশ্বারোহী ৩২০, পদাতিক ১৫০০।

(৭)–সরকার পূর্ণিমা :– পরগণা ৯টি; রাজস্ব ৬৪০৯৭৯৩ দাম; অশ্বারোহী ১০০; পদাতিক ৫০০০।

(৮)–সরকার তাজপুর :– পরগণা ২৯টি: রাজস্ব ৬৪৮৩৮৫৭ দাম: অশ্বারোহী ১০০; পদাতিক ৫০০। (৯)– সরকার ঘোড়াঘাট :– পরগণা ৮৪টি। রাজস্ব ৮৩৮৩০৭২ দাম; অশ্বারোহী ১০০: হস্তী ৫০টি এবং পদাতিক ২২৬ জন।

(১০)–সরকার পিঞ্জিরা :– পরগণা ২১টি; রাজস্ব ৫৮০৩২৭৫ দাম: অশ্বারোহী ৫০; পদাতিক ৭০০০। (১১) –সরকার বারবাকাবাদ :–পরগণা ৩৬টি; রাজস্ব ১৭১৫৩২ দাম; অশ্বারোহী ৫০; পদাতিক ৭০০। (১২) –সরকার বাজুহা : – পরগণা ৩৩টি: রাজস্ব ৩৯৫১৬৮৭১ দাম; হস্তী ১০টি অশ্বারোহী ১৭০০০: পদাতিক ৪৫৩০০.

(১৩)–সরকার শোনার গাঁও :– পরগণা ৫১টি; রাজস্ব ১০৩৩১৩৩৩ দাম; অশ্বারোহী ১৫০০; হস্তী ২০০: পদাতিক ৪৬০০ জন।

(১৪)–সরকার সিলেট : –পরগণা ৮টি: রাজস্ব ৬৬৮১৬২০ দাম; অশ্বারোহী ১০০; পদাতিক ১৫৮০।

(১৫)–সরকার চাটগাঁও :– পরগণা ৪টি। রাজস্ব ১১৪২৩১০ দাম; অশ্বারোহী ১০০; পদাতিক ১৫০০।

(১৬)–সরকার শরিফাবাদ :– পরগণা ২৬টি; রাজস্ব ২২৪৮৮৭৫০ দাম: অশ্বারোহী ২০০; পদাতিক ৫০০০। (১৭)–সরকার সেলিমাবাদ :– পরগণা ৩১টি; রাজস্ব ১৭৬২৯৯৬৪ দাম; অশ্বারোহী ১০০: পদাতিক ৫০০০। (১৮) –সরকার সাতগাঁ (সপ্তগ্রাম) :–পরগণা ৩৭টি রাজস্ব ১৬৭২৪৭২০ দাম; অশ্বারোহী ৫০; পদাতিক ৬০০। (১৯) –সরকার মান্দারণ (গড়) :– পরগণা ১৬টি; রাজস্ব ৯৪০।

এতদব্যতীত উড়িষ্যা ও বিহারের অন্তর্গত আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরকার ছিল। যেমন জলেশ্বর, রুদ্রক, কটক, কুলেন, দন্দ্রপাত, মুঙ্গের, চম্পারন, হাজিপুর, শ্বারণ, ত্রিহুত ও রোটাস।

টোডরমল্লের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই ঐতিহাসিক প্রথায় রাজস্ব বর্দ্ধিত হইলে বাদশাহের প্রচুর আয় হয়। এই জন্য সম্রাট আকবর টোডরমল্লকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করিয়া দিল্লীর রাজস্ব বিভাগের প্রধান দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। তৎপদে আজিজ খাঁ (খান-ই-আজিম?) কে ১৫৮২ (?) সালে বাঙলার শাসন কর্তা করিয়া পাঠান।

আজিকার রাজশাহী জেলার ভূমিভাগে উল্লিখিত প্রাচীন সরকার গুলির মধ্যে সরকার জিন্নাতাবাদ, সরকার বাজুহা, সরকার মাহমুদাবাদ, সরকার শরিফাবাদ, সরকার পিঞ্জিরা ও সরকার বারবাকাবাদ এই ছয়টি সরকারের কতকগুলি পরগণা লইয়া বর্তমান পুনর্গঠিত রাজশাহী জেলার আয়তন ধরা যায়।

পরগণা

দেশ বিভাগের আগে ইং ১৮৭০-৭১ সালে রাজশাহী জেলার ৪৮টি পরগণা নিম্নরূপে বিভক্ত ছিল৭৪ যথা :–আমরুল, বাজুরাশ–মহব্বতপুর, বলিহার, বান্দাইখাড়া,

বনগাঁও, জায়গীর বনগাঁও খালসা, বারবাকপুর, বড় বড়িয়া, তপ্পেবিয়াস, চাঁদলাই, তপ্পেচাপিলা, চৌগাঁও, চীনাসৌ, ছিন্দাবাজু, দক্ষিণ জোয়ার, ধামীন, দীঘা, গয়াহাটা, গোপীনাথপুর, গড়েরহাট, গোবিন্দপুর, হাণ্ডিয়াল, হুসুরপুর, ইসলামপুর, জাহাঙ্গীরাবাদ, জিরাসিন্দু, কালীগাঁও, কালীসভা, কাশিপুর, কাটার মহল, কাজী হাটা, খাস তালুক, তপ্পে কুশুম্বী, লস্করপুর, মালঞ্চী, মেহমনশাহী, মোহাম্মদীপুর, নিজামপুর, প্রতাপবাজু, রোকনপুর, সরিষাবাদ, সোনাবাজু, শুজানগর, তাহিরপুর, তারাগণিয়া, তেগাছি।

এই সব পরগণার শাসন কার্য্য রাজস্ব আদায়াদির সদর দপ্তর পরগণার মধ্যেই ছিল। যেমন আমরুল পরগণার সদর 'আমরুল'। ইহা আত্রাই রেল ষ্টেশনের নিকট অবস্থিত। যেমন 'চাপিলা'–পরগণে তপ্পেচাপিলার বা চাপিলার সদর ছিল। তখনকার যুগের সরকার ইংরেজ আমলে জেলায় রূপান্তরিত এবং পরগণা মহকুমায় রূপান্তরিত এবং তখনকার ডিহি আজিকার থানার মত ছিল। এইভাবে সরকার পরগণা ডিহি প্রভৃতির পর্য্যায়ক্রমে শাসন কর্তা ছিলেন। এবং সরকারগুলিকে সুবার অধীনে থাকিতে হইত। তখনকার যুগে জমির রাজস্ব আদায়ের জন্য দেশের সংস্কার যত কিছু প্রয়োজন হইত। স্বাধীনতা উত্তর যুগে জমির রাজস্ব আদায়ের তহশীল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগেকার জমিদারী রাজস্ব আদায়ের কাছারীগুলিতে আজিকার রাজস্ব আদায়ের তহশীল স্থাপিত। ক্ষেত্র বিশেষে অভাব পক্ষে স্বতন্ত্র তহশীল অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজশাহীতে রাজস্ব আদায়ের ১৩৪ টি তহশীল আছে।

ইং ১৭০৩-৪ সালে দেওয়ান মুর্শিদকুলী খান বাদশাহ আওরঙ্গজেব কর্তৃক বাঙলার নওয়াবী পদে অধিষ্ঠিত হন[৭৫]। এই সময় বঙ্গদেশের মোঘল সরকারের অধীনস্থ জমিদারগণের রাজস্ব যথারীতি সরকারের কোষাগারে পৌছিত না। জমিদারগণ ঠিক সময়ে রাজস্ব প্রদান না করিতে পারিয়া অনেক সময় কারারুদ্ধ হইতেন। কেহ 'বৈকুণ্ঠ' দর্শন করিতেন*। কেহ বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেন। সাঁত্তাল

নওয়াব মুর্শিদকুলী খাঁর শাসন শৃঙ্খলা

পরগণার রাজা উদিত নারায়ণ (ইঁহার অধীনে রাজশাহী চাকলাও বন্দোবস্ত ছিল) ও ভূষনা মহাম্মদ পুরের জমিদার সীতারাম রায় প্রভৃতি বিদ্রোহী জমিদার গণের বিরুদ্ধে মুর্শিদকুলী খাঁ সৈন্য প্রেরণ করিয়া পরাস্ত করেন। এবং তাহাদের জমিদারী উচ্ছেদ করিয়া রঘুনন্দনকে দেওয়া হইয়াছিল। এই ভাবে মুর্শিদকুলী খাঁ বিদ্রোহী ও ধূর্ত্ত জমিদারকে উচ্ছেদ করিয়া নূতন লোকের সহিত নূতন ভাবে বিলি বন্দোবস্ত করিতেন। এই অভিনব জমিদারগণ অধিকাংশই তখন নওয়াব সরকারের গোলাম বা রাজকর্মচারী ছিলেন। রঘুনন্দনও তখন মুর্শিদকুলী খাঁর প্রধান মুৎসদ্দি ও সায়েরাৎ বিভাগের ইজারাদার ছিলেন।

নওয়াব মুর্শিদকুলী খান বাঙলা ১২২৮ সালে (১৭২২ খ্রীঃ) নূতন বিলি বন্দোবস্তের

---

৭৪. Vide, statistical account of Rajshahi

৭৫. Stewart's History of Bengal. P. 418, কালী প্রসন্ন কৃত বাঙলার ইতিহাস দ্রষ্টব্য

* 'বৈকুণ্ঠ' অর্থ একজন মানুষ লম্ফদিয়া পার হইতে না পারে, এমন একটি চৌবাচ্চা বিষ্ঠা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত অথবা চৌবাচ্চার মধ্যে তীক্ষ্ণ লৌহ নির্মিত শিক প্রোথিত থাকিত এবং জমিদারগণকে তাহা লম্ফ দিয়া পার হইবার আদেশ হইত। অধিকাংশই পার হইতে না পারিয়া অকালে অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু বরণ করিতেন।

রাজস্ব আদায়ের যে কাগজ প্রস্তুত করেন তাহার নাম হয় "জমা কামেল তুমারী"। তখন পরগণার সংখ্যা হয় ১৬৬০টি, রাজস্ব দাঁড়ায় ১,৪২,৮৮,১৮৩ টাকা। উক্ত বন্দোবস্তের সময় কোন গোলযোগ সৃষ্টি হইতে না পারে মনে করিয়া মুর্শিদকুলী খাঁ বহু অবাধ্য জমিদারকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। পরবর্তী নওয়াব মুর্শিদকুলী খাঁর জামাতা সুজা-উদ-দীনের সময় ইং ১৭২৮ সালে (বাং ১১৩৫) উক্ত বন্দোবস্ত পাকা হইয়া 'গোসোয়ারা' প্রস্তুত হইয়াছিল।

সুজা-উদ-দীনের সময় জমিদাব ও দেশের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল। কেবল মাত্র বীরভূমের জমিদার বদিউজ্জামান একবার বিদ্রোহী হইয়া পরে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে জমিদারগণ নওয়াবকে কেবল রাজস্ব প্রদান করিতেন। দেশের শান্তি শৃঙ্খলার সকল রকম দায়িত্ব নিজের হস্তে থাকিত। তাহার দরুণ সৈন্য, গড়, অন্যান্য হাল-হাতিয়ার যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম জমিদারকেও রাখিতে হইত। যুদ্ধ বিগ্রহ কালে নওয়াব-সুলতানদের সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে হইত। এইরূপ নিয়ম-শৃঙ্খলা নওয়াব জমিদারদের ছিল। সুজা-উদ-দীনের সময় নূতন নিয়ম প্রবর্তন হয়। সুজা-উদ-দীন, হাজী আহমদ, আলমচাঁদ ও ফতেচাঁদকে লইয়া একটি উপদেষ্টা বোর্ড বা মন্ত্রী সভা গঠন করিয়াছিলেন। নওয়াবী আমলে ইহাই বোধ হয় প্রথম মন্ত্রী সভা গঠিত হয়। ফতেচাঁদ মুর্শিদ কুলী খাঁর খাজাঞ্চী বা ধন রক্ষক ছিলেন। তিনি মুর্শিদকুলী খাঁর সুপারিশে বাদশাহ আওরঙ্গজেব কর্তৃক "জগৎ শেঠ" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। সূজা-উদ-দীনের সময় 'মুন্সী যশোবন্ত' ঢাকার নায়েবী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে ঢাকার বিস্তর উন্নতি হইয়াছিল। নওযাব শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮ মন চাউল বিক্রয় হইত; যশোবন্ত এই কথা স্মরণ করিয়া ঢাকা রাজধানীতে একটি নূতন তোরণ নির্মান করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, "যে রাজার সময় টাকায় ৮ মন চাউল হইবে, তিনি এই তোরণ উন্মুক্ত করিবেন।" বলা বাহুল্য নায়েব যশোবন্তের সময়ই টাকায় ৮ মন চাউল হইয়াছিল। তিনিই এই দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। ঢাকা লালবাগ ফোর্টের উত্তর-পূর্ব কোণে বর্তমান ভগ্ন তোরণটি বোধ হয় যশোবন্তের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল।

আগেই ইঙ্গিত করিয়াছি, সূজা-উদ-দীনের গঠিত মন্ত্রী সভার প্ররোচনায় সরফরাজ ও তদীয় পত্রদ্বয়কে উৎখাত করিয়া আলীবর্দ্দী খান (হাজী আহমদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সূজা-উদ-দীন কর্তৃক বিহারের নওয়াব নিযুক্ত) মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ছিলেন। এই আলীবর্দ্দী খানও বোধ হয় শান্তিতে জীবন যাপন করিতে পারেন নাই। নওয়াব আলীবর্দ্দী খাঁর সময়ে বর্গীব হাঙ্গামা একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। এই বর্গীর হাঙ্গামার সময় রাজশাহী বাসীকেও সর্বদাই আতঙ্কগ্রস্থ থাকিতে হইয়াছিল। মোঘল সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে পারিয়া মহারাষ্ট্রিরগণ উড়িষ্যার গিরি নদী অতিক্রম করিয়া উত্তরে সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম ও দক্ষিণে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের শাল বনের মধ্য

---

চাকলা রাজশাহীর অধীনে দেবীনগর গ্রামে রাজা উদিত নারায়ণের রাজবাড়ী ছিল। তাহা পদ্মা গর্ভে বহুদিন আগে নিমজ্জিত হইয়াছে। পদ্মা বর্তমানে দক্ষিণে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। পদ্মাব চরে নূতন দেবীনগরের সৃষ্টি হইয়াছে। গোদাগাড়ী থানার পশ্চিমে মহানন্দার পশ্চিম তীরে এই প্রাচীন ও নূতন দেবীনগর নির্দ্দেশ করা যায়। বীরভুমের দেবীনগর তো মনে হয় না।

দিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে সহস্র সহস্র অশ্বারোহী পঙ্গপালের মত বাঙ্লা দেশের বুকে প্রবেশ করিয়াছিল।

মহারাষ্ট্রিরগণ বিভিন্ন প্রদেশে রাজকরের চতুর্থাংশ "চৌথ" আদায় উদ্দেশ্যে এই অভিযান চালাইয়া ইং ১৭৪১-৪২ সালে বাঙ্লার দিকে ছুটিয়া আসিয়াছিল। ভাস্কর পণ্ডিত এই অভিযানের নেতৃত্ব করিতেছিল। লুঠ-তারাজই তাহাদের চৌথ আদাযের অবলম্বন। তাহাদের অত্যাচার হইতে প্রজাগণও রেহাই পায় নাই। অর্থের জন্য অযথা উৎপীড়ন ও গৃহদাহ করিত। ধন লুক্কাইত রাখিয়াছে সন্দেহ করিয়া লোকের নাসিকা, কর্ণ হস্ত পদাদি অবাধে কর্ত্তন করিত এবং এই অপরাদে অবলাগণের স্তন পর্য্যন্ত ছেদন করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হইত না। এমনি ভাবে তাহারা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে লুণ্ঠন করিয়া মুর্শিদাবাদ নগরের উপকণ্ঠে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে উপস্থিত হয়। ইং ১৭৪২ সালে এপ্রিল মাসে 'জগৎ শেঠের' কোষাগার হইতে তিন লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে। আলীবর্দ্দী খাঁন বাং ১১৪৭ সালে তাহাদের একবার কোন রকমে পরাস্ত করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু ক্রমাগত এই সমস্ত কার্য্যে প্রতিরোধ করিতে যাইয়া গুরুতর পরিশ্রমে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং বাধ্য হইয়া বাং ১১৫৭ সালে (১৭৫১ খ্রীঃ) বাঙ্লা, বিহার ও উড়িষ্যার চৌথ বাবদ বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকারে সন্ধি করিয়া উড়িষ্যার স্বত্ব ত্যাগ করেন। এই ঘটনা 'বর্গীর হাঙ্গামা' নামে খ্যাত৭৬। বর্গীর হাঙ্গামা বাঙ্লার নরনারীদের এত ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল যে, এখনও শিশু সন্তানদের ঘুম পাড়াইবার সময় বর্গীর ভয় দেখাইয়া ঘুম পাড়ানী ছড়া, গীত শুনাইয়া থাকে। বাঙ্লার লোক সাহিত্যে আজও–

ভাস্কর পণ্ডিত

ছেলে ঘুমাল, পাড়া জুড়ালো,  
বর্গী এল দেশে–  
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে  
খাজনা দিবে কিসে?  
ধান ফুরালো, পান ফুরালো,  
খাজনার উপায় কি?  
আর ক'টা দিন সবুর কর  
রশুন বুনেছি॥

পশ্চিম বঙ্গ তথা মুর্শিদাবাদ নগর মহারাষ্ট্রিরগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া লুঠ তারাজ, অগ্নিদাহ, নারী নির্য্যাতন হইতে থাকিলে বরেন্দ্র ভুমি নিরাপদ মনে করিয়া পদ্মা অতিক্রম করিয়া বিশেষতঃ মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার সহস্র সহস্র অধিবাসী রাজশাহী তথা উত্তর বঙ্গের নানা স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

এই সময় রাজশাহীর বুয়ালিয়া, গোদাগাড়ী, নওয়াবগঞ্জে, মালদহের জাহাঙ্গীর নগর এই চারিটি বিশিষ্ট উপনিবেশ স্থাপিত হয়। আগত মোহাজেরদের মধ্যে গৃহস্থ, কৃষি-মজুর, ব্যবসায়ী, শিল্পী, জমিদার, জোতদার, উচ্চ পদস্থ কর্মচারী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর

৭৬. Vide-Sair ul Mutakharin, Rajshahi Gazetteer, কালী প্রসন্ন কৃত 'বাঙলার ইতিহাস Stewarts' History of Bengal, অক্ষয় মৈত্রেয় কৃত সিরাজদ্দৌলা, Wellesley's Maharastra war প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

লোকই ছিল। চারঘাট, লালপুর, বুয়ালিয়া, গোদাগাড়ী, শিবগঞ্জ প্রভৃতি পদ্মা তীরস্থ থানাগুলির অধিবাসী বৃন্দের মধ্যে আনুমানিক শতকরা ৫০ জন লোক পশ্চিম বঙ্গে তাহাদের আদিবাস বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। তাহাদের চাল চলন ভাষা ইত্যাদি হইতে এখনও তাহা অনুমান করা যায়। দেশ বিভাগের পর মুর্শিদাবাদ তথা পশ্চিম বঙ্গ ও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু মোহাজের আসিয়া রাজশাহীতে বসবাস করিতেছে*। অধিকন্তু, পদ্মার ভাঙ্গা গড়ার স্মৃতির সহিত বহু মুর্শিদাবাদীর স্মৃতি জড়িত।

রাজশাহীর বিভিন্ন স্থানে পশ্চিম বঙ্গ বাসীব উপনিবেশ স্থাপন ও বসতি বিস্তার

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী নওয়াব পরিবারের আশ্রয় স্থল হিসাবে যুগে যুগে অমর হইয়া থাকিবে। বর্গীর হাঙ্গামায় অতিষ্ট হইয়া নওয়াব আলীবর্দ্দী খাঁন সপরিবারে পদ্মা পার হইয়া আপৎকালে এই গোদাগাড়ীতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ডেপুটি গভর্ণর নওয়াজেস মোহাম্মদ খানের নেতৃত্বে স্বীয় পরিবারের লোকজন ও আসবাবপত্র এতদসহ রাজধানীর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গোদাগাড়ীতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। সেইজন্য গোদাগাড়ীর কালীবারই পাড়াতে কেন্দ্র করিয়া স্বল্প কালের জন্য সৈন্য-গড় পথঘাট নির্মিত হইয়াছিল। 'কেল্লায়ে বারই পাড়া' নামে আজও সেই স্থান প্রসিদ্ধ। হিন্দুদের কোন কোন ইতিহাসে ইহা কালী বারই পাড়া নামে অভিহিত হইয়াছে। অথচ সিয়ার-উল-মুতাখেরিনে এই স্থান "কেল্লায়ে বারই পাড়া" নামে সুস্পষ্ট[৭৭]।

নওয়াব পবিবারেব উপনিবেশ স্থাপন

উত্তর বঙ্গে (বরেন্দ্র ভূমিতে) সন্ন্যাসী বিদ্রোহ মারাঠাদেব মতই ভয়াবহতা সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারাও লুঠ তরাজ, অগ্নিদাহ, নারী নির্য্যাতন এবং শিশুহত্যা অসহায় লোকদের নিষ্ঠুরভাবে বধ করিত। চলন বিলের বিখ্যাত 'পণ্ডিতা ডাকাত' দলের সহিত তাহাদের খণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল। বগুড়ার ভবানীপুর হিন্দু পীঠ সন্ন্যাসীর দল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া লুণ্ঠিত হইয়াছিল। শোনা যায়, "মারাঠা প্রধান ভাস্কর পণ্ডিত এই অঞ্চলে সন্ন্যাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল এবং সিঙ্গড়া থানার সন্নিকট পাকুরিয়া গ্রামে ঠাকুর পরিবার কর্তৃক আপ্যায়িত হইয়া ছিল। তাহার দরুণ তাঁহারা নাকি ভাস্কর পণ্ডিতের দল কর্তৃক একটি তরবারী লাভ করিয়াছিল।" কিন্তু বন্দ্রে ভূমির দক্ষিণাঞ্চল মারাঠা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল এই কথার মূলে প্রামাণ্য তথ্যের অভাব।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

---

* প্রথম খণ্ডে পাকিস্তান আমল দ্রষ্টব্য।

৭৭ The Seir-ul-Mutakharin, Vol. 1 PP 395-96 ইংরেজী অনুবাদ

## ॥ একাদশ পরিচ্ছেদ ॥

# রাজশাহীর জমিদারী বন্দোবস্ত

সম্রাট আকবর ও নওয়াব মুর্শিদকুলী খাঁর শাসন সময়ে রাজশাহীর প্রায় অধিকাংশ মুসলমান জায়গীরদার ও জমিদারগণ উৎখাত এবং বিতাড়িত হইয়া হিন্দু আমলা-কর্মচারীদের সহিত এই সব জমিদারী বিলি বন্দোবস্ত হয়। রাজশাহীর এই জমিদারী বন্দোবস্ত ও জমিদারগণের আত্মচরিত সম্পর্কে ইতিপূর্বে কিশোরী চাঁদ মিত্র (Rajas of Rajshahi, Calcutta Review) অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, কালীনাথ চৌধুরী, বিমলা চরণ মৈত্রেয় প্রমুখ বহু বই পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং রাজশাহীর জমিদারী ও জমিদারদের সম্পর্কে নূতন করিয়া লিখিতে যাওয়া ধৃষ্টতা তো বটেই, উপরন্তু সময় ও অর্থেরও অপচয় হইবে। স্বাধীনতা উত্তর যুগে ইং ১৯৫১ সালের '২৮' আইন অনুসারে এই সালের ১৫ই মে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ আইন কার্য্যকরী হওয়ায় পূর্ব্ব পাকিস্তানের অন্যান্য জেলার ন্যায় জমিদার প্রধান রাজশাহীর জমিদারগণেরও জমিদারী উচ্ছেদ হয়। আজাদী উত্তর যুগে এই সব জমিদার রাজশাহী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করায় তাঁহাদের অনেকের জমিদার বাটির আকৃতি প্রকৃতি পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। সমস্তই প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সুতরাং উপরোক্ত ইতিহাস, বংশাবলী, কুল পঞ্জিকা ও অন্যান্য বই পুস্তক হইতে সম্ভাব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রধান প্রধান জমিদারগণের পরিচিত স্বরূপ আমরা এই অধ্যায়ে তাহাদের বিষয়ে কিছু আলোকপাত করিতে প্রয়াস পাইব।

রাজশাহী জেলায় তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের বংশ ও সাঁতুলের রাজবংশ আদি ও প্রসিদ্ধ ছিল। এই দুই ভৌমিক বঙ্গের বার ভুঁইয়াদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। নাটোর রাজবংশের অভ্যুদয়ের আগে পুঁঠিয়া রাজবংশের উৎপত্তি। কিন্তু কালে নাটোর রাজবংশ নানা কারণে বঙ্গ বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্তীকালে নাটোর রাজের দেওয়ান দয়রামবংশ দীঘাপতিয়ার রাজার বিবিধ দান পুণ্যের জন্যে খুব খ্যাতি লাভ করেন। নাটোর রাজবংশ দীর্ঘদিন ধরিয়া নাটোর রাজ্য শাসন করেন। প্রাতঃস্মরনীয়া মহারাণী ভবাণীর শাসন শৃঙ্খলা ও দান পুণ্য রাজশাহী রাজ্যকে গৌরবময় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

সিংড়া থানার সন্নিকট প্রাচীন করতোয়া ও আত্রায়ের সঙ্গম স্থলে সাঁতুলের রাজার প্রাচীন রাজ বাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। সেখানকার সাঁতুলের বিল আজও তাঁহাদের স্মৃতি বহন করিতেছে। রাজা কংস বা গণেশের সময় সাঁতুল রাজের সৃষ্টি এবং ভাতুড়িয়ার অন্তর্গত ২৪১৯৭ টাকা বার্ষিক আয়ের ও অন্যান্য ১৩টি পরগণা সাঁতুল রাজের অধিকারে ছিল। সরকার পিঞ্জিরার অন্তর্গত সাঁতুল জমিদারী বিস্তৃত ছিল। সাঁতুল রাজের জমিদারগণের মধ্যে রাজা সীতানাথ, রাজা রামকৃষ্ণ ও তদীয় পত্নী রাণী সর্বাণী উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে যে, সাঁতুলের রাজবংশ পঞ্চপাতকী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই মহা পাপের জন্য এই বংশ

সাঁতুল রাজ

লোপ পাইয়াছে। কথিত আছে যে, সাঁতুলের রাণী সর্বানী কর্তৃক বগুড়ার ভবানীপুরের পীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিল[৭৮]। নাটোরের রাজা রামজীবন সাঁতুল হইতে একটি বিগ্রহ চুরি করিয়া আনিয়া নাটোরের 'জয়কালী মন্দিরের' সৃষ্টি করেন।

পুঁঠিয়া থানার অধীনে তাহিরপুরের 'রামরামা' গ্রামে তাহিরপুর ভৌমিকের আদি রাজ বাটীর ভগ্নাবশেষ বর্তমান। পঞ্চদশ শতকে তাহিরপুর রাজের প্রতিষ্ঠাতা কামদেব ভট্ট। তাহির খান নামক এক পাঠান জায়গীরদার উৎখাত হইয়া পরগনে তাহিরপুরের বিস্তীর্ণ জমিদারী কামদেব ভট্টর নামে বন্দোবস্ত হয়। তখন হইতে পরগণার নামানুসারে 'তাহিরপুর রাজের' প্রতিষ্ঠা হয়। পরে পরগণে ভাতুড়িয়ার জমিদার ও গৌড়ীয় সুলতানের কর্মচারী এই বংশের অধঃস্তন হরিনারাযণের পুত্র রাজা কংস নারায়ণই গৌড়ের সুলতান সিহাব-উদ-দীন বায়োজিদ শাহ ও তদীয় উত্তরাধিকারী আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে হত্যা করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ছিলেন। রাজা গণেশ ভাতুড়িয়া পরগণার বিখ্যাত জমিদার ছিলেন– সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বুকানন হ্যামিলটন রাজা গণেশকে "Hakim of Dynwaj" উল্লেখ করিয়াছেন। তখন বর্তমান দিনাজপুরের বহুলাংশ পরগণে ভাতুড়িয়ার অধীনে ছিল। হয়ত সেই জন্যই তিনি হ্যামিলটনের বিবরণে "Hakim of Dynwaj" (হাকিম অব দিনওয়াজ) নামে লিপিবদ্ধ হইয়াছে[৭৯]। রিয়াজ-উস-সালাতিনে রাজা গণেশের কলঙ্কময় চরিত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে কিন্তু হিন্দু ঐতিহাসিকগণ গণেশকে কলুষ মুক্ত করিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন[৮০]। রাজা গণেশ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বাঙলা দেশে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য কৃত সংকল্প হইয়াছিলেন। এবং মুসলমান নিধনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ব্যর্থ হন। এবং সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করিবার প্রতিশ্রুত হইয়াও গৌড়ের সিংহাসনে স্থায়ী হইতে পারেন নাই। এমন কি নিজ নামে মুদ্রাও প্রচার করিবার অবসর পান নাই। তাহার স্বপ্ন স্বপ্নই থাকিয়া গেল। তদীয় পুত্র যদু হজরত নূর-কুতুব-উল-আলমের উচ্ছিষ্ট পান খাইয়া মুসলমান হইয়া জালাল-উদ-দীন মোহাম্মদ শাহ নামে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তাহিরপুর রাজবংশ ও রাজা গনেশ

গণেশের জীবন অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ ছিল। হিন্দুর মনগড়া ইতিহাসে গণেশ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় যে, রাজা গণেশ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি ইসলামের উঠন্ত রাজ শক্তি দিগন্ত বিস্তৃত সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই তিনি মুসলমান সুলতানগণের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া চৈতন্য দেবের শিষ্য অদ্বৈতাচার্য্যের প্রপিতামহ নর সিংহ নাড়িয়াল নামক ব্রাহ্মণের পরামর্শে স্বীয় মনিবকে (সুলতান বায়োজিদ শাহাকে) হত্যা করেন। এবং সিংহাসনে আরোহন করেন। সিংহাসনে আরোহন করিয়াই তিনি দেশ হইতে ইসলামের মূলচ্ছেদ করিতে দৃঢ় সংকল্প করিলেন। এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু ইসলাম প্রচারক ও মুসলমানকে নানা ভাবে নির্য্যাতন করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই গৌড়ীয় মুসলমানদের অভিভাবক হজরত সেখ নূরুদ্দীন কুতুব-ই আলম তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা ও সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম

---

৭৮. উৎসাহ পত্রিকা, শ্রাবণ সংখ্যা–১৩০৫ সাল।

৭৯. Martin's Eastern India, Vol II, P 624.1

৮০. বাঙলার ইতিহাসের দু'শ বছর ঃ –শ্রী সুকুমার মুখোপাধ্যায়।

শর্কীর সহিত পত্রালাপ করেন[৮১]। সুলতান ইব্রাহিম (রাজ্যকাল ১৪০৫-১৪৪০ খ্রীঃ?) স্বীয় মুর্শেদের অনুরোধক্রমে গৌড় আক্রমণ উদ্দেশ্যে বাঙলার পশ্চিম সীমান্তে উপস্থিত হন। তখন রাজা হারাইবার আশঙ্খায় গণেশ নূর কুতুব-ই আলমের শরণাগত হইয়া সপরিবারে ইসলামে দীক্ষিত হইবার প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু পরে তাঁহার স্ত্রীর পরামর্শে তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিয়া স্বীয় অল্প বয়স্ক পুত্র জীতু মল বা যদুকে ইসলামে দীক্ষিত হইতে দিয়া তিনি স্বধর্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। যদু নূর কুতুব-ই আলমের উচ্ছিষ্ট পান খাইয়া মুসলমান হন[৮২]। এবং জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করিযাছিলেন[৮৩]। পরে ইব্রাহিম শর্কীকে দরবেশ স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সাময়িকভাবে রাজা গণেশ বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নূর কুতুব-ই আলমের মৃত্যু হইয়া মাত্র পুনরায় তাঁহার পূর্ব হিন্দু মানসিকতা ও হিন্দু প্রীতি স্বক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। পুত্র যদুর নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া পুনরায় গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করিলেন। যদুর প্রায়শ্চিত্যের আয়োজন হইল। একটি স্বর্ণ নির্মিত গাভী সুকৌশলে গঠিত করিয়া "যদুকে ইহার মুখ গহ্বরের মধ্য দিয়া উদরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার পর গোময় অনুলিপ্ত অবস্থায় গাভীটির মলদ্বার দিয়া বাহির করিয়া লওয়া এবং গাভীটির স্বর্ণ ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া হয়[৮৪]। এই ভাবে সুবর্ণ ধেনু ব্রতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যদুকে জাতে তুলিয়া নেওয়া হইয়াছিল।

তারপর ধীরে সুস্থীরে আবার নূতন ফন্দিতে "মুসলিম ধর্ষন" "যবন-দলন" আরম্ভ হইল। মুসলিম বঙ্গের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রনেতা নূর কুতুব-ই আলমের পুত্রদ্বয় শেখ আনোয়ার ও শেখ জাহিদকে সোনার গাঁয়ে (ঢাকা) নির্বাসিত করিয়া সেখানে গুপ্তচর দ্বারা পীর জাদা আনোয়ারকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইল[৮৫]। কুতুব-ই আলমের সময়ের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। এইভাবে মুসলিম ধর্ষন বা যবন দলনের মাধ্যমে বাঙলা দেশে হিন্দু ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। গণেশের অভ্যুত্থানে হিন্দু ধর্ম পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিলেও তাঁহার স্বল্পকাল রাজত্বের মধ্যে তাহার উন্নয়নের জন্য বিশেষ কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই।

একথা স্বীকার্য্য যে, গণেশ বাঙলা দেশে হিন্দু জাগরণের যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তৎপুত্র যদু তাহাকে পল্লবিত হইতে দেয় নাই। যদুর জন্য গণেশের প্রায়শ্চিত্ত বিফল হইয়াছিল। গণেশের মৃত্যুর পর ৮২১ হিজরীর শেষের দিকে (১৪৮ খ্রীঃ) যদু সিংহাসনে আরোহন করিয়াই রাজ্যের উন্নতি ও ইসলাম বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। এবং বহু হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। যে সব ব্রাহ্মণ "সুবর্ণ ধেনু ব্রত" অনুষ্টানে যোগদান করিয়া স্বর্ণাংশ দান স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন যদু বা জালাল-উদ-দীন তাঁহাদিগকে গোমাংস ভক্ষণ করাইযা জাতিচ্যুত করেন। এবং তাহারা মুসলমান

৮১. Bengal past and present, Vol, LXVII, 1948, pp 3839

৮২. রিয়াস উস-সালাতীন–ইংরেজী অনুবাদ পৃষ্ঠা ১১৬।

৮৩. রিয়াস-উস-সালাতীন–ইংরেজী অনুবাদ পৃষ্ঠা ১১৮।

৮৪. পূর্ব্ব পাকিস্তান ইসলাম–৮৯ পৃঃ।

৮৫. রিয়াস-উস-সালাতীন–১৩–১১৭ পৃঃ (ইংরেজী অনুবাদ)।

হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখানে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয় যে, বল্লালী কুল প্রথা প্রকারান্তরে বাঙলায় মুসলমানের আগমন ও ইসলাম বিস্তৃতির সূচনা করিয়া ছিল–আর রাজা কংস সেই বর্ণতর হিন্দু ধর্মকে পুনর্জীবিত করিতে যাইয়া আমানতে খিয়ানত করিয়াছিলেন।

রাজা কংসের অধঃস্তন বংশধর নরেন্দ্র নারায়ণ রায় কন্যা কুমারী উমাপতী দেবীকে রাখিয়া মৃত্যু বরণ করেন। আনন্দীরামের সহিত উমার বিবাহ হয়। আনন্দীরামের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা বিনোদরাম রায় এই বংশের উত্তরাধিকারী হন। এই বিনোদরামের বংশধর তাহিরপুর রাজের শেষ জমিদার রাজা শশি শেখরেশ্বর রায়। ইঁনি একজন সদাশয় ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। ইঁনি একাধারে জমিদারী, পঞ্চায়েতী সভার প্রতিষ্ঠাতা, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ছিলেন[৮৬]।

পুঠিয়ার রাজবংশ

ষোড়শ শতকে সরকার বারবাকাবাদের অন্তর্গত পরগণে লস্করপুর অবস্থিত। পদ্মার উভয় তীরে মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জেলায় ইহার ভূমি বিস্তৃত ছিল। বর্তমান পুঠিয়া গ্রামে এই পরগণার সদর এবং চারঘাঠ থানার আলাইপুর গ্রামে ইঁহার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। তখন এই পরগণার বার্ষিক রাজস্ব ছিল ২৫৫০৯০ দাম। এই লস্করপুর পরগণা পুঁঠিয়া রাজ বংশের প্রথম জমিদারী। বৎসরাচার্য্য নামক জনৈক ঠাকুর এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

পাক–ভারতের ইতিহাসে পাঠান মোঘল সংঘর্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ; পাঠানদের পরাজয়। মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং মোঘল সাম্রাজ্যে পাঠান জায়গীরদার উৎখাত ইত্যাদি সুবিদিত।

লস্করী খান একজন পাঠান জায়গীরদার। নিজ নামে পরগণে লস্করপুরের জায়গীরদারী করিতেন। একদা লস্করী খান বিদ্রোহী হইয়া মোঘল সরকারকে রাজস্ব প্রদানে বিরত থাকেন। বাদশাহ আকবর কর্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে সেনাপতি মান-সিংহকে প্রেরণ করিলে লস্করী খান উৎখাত হইয়া স্বীয় জমিদারী হইতে বেদখল হন। অতঃপর এই লস্করপুর পরগণা বৎসরাচার্য্য মতান্তরে তৎপুত্র পিতম্বরের নামে বন্দোবস্ত হয়। এই পিতম্বর হইতে পুঁঠিয়া রাজের উৎপত্তি[৮৭]।

উক্ত লস্কর খান পরে আলাইপুরে কিছুদিন অতিবাহিত করিবার পর পরলোক গমন করেন। তাঁহার অধঃস্তন বংশের দাবীদারগণ এখনও আলাইপুরে জীবিত আছেন। তাঁহা

আলাইপুরের খাঁ পরিবার

এই আলাইপুরের খাঁ নামে পরিচিত। এই বংশের ওয়ারিস খাঁনের পুত্র আবদুর রহমান খান, তৎপুত্র আনসার রহমান খান ও মাজদার রহমান খান এবং ওয়ারিস খানের অপর পুত্র ইসরাইল হোসেন খান তৎপুত্র ডা: নুরুল হোসেন খান প্রমুখ তিন সহোদর বর্তমান আছেন।

পুঁঠিয়া রাজের প্রতিষ্ঠাতা পিতম্বরের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা পুষ্করাক্ষ ও নীলাম্বর উত্তরাধিকারী হন। পুষ্করাক্ষ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হইলে নীলাম্বর সমস্ত বিষয় সম্পত্তির মালিক হন। পুঁঠিয়ার অধঃস্তন রাজবংশ এই নীলাম্বরের বংশক্রম। বাদশাহ জাহাঙ্গীর

---

৮৬. Vide, Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

৮৭. এই অধ্যায়ের জন্য আইন-ই আকবরী, পুঁঠিয়া রাজবংশ; Rajas of Rajshahi, মহারাণী শরৎ সুন্দরীর জীবন চরিত, রাজশাহী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

কর্তৃক নীলাম্বর রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। নীলাম্বরের পুত্র বৈবাহিক সূত্রে তাহিরপুর রাজের অর্দ্ধাংশ ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তৎপর জগন্নারায়ণ বাং ১২২৪ সালে পরগণে পাকুরিয়া (মেহ্মান শাহী) পরগণে কালীগাঁও, কালী সুবা এবং কাজী হাট্টা (রাজশাহী) ভবানন্দ দিয়াড় (নদীয়া) এই চারিটি পরগণা ও মহল খরিদ করিয়া পুঁঠিয়া জমিদারীর আয়তন ও আয় বৃদ্ধি করেন। জগন্নারায়ণ ও রাজেন্দ্র নারায়ণ স্বীয় দান পুণ্যের ফলে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। শেষের দিকে আসিয়া এই পুঁঠিয়া রাজবংশের অনেক জমিদার স্বীয় বংশের পূর্ব গৌরব রক্ষা করিতে পারে নাই। মদ মত্ততা ও বাইজী পরিবেষ্টিত হইয়া বহু পৈতৃক সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। পুঁঠিয়াতে এখনও সেই অধঃস্তন জমিদারদের কুকীর্তির নিঃশেষ বর্তমান আছে। পুঁঠিয়ার রাজবংশের অধঃস্তন দুইজন মহিলা পুঁঠিয়ার নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন। ইহারা যোগেন্দ্র নারায়নের স্ত্রী মহারাণী শরৎ সুন্দরী ও যতীন্দ্র নারায়নের স্ত্রী রাণী হেমন্ত কুমারী দেবী। রাজশাহীর কয়েকটি পুণ্য কীর্তি এই দুই মহিলার নাম অমর করিযা রাখিয়াছে।

হিন্দু পর্বের পুঁঠিয়া রাজবাড়ী এখন ধ্বংসোন্মুখ। পাকিস্তান আমলে মুসলমানদের বসতি বিস্তার ও নানা সদানুষ্ঠানের মাধ্যমে পুঁঠিয়ার নূতন চিত্র রচিত হইতেছে। খুবই আনন্দের কথা পুঁঠিয়াকে নূতন ভাবে ঢালিয়া সাজিয়া গড়িয়া তুলিতে স্থানীয় একদল কর্মী আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ভাবি, কালে হয়ত তাহা মুসলমানী কৃষ্টি-সভ্যতারই পুষ্টি সাধন করিবে।

রাজশাহী সদর মহকুমার অধীনে নাটোর-রাজপথে নাটোর টাউন হইতে প্রায় ১০ মাইল পশ্চিমে পুঁঠিয়া রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত।

নাটোর রাজবংশ

অষ্টাদশ শতকে নাটোর রাজের উৎপত্তি। রাজশাহী তথা উত্তর বঙ্গের জমিদারগণের মধ্যে নাটোর রাজ বিষয় সম্পত্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হিন্দু জমিদারী শাসনের অন্যায় অত্যাচার অবিচারের কথা সুবিদিত। তবুও নাটোর রাজের ক্ষুদ্র বৃহৎ কলঙ্ক থাকিলেও প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর শাসন শৃঙ্খলা ও দান পূণ্যে তাহা চাপা পড়িয়া যায়। ইংরেজ শাসন যন্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্ব পর্য্যন্ত নাটোর রাজে রাজশাহী রাজ্যের শাসনকেন্দ্র ছিল। নাটোরের রাজারা নওয়াবদের অধীনে শাসন করিতেন। এই শাসন কার্য্যের মাধ্যমেই রাণী ভবানী নাটোরকে দেশের গৌরব স্থল করিয়া তুলিয়াছিলেন। আপদ-বিপদে ১৭৭৭ এর মন্বন্তরে, ও বর্গীর হাঙ্গামায় নির্য্যাতীত তিনি দেশ বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ইতিহাসের কষ্টি পাথরে যাচাই করিলে দেখা যাইবে যে, নওয়াব মুর্শিদ কুলী খানই নাটোর রাজের পরোক্ষ প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারই অনুগ্রহে রঘু নন্দন নাটোর রাজের সৃষ্টি করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নওয়াব মুর্শিদ কুলী খাঁর শাসন সময়ে জমিদারী বিলি বন্দোবস্ত ও উচ্ছেদের কথা একটু আগেই উল্লেখ করিয়াছি। এই মুর্শিদ কুলীখাঁর শাসন সময়ে স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত ব্যাপারে রঘু নন্দন নওয়াব মুর্শিদ কুলীখাঁর প্রিয় পাত্র হইযা উঠিয়াছিলেন। এবং নওয়াব সরকারে সামান্য চাকুরী হইতে পদোন্নতি হইয়া ১১২৩ সালে (১৭১৬ খ্রী:) তিনি নওয়াবের প্রধান মুৎসুদ্দিও সায়েরাত বিভাগের প্রধান

ইজারাদার ছিলেন।

নওয়াব মুর্শিদ কুলী খাঁর সময়ে পুঠিঁয়াস্থিত ঠাকুর দীপ নারায়ণ পরগণে লস্করপুরের জমিদারি ছিলেন। রঘুনন্দের পিতা কামদেব ঠাকুর দীপ নারায়ণের লস্করপুর জমিদারীর বারই-হাটি গ্রামের সামান্য তহশীলদার ছিল। কামদেবের তিন পুত্র রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম। এই ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে রঘুনন্দন পুঠিঁয়া রাজার দেব মন্দিরের ফুল সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিল। এই সময় সে দীপ নারায়ণের অনুগ্রহে পড়া লেখা শিখিবার সুযোগ লাভ করে। কালে রঘু নন্দন স্বীয় প্রতিভা ও দক্ষতায় পুঁঠিয়ারাজের নওয়াব দরবারের উকিল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন জমিদারীর অভাব অভিযোগের ব্যাপারে রঘুনন্দনকে মুর্শিদাবাদ সদরে থাকিতে হইত।

এই সময়ে নওয়াবের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া তিনি কানুনগোর পদ লাভ করেন। অতঃপর রঘুনন্দন মুশিদাবাদে অবস্থান কালে যে সব জমিদার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন ও যাঁহারা উচিৎ রাজস্ব দিতেন না তাঁহাদের জমিদারী বেদখল হইয়া গেলে নওয়াবের সাহায্যে সেই সব জমিদারী রঘনন্দন নিজ নামে না লইয়া নাম মাত্র নজরানায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদয় রামজীবন ও তদীয় পুত্র কালীকা প্রসাদের (কালু কোঙর) নামে বন্দোবস্ত করিয়া লইতে থাকেন।

রঘুনন্দনের জমিদারী লাভ ও রাম জীবন

এই ভাবে তিনি একাদিক্রমে ১১১৩ সালে (১৭০৬ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী) পরগণে বানগাছি, ১১১৭ (১৭১০ খ্রীঃ) পরগণে ভাতুড়িয়া ১১২১ সালে (১৭১৪ খ্রীঃ) পরগণে রাজশাহী; ১১২২ সালে (১৭১৫ খ্রীঃ) পরগণে নলদাহ: ১২২১ সালে (১৭১৪ খ্রীঃ) পরগণে ভূষনা ও ইব্রাহিমপুর প্রভৃতি ১১৩১ সালে (১৭২৪ খ্রীঃ) হাবিলি মোহাম্মদপুর, শাহজিয়ান, তুজ্জী স্বরূপপুর প্রভৃতি বহু জমিদারী ক্রয় করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিস্তৃত জমিদারীর অধিকারী হইয়া উঠিলেন[৮৮]। এই সময়ে রামজীবনের জমিদারী আয়তন ও রাজস্বের দিক দিয়া সর্ব বৃহৎ ছিল। তখন লস্করপুর পরগণা ব্যতীত মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, মালদহ, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর, ফরিদপুর, ঢাকা, যশোর, সাঁওতাল পরগণা ভাগলপুর প্রভৃতি জেলাতে ১৩৯ টি পরগণার মধ্যে নাটোর জমিদারী বিস্তৃত ছিল। তখন আয় ছিল ৫২ লক্ষের অধিক। মোট ১৩৯ টি পরগণার রাজস্ব ছিল মাত্র ১৭৪১৯৮৭ মতান্তরে ১৬৯৬০৮৭ টাকা।

পরগণে বানগাছি, ভাতুড়িয়া ও পরগণে রাজশাহী খরিদ করিবার পর রামজীবন নাটোর রাজবাটি নির্মান করেন। সেই প্রাচীন রাজবাটি ১৩০৪ সালের ভুকম্পনে ধ্বংস হইয়া গেলে পুনরায় যে রাজবাটি পুনর্নিমিত হয় তাহাই বর্তমান রহিয়াছে।

রাজবাটী নির্মাণ

নাটোর রাজ্যের দেওয়ান দয়রামের দক্ষ শাসনে নাটোর রাজের গৌরব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রামজীবন ও দয়রাম নাটোর এবং মুর্শিদাবাদ বরাহ নগরে (আজিমগঞ্জ রেল ষ্টেশনের সন্নিকট) আর একটি রাজ প্রাসাদ নির্মান করিয়া রঘুনন্দন গঙ্গা পদ্মার তীরে বসবাস করিতে থাকেন। অক্ষয় মৈত্রেয় লিখিয়াছেন যে, "রামজীবনের বীরত্ব, সাহস, কর্ম কুশলতা এবং রঘুনন্দনের ভ্রাতৃপ্রেম একত্রিত হওয়ায় নাটোর

---

৮৮ Vide-Rajas of Rajshahi, Calcutta Review.
উৎসাহ শ্রাবণ সংখ্যা ১৩০৫ সাল। কালী প্রসন্ন কৃত বাংলার ইতিহাস প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

রাজবংশের বিস্তীর্ণ রাজ্য লাভের মূল কারণ। মন্ত্রী দয়রামের পরামর্শে রামজীবন জমিদারীকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া (যথা - নাটোর, বরাহনগর ও শেরপুর, বগুড়া) তিনটি রাজকাচারী স্থাপন করেন। রামজীবন বাদশাহ কর্তৃক বাং ১১১৩ সালে 'রাজাবাহাদুর' উপাধি লাভ করেন।

বাং ১১৩১ সালে রঘুনন্দনের মৃত্যু হয়। এই সময় রামজীবনের পুত্র দ্বয়েরও মৃত্যু হয়। কেবল মাত্র বিষ্ণুরামের একমাত্র পুত্র জীবিত থাকে। তথাপি জনৈক রসিক রায়ের পুত্র 'রামকান্তকে' দত্তক রাখিয়া (১৭৩০ খ্রীঃ) রামজীবন পরলোক গমন করেন। রামকান্তের সময় নাটোর রাজের পরগণা সংখ্যা ১৬৪ এবং মোট রাজস্ব ছিল ১৮৫৩৩২৫ টাকা। দয়রামের চেষ্টাতেই এই উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল।

রাজা রামকান্ত

রামকান্তের সহিত রাণী ভবাণীর বিবাহ

বগুড়া জেলার অন্তর্গত শান্তাহার রেলওয়ে জংশনের সন্নিকট ছাতিয়ান গ্রাম নিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর ভবাণী নাম্নী ১৫ বৎসর বয়স্কা কন্যার সহিত রামকান্তের বিবাহ হয়।

রাজকার্য্যে অযোগ্য থাকায় নওয়াব আলীবর্দ্দীর শাসন সময়ে রামকান্ত রাজস্ব ঠিক সময়ে পরিশোধ না করায় নাটোরের অধিকাংশ পরগণা বেদখল হইয়া যায়। তখন কতিপয় তোষামোদ প্রিয় লোক পরিবেষ্টিত হইয়া রামকান্ত পিতার বন্ধু ও বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারামকে অপসারিত করেন। কিছুকাল কষ্টভোগের পর পুনরায় রামকান্ত দয়ারামের শরনাপন্ন হওয়ায় দয়ারাম নানা কৌশলে রাজ্য ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন।

দয়ারামের প্রতি অবিচার

রাণী ভবাণীর গর্ভজাত একমাত্র কন্যা তারা সুন্দরীকে রাখিয়া ১১৫৩ সালে (১৭৪৮ খ্রীঃ) রামকান্ত পরলোক গমন করেন। খাজুরা নিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত তারার বিবাহ হয়। কিন্তু অকালে রঘুনাথের হইলে অন্য উপায় না দেখিয়া ১১৫৮ সালে রাণী ভবাণী তারা ও দয়রামের উৎসাহে স্বয়ং নাটোরের রাজপদে অধিষ্ঠিতা হন।

রাণী ভবাণীর জমিদারী কালে বঙ্গদেশ মহারাষ্ট্রীয় কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এই সময় তিনি নানা উপায় অবলম্বন করিয়া প্রজাগণকে নিরাপদে রাখিয়াছিলেন। রাণী ভবাণীর সময়ে রাজশাহী রাজ্যের প্রজাগণ সুখে শান্তিতে দিন যাপন করিয়াছিলেন। জমিদারীর খাজনা আদায় ব্যাপারে তিনি কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইংরেজগণ তাঁহার প্রজা পালনের বহু তারিফ করিয়া গিয়াছেন।

রাণী ভবানীর রাজপদ লাভ

বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রথম সমর্থক হইয়া রাণী ভবাণী স্বীয় কন্যা তারার দ্বিতীয় বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কথিত আছে যে, এই সময় রাণী ভবাণীর সহিত বরাহনগরে তারা সুন্দরীর (ঠাকুর ঝি) অবস্থান কালে নওয়াব সিরাজদ্দৌলার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবার ব্যাপারে চিঠি পত্র আদান প্রদান হইয়াছিল। তারা নওয়াব সিরাজদ্দৌলার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িলে রাণী ভবাণী তারার মৃত্যু রটনা করিয়া তাঁহাকে কাশীতে নির্ব্বাসিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু, অক্ষয় মিত্রের ও কিশোরী চাঁদ মিত্রের বিবরণে এই ঘটনা একটু কৌশলে লিখিত হইয়াছে।

তারাব দ্বিতীয় বিবাহে নওয়াব সিরাজদ্দৌলার প্রস্তাব

ইসলাম ও মুসলমানের সেবার নওয়াব বাদশাহদের দান পুণ্যের কথা সুবিদিত। রাজশাহী দানের সংখ্যা ১২/১৩ টি হইবে। যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব। বোধহয় উক্ত দান পুণ্যের সূত্র ধরিয়াই নাটোর রাজ তথা রাণী ভবাণীর দানের সূত্রপাত হইয়াছিল। কাশী বেনারসে রাণী ভবাণীর বহু পুণ্য কীতি রহিয়াছে। রাজশাহী জেলায় সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপারে তিনি বহু টোলের পন্ডিতগণের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন*। দেব মন্দির ইত্যাদি ব্যাপারে বহু দেবোত্তর ছাড়াও মুসলমান পীরের জন্যও তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন। রাজশাহীর সন্নিকট পাথরঘাটা ও বনগাঁও প্রভৃতি স্থানে তিনি পীরোত্তর দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও তিনি জীবনভর দান খয়রাত করিয়া গিয়াছেন। মোট কথা নাটোর রাজের অধীন প্রত্যেক স্থানে তাঁহার কিছু কীতি এখনও কালের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। '৭৭ এর ঐতিহাসিক মন্বন্তরে রাণী ভবাণীর রাজকোষ দান খয়রাতে প্রায় শূন্য হইয়া গিয়াছিল। এই সময় প্রজা বৃন্দের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া পড়েন। অবশেষে দত্তক পুত্ররামকৃষ্ণের হাতে নাটোর রাজের দায়িত্ব ভার অর্পন করেন। রাণী ভবাণীব মৃত্যুর পর রাজা রামকৃষ্ণ নাটোর রাজের উত্তরাধিকারী হন। এই রামকৃষ্ণের রাজকার্য্যে অযোগ্যতার দরুণ নাটোর রাজ ধ্বংস হইতে থাকে। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তাঁহার সরলতার সুযোগ লইয়া আমলাগণ প্রজাবৃন্দকে নানাভাবে উৎপীড়ন করিতে থাকেন। এবং খাজনা ইত্যাদি আদায় করিয়া আমলারা উহা আত্মসাৎ করেন। অর্থের অভাবে ঠিক সময়ে রাজস্ব পরিশোধ করিতে না পারিয়া কোম্পানী সরকারের দেনার দরুন১৭৯৩ সালে ৬ই মার্চ রাজা রামকৃষ্ণকে কারাবাসে যাইতে হয়। এই সালের ১৮ই মার্চ একটি "অঙ্গীকার পত্র" অনুযায়ী তিনি মুক্তি লাভ করেন বটে, কিন্তু পরবর্তী কালে সমূদয় টাকা পরিশোধ করিতে না পারিয়া বাকী রাজস্বের দরুন বহু পরগণা নিলাম হইয়া যায়। বৃদ্ধ বয়সে রাজা রামকৃষ্ণ দুই পুত্র বিশ্বনাথ ও শবনাথকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। যে নাটোর-রাজ্য রাজা রামকান্ত ও রাণী ভবাণীর সময়ে বাঙলার শ্রেষ্ঠ জমিদারী ছিল। সেই রাজ্য রামকৃষ্ণের সময় ধ্বংস হইয়া অতি ক্ষুদ্র জমিদারীতে পরিণত হয়।

বাদশাহী দানের সূত্র ধরিয়া রাণী ভবাণীর পুণ্য কীর্তি ও নাটোব রাজ্যর পতন

পিতার মৃত্যুর পর জ্যৈষ্ঠ বিশ্বনাথ পিতার ক্ষুদ্র রাজ্যের এবং কনিষ্ঠ শিবনাথ দেবোত্তর সেবার অধিকারী হন। এই সময় হইতে নাটোর রাজ 'ছোট' ও 'বড়' এই দুই তরফে ভাগ হইয়া যায়। এই দুই তরফের রাজা ও তাঁহাদের বংশাবলী নাটোর রাজের কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই। দানপুণ্যে তাঁহাদের নিজস্ব কোন কীতি নাই। ত্যাগীর

নিম্নলিখিত টোলগুলি রাণী ভবাণীর দানে পরিচালিত হইত। যথা- নাটোর সারস্বত টোল; অভয়া, চতুস্পঠি, আনন্দময়ী চতুস্পাঠি; রাণী হেমাঙ্গিণী চতুস্পাঠি; রাণী ভবাণী চতুস্পাঠি; বাসুদেবপুর; বৈদ্য বেলঘরিয়া; পূর্বে এখানে কাব্য, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি পড়ান হইত। বাসুদেবপুরে বহু পন্ডিত ছিলেন। তৎকালে এই স্থানদ্বয়কে উত্তর বঙ্গের নবদ্বীপ বলা হইত। হাল্সা; মাঝগ্রাম; পুঁঠিয়া; থাঐপাড়া; এখানে কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন ও আয়ুর্ব্বেদ পড়ান হইত। গুড়নই; মির্জাপুর দীঘা; মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টিকাকার রমতর্কবাগীশ মহাশয় এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। আকদীঘা; মান্দা; এই টোলগুলির অধিকাংশই রাজশাহী জেলার পূর্বাঞ্চলে বিশেষত নাটোর মহকুমার অবস্থিত (উত্তর বঙ্গের সংস্কৃত চর্চার বিষয়ে আমাদের পরবর্তী ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। নাটোরের বিখ্যাত অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ব্যাকারণতীর্থ একজন অমায়িক ও পন্ডিত ব্যক্তি।

চেয়ে ভোগী হইয়াছিলেন বেশী। তাঁহারা একাধিক বিবাহ করিয়া ছিলেন। তবুও তাঁহাদের চরিত্রে নানা কলঙ্ক ছিল। ছোট তরফের রাজা শিবনাথ নয় (৯) টি বিবাহ করিয়াছিলেন।

বড় তরফের রাজা জগদিন্দ্রনাথ গোবিন্দ্র চন্দ্র নাথের দত্তক পুত্র। আধুনিক শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত হইলেও তিনি বিশেষ কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। লেখক এবং 'মানসী ও মর্মবানী' নামক একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি রসিক সমাজে কিছুটা পবিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

নাটোর-রাজ বংশের উপসংহারে আমরা এতটুকুই অবগত হইয়াছি যে, রাজা রামজীবনের উপযুক্ত মন্ত্রী দয়বামের কর্ম কুশলতা এবং মহারাণী ভবাণীর দান পূণ্যে যে নাটোর রাজের সুখ্যাতি শতাধিক বৎসর ধরিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল আর সেই 'নাটোর' রাজা রামকৃষ্ণের সময়ে তাঁহার অযোগ্যতার দরুন ধ্বংসোম্মুখ হয় এবং পরে ছোট ও বড় তরফের রাণী কৃষ্ণমণি ও রাণী শিবেশ্বরী সেই নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধাবের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন[৮৯]।

রাজশাহী জেলায় হিন্দু জমিদারদের যতগুলি দানপুণ্য রহিয়াছে তন্মধ্যে দীঘাপতিয়া রাজের দান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা ইংরেজী শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত ছিলেন। রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়াম ও রাজশাহী কলেজ ইঁহাদের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। নাটোর রাজের দেওয়ান দয়রাম রায় (১৬৪০ - ১৭৬০ খ্রী:) দীঘাপতিয়া রাজের প্রতিষ্ঠাতা। এই দয়রাম রায় নাটোর বাজের সামান্য কর্মচারী হইতে দেওয়ানী পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

দীঘাপতিয়া বাজের উৎপত্তি

যশোহরের মোহাম্মদপুর ভুষণার জমিদার সীতারাম বিদ্রোহী হইয়া রাজস্ব বন্ধ করিলে নওয়াবের আদেশে দয়রাম সসৈন্যে সীতারামকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী কবেন। পরে নাটোর কারাগারে সীতারামের মৃত্যু হয়।

বংশাবলী

নওয়াব ও বামজীবনের অনুগ্রহে দয়রাম প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী হন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র জগন্নাথ রায় উত্তবাধিকারী হন। জগন্নাথের উত্তরাধিকারী প্রাণনাথ দত্তক রাখিয়া পরলোক গমন করেন। এই প্রাণনাথের উত্তরাধিকারী রাজা প্রসন্ননাথ হইতে পরবর্তী অধিকাংশ উত্তরাধিকারী দত্তক ছিলেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই রাজা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের রাজা প্রমথনাথের চারি পুত্র এক কন্যা। ইঁহারা রাজা প্রমদানাথ, কুমাব শরৎ কুমার, কুমার বসন্ত কুমার, কুমার হেমন্ত কুমাব রায় ও রাজকুমারী ইন্দুপ্রভা। ইঁহাবা সকলেই ক্ষণজন্মা ছিলেন।

বাজবাটি নির্মাণ

দয়রাম দীঘাপতিয়াতে রাজ বাটি নির্মান কবিয়াছিলেন। ১৩০৪ সালের (১৮৯৭ খ্রী:) ভূকম্পনে তাহা ধ্বংস হইয়া গেলে সেই ভগ্ন স্তূপের উত্তর ধারে রাজা প্রমদানাথ যে নূতন একতলা ইমারত নির্মান করেন তাহাই এখন বর্তমান আছে[৯০]। এই রাজ বাড়ীতে বহু দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান জিনিষপত্র রহিয়াছে। উপযুক্ত রক্ষীর অভাবে ইঁহার বহু

৮৯ নাটোব বাজেব আলোচনা ও বিস্তৃত তথ্যের জন্য Rajas of Rajshahi, Calcutta Revew; The Modern History of the India chiefs Rajas and zaminders pt 11 'রাণী ভবাণী' প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৯০. বিস্তৃত বিবরণের জন্য প্রধানত Administration Report of the Rajshahi Division, 1898-99, Rajas of Rajshahi and Dighapotia Rajfamily etc

মূল্যবান জিনিষ পত্র উধাও হইয়া যাইতেছে। এবং রাজ প্রাসাদটি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহা রাজশাহীর একটি দর্শনীয় কীর্তি বটে। নাটোর টাউন হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তরে ইহা অবস্থিত।

রাজশাহীর নওগাঁ মহকুমা শহরের প্রায় ৪/৫ মাইল পশ্চিমে দুবোল হাটির রাজবাটি অবস্থিত। বর্ষার সময় এই দুবোলহাটি একটি দ্বীপের ন্যায় দেখায়। তখন দুর হইতে রাজবাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মানোমুগ্ধকর হয়। দুবোল হাটির চারিপার্শে প্রায় ৬০ টি বিল গণনা করা যায়। এই বিলের অধিকাংশই দুবোল হাটির জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত যজ্ঞেশ্বব পুর নিবাসী শুড়ী জাতীয় জগৎরাম রায় নামক একজন লবণ ব্যবসায়ী এতদঞ্চলে আসিয়া স্বীয় সমৃদ্ধির আশায় দুবোল হাটির অদূরে কসবা গ্রামে সর্ব প্রথম বসতি স্থাপন করেন। পরে বাদশাহী সনদ মূলে এই বিল অঞ্চলের জঙ্গলাদির ইজারাদার হন। আর একটি জনশ্রুতি এইরূপ; ইহারা রাজশাহী জেলার প্রাচীনতম জমিদার বংশ। কিন্তু এই জনশ্রুতি ভিত্তিহীন। যাহা হউক, এই বংশ রাজশাহী জেলার শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রগামী ছিলেন। মুক্তরাম চৌধুরীর বংশ কৃষ্ণরাম ও রঘুরাম এই রাজের উত্তরাধিকারী হন। ভ্রাতৃ কলহে জমিদারী ভাগ হইয়া কৃষ্ণরাম মৈনম গ্রাম এবং রঘুরাম কসবা হইতে বর্তমান দূবোল হাটিতে রাজবাটি নির্মান করেন। কৃষ্ণরাম নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে তাঁহার স্ত্রী এই জমিদারী বলিহার ও দামনাশের জমিদারের নিকট বিক্রয় করেন। রঘুরামের বংশধরগণ জমিদারী উচ্ছেদ আইন কার্যকরী হওয়া পর্য্যন্ত দুবোল হাটিতেই জমিদারী করেন। এই বংশের রাজা হরনাথ একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তিনি বহু দানপুণ্য রাখিয়া গিয়াছেন। নওগাঁ ও রাজশাহীতে তাঁহার কয়েকটি পুণ্য কীর্তি আছে। রাজশাহীর প্রাচীনতম পত্রিকা হিন্দুরঞ্জিকা প্রকাশের জন্য যে মুদ্রাযন্ত্র দান করিয়াছিলেন তাহা এখন একটি ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য।

দুবোল হাটি বাজ

মুদ্রা যন্ত্র

দুবোল হাটির রাজারা প্রকারন্তরে মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহারা প্রজাদের নানাভাবে জুলুম করিতেন। খাজনার রেট ও পত্তো জমির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির জন্যে এবং স্থানীয় কতিপয় অসহায় প্রজাদের উপর নানা উৎপীড়ন ও পাশবিক অত্যাচার করার অভিযোগে 'হাসাই গাড়ীর' মৌলবী আস্তান মোল্লার নেতৃত্বে বাং ১২৯১ সালে (১৮৮৩ খ্রী:) প্রায় ৫০ হাজার প্রজা বিদ্রোহী হইয়া ৭ বৎসর যাবৎ খাজনা বন্ধ করিয়া দেন। পরে রাজা হরনাথের দুই স্ত্রী হাতীর পীঠে চড়িয়া প্রজাবৃন্দের কাছে সানুনয় পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং সেটেলমেন্ট অফিসারের মাধ্যমে প্রজাদের সহিত একটা আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া লন।

কাশিমপুর লাহিড়ী জমিদার বংশ শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া দাবী করেন। রাম কিশোর লাহিড়ী এই বংশের অদি পুরুষ। এই বংশের অধঃস্তন কেদার প্রসন্ন ও তৎপুত্র অন্নদা প্রসন্ন স্বীয় দান পুণ্যের জন্য অমর হইয়া আছেন। রায় বাহাদুর গিরিশচন্দ্র লাহিড়ীও এই বংশের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। এই গ্রামে কাশিম খাঁ নামক এক পাঠান জায়গীরদার মোঘল সেনা কর্তৃক উৎখাত হইয়া কাশিমপুর চৌধুরী বংশের উৎপত্তি করেন।

কাশিমপুর লাহিড়ি ও চৌধুরী বংশ

প্রাণকৃষ্ণের বংশধর বলিহার রাজ বংশের আদি। এই প্রাণকৃষ্ণের প্রপৌত্র রাজেন্দ্র

রায় নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করেন। এই বংশের কৃষেন্দ্র রায় শিবপ্রসাদ রায়ের দত্তক পুত্র ছিলেন। ইঁনি যৌবনে বহু পাপ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া পরিণত বয়সে অনুতপ্ত হন এবং কয়েক খানি উপদেশ মূলক পুস্তক লিখিয়া জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার 'স্বভাব নীতি' নামক একখানা পুস্তকে নিজের জীবন সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "প্রাচীন! এখন আর বৃথা রোদন করিয়া বক্ষঃস্থল আর্দ্র করিতেছ কেন? পূর্বে বিবেচনা না করিয়াই অধুনা এতাদৃশ্য দুর্গতি লাভ করিলে।" তিনি বলিহার জমিদার বাটিতে একটি গোলাপ ফুলের বাগান তৈয়ারী করিয়াছিলেন। মহাদেবপুর ও নওগাঁর মধ্যবর্তী স্থানে বলিহার জমিদার বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে।

বলিহার জমিদার বংশ

রাজশাহী জেলার তালন্দ মৈত্রের বংশীয় জমিদার নানা কারণে প্রসিদ্ধ। এই জমিদার বংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা ব্রজকিশের মৈত্রের। এই বংশে আনন্দমোহন মৈত্রের দত্তক পুত্র হিসাবে ললিতমোহন মৈত্র জমিদারীর উত্তাধিকারী হন। ললিতামোহন মৈত্র একজন সাধক ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। বহু সদানুষ্ঠানে তাঁহার দান পুণ্য লুক্কায়িত আছে। তাঁহার জমিদারী মধ্যে 'ললিতনগর রেল ষ্টেশন' তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে। তদীয় উত্তরাধিকারী রায় বাহাদুর ব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্রেয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বটে। তালন্দের শিব বিখ্যাত। ইহার নামে বহু দেবোত্তর আছে।

তালন্দ মৈত্রে জমিদার বংশ

এই বংশের আর একটি শাখার গোবিন্দমোহন মৈত্রের দত্তক পুত্র ছিলেন কুঞ্জমোহন মৈত্রেয় একজন বিণয়ী ও সরল প্রকৃতির ব্যক্তি। রাজশাহী শহরের বিভিন্ন সদানুষ্ঠানে তাঁহার অবদান লুক্কায়িত আছে।

রায় বাহাদুব ধরণীমোহন মৈত্রেয়

ইঁনি রাজা জমিদার নহেন। "ইঁনি নিজেই একজন অক্ষয়কীর্তি।" তানোর থানার নানা সদানুষ্ঠানের সহিত তিনি অমর হইয়া আছেন। তাঁহার 'দেশপ্রেম' ও জন সেবার কথা এ অঞ্চলে এখনও মুখর হইয়া আছে। ১৩৬২ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ইঁনি তালন্দের অধিবাসী ছিলেন।

পল্লীর মানুষ শশীশেখর

বর্গীর হাঙ্গামার সময় মহাদেবপুর ও কানষাটের জমিদারের পূর্ব পুরুষ রাঢ় হইতে বরেন্দ্র ভূমিতে আবির্ভূত হন এবং মোঘল সরকারের অনুগ্রহে কালক্রমে জমিদারী লাভ করেন। ইঁহারা রাহী-জমিদার বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারাও ভারতে পাড়ি দিয়াছেন।

মহাদেবপুর ও কানষাট জমিদারী

নওগাঁ টাউন হইতে ১৩ মাইল দূরত্বে মহাদেবপুর থানার সন্নিকট মহাদেবপুর জমিদার বাটির ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। ইঁহাদের পূর্ব পুরুষ দিল্লীর বাদশাহের অধীনে স্থানীয় পরগণে জাহাঙ্গীরপুরের 'মসনদার' ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। তিনি কোন এক যুদ্ধে মোঘল সরকারের পক্ষে জয়লাভ করেন। এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ অধঃস্তন বংশধর "বিরেশ্বর রায়" পরগণে জাহাঙ্গীরপুরের জায়গীরদারী লাভ করেন। তাহাই জমিদারীতে পরিণত হইয়াছিল।

প্রজা সাধারণের মঙ্গলার্থে মহাদেবপুর জমিদারের স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়টি অন্যতম উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী নীলরতন দাস একজন সুসাহিত্যিক ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন।

মহাদেবপুর জমিদারের পূর্ব পুরুষ প্রতিষ্ঠিত 'আদ্য বাড়ী' একটি পৈত্তিক দেবালয় ছিল। মহাদেবপুর হইতে তিন মাইল দূরত্বে দেবীপুর নামক গ্রামে ইহার ধ্বংসাবশেষ আছে। এখানে শতাধিক শিব ও ভগবতীর প্রস্তর মূর্তি স্থাপিত ছিল। ইহা দ্বিতীয় "কাশী" কল্পনায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। মহাদেবপুর হইতে ৫ মাইল দূরত্বে "কুশুম শহর" নামক একটি প্রাচীন স্থান বর্তমান আছে। এখানে বহু দীঘি পুষ্করিণী ও ইষ্টক নির্মিত বাড়ীর ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। 'আখিয়া' গ্রামের মন্দিরটিও প্রাচীন।

কুশুম শহর

শিবগঞ্জ থানার কানষাট একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানকার জমিদারদের আদি পুরুষ প্রথমত: বগুড়া জেলার 'কড়ইঝাকৈর' গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। দস্যু সরদার পণ্ডিত ডাকাতের অত্যাচারে তাহারা মোমেনশাহী জেলার মুক্তাগাছাতে স্থানান্তরিত হন। পরে তাহাদের জমিদারী মধ্যে রাজশাহীর এই কানষাটে আসিয়া স্থায়ী হন। সূর্য্যকান্ত, শশীকান্ত ও শীতাংশুকান্ত এই বংশের অধঃস্তন বংশক্রম। প্রজা সাধারণের জন্য ইহারা কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহারা মুসলমান বিদ্বেষী জমিদার হিসাবে কুখ্যাত ছিল। বলা বাহুল্য জমিদারী কার্য্য ছাড়াও ইহারা 'হাতীর কেনা বেচা' করিতেন। আসামে তাহাদের একটি "খেদা" ছিল।

তাহাদের মুসলমান বিদ্বেষীর বহু দৃষ্টান্ত এতদঅঞ্চলে বর্তমান আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৪০ সালে স্থানীয় কাগজী পাড়ার মুসলমান সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করে ষড়যন্ত্র মূলক স্বরস্বতী পূজা উপলক্ষে বিখ্যাত সুভাস চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়া স্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের (মসজিদ) সম্মুখে নানারূপ ব্যঙ্গনৃত্য করিতে করিতে গমন করায় হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একটি দাঙ্গা হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। ফলে, ১-২-৪০ সালে স্থানীয় শ্যামপুর চৌধুরী পরিবারেব নেতৃত্বে বাজিত পুর গ্রামের 'আম্রকাননে" প্রায় ১২টি ইউনিয়নের মুসলমান সম্প্রদায় একত্র হইয়া উহার জোর প্রতিবাদ জানায় এবং একটি মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় (মোকদ্দমা) জমিদার শীতাংশু বাবু হারিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়কে ডাকিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং সাময়িক বিপদ হইতে অবহিত পান। এই হাঙ্গামা সংক্রান্ত মামলার যাবতীয় কাগজ পত্রের নকল স্থানীয় চৌধুরী মৌলবী আবুল ফজল সাহেবের নিকট রক্ষিত আছে।

এতদব্যতীত রাজশাহী জেলায় আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার ছিল। যেমন নাটোরের শুকুল, জোয়ারীর চৌধুরী, চৌগ্রামের ভাদুড়ী, পতিসরের ঠাকুর প্রভৃতির নাম করা যায়। আজাদী উত্তর যুগে নাটোর, পুঁঠিয়া ও দীঘাপতিয়া প্রভৃতি জমিদার বংশের উত্তরাধিকারীগণ মাতৃভূমি দর্শনার্থে ইতিমধ্যে দুই এক বার আসিয়া থাকিবেন। কিন্তু ক্ষুদ্র জমিদারগণ পূর্ণবার রাজশাহীর ভূমি দর্শন করেন নাই। অথচ হিন্দু শাস্ত্রে লেখা আছে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী।" বলাবাহুল্য, আজিকার রাজশাহী দর্শন করিলে, আশা করি তাঁহারা আনন্দই লাভ করিবেন। এই খানেই আমরা রাজশাহীর হিন্দু জমিদার পর্বের কথা শেষ করিয়া এখন মুসলমান জমিদার, আয়মাদার ও জায়গীরদার সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আলোকপাত করিতে প্রবৃত্ত হইব।

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥

# মুসলমান জমিদার ও আয়মাদার বংশ

রাজশাহী জেলায় মুসলমান জমিদারের সংখ্যা খুবই কম। যে কয়েকটি জমিদার পরিবারের নাম জানা যায়, তাঁহাদের পূর্ব পুরুষেরা ঠিক জমিদার হিসাবে আবিভূত হন নাই। তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন সাধক, দরবেশ, জায়গীরদার এবং নওয়াব ও কোম্পানী আমলের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী রূপে। সুতরাং জমির রক্ষক হিসাবে এখানে তাঁহাদের বর্ণনা করা যায় না*। তাঁহারা ইসলাম ও মুসলমানের সেবক এবং শাসক হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদেব ভরণ পোষণ নিমিত্তে যে সব জায়গীব ও লাখেরাজ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাই কালে ছোট খাট জমিদারী হিসাবে গণ্য হইত। পাঠান আমলে এ জেলার অধিকাংশ পরগণাগুলি পাঠান জায়গীরদারদের অধীনস্থ ছিল। যেমন আলাবখশ্ – বরখুদার লস্করী খানের নামানুসারে 'লস্করপুর' পরগণা; তাহির খানের নামানুসারে 'তাহিরপুর' পরগণা: ইসলাম খানের নামানুসারে 'ইসলামপুর' পরগণা; কাশিম খানের নামানুসারে 'কাশিমপুর' পরগণা প্রভৃতি পরগণা ছিল। মোঘল আমলে

জায়গীর ও মদদমাস

বাদশাহ আকবরের হিন্দু মন্ত্রী বা সেনাপতি মানসিংহ ও টোডরমল্লের দ্বারা এই সব পাঠান জায়গীরদার উৎখাত হইয়া হিন্দু কর্মচারীদের পক্ষে উক্ত সমুদয় জায়গীর বন্দোবস্ত হইয়াছিল। মোঘল বাদশাহ মোহাম্মদ শাহ, শাহজাহান, শাহ আলম, আলমগীর মুহাম্মদ মহিউদ্দীন আওরঙ্গজেব প্রভৃতি বাদশাহ মুসলমান ও ইসলামেব সেবায় যে সব মদদমাস বা লাখেরাজ দিয়াছিলেন, এ জেলায় তাহার সংখ্যা ১১ হইতে ১২টি হইবে। এই শ্রেণীর লাখেরাজ গ্রহণকারীদের মধ্যে শেখ তাজ-উদদীন, মৌলানা আবদুল ওয়াহাব, মৌলবী নজিবুল্লাহ, হজরত শাহ নেয়ামতুল্লাহ, হজরত শাহ মখদুম রূহ্ পোষ, দরবেশ বদর উদদীন, দোস্ত মুহাম্মদ খান, দরবেশ মুহাম্মদ ও রইস উল্লার নাম আমরা জানিতে পারি। নাটোর, বড়াই গ্রাম, লাল-পুর, চারঘাট, বুয়ালিয়া, সিংড়া ও শিবগঞ্জ থানায় এই সব পীরোত্তর- লাখেরাজ ভোগ দখলকারীর বংশধরদের মধ্যে আমরা বাঘার পীরোত্তর যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। আর গুলির হদিস পাওয়া যায় নাই। বোধহয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় উপযুক্ত ওয়ারীশ ও দলিল পত্র উপস্থিত করিতে না পারায় এ সব লাখেরাজ ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইযাছে। উল্লিখিত শেখ তাজ-উদদীন বোধহর নওগাঁর তারোটিয়ার শেখ পরিবারের পূর্ব পুরুষের অন্যতম ছিলেন। একটু পরই তাঁহার আলোচনা করিব। হজরত শাহ নেয়ামতুল্লাহ ও মখদুম রূপ পোষের কথাতো আগেই বলিয়াছি। তদানীন্তন সরকারী কর্মচারী হিসাবে যাঁহারা বিষয় সম্পত্তি ক্রয় করিয়া পরে জমিদারে উন্নীত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নাটোর চৌধুরী' পরিবার উল্লেখযোগ্য। এতদব্যতীত অতি সাধারণ অবস্থা হইতে ছোট খাট তালুক, জমিদারী, জোতদারী ক্রয় করিয়া যাঁহারা ঊনবিংশ-বিংশ শতকে চৌধুরী হইয়াছিলেন রাজশাহীর ইতিহাসে তাঁহাদের উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা না থাকিলেও সংখ্যায় তাহারা নগণ্য নহেন।

---

* জমিনদার ফারসী 'শব্দ'। জমিন-অর্থে-ভূমিদার অর্থে রক্ষক, এই দুই শব্দ একত্র হইয়া জমিনদার এর অপভ্রংশ-'জমিদার' হইযাছিল।

মোঘল যুগে পশ্চিম হইতে আগত শেখ গোল মুহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি রাজশাহী জেলার পরগণে আমরুলের অধীন 'শাহগোলা' (পরে তারোটিয়া) নামক গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার ৫ পুত্র– শেখ তাজ উদদীন তন্মধ্যে অন্যতম। ইনি হয়ত একজন গুণী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নামে একটি মদদ মাস দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় ইনি এদেশে বেশী দিন অতিবাহিত করেন নাই। অবশিষ্ট চারি ভ্রাতা শাহ্ গোলায় অবস্থান করেন। নওগাঁর তারোটিয়ার বর্তমান শেখ পরিবার উক্ত চারি ভ্রাতার অধঃস্তন বংশক্রম। কথিত আছে যে, বাদশাহ্ শাহজাহান মতান্তরে আকবর এই শেখ পরিবারের গোল মুহাম্মদকে পরগণে সিন্দাবাজু ও আওরঙ্গজেব নগরের অন্তর্গত 'উলুবেড়িয়া-তারোটিয়া' এবং বিজয়কান্দি নামক মহল মদদমাস দেন। অথচ প্রাচীন সরকারী কাগজ পত্রে শেখ তাজ-উদদীন ব্যতীত অন্য কাহারও নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। নওগাঁর কাজী পরিবারের অন্যতম মরহুম মোজাফর হোসেন খাকী সাহেবের হস্তলিখিত একটি জনশ্রুতি মূলক প্রবন্ধ পড়িয়া ইহাই অনুমান করা যায় যে, তারোটিয়ার শেখ পরিবার প্রাচীন এবং ইসলাম প্রচারার্থে তাঁহাদের পূর্ব পুরুষ বরেন্দ্র ভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই বংশের শেখ কবুলের সময় ১০৬৮ হিজরীতে (১৬৫৭ খ্রী:) একটি মসজিদ বিনির্মিত হয়।

তারোটিয়ার শেখ পরিবার

নাটোর রাজের পতনের যুগে কোম্পানী আমলের প্রথম ভাগে নাটোরের চারিপার্শ্বে চুরি ডাকাইতি এবং নাটোর জমিদারীর আমলাদের অনাচার অত্যাচারে প্রজাগণ প্রপীড়িত ও জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঠিক এই যুগ সন্ধিক্ষণে নাটোর কোম্পানী দপ্তরের ফৌজদারী কোর্টের নাজির (Magistrate) হিসাবে 'জমা খাঁ' নামক এক পুরুষ সিংহের আবির্ভাব হয়[৯১]। ইনিই হইলেন নাটোর চৌধুরী পরিবারের আদি পুরুষ। এই জমা খাঁ নাটোরে থাকা কালীন প্রচুর বিষয় সম্পত্তি অর্জন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র দোস্ত মুহম্মদ খাঁ পিতার উত্তরাধীকারী হন। ইনি পিতার সঞ্চিত অর্থে কলম, পিপরুল, খোলাবাড়িয়া প্রভৃতি কয়েকটি বৃহৎ জমিদারী ক্রয় করিয়া পরে ইংরেজ কোম্পানীর নিকট হইতে ১৭৮৭ খ্রী:) চৌধুরী উপাধি লাভ করেন। দোস্ত মুহাম্মদের জ্যৈষ্ঠ পুত্র মুহাম্মদ আলী খাঁ হাদিস কোরানে তখন বাঙলা দেশে একজন অদ্বিতীয় আলেম ও বাগ্মী ছিলেন। তদীয় উত্তরাধিকারী রশীদ আলী খাঁর পরে নূর মুহাম্মদ খাঁ নানা কুসংসর্গে পড়িয়া ঋণগ্রস্ত হন এবং তাঁহার দরুণ সকলের অপ্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। তাঁহার সময়ে পৈত্রিক জমিদারীর বহুলাংশ হস্তান্তরিত হয়।

নাটোর চৌধুরী বংশ

নাটোর চৌধুরী পরিবারের কৃতী সন্তানদের মধ্যে খানবাহাদুর আবুল হাশিম খান, আশরাফ আলী খান, আবদুর রশীদ খান, খানবাহাদুর এরশাদ আলী খান প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবদুর রশীদ খান প্রতিষ্ঠিত নাটোর 'রশীদ স্কুল' বর্তমানে 'মহারাজা হাইস্কুল, নামে পরিবর্তিত। রশীদ খানের মৃত্যুর পর উক্ত স্কুল পরিচালনায় শিথিলতা আসিলে মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ' এই স্কুলকে নিজ নামে রূপান্তরিত করিয়া উহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এরশাদ আলী খান প্রতিষ্ঠিত 'নাটোর এম, ই, স্কুল' এখন 'জিন্নাহ মডেল হাই স্কুল' নামে প্রসিদ্ধ।

বর্তমানে নাটোরের বিবিধ সদানুষ্ঠানে ও অন্যান্য ভূমিকায় চৌধুরী পরিবারের আবদুস সাত্তার খান (মধু মিয়া) এবং খোরশেদ আলম খান (চৌধুরী) সাধারণ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ

৯১. Rajas of Rajshahi, Calcutta Review 1873

করিয়াছেন। এই পরিবারের মোতয়ালী জাহাঙ্গীর চৌধুরীও একজন প্রবীণ ও জ্ঞানী ব্যক্তি।

জমা খাঁর আদি নিবাস ভারতের পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলা। তিনি বাণিজ্য উপলক্ষে বর্ধমান মহারাজার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করেন। এবং সেখান হইতে রাজাদের সুপারিশে জমা খাঁ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' চাকরী লাভ করিয়া রাজশাহী জেলার শাসক হিসাবে নাটোর সদরে নাজীরের পদে অধিষ্ঠিত হন। তদীয় সুযোগ্য পুত্র দোস্ত মুহাম্মদ খান নাটোর বর্তমান চৌধুরী বাড়ীর ভিত্তিঁ স্থাপন করেন।

নাটোর কাজী পরিবার নানা কারণে মশহুর। এই পরিবারের মরহুম কাজী জসীম উদদীনের সুযোগ্য সন্তান কাজী আবদুল মজিদ ও কাজী আবুল মাসুদ পাকিস্তান আন্দোলনের একনিষ্ঠ সাধক। কাজী মাসুদ ইতিপূর্বে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী থাকা কালীন নাটোরের বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়া সুনাম অর্জন করেন। বর্তমানে জ্যৈষ্ঠ কাজী আবদুল মজিদ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের একজন সদস্য আছেন।

নাটোর কাজী পরিবার

শেখ মুহম্মদ তকী উদদীন খান তদীয় পুত্র দৌলত আলী খান দফাদার মনাকষা চৌধুরী পরিবারের আদি পুরুষ। ১৯১৮ সালে বাঙলা সরকারের একটি বিবরণ হইতে অবগত হইতে পারি যে, উক্ত দৌলত আলী দফাদারের পৌত্র মুনশী গোলাম আলী খান এই চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি কিছু ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার মনাকষা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী মুনশী নাসির উদদীন। তদীয় পুত্র হেমায়েত উল্লা চৌধুরী পিতার বিষয় সম্পত্তির মালিক হন। এই হেমায়েত উল্লাই এই বংশের প্রথম চৌধুরী।

মনকষা চৌধুরী পবিবার

এই পরিবারের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে মরহুম জহুর আহমেদ চৌধুরী ও মুরতেজা রেজা চৌধুরী তৎকালে মালদহ জেলার মুসলমানের প্রতিনিধি ছিলেন। স্থানীয় বিভিন্ন হিতকর প্রতিষ্ঠানে ইঁহাদের অবদান লুক্কায়িত আছে। জহুর আহমেদ চৌধুরী চীফ হুইপ এবং মুরতেজা রেজা চৌধুরী প্রথমে স্টেট্ মন্ত্রী এবং পরে কলিকাতার ডেপুটী হাই কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ফারসী পাড়ার চৌধুরী পরিবার এতদঞ্চলে বিখ্যাত। আলীশাহ মোল্লা এই বংশের আদি পুরুষ। তদীয় পুত্র মুহম্মদ শাহ গুরুগরি উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করিয়া 'ওমরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন বলিয়া কথিত হয়। এই 'ওমরগ্রাম' পরবর্তীকালে 'ফারসী পাড়া' নামে পরিবর্তিত হয়। শোনা যায় আদিকালে এখানে নাকি ফারসী ভাষা শিক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিল। এই বংশের হাজী মুহম্মদ শাহ বাংলা ১২৭৬ সালে একটি জমিদারী ক্রয় করিয়া 'চৌধুরী উপাধি' লাভ করেন। মফিজউদ্দীন চৌধুরী এই পরিবারের একজন কৃতী সন্তান ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ নানা জনহিতকর কার্য্যের সহিত জড়িত আছেন। এই পরিবারের মোজাফফর হোসেন চৌধুরী পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন। ধামৈয়ের হাট থানার সন্নিকট ফারসী পাড়া অবস্থিত।

ফারসীপাড়া চৌধুরী পবিবাব

পোরশার শাহ পরিবার এতদঞ্চলে বিখ্যাত। ফাজেল শাহ এই বংশের আদি পুরুষ। সওদাগরী উপলক্ষে বরিশাল জেলা হইতে ইনি এবং অঞ্চলে আগমন করিয়া এই গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বংশের অধঃস্তন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে মরহুম ইবরাহিম শাহ তদীয় পুত্র চৌধুরী জিল্লুর রহমান শাহ, চৌধুরী আব্দুল গফুর শাহ প্রমুখ

অন্যতম। ইঁহারা বিভিন্ন সদানুষ্ঠানের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন।

রামরামার দেওয়ান পরিবার

রামরামার দেওয়ান পরিবার প্রাচীন ও খানদানী। এই বংশের নবিবর উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া সাধারণ সমাজের উন্নতি কল্পে রহমান দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি একজন যুব নেতাও বটে।

কাজী পরিবার

নওগাঁর কাজী পরিবার প্রসিদ্ধ। এই বংশের কবি মরহুম মোজাফফর হোসেন খাকী ও মৌলবী কাজী ইউসুফ নাম করা লোক ছিলেন।

মীর ও কাজী পরিবার

নওয়াবগঞ্জ জয়নগরের (বটতলা) কাজী এবং মীর এহসান পরিবার সম্ভ্রান্ত ও প্রাচীন। ইঁহাদের আদি পুরুষ ইসলাম ও মুসলমানের সেবায় বঙ্গদেশে আগমন করিয়া ছিলেন। জনাব এহসান সাহেবের আন্তরিক চেষ্টায় স্বীয় বাসভবনে আধুনিক বই পুস্তকে সজ্জিত একটি পাঠাগার গড়িয়া উঠিয়াছে।

মির্জ্জা পরিবার

নওয়াবগঞ্জ টাউনের মির্জ্জা পরিবার শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত। এই বংশের মির্জ্জা মৌ: আব্দুল কাইয়ুম (উকিল) সাহেব একজন বৃদ্ধ ও বিনয়ী ভদ্রলোক।

রাজশাহীর আদি শিক্ষিত পরিবার

রাজশাহী জেলা আদি বাসিন্দাদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে যে কয়েকটি পরিবার শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত তন্মধ্যে বর্তমানে রাজশাহী শহরের পাঠান পাড়া নিবাসী সৈয়দ মেহের আলী মরহুমের বংশধর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গের প্রাচীন শরীফ পরিবারের ইতিবৃত্ত হইতে অবগত হওয়া যায় যে, আদিতে ইঁহাদের পূর্ব পুরুষ ইসলাম প্রচারার্থে এ দেশে আগমন করেন। এবং নওয়াবী আমলে এই বংশের কৃতী সন্তান মীর গোলাম আলী (?) নওয়াব আলীবর্দী খাঁর অধীনে 'কাজী-উল-কুজ্জাৎ' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তীকালে ইহাদের মধ্যে পিয়ার আলী, মীর আলী, গোলজার আলী স্বীয় বংশ গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হন। গোলজার আলীর পুত্র সৈয়দ মেহের আলী মরহুম মগফুর রাজশাহী জর্জ কোর্টের একজন সেরেস্তাদার হইয়াও স্বীয় ঐতিহ্যের কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে পুত্র কন্যাগণ স্বীয় বংশের মুখোজ্জল করিতে পারিয়াছেন। ইঁহারা বর্তমানে সকলেই উচ্চ শিক্ষিত ও সরকারী উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছেন*। নওয়াবগঞ্জের হুজরাপুরে (বর্তমানে মহানন্দাগর্ভে নিমজ্জিত) ইঁহাদের আদি বাস ছিল।

নওয়াবগঞ্জ মহকুমায় রাজারামপুর নিবাসী বিখ্যাত মৌলবী ফয়েজুর রহমান মরহুম একজন নামকরা আলেম ছিলেন।

মহারাজপুর চৌধুরী পরিবার প্রাচীন। এই পবিরারের মরহুম এনায়েত উল্লাহ চৌধুরী একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

মধুইল চৌধুরী পরিবার নানা কারণে এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধ। এই বংশেব অধঃস্তন চৌধুরী মুহাম্মদ সালেহ্ তাঁহাদের পূর্ব গৌরবের জন্য খুবই গর্বিত। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই বংশের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য নানা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন।

পত্নীতলা বন্দরের সন্নিকট সবরাজপুরের চৌধুরী অপির উদ্দীন একজন বিখ্যাত সমাজ পতি ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

---

ডা: সৈয়দ মোঃ সাজ্জাদ আলী (এল, এম, এফ) সৈয়দা নূব-উন-নাহার (স্বামী, বগুড়ার য়্যাডভোকেট নবীর-উদদীন তালুকদাব), সৈয়েদা জিয়া উন-নাহাব (স্বামী, বগুড়ার বিখ্যাত ডা: কছির উদ-দীন তালুকদাব), সৈয়দ মোঃ হাম্মাদ আলী (এডিশনাল ডেপুটি কমিশন'র), সৈয়দ মোঃ হাসান আলী, সৈয়দ মোঃ এবশাদ আলী (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট), সৈয়দ মো: এমদাদ আলী (কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী) সৈয়দ মোঃ মহসেন আলী (এ্যাডভোকেট, ঢাকা হাইকোর্ট।)

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥

# জমিদারী আমলে শাসন-ব্যবস্থা ও অরাজকতা

পাঠান সুলতানদের শাসন মোঘল যুগে কিছুটা পরিবর্তিত হয় এবং তাহাই চলিয়া আসে মোগল যুগের শেষ অধ্যায়ে। নওয়াবী আমল পর্য্যন্ত তাহার জের থাকিয়া যায়। বাঙলার সুবাদারী শাসনামলে দেশীয় রাজা জমিদারগণের হস্তে আংশিক শাসন ক্ষমতা থাকে এবং তাঁহাদিগকে সুবাদার ও নওয়াবদের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে হইত। প্রয়োজন বোধে তাঁহাদিগকে সৈন্য ও যুদ্ধের রসদ হাল-হাতিয়ার মাল-মশলা দিয়া সাহায্য করিতে হইত। তারপর রাজা জমিদারদের পতন ও হাত বদল হইয়া যখন ইংরেজ কোম্পানী এদেশের শাসনভার কবলিয়ত করিতেছিল, ঠিক সেই যুগ সন্ধিক্ষণে এবং তাহার পরে দীর্ঘদিন ধরিয়া লুট তারাজ, দস্যুবৃত্তি খুন খারাবিতে দেশে অরাজকতা চলিয়াছিল।

রাজশাহী জমিদারী সংগঠন হইবার পর পাঠান ও মোঘল জায়গীরদারগণের ন্যায় স্থানীয় জমিদারগণ নিজ নিজ অঞ্চলের শাসন শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিতেন। এবং নির্দ্ধারিত সময়ে নওয়াব সরকারকে রাজস্ব প্রদান করিতেন। যিনি ঠিক সময়ে রাজস্ব প্রদান করিতে পারিতেন না অথবা স্বাধীন মনোবৃত্তিতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেন (বিশেষত: মুর্শিদকুলী খাঁর শাসন সময়ে) নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে যাইয়া তাহাদিগকে "বৈকুণ্ঠ" দর্শন করিতে হইত। কেহ বা রাজবন্দী হইয়া শর্তসাপক্ষে মুক্তি লাভ করিতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জমিদারী বাজেয়াপ্ত হইয়া অন্যের সহিত নূতন বন্দোবস্ত হইত।

নাটোর রাজাদের শাসন ব্যবস্থা ছিল। সৈন্য-গড়, কারাগার, বিচারালয় প্রভৃতি ছিল। শান্তি শৃঙ্খলার জন্য তাঁহারা দণ্ড, জরিমানা সব রকম শাস্তি দিতে পারিতেন। ইংরেজ আমলে ১৭৯৩ সালের 'দশশালা' চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত রাজশাহী রাজ্যের শাসন ক্ষমতা নাটোর রাজের হস্তেই ছিল। তাঁহারা স্বাধীন ভাবে স্বীয় জমিদারীর মধ্যে শাসন কার্য্য চালাইতেন।

॥ চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ॥

# ইংরেজ আমল

ইংরেজ আমলে রাজশাহী রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি হয় নাই বরং শাসন শৃঙ্খলার সুবিধার জন্য রাজশাহীর আয়তন ক্ষুদ্রতর হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জেলার সৃষ্টি হইয়াছে।

*রাজশাহীর শাসন ব্যবস্থা ও জেলা সংগঠন*

ইংরেজী ১৭৫৭ সালে ২৩শে জুন বাঙলার শেষ স্বাধীন নওয়াব সিরাজ-উদ- দৌল্লা হিন্দু মন্ত্রী মণ্ডলীর ষড়যন্ত্রে ও সিপাহী সালার (সৈন্যধ্যক্ষ) মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান ক্লাইভের নিকট পলাশীর প্রান্তরে পরাজিত ও নৃশংসভাবে নিহত হন। এবং প্রকৃত পক্ষে সেই দিন হইতেই বাঙলার স্বাধীনতা অস্তমিত হয় এবং জমিদারী শাসনক্ষমতার ভিত্তি টল-টলায়মান হইতে থাকে। ১৭৯৩ সালের পর হইতে ইংরেজদের শাসন ক্ষমতা কায়েম হয়। এবং ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এই দেশের শাসন ভার ইংরেজদের হস্তেই থাকে।

ইং ১৭৬০ সালে ক্লাইভ বিলাত যাত্রা করিলে তদস্থলে বান্সিটার্ট সাহেব কোম্পানীর বঙ্গ দেশীয় কুঠি সমূহের গবর্ণর হন।

*মীর জাফর ও মীর কাসিম*

কোম্পানী কৃত অনুগ্রহ বলে, মীর জাফর বাঙলার নওয়াবী মসনদে আরোহণ করেন। ইংরেজদের অনুগ্রহের জন্য তিনি ২৪ পরগণার জমিদারী কোম্পানীকে দান করেন। অতঃপর অযোগ্যতার দরুন তিনি অপসারিত হইয়া তদস্থলে তাঁহার জামাতা মীর কাসিম নগদ দুই লক্ষ টাকা কোম্পানীর নজরানা ও এতদসহ বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের প্রায় অর্দ্ধেক (?) রাজস্ব অঙ্গিকার করিয়া সুবে বাঙলার নওয়াবী পদ লাভ করেন। তৎপর মীর কাশেম বাঙলার স্বাধীন সার্ব্বভৌম পুনরুদ্ধার করিবার জন্য প্রয়াস পান। কিন্তু, ইংরেজদের সহিত, পাটনা পরে গিরি ও উদয়নালা প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। অবশেষে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসেম ধৃত ও নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হন। তাঁহার শিশু পুত্র ও কন্যা গুলবাহারও ইংরেজদের গুলিতে নিহত হন। পরিশেষে এই খানেই (১৭৬৪ খ্রী:?) পরাধীন বাঙলার প্রথম পুনরুদ্ধারের যবনিকা পাত হয় এবং ইংরেজ সুদৃঢ়ভাবে শিকড় গাড়িয়া বসে।

*দেওয়ানী লাভ ও হেষ্টিংসের সময়ে রাজশাহীর জমিদার*

উল্লিখিত ঘটনার পর ক্লাইভ লর্ড ক্লাইব রূপে পুনরায় বাঙলাদেশে দ্বিতীয়বার গবর্ণর হন। এবং ১৭৬৫ সালে ১২ই আগষ্ট দিল্লীর অপদার্থ নাম সর্ব্বস্ব বাদশাহ শাহ আলম বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব বন্দোবস্ত সুবে বাঙলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী ইংরেজদের হস্তে ছাড়িয়া দেন। তখন হইতে দেশে দ্বৈত শাসনের সূত্রপাত হয় এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটে। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস পাক-ভারতের গবর্ণর জেনারেল হন। তিনি ১৭৭৩ সালে পঞ্চ বার্ষিকী নামে ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন এবং সুবে

বাঙলা বিহার উড়িষ্যা কয়েকটি জমিদারীতে বিভক্ত করেন। এবং প্রত্যেক জমিদারী বিভাগে একজন করিয়া কালেক্টর নিযুক্ত করেন। পরে এই জমিদারী গুলিই পৃথক পৃথক জেলায় রূপান্তরিত হয়। তখন রাজশাহীর জমিদারী ১৩,০০০ বর্গ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তরবঙ্গের (ইংরেজ আমলের রাজশাহী বিভাগ) বহুলাংশ ছাড়াও মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার বহুলাংশ রাজশাহীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। জনৈক ইংরেজ লেখক মিঃ হো'য়েল, এর মতে তখন রাজশাহী জমিদারীতে ভ্রমণ করিতে প্রায় ৩৫ দিন সময় লাগিত। গ্রাণ্ট সাহেবের রাজস্ব বিবরণীর মতে তখন বঙ্গ তথা ভারতবর্ষের মধ্যেও রাজশাহী একটি বৃহৎ জমিদারী[৯২]। হেষ্টিংসের আমলেই রাজশাহী বাঙলার দ্বিতীয় জমিদারীতে পরিণত হয়[৯৩]। হেষ্টিংসের সময়ে ইহার রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়া বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছিল।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় বাজকোষ ও অন্যান্য কার্য্যালয় মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। বিচার বিভাগের জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সংস্থাপিত হয়। আপিলাদির জন্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত নামক দুইটি প্রধান বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শান্তি রক্ষার জন্য প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া ফৌজদার নিযুক্ত হন। ১৭৭৫ সালে 'সদর নিজামত আদালত' কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ স্থানান্তরিত হয়। এবং মহাম্মদ রেজা খাঁ 'নায়েবে নাজিম' উপাধি গ্রহণ পূর্বক উহার প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে (১৮৬২? খ্রীঃ) 'সদর নিজামত আদালত ও কলিকাতার সুপ্রীম কোর্ট একত্র হইয়া 'হাইকোর্টের' প্রতিষ্ঠা হয়।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় এদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজস্ব আদায়ের নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হইলে রাজশাহীর কার্য্য তদারকের জন্য ইং ১৭৮৩ সালের আগষ্ট মাসে মিঃ জজ ডালেস রাজশাহী জেলার প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন। তাহার মাসিক ভাতা বাবৎ ১২ শত টাকা এবং বাড়ী ভাড়া যাবৎ ৩ শত টাকা নির্দ্ধারিত হয়। অধিকন্তু, আদায়কৃত রাজস্বের শতকরা দশ ভাগ পাইতেন। ১৭৮৬ সালে জানুয়ারীতে মিঃ ডালেস পদত্যাগ করিলে তদস্থলে মিঃ পিটার্স স্পেক্ কালেক্টর স্থলাভিষিক্ত হন। এবং ১৭৮৭ সালে তিনি জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদেও উন্নীত হন। ইঁনি কালেক্টর, জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ হিসাবে মাসিক বেতন ও বাড়ী ভাড়া বাবৎ মোট ১৫ শত টাকা পাইতেন। তাহার দুইজন সহকারী ছিল। তন্মধ্যে ১ম জনের মাসিক বেতন ছিল পাঁচ শত টাকা; দ্বিতীয় জনের মাসিক বেতন ছিল ৪ শত টাকা। এই সহকারী দুই জনের একজন মুর্শিদাবাদ মুরাদাবাদে অপর জন নাটোরে থাকিতেন।

রাজশাহী জেলাব প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় জমিদারদের মধ্যে বেশী রাজস্বে নূতন ইজারার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে জমিদারদের মধ্যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয় এবং বৃদ্ধি হারে খাজনা আদায় করিতে থাকিলে প্রজাগণ প্রপীড়িত হইতে থাকে। যথা সময়ে রাজস্ব পরিশোধ করিতে না পারিয়া বহু জমিদার উৎখাত হয়। এই সময় রাজশাহী জমিদারী হইতে "বাহির বন্ধ পরগণা" কাশিম বাজার কান্ত

উত্তরবঙ্গে প্রথম প্রজা বিদ্রোহ

৯২. Vide. grant's Analyris of the Finance of Bengal.

৯৩. Vide. Rajshahi gazetteer

মোদীর সহিত বন্দোবস্ত হয়। তৎপর যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ স্বরূপ ইংরেজগণ অমানুষিক অত্যাচার ও জুলুম করিয়া পাইকারী হারে খাজনা ও রাজস্ব আদায় করিতে থাকে। ফলে কোম্পানীর কর্মচারীর বিরুদ্ধে উত্তর বঙ্গে প্রজাবিদ্রোহের উদ্ভব হয়*।

নূতন ইজারার ফলে জমিদারীর রাজস্ব বৃদ্ধি হওয়ায় জমিদারদেব শাসন ক্ষমতায় শিথিলতা আসে। তাহার দরুণ দেশে দস্যু তস্করের উপদ্রব হয়। একদিকে খাজনা বৃদ্ধি অন্যদিকে পাইকারী হারে খাজনা আদায়–দ্বিতীয়তঃ অনাবৃষ্টির দরুণ ফসল উৎপন্ন না হওয়ায় চুরি ডাকাইতি ইত্যাদি কারণে দেশে হাহাকার রব উঠে। দুর্ভিক্ষের কালোছায়া নামিয়া আসে[৯৪]। অবশেষে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বিঘোষিত হয়। এই দুর্ভিক্ষে প্রজাগণ অন্নাভাবে দলে দলে প্রাণ ত্যাগ করে। হলকর্ষনাক্ষম কৃষকের অভাবে কৃষি বন্ধ হইয়া যায়। শস্যক্ষেত্র তৃণ কণ্টকে পূর্ণ হইয়া উঠে। ফলে বহু জমিদারের ভিঁটা মাটি উচ্ছন্ন যায়। এই অরাজকতা ও দুর্দিনে দুর্ভিক্ষের সময় রানী ভবানী তাঁহার দান ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। রাণী ভবাণীর শাসন সময়ে রাজশাহী রাজ্যে ধান্য চাউল টাকায় ৫।৬ মন করিয়া বিক্রয় হইত। এই দুর্ভিক্ষের সময় সেই চাউল ধান্য টাকায় নাটোরে বিক্রি হয় ১৮ সের ও মুর্শিদাবাদে ৩০ সের[৯৫]।

হেষ্টিংসের সময় দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতার দরুণ দেশে যে দস্যু তস্করের উদ্ভব হয়

অগ্নিকাণ্ড দাঙ্গাহাঙ্গামা সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও ডাকাইতি

তাহার বীজ কেবল বিল চলনেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সমগ্র উত্তর বঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে। আজও সেই দস্যু তস্করের বংশধর কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয়। চলন বিলের দস্যুর কথা বর্গীর হাঙ্গামার মতই ভয়াবহ। নাটোরস্থ ইংরেজ সুপারভাইজারের একটি বিবরণে অবগত হওয়া যায় যে, "এই সময় এক শ্রেণীর বর্ব্বর লোকের দ্বারা রাজশাহীর গ্রামে বার বার অগ্নিসংযোগ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রায়ই হইত[৯৬]।"

দস্যু তস্করের উপদ্রব ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দেশে অবাজকতা সৃষ্টি হয়। দেশের আইন কানুন অচল হইয়া পড়ে। এই সময় ডাকাইতদের প্রধান আড্ডা ছিল বিল চলনে[৯৭]। ডাকাইত দল বরেন্দ্র ভূমির বিভিন্ন স্থানে ঘাটি করিয়া ডাকাইতি করিত। ইংরেজ লেখকগণের মতে তখন জমির প্রকৃত মালিক ঠাহর করা যাইতনা, জোর যার মুল্লক তাঁর' এমনই ছিল তখন দেশের অবস্থা। স্থানীয় (হিন্দু) লেখকগণের মতে উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু জমিদার ও জোতদারগণ এই শ্রেণীর দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়ার শেরপুরের হিন্দু জমিদারগণ এই দুর্ণামেব সহিত জড়িত ছিল[৯৮]। মিঃ গ্লেজারের বিবরণে অবগত হওয়া যায় যে, এই অঞ্চলের অধিকাংশ জমিদার এই সব ডাকাইত দলের সহযোগিতা করিত এবং নিজেরাও ডাকাইতি করিত[৯৯]।

* বংপুব, দিনাজপুব পূর্ণিমা জেলায কোম্পানীব কর্মচাবী বিশেষতঃ গঙ্গা গোবিন্দসিংহ, হবরাম, বেজা খাঁ, দেবী সিংহ ও কালেক্টর গুডল্যাডেব বিরুদ্ধে জনৈক মজনু শাহের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। স্থানান্তরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ পাইব।

৯৪. 'সাহিত্য' ফাল্গুন- চৈত্র'-১৩০৪ সাল, Mill's History of India Vol. III.

৯৫. Vide- Hunter's Annals of Rural Bengal

৯৬. Vide-Letter copy Book of the Superviser of Rajshahi at Nator, (1769-1772)

৯৭. Rajshahi Gazetteer. P 41

৯৮. বাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পাবনার ইতিহাস, বগুডার ইতিহাস প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

৯৯. E G Glazier, Report on the District of Rangpur, PP 41-42

মহারাষ্ট্রীয়গণের পদানুস্মরণে উত্তরবঙ্গ নাগা-সন্ন্যাসী নামে আর একদল দস্যুর আবির্ভাব হয়। ইহারা জমিদারদের আশ্রয়ে এই অঞ্চলে দস্যু বৃত্তি করিত। এই দস্যুদের সহিত বগুড়ার চাপাপুরের নিকট এক দল ফকিরের সংঘর্ষ হয়[১০০]। এই ফকিরেরাই সম্ভবতঃ বিদ্রোহী মজনু ফকিরের দল। বলা বাহুল্য, প্রাগুক্ত উত্তর-বঙ্গের প্রজা বিদ্রোহকে কেন্দ্র করিয়া ইংরেজ বেতন ভোগী- গোলাম যামিনী মোহন ঘোষ 'রায় সাহেব' খেতাবের লোভে "Saunyasi and Fakir Raidirs in Bengal" নামক একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানি ইংরেজ কর্মকর্তাদের ইঙ্গিতে লিখিত এবং ইহাতে উত্তরবঙ্গের প্রজাবিদ্রোহ'কে দস্যুবৃত্তি রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

অথচ ফকির মজনু শাহের সহিত নাগা সন্ন্যাসীর কোন সম্পর্ক ছিল কিনা তাহার সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি উদার পিণ্ডি বুধার ঘাড়ে চাপাইয়া ইংরেজদের কলুষ মুক্ত করিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে পণ্ডিতা ডাকাতদলের আবির্ভাব হয়। বগুড়া শহরের ৫।৬ মাইল দক্ষিণে 'মাঝিরা' নামক স্থানে এবং শহরের কালিতলা হাটে এই পণ্ডিতা ডাকাতের প্রধান আড্ডা ছিল। সে বিল চলনে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দস্যু বৃত্তি করিত। তাহার আশ্রয় স্থল ছিল জমিদার অনুপ নারায়ণ। এই অনুপ নাটোর রাজের একজন সামান্য কেরাণী ছিল। ১৮১২ সালে বগুড়ার নওয়াব সৈয়দ আসাদুজ্জুমান চৌধুরীর চেষ্টায় সে ধৃত হইয়া বিচারের জন্য রাজশাহীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হয়। বিচারে তাহার যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়। পরে অনুপ নারায়ণ ধৃত হইয়া বিচারে ৯ বৎসর দণ্ডিত হয়। এই অনুপ বগুড়ার শেরপুরের মুন্সী জমিদারের পূর্ব্বপুরুষ ছিল[১]। এবং এই সময় বগুড়া জেলা রাজশাহীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পণ্ডিতা ডাকাত ও অনুপ নারায়ণ

রাজশাহীর পূর্ব্বাঞ্চলে ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে লর্ড বেণ্টিকের আমলে আর এক দল দস্যুর উপদ্রপ হয়। তাহারা অভিনব উপায়ে জন সাধারণের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। তাহারা কেহ ব্যবসায়ী, কেহ তীর্থ যাত্রী, কেহ ভদ্রবেশী ও বহুরূপী সাজিয়া সুযোগ সুবিধা মতে চুরি ডাকাইতি করিত। নিরীহ নর নারী দিগকে পশুর মত হত্যা করিত। ইহারাও একশ্রেণীর জল ও স্থল দস্যু বিশেষ।

ইহাদিগকে সাধারণত: গামছা মোড়া বা ঠগী বলা হইত। যমুনা নদীর তীরে নাজিরগঞ্জ, বরখাপুর প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা ইহাদের দলে যোগদান করিয়া দস্যু বৃত্তি করিত। পাবনা জেলার শিবপুর নিবাসী মৈত্র বংশের লোকেরা এই দলের নায়ক ছিল। বর্তমান পাবনা তখন রাজশাহীর অন্তর্ভুক্ত ছিল[২]।

এতদব্যতীত তখন বিল চলনের বিখ্যাত জলদস্যু রমা, শ্যামা, বেনীরায়ের দস্যু বৃত্তির কথা এখনও স্থানীয় লোকেরা বিস্মৃত হয় নাই। পরবর্তীকালে চলনের পঞ্চ৬ ডাকাত, নন্দ ডাকাত, হারান ডাকাত, মহিম ডাকাত, নাম করা ছিল। এই সব ডাকাতের বংশধর এখনও জীবিত আছে। শোনা যায়–ইহারাও নাকি অনেক সময় গা ঢাকা দিয়া

---

১০০. বগুড়ার ইতিকাহিনী-২৮১-২৮৬।

১. Vide, fifth, Report p 686, বাধা বমন সাহার পাবনার ইতিহাস (২য় খণ্ড), প্রভাসের বগুডার ইতিহাস: বগুড়ার ইতি কাহিনীতে মাঝিবা; দ্রষ্টব্য।

২ Rajshahi gazetteer-pp 41-43, পাবনাব ইতিহাস ১১৪ পৃ ঃ।

বেড়ায়। অবশেষে পঞ্চ ডাকাতের উভয় হাত কাটিয়া দেয়া হয়। তবুও নাকি সে হাটে বাজারে, লোকের বাড়ীতে বখরা আদায় করিত। নন্দ ডাকাতের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া স্থানীয় লোকের তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া বিলে ভাসাইয়া দেয়। হারান ও মহিম ডাকাত পরে স্থানীয় লোক দ্বারা অনুরূপ শাস্তি ভোগ করিয়াছিল। এই সব ডাকাত দল পুলিশ-পিয়াদা বরকন্দাজদের অর্থ দ্বারা হাত করিয়া ডাকাতি করিত।

হিন্দু জমিদারগণের সহায়তায় দেশে কিরূপ দস্যু তস্করের উপদ্রপ ছিল, আলোচনা বিবরণ হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়। পাবার রাধারমন সাহা ও রাজশাহীর কালীনাথ চৌধুরী লিখিয়াছেন যে, পাবনা, বগুড়া ও রাজশাহীর অধিকাংশ হিন্দু জমিদার, তালুকদার ডাকাত দলের নায়কত্ব করিত। কেহ কেহ থানাদার বা থানীদার ছিল[৩]। এই হইল নওয়াবী আমলের পরে রাজশাহী রাজ্যের দস্যু তস্করের উপদ্রবের মোটামুটি কথা।

লর্ড কর্ণওয়ালিসেব সময়ে রাজশাহীর শাসন

হেষ্টিংসের পরে লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-১৭৯৩ খ্রীঃ) পাক-ভারতে ইংরেজ অধিকার সমূহের গবর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। কর্নওয়ালিসের ঐতিহাসিক 'দশশালা বন্দোবস্ত' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে (Permanent Settlement) পরিবর্তিত হয়। কর্নওয়ালিসের সময় চুরি ডাকাতি নিবারণ কল্পে পুলিশ বিভাগের উন্নতি হয়। এবং দেশের স্থানে স্থানে পুলিশ থানার প্রবর্তন হয়। ১৭৯০ সালে রাজশাহী জমিদারীর পুলিশ বাবৎ খরচা স্বরূপ রাজা রামকৃষ্ণ ৩৬,৯২৬ টাকা বরাদ্দ করেন। এই টাকার বেশীর ভাগ জমিদারীর রাজস্ব আদায় কাচারী ও কোষাগার বক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়। শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশ খরচা হয় মাত্র ১৬,০০০ টাকা। এই সময়ে ১২টি পুলিশ নৌকা বিভিন্ন নদী ও বিল অঞ্চলে ডাকাইতি ও অন্যান্য উপদ্রব নিবারণ কল্পে টহল দিয়া বেড়াইত। ফৌজদারী পুলিশ বাজার-বন্দর, জেলা, থানা, কারাগার, এবং যেখানে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা থাকিত সেই সব স্থানে পাহারা দিত। তাহারা টহলদারী নৌকা রাখিত। ১৭৯৩ সালে রাজশাহীর কালেক্টর জমিদারের নিকট হইতে পুলিশ বিভাগ স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮০১-০২ সালে 'স্বদেশ রক্ষী' নামক ১১০ জন (২ জন জমাদার, ৪ জন হাবিলদার, ৪ জন নায়েব ও ১০০ জন সেপাই) পুলিশের সাহায্যে রাজশাহীর শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। উপরন্ত, ৩৫,৬০৪ টাকা ব্যয়ে ২৭ জনসাধারণ জেলা পুলিশ "পুলিশের সারকেল সমূহে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৭৯০ সাল হইতে ১৭৯৩ সাল পর্য্যন্ত পরীক্ষা মূলক ভাবে রাজশাহীতে পুলিশের এমনতর ব্যবস্থা ছিল।

বাজা বামকৃষ্ণেব শাস্তি

কোম্পানী শাসন কালে রাজশাহী রাজ্যে অত্যাচার অবিচারের যে তাণ্ডব লীলা চলিয়াছিল—তন্মধ্যে রামকৃষ্ণও রেহাই পান নাই। রাজস্ব বাকী ফেলার দরুণ তিনি ১৭৯৩ সালের ৬ই মার্চ্চ কারাগারে নীত হন। ১৮ই মার্চ্চ 'অঙ্গীকার পত্র' লিখিয়া দিয়া মুক্তি লাভ করেন। পরে রাজস্ব পরিশোধ করিতে না পারায় কয়েকটি পরগণা ও ডিহি নিলাম হইয়া যায়।

১৭৯৩ সালে দশ শালা বন্দোবস্ত হওয়ার সময় বাঙলা দেশের জেলা সমূহের বহু পরিবর্তন হয়। ১৭৮৬ সালের গঠিত রাজশাহী হইতে পুনরায় রাজশাহীর প্রান্তস্থিত

---

৩. গুরুদাসপুর হইতে প্রচারিত। 'অভিযান' চতুর্থ বার্ষিকী পৃঃ ৩০; রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও পাবনার ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

পরগণে লস্করপুর, তাহিরপুর ও রাজশাহী নিজ-চাকলা বাহির হইয়া মুর্শিদাবাদের সহিত যুক্ত হয়। এই সময় রাজশাহীর ভৌগলিক সীমা রেখা দাঁড়ায় দক্ষিণে পদ্মা (বা গঙ্গা) এবং পূর্বে যমুনা নদী। তখনও রাজশাহী জেলা বিভাগ পূর্ব্ব জেলার পাঁচগুণ অর্থাৎ জেলা মালদহ, পাবনা ও বগুড়া এবং রংপুর ও দিনাজপুরের বহুলাংশ রাজশাহীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। ৯৩ সালের পরেও এই সুবিস্তৃত জেলা একজন কালেক্টরের অধীনে সম্যকরূপে

**জেলার পুনর্গঠন**

সুশাসিত হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। জল ও স্থল দস্যুর এত প্রাদুর্ভাব ঘটে যে, জনসাধারণের নিরাপত্তা কল্পে জেলাকে আরও ক্ষুদ্রতর করা বিবেচিত হওয়ায় ১৮১৩ সালে মার্চ্চ মাসে রাজশাহী হইতে চাপাই ও রহনপুর থানা বিচ্ছিন্ন করিয়া তৎসহ পূর্ণিয়া ও দিনাজপুর হইতে আরও কতকগুলি থানা সংযোজিত করিয়া বর্তমান মালদহ জেলা গঠিত হয়। ১৮২১ সালে রাজশাহী হইতে আদম দীঘি, শেরপুর, নওখিলা বগুড়া এবং রংপুর হইতে দেওয়ানগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ এবং দিনাজপুর হইতে লাল বাজার, ক্ষেতলাল, বদলগাছি এই মোট ৯টি থানা লইয়া বগুড়া জেলা গঠিত হয়। তৎপর ১৮২৮ সালে রাজশাহী জেলা হইতে শাহজাদপুর, খেতু পাড়া, রায়গঞ্জ মধুয়া ও পাবনা এই পাঁচটি থানা এবং যশোহর হইতে আর চারিটি, মোট ৯টি থানা লইয়া পাবনা জেলার সৃষ্টি হয়। এইভাবে রাজশাহী জেলা ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর করা হয়।

ইং ১৮২৫ সালে জেলার সদর নাটোর হইতে রামপুর-বুয়ালিয়াতে (রাজশাহী শহর) স্থানান্তরিত হয়। ১৮২৯ সালে নাটোর স্বতন্ত্র মহকুমা ও ১৮৭৭ সালে নওগাঁ মহকুমা গঠিত হয়। ১৮... ...সালে রামপুর-বুয়ালিয়া এবং ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হইলে পশ্চিম বঙ্গের দিনাজপুর হইতে থানা পোরশা, পত্নীতলা ও ধামৈরহাট, মালদহ জেলা

**সদর ও পাকিস্তানী আমলে জেলাব সংগঠন**

হইতে থানা নাচোল, নওয়াবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, মোট ৮টি থানা রাজশাহীর অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর ১৯৪৭ সালেই থানা পোরশা নাচোল, নওয়াবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, এই ৬টি থানা লইয়া নওয়াবগঞ্জ মহকুমা গঠিত হয়।

বর্তমান রাজশাহী জেলায় চারিটি মহকুমায় ৩০টি থানা আছে। যথা ঃ (সদর) বুয়ালিয়া, পবা, গোদাগাড়ী, তানোর, মোহনপুর, বাগমারা, দুর্গাপুর, পুঁঠিয়া, চারঘাট; নওয়াবগঞ্জ মহকুমায় নওয়াবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, পোরশা, নাচোল,

**থানা ও ইউনিয়ন কাউন্সিল, গ্রাম ও ডাকবাংলো**

নওগাঁ মহকুমায় ধামৈরহাট, পত্নীতলা, বদলগাছি, মহাদেবপুর, আত্রাই রাণীনগর, মান্দা, নওগাঁ, নেয়ামত পুর; নাটোর মহকুমায় গুরুদাসপুর, বড়াইগ্রাম, সিংড়া, বাগাতি পাড়া, লালপুর, নাটোর। এই ৩০টি থানায় ২৫০টি ইউনিয়ন কাউন্সিল আছে। মোট গ্রামের সংখ্যা ৬২২২ টি।

এতদব্যতীত জেলা কাউন্সিলের মোট ২৬টি ডাকবাংলো আছে। যেমন সদর, চারঘাট, বাগমারা, তাহিরপুর, গোদাগাড়ী, তানোর, মুণ্ডুমালা, নাটোর, লালপুর, বড়াইগ্রাম, সিংড়া, গুরুদাসপুর, নওগাঁ, মান্দা, বদলগাছি, মহাদেবপুর, নওয়াবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, রহনপুর, নাচোল, ভোলাহাট, শাহ পাহাড়, মধৈইল, নীৎপুর, পত্নীতলা, ধামৈরহাট। তানোর ডাক বাংলো সর্ব প্রাচীন*। অধিকন্তু শহরের সার্কেট হাউস ছাড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে আরও কতকগুলি বাংলো আছে। তাহার কতক 'সি, এন, বি' এবং কতক ওয়াপদা প্রভৃতি বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে।

* ইহা রাজশাহীব রোড সেস আদাযেব দূর মফঃস্বলীয় সর্ব প্রাচীন অফিস ঘর ছিল।

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥

# আজাদী আন্দোলন

লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির বক্ষক বা জমিদারেরা দেশের সার্বভৌমিকত্ব লাভ করেন বটে শোষণ-শাসনের নামে প্রজা সাধারণ অত্যাচার, অবিচার, অনাচার অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। এই সময় হইতেই দেশের সর্বত্র প্রজা বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়, এবং পরবর্তী সিপাহী বিদ্রোহে তাহা পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

ইংরেজী ১৮৫৭ সালের ১০ই মার্চ্চ বহরমপুর সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হইলে প্রান্তস্থিত জেলা রাজশাহীতে যদিও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই কিন্তু, ইংরেজের

আজাদী আন্দোলনের অগ্রদূত মোজাহেদ বাহিনী বা সিপাহী বিদ্রোহ

বিরুদ্ধে যখন দেশীয় সিপাহীরা সমগ্র ভারত ব্যাপী প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু করেন তখন রাজশাহীর মেসার্স রবার্ট ওয়ার্টশন কোম্পানী প্রভৃতি নিজেদের আত্মরক্ষা ও ফ্যাক্টরী সমূহ রক্ষার জন্য একটি সেনা-বাহিনী প্রস্তুত করেন। সম্ভবত: ৫৭ সালের কোন এক সময়ে আজাদী আন্দোলনের অগ্রদূত হিসাবে মোজাহিদগণের ক্ষুদ্র একটি দল মুর্শিদাবাদ হইতে রাজশাহী বুয়ালিয়া গামী মরিচাইয়ের পথ ধরিয়া গঙ্গা-পদ্মা অতিক্রম করত: রামপুর বুয়ালিয়া ও সরদা রাস্তার মধ্যস্থলে সম্ভবত: 'জামিরা গ্রামে' একটি ঘাটি স্থাপন করেন। এই সময় সুযোগ বুঝিয়া রাত্রিব অন্ধকারে ঘুমন্ত অবস্থায় কুঠিয়ালদের উক্ত সেনাবাহিনী তাঁহাদের উপর অতর্কিতভাবে আপতিত হইয়া মোজাহিতগণের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে[8]।

ইং ১৮৫৮ সালের ১লা নবেম্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোম্পানীর কবল হইতে পাক-ভারতের শাসন ভার গ্রহন করিলে সিপাহী বিদ্রোহ কিছুটা প্রশমিত হইল বটে, কিন্তু দেশের চাষী মজুর এবার নীল করদের বিরুদ্ধে আবার ক্ষেপিয়া উঠে। ইং ১৮৫৯-৬০

নীল বিদ্রোহ ও ইহাব রূপ

সালে সমগ্র বাঙলা ব্যাপী যে নীল বিদ্রোহ শুরু হয় তাহাতে রাজশাহী জেলার প্রজা সাধারণ ঐক্য এবং স্বীয় বীর্য্য বলের যে পরিচয় দিয়াছে রাজশাহীর ইতিহাস যুগে যুগে তাঁহাদের স্মরণ করিবে। বিদ্রোহী প্রজা সাধারণ রাজশাহীর নিম্নলিখিত নীলকুঠি ও কয়েকটি রেশমের কুঠি আক্রমণ করিয়া বিশেষত: কয়েকজন (নীল কুঠির) ইংরেজ দেওয়ান ও বহু কর্মচারীকে হত্যা করে। ইংরেজদের বিবরণীতে এই সব ঘটনা প্রচ্ছন্ন ভাবে লিখিত আছে। বাঙ্গালী এখনও সেই সব কাহিনী ও ঘটনার কথা পল্লীগাথায় ও মুখে মুখে জিয়াইয়া রাখিয়াছে। তৎকালীন কুঠিয়ালদের অত্যাচার ও কুঠি ভাঙ্গার একটি পল্লীগাথা নিম্নরূপ :

৪. Vide, Bengal under the Lt. Governors, statistical account of Rajshahi and district gazetteer

## নীলের গান

মুল্লুকের গুড়াগুড়ি, কবিতার শুরু করি
যা করেন গুরু;
শুন কুঠালের সমাচার, কালিদহে কুঠি যার,
ক্যানি সাহেব ক্যাজার কল্লশুরু
মে আউসের জমিতে বোনে নীল, সব রায়তের হল মুস্কিল–
সব রায়তের মনে অবিস্তর;
দিলেতে পাইয়া ব্যাথা, নালিশ করে কলিকাতা,
দরখাস্ত দিল তিন সায়াল;
দরখাস্তে হল স্পষ্ট, লাট সাহেব হ'লো ব্যস্ত
বাঙ্গালাতে পাঠাল গব্‌নাল;
গব্‌নাল এলো বাঙ্গালা পরে, ধুমাকলে নৌকা চলে,
বল্‌ব কি সে নৌকা সাজের কথা।
তার দুই পাশে দুই চাকা ঘুরে চলে কেবল আগুন জোরে,
গোলই বাঁধা সোনা।
তার পাছা নায়ে নিশান গাড়া ধুমাকলে নস্কার পোরা
মধ্য নায়ে যান ব্যস্ত পুরী
দোহাই ধর্ম্ম অবতার, তুমি কর সুবিচার,
ঝাপ দিল সব ইছামতির জলে,
* * * * * *
* * * * * *
তাড়াশের ছোট বাবু কুঠাল দেখে বড়ই কাবু,
ফরিদপুর সে দিয়াছে ইজারা।
বড় তরফ বনয়ারী লাল, যার ডঙ্কা চিরকাল;
সাহেব মা'রে কল্ল ছারখার;
সে পুণ্যা করে জ্যৈষ্ঠ মাসে, আমলাগণ সব চতুস্পার্শ্বে,
আগে বাঁধে লাঠির আগায় কুল।
* * * * * *
* * * * * *
ড্যামরা আছে ছালু সরকার, করতে দেয়না নীলের কারবার
লাঠি ধরে ডোমরার পচা রায়।
ডোমন গিরি সন্ন্যাসী বগুড়া জেলা যার বাড়ী
গোসাইদের গুরুদেব হয়।
* * * * * *
* * * * * *
হামকুড়ার মজুমদার, বিশিদের কার পর দাজ,

নাটোরের মহারাজা বড়ই সুখী তার প্রজা,
রতন বিশির দেখে করে ভয়।
রতন বিশি হুকুক দেয় কুঠী ভাঙ্গে ডেমরার রায়,
কুঠী ভাঙ্গে ফ্যালল জলে;
পয়দাওয়ালা শুনতে পায়, জজের কাছে খবর দেয়,
জজে সেই খবর পাল, অগ্নি সমান রাগ হল,
শুনল রতন বিশির কথা, জজে করে হেট মাথা
মোকদ্দমা করে ডিস্‌মিস্‌॥

**উপরোক্ত আক্রান্ত কুঠির হিসাব :**

| নীলকুঠি | থানা | রেশম কুঠি | থানা |
|---|---|---|---|
| নন্দকুজা | বড়াই গ্রাম | সরদাহ | চারঘাট |
| চন্দ্রপুর | গুরুদাসপুর | বাঘা, চকসাতারী | ” |
| গুরুদাসপুর | ” | মীরগঞ্জ | ” |
| বীরা বাড়িয়া | গুরুদাস পুর | লালপুর | লালপুর |
| সিধুলী | ” | বিল মাড়িয়া | ” |
| নাড়ীবাড়ী | ” | পান নগর | দুর্গপুর |
| লাল পুর | লালপুব | দুর্গপুর | ” |
| বিল মাড়িয়া | ” | নও পাড়া নন্দনপুর | ” |
| কালিদাস খালি | ” | ভোলাহাট | ভোলাহাট |
| চারঘাট | চারঘাট | রামচন্দ্র | শিবগঞ্জ |
| নন্দনগাছি | ” | সুলতানগঞ্জ | গোদাগাড়ী |
| আরাণী | ” | নওগাঁ | নওগাঁ |
| রাজাপুর | ” | নাজিরবা নজিপুর | পত্নীতলা |
| সরদাহ | ” | বাগমারা | বাগমারা |
| বাঘা-চর্কসাতারী | ” | মহন পুর আছিন ঘাট | ” |
| পানা নগর | দুর্গপুর | গোমস্তাপুর | গোমস্তাপুর |
| দুর্গপুর | ” | মোহনগঞ্জ | বাগমারা |
| দমদমা | ” | বালুয়া | গোদাগাড়ী |
| বিড়ালদহ | পুঁঠিয়া | খরচাকা | ” |
| নন্দন পুর | দুর্গপুর | বড়গাছি | ” |
| পাথাইল ঝাড়া | আত্রাই | জামবাড়িয়া আদমপুর | ভোলাহাট |
| কানষাট | শিবগঞ্জ | বুঁদেলা বা বাদাল | বদল গাছি |
| রামচন্দ্রপুর হাট | ” | রাঙ্গামাটি | পত্নীতলা |
| চালাল | গোমস্তাপুর | বদল গাছি | বদল গাছি |

নীল বিদ্রোহের সময় প্রত্যেক জেলার কালেক্টরের রদবদল হইয়া যোগ্যতর ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু, হইলে কি হইবে, নীলের পরেই আবার শুরু হইল দেশব্যাপী প্রজা বিদ্রোহ। এই প্রজা বিদ্রোহ এবার কেবল ইংরেজ কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে নয়। দেশী রাজা-জমিদারদের বিরুদ্ধেও।

ইংরেজ কোম্পানীর আমলে হেষ্টিংসের সময়ে নূতন ইজারা বন্দোবস্ত প্রবর্তণের ফলে উত্তর বঙ্গে যে প্রজা বিদ্রোহের উদ্ভব হয় তাহার ইসু ধরিয়া পরবর্তীকালে পাবনা-রাজশাহীতে প্রজা বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। ১৮৭২-৭৩ সালে পাবনার প্রজাবিদ্রোহ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা[৫]। এই প্রজাবিদ্রোহের ফলে ১৮৮৫ সালে "বঙ্গীয় প্রজাসত্ব" আইন প্রবর্তিত হয়[৬]। বাজে জমা আদায় ও নূতন জরিপের নামে খাজনা বৃদ্ধি, কবলিয়াত গ্রহণ ইত্যাদি কারণে এই বিদ্রোহের উদ্ভব হয়। বাংলা ১২২৭ সালের ফাগুন-চৈত্র মাসে বিদ্রোহীগণ খাজনা বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে বাদানুবাদ চলে। অবশেষে প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া নিজেদিগকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহীদিগের নেতৃত্বে করেন শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত দৌলতপুর নিবাসী বিখ্যাত ঈশান চন্দ্র রায়*।

পাবনার প্রজা বিদ্রোহের প্রভাব

পাবনা প্রজাবিদ্রোহের ঢেও পরবর্তীকালে রাজশাহীর বহু জমিদারকে নাজেহাল করিয়া ফেলে। বিশেষতঃ বিদ্রোহী নেতা মৌঃ আস্তান মোল্লার নেতৃত্বে রাজশাহীতে প্রজা আন্দোলন গড়িয়া উঠে।

খাজনা বৃদ্ধি করিবার জন্য দুবোল হাটির জমিদার পূর্বাপেক্ষা কম মাফ কাঠির দ্বারা নূতন করিয়া জমা ও খাজনা বৃদ্ধি করে+। ফলে জমিদারের প্রজাবর্গের মধ্যে এ ব্যাপারে একটি আন্দোলন চলিতে থাকে এবং খাজনা বন্ধ করিয়া দেয়। অবশেষে দুবোল হাটির রাজার বিশ্বস্ত প্রজা মৌঃ আস্তান মোল্লার নেতৃত্বে প্রায় ৫০ হাজার প্রজা একত্র হইয়া রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তিন দিন ধরিয়া রাজবাড়ী অবরোধ করিয়া রাখেন। শেষে হাতির পীঠে আরোহনাবস্থায় রাজা হরনাথের স্ত্রীদ্বয় শ্যামা সুন্দরী ও উমা সুন্দরী রাজবাটির বাহিরে আসিয়া বিদ্রোহীদের শান্ত হইতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, রাজা হরনাথ মৃত্যু শয্যায় শায়িত ....... আপনাদের অভিযোগ বিবেচনা করা হইবে ........ইত্যাদি।" এই আহবানে প্রজা নেতা আস্তান মোল্লা তাঁহার প্রধান সহকারী (সাধারণের ভাষায় আস্তান মোল্লার দেওয়ান) নারু মোল্লাকে প্রতিনিধি করিয়া সহস্রাধিক বিদ্রোহী সহ রাজবাটির কাচারিতে প্রেরণ করেন। অবশেষে ম্যানেজার শশিভূষণ রায়ের ক্ষমা প্রার্থনা এবং জনৈক সরকারী কর্মচারীর উপস্থিতিতে প্রজাদের সহিত আপোষ নিস্পত্তি হয়।

প্রজা বিদ্রোহের কবলে দুবোল হাটি

শোনা যায়, এই প্রজা বিদ্রোহ হইতে বিরত থাকিবার জন্য রাজা হরনাথ প্রজা নেতা

---

৫. Imperial gazetteer E B, And Assam P. 285, statistical account of Pabna, PP 319-20

6 The Bengal Tnancy Act, 1885

* পাবনা প্রজা বিদ্রোহের বিস্তৃত ঘটনা ও পল্লীগাথা নদীয় পাবনার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইবে।

\+ আগে জমিদারী আমলে উত্তরাধিকারী জমিদারের হাতের মাপকাঠি দ্বারা ভূমি মাপ করার নিয়ম প্রচলিত ছিল। এই সব মাপ কাঠির কতকগুলি এখনও রাজশাহী কালেক্টরীর মহফুজ খানায় রক্ষিত আছে।

মৌঃ মরহুম মোল্লা আস্তানকে প্রচুর লাখেরাজ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রজা স্বার্থে তাহা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। বাংলা ১২৯১ সালে (১৮৮৩ খ্রীঃ) এই বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় আর উহার পরিসমাপ্তি ঘটে ১২৯৬ (১৮৮৮ খ্রীঃ) সালে। দুবোল হাটির এই শোচনীয় পরাজয় দেখিয়া বলিহার, মহাদেবপুর, চৌগ্রাম, কানষাট প্রভৃতি জমিদাবগণ নূতন জরিপ দ্বারা তাহাদের জমা ও খাজনা বৃদ্ধির সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

নাটোর কৃষক সম্মেলনী

নওগাঁর দুবোল হাটির প্রজা বিদ্রোহের সমসাময়িক নাটোরে একটি 'কৃষক সম্মেলনী' প্রতিষ্ঠা হয়। এই সম্মেলনী কেবল জমিদার নয়, বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করিয়াছেন। তাহারা এই সম্মেলনীর মাধ্যমে ঐক্য বদ্ধ হইয়া কৃষক প্রজার পক্ষে জমিদার ও বৃটিশ সরকারের অবিচার, অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় বাদ প্রতিবাদ জানিয়াছেন। আবেদন নিবেদন করিয়াছেন। বৃটিশ সরকারের রাষ্ট্র নীতির জঘন্যতম সমালোচনা করিয়াছেন। এই সম্মেলনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুন্সী মহাম্মদ মহসেন উল্লাহ্ 'বুড়ীর সূতা' নামক সমালোচনামূলক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক বাংলা ১৩১৬ সালে প্রকাশ করিয়া প্রজা সাধারণকে ঐক্য বদ্ধ করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন।

তখন হিন্দু জমিদারী মধ্যে মুসলমানদের গো-মাংস খাওয়া নিষেধ ছিল। কুত্রাপি কেহ গোপনে গো-মাংস ভক্ষন করিলে তাহার উপর অকথ্য অমানুষিক সীমাহীন অত্যাচার হইত্ 'বুড়ীর সূতাতে' এইরূপ ঘটনা ও উহার প্রতিবাদ মূলক বহু কাহিনী এবং হিন্দু জমিদারী মধ্যে ইমারত গড়ান, পুকুর খনন, গাছ কাটা, পূজার অর্ঘ্য স্বরূপ খাসি-পাঠাজোর পূর্ব্বক গ্রহণ, সুন্দরী নারীদের উপর বল পূর্ব্বক ধর্ষন ইত্যাদি বহু ঘটনা সন তারিখ সহ লিপিবদ্ধ আছে।

বিলমাড়িয়া পুজা আন্দোলন

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে দেশ বন্দুর ডাকে ছাত্র-শিক্ষক-স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করেন। এই আন্দোলনের একজন নায়ক কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র শ্রীসোমেশ্বর চৌধুরীর নেতৃত্বে 'বিলমাড়িয়া' প্রজা আন্দোলন গড়িয়া উঠে।

বিলমাড়িয়া, মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর সাহেবরা আগে এতদঞ্চলে নীলের চাষ করিত। তাহাদের বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী সুবিদিত। নীলের চাষ বন্ধ হইয়া গেলে পুণরায় তাহারা জমিদারী শুরু করিয়া প্রজাদিগকে নানাভাবে নির্য্যাতন করিতে থাকে। বিলমাড়িয়া কন্‌সারনের ষাট (৬০) হাজারের অধিক প্রজা সজ্ঘ বদ্ধ হইয়া কোম্পানীর খাজনা বন্ধ করিয়া দেয়। এমন কি ধোপা, নাপিত, বাবুর্চি সকলেই কোম্পানীর কুঠি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই আন্দোলনে সোমেশ্বর বাবু ও বহু প্রজা বন্দী হন। শেষে কুঠিয়াল সাহেবেরা বেকায়দায় পড়িয়া প্রজানেতা প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ীর সহিত আপোষ করিতে বাধ্য হয়।

বীরকুৎসা প্রজা আন্দোলন

১৯৩১ সালে গান্ধী–আরউইন প্যাকট অনুযায়ী জেল হইতে মুক্তি পাইয়া প্রজা নেতা প্রভাস লাহিড়ী বীরকুৎসা জমিদারের অধীনে নিপীড়িত প্রজাবর্গের পক্ষে আন্দোলন করিতে থাকেন। এই আন্দোলনে প্রভাস বাবু বন্দী হন। তাঁহার পরে খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রী সতীশচন্দ্র দাস গুপ্তের নেতৃত্বে বিশিষ্ট কংগ্রেস শ্রী মানস গোবিন্দ সেন এই আন্দোলন পরিচালনা করেন। তাহারাও যখন বন্দী হন

তখন নেতৃত্ব করেন স্থানীয় নৈমুদ্দীন মিঞা। এতদব্যতীত কৃষাণ-শ্রমিক প্রভৃতি আন্দোলন ও বিদ্রোহের মধ্যে দিয়া রাজশাহী তথা বাঙ্গালার মুক্তি আন্দোলন জোরদার হইয়া উঠিয়াছিল।

মান্দা প্রজা আন্দোলন

এই সময় মান্দাকে কেন্দ্র করিয়া আর একটি প্রজা আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল।

আমরা অত্র ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে রাজশাহীর জনবসতি কর্ম কীর্তি ও রাজা জমিদার প্রভৃতি প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছি। ইংরেজ আমলে, মধ্যে মাত্র ২৫-২৬ বৎসর এই জেলার মুসলমানরা হিন্দু রাজা জমিদারদের প্রভাবে পড়িয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র ও অধিকার সব কিছুই হারাইয়া ফেলিয়াছিল। আবার যখন তাহারা তাঁহাদের ঐতিহ্য ও বল বীর্য্যের কথা স্মরণ করিল, তখন তাহাদের রোধ করা আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। যে যেখানে থাকিল সে সেখানেই দুর্ব্বার শক্তিতে আত্ম প্রকাশ করিল। তাই, আমরা পরবর্তী একটি ঘটনাতে দেখিতে পাই। আনুমানিক ১৯০৪-৫ সালে (?) একই

বিংশ শতকে রাজশাহীতে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ

দিনে একই সময়ে বাগমারা থানাধীন 'একডালা হাট' ও মোহনপুর থানাধীন 'কেশর হাট' লুটকে কেন্দ্র করিয়া এতদঞ্চলের বহু বিশিষ্ট মুসলমানকে দোষী সাব্যস্থ করা হয় এবং ধর পাকর চলে। এই সময় যে সব মুসলমান কারা নির্য্যাতন ভোগ করেন তন্মধ্যে কেশর হাট লুট ব্যাপারে হাজি জয়েন উদ-দীন, একডালা হাট লুট ব্যাপারে হাজি মির্জ্জা ইয়াকুব আলী অন্যতম। এই ঘটনায় স্থানীয় হিন্দুগণ ষড়যন্ত্রমূলক মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমা দায়ের করেন। রাজশাহীতে তখন মুসলমান উকিল না থাকায় হিন্দু উকিলগণ মুসলমানের পক্ষে মোকদ্দমা গ্রহণ করেন না। অবশেষে শরৎচন্দ্র রায় নামক জনৈক জুনিয়ার উকিল এই মোকদ্দমার প্রাথমিক কার্য্য সম্পাদন করেন। পরে, এই মোকদ্দমা পরিচালনা করিবার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল মৌঃ এস্ ওয়াহেদ হোসেনকে নিযুক্ত করা হয়। বাঙ্লা সরকারের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট, মৌঃ নাছিরুদ্দীন আহম্মদের ব্রাঞ্চ কোর্টে (রাজশাহী) বিচারে শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রামী মুসলমানরাই জয়ী হন। এই মোকদ্দমার ব্যাপারে স্থানীয় মুসলমানগণ একতা, ধৈর্য্য ও ত্যাগের যে মহান আদর্শ সৃষ্টি করেন তাহাই পরবর্তীকালে সমগ্র রাজশাহী জেলার মুসলমানদের আত্মজাগরণের মূল কারণ হইয়া উঠে। এবং তখন হইতেই প্রকৃত পক্ষে স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সকল রকম চেতনা, ঐক্য ও সংহতি গড়িয়া উঠে। এবং নানা আন্দোলন বিপ্লব বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়।

বলা বাহুল্য, শরৎ বাবু মুসলমানদের পক্ষে মোকদ্দমা গ্রহণ করায় স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক নানা নির্য্যাতন সহ্য করেন। এই সময় হইতে মুসলমানদের আত্মচেতনা দেখিয়া স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হয়। এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের কোণঠাসা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে।

রাজশাহী জেলার রাজনীতিকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহার

রাজনৈতিক মঞ্চ

প্রথমভাগেই রাজশাহী জেলার প্রজা-চাষীদের কথা বলিতে হয়। জমিদার ও পরে বৃটিশ সাম্রাজ্য বাদীদের অধীনে প্রজাগণের উপর যখন নানা নিপীড়ন ও নির্য্যাতন চলিতে থাকে তখন এ জেলার চাষী প্রজারাই

তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রথম আওয়াজ তোলে। এই আন্দোলরে প্রধান কেন্দ্র ছিল পত্নীতলা, নওগাঁ ও নাটোর। নওগাঁর মোহামেডান এসোসিয়েশন এতদঞ্চলের প্রজা আন্দোলনের ভূমিকায় স্বকীয় অংশগ্রহণ করেন। এবং নাটোরের কৃষক-সম্মেলনী নাটোর প্রজা আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন।

কান্তকবি ও স্বদেশী আন্দোলন

ইহার দ্বিতীয় স্তরে স্বদেশী আন্দোলনের কথা। পূর্ব্ব বঙ্গীয় মুসলমান স্বার্থের বিরুদ্ধে বঙ্গ ভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু নেতারা এই আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। এই আন্দোলনে রাজশাহীর 'স্বদেশী কবি' কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজশাহীর পথে-প্রান্তরে হাটে-ঘাটে সভা-সমিতিতে

কবি কণ্ঠে–

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই,
* * * * *
ঐ মোটা সূতোর সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই,
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।
* * * *
পরের জিনিস কিনবো না যদি
মায়ের ঘরের জিনিষ পাই।"

গীত হয়।" এই সুরে সেদিন রাজশাহীর আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন কবি রবীন্দ্রনাথের রাখি বন্ধন,–"বাঙ্‌লার মাটি বাঙ্‌লার জল–বাঙ্‌লার বায়ু বাঙ্‌লার ফল"... ... ... ... রসরাজের কবি অমৃত লালের "আমরা জাত বাঙ্গালী, 'প্রেম বাঙালী'... ... ... ... কবি দ্বিজেন্দ্র লালের "বঙ্গ আমার, জননী আমার ... ... ... ...।" কবি গবিন্দ দাস ও সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতির গান গীত রাজশাহীর বিশেষতঃ হিন্দু আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই আন্দোলনে বিদেশী বর্জ্জন, বিলাসিতা ত্যাগ দেশী চরকায় সূতা কাটা, দেশী সূতায় প্রস্তুত মোটা কাপড় ব্যবহার ইত্যাদি ব্রত অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছিল।

তৃতীয় স্তবের কথা বিপ্লব বিদ্রোহের কথা। অগ্নি যুগের কথা। এই যুগে বৃটিশ শক্তি টল টলায়মান হইয়া পড়িয়াছিল। এই যুগেই দেশের আজাদী তরান্বিত হইয়াছিল, ইতিহাস এই যুগকে 'বিপ্লবী যুগ' আখ্যা দিয়াছে।

ইং ১৯১১-১২ সালে বৈপ্লবিক কর্মী হিসাবে ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী* (পরে "মহারাজ" নামে খ্যাত) রাজশাহীতে আগমন করিয়া বৈপ্লবিক পাটির (অনুশীলন সমিতির শাখা) একটি শাখা স্থাপন করেন। এবং কর্মী হিসাবে এই সমিতিতে পর্য্যায় ক্রমে যোগদান করেন প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, নরেন্দ্র কিশোর ভট্টাচার্য্য, জিতেশ লাহিড়ী ও

* ইঁনি মোমেনশাহী জেলার কাপাসাটিয়া গ্রামের অধিবাসী। জেলে ৩০ বৎসর, ১৬ দিন অনশন ও ৬০ মাস পলাতক ছিলেন।

ধীরেন ঘটক। পরে শুধাংশু চৌধুরী (চেরু) বীরেন্দ্র নাথ সরকার (বর্তমান য়্যাড্ভোকেট) সচীন খাঁ, সৈয়দালী সরকার প্রমুখ অন্যতম×। বগুড়া শহর নিবাসী বিখ্যাত 'যতীন দার' দলের সহিত এই সমিতি এক যোগে কার্য্য করিতে থাকে। পরে, ১৯২১ সালে গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে রাজশাহীর অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী কর্মীগণ কংগ্রেস দলের সহিত ভিড়িয়া গিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন গড়িয়া তোলেন+। এই আন্দোলনের ফলে রাজশাহী জেলার মক্তব মাদ্রাসা হাইস্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া যায়। গ্রামে গ্রামে তাঁত ও চরকা গড়িয়া উঠে এবং এই সময় পাট ও চরকা শিল্পের প্রভূত উন্নত হয়। দেশের সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হইয়া গেলে বিপ্লবী কর্মীগণ স্থানে স্থানে কতকগুলি জাতীয় বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী কালে আলী ভ্রাতৃদ্বয় প্রতিষ্ঠিত 'খেলাফত' এবং ডাঃ সৈফুদ্দীন কীচুলুর প্রতিষ্ঠিত "তাঞ্জিম" আন্দোলন মরহুম খান বাহাদুর ইমাদ-উদ-দীন সাহেবের নেতৃত্বে গড়িয়া উঠে।

অনুশীলন সমিতির শাখা

রাজশাহীর বিপ্লবী কর্মীদের দ্বারা ১৯২৯ সালে বিজন সেন প্রমুখ কর্মী কর্তৃক নাটোর রাস্তায় (চাঁদ পুরের নিকট) ডাকমারা সাকোর সন্নিকট "মেল ডাকাইতি," ১৯৩০ সালে রাজশাহী জেলের সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ লিউককে গুলি করার অভিযোগ ভোলানাথ রায় ধৃত হইয়া দশ বৎসর দীপান্তর; ১১৩০ সালে রাজশাহীর মেল ডাকাইতি (সেরিকালচারের উত্তরে বড় রাস্তার উপর পুলের নিকট) ও ১৯৩১ সালে পুঁঠিয়াতে রাজশাহীর অমলেন্দু বাগচী প্রমুখের নেতৃত্বে মেল ডাকাইতি এবং ধরাইল ডাকাইতি প্রভৃতি কার্য্য সংঘটিত হয়।

১৯৩০ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠানিক ভাবে একটি কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের মূল সভার সভাপতিত্ব করেন বিপিণ চন্দ্র গাঙ্গুলী। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন বাবু সুরেন্দ্র মোহন মৈত্রেয়। এই সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃত্ব করেন শুধাংশু চৌধুরী (চেরুদা) ও বীরেন্দ্রনাথ সরকার। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সন্দেহে এই সম্মেলনে যোগদানকারী অনুশীলন সমিতির কর্মী মহারাজ (ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী), চেরু চৌধুরী, পুতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী ও বঙ্কিম মুখর্জ্জি প্রমুখ গ্রেপ্তার হইয়া রাজশাহী জেলে নীত হন। অতঃপর কোন রকমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

কংগ্রেস সম্মেলন ও নেতৃবৃন্দ

রাজশাহী জেলায় বিশিষ্ট কংগ্রেস ও বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে কংগ্রেস নেতা মৃত সুরেন্দ্র মোহন মৈত্রেয় (নাটোরের কলম নিবাসী), মৃত সত্য প্রিয় বন্দোপাধ্যায়, প্রজানেতা প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, জিতেশ লাহিড়ী, মানস গোবিন্দ সেন, সুরেন্দ্র নাথ বখশী, নীরেন্দ্র নাথ দত্ত, শরদিন্দু, মৃত তিন কড়ি চক্রবর্তী, বীরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, জনাব নৈমু-দ্দিন, শুধাংশু চৌধুরী (চেরুদা), সমাজ তন্ত্রী দলীয় নেতা য়্যাড্ভোকেট বীরেন্দ্রনাথ

× শ্রী প্রভাস লাহিড়ী– ঃ জেলে ২৩ বৎসর, ৩০ দিন অনশন, ৩৬ মাস পলাতক; শ্রী শুধাংশু চৌধুরী জেলে ১২ বৎসর, প্রভাস লাহিড়ীর ভ্রাতা শ্রী জিতেশ লাহিড়ী ঃ জেলে ১২ বৎসর; শ্রী বীরেন্দ্রনাথ সরকার জেলে ১২ বৎসর, অনশন ১৭ দিন; সচীন খাঁ জেলে ৮ বৎসর।

\+ অসহযোগ আন্দোলনে কয়েদীরা লোহার থালা দ্বারা রাজশাহী জেলের লোহার গেট ভাঙ্গিয়া বহু কয়েদী পলায়ন করে। পরে তাহারা অধিকাংশই ধরা পড়ে। শোনা যায় এই ঘটনার পর হইতে লোহার থালার পরিবর্তে 'এলোমনিয়াম থালার প্রচলন হয়।

সরকার, শচীন্দ্র চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ সান্ন্যাল, ক্ষিতিশ চন্দ্র দেব, হেমেন্দ্র নাথ মৈত্রেয়, মৃত প্রভাস চন্দ্র মৈত্রেয়, মৃত কুমারী মীরা মৈত্রেয়, বীনা পানি দেব্যা, হেম নলিনী বিশি, মৃনালিনী দেবী, সুকুমার চক্রবর্তী, অতুল চন্দ্র মৈত্রেয়, কেদারেশ্বর সিংহ, শক্তি ভূতি চৌধুরী, অমর গোপাল নন্দী প্রমুখ অন্যতম। ইঁহারা ১৯২১ সাল হইতে দেশ-বিভাগ পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন ভূমিকায় অবতরণ হইয়া রাজশাহীর মুখোজ্জল করিয়াছেন। ১৯২১ সালে কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন সুদর্শন চক্রবর্তী।

'অসহযোগ', 'খেলাফত', ও 'তাঞ্জিম' আন্দোলন স্তিমিত হইয়া পড়িলে উত্তর বঙ্গের প্রজা আন্দোলনের অগ্রদূত ও নেতা মরহুম মৌঃ রজীব উদ-দীন তরফদারের নেতৃত্বে নাটোরে কৃষকদের মধ্যে নব পর্য্যায়ে কৃষক প্রজা আন্দোলন গড়িয়া উঠে। পরে ইহার ঢেউ সমগ্র জেলায় বিস্তৃতি লাভ করে। সদরে খান-বাহাদুর ইমাদ-উদ-দীন ও নওগাঁ অঞ্চলে মৌঃ মুসলিম আলী মোল্লা প্রমুখ এবং নওয়াবগঞ্জ অঞ্চলে মওলানা ইদরীস আলী আহম্মদ (বি. এ.) প্রমুখ এবং নওগাঁর ডাঃ আলা উদ-দীন, মৌঃ খন্দকার আশরাফ আলী প্রভৃতির নেতৃত্বে এই আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। সেদিন এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন প্রজানেতা মরহুম—"শেরে বঙ্গাল" মৌঃ এ, কে, ফজলুল হক, প্রজানেতা আবু হোসেন সরকার প্রমুখ জন-নায়ক। দেশ বিভাগের পর আবার ইহার আত্মপ্রকাশ হইলে উহার গতি তেমন জোরদার হয় নাই। তখন উহার রূপ দাঁড়ায় 'কৃষক-শ্রমিক' আন্দোলন। অতঃপর দেশে মুসলিম লীগ আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিলে অন্যান্য আন্দোলন স্থিমিত হইয়া পড়ে। খেলাফত ও তাঞ্জিম আন্দোলনের কর্মীবৃন্দ* মুসলীম লীগে যোগদান করিলে এই দুই আন্দোলন বন্ধ হইয়া যায়। অবশেষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় মুসলিম লীগ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

প্রজা আন্দোলন

চতুর্থ স্তরে রাজশাহী জেলা মুসলীম লীগের কথা। ইং ১৯০৬ সালে ঢাকা নগরীতে নওয়াব মরহুম স্যার সলিমুল্লার নেতৃত্বে মুসলীম লীগের আনুষ্ঠানিক জন্ম হয়। তদবধি ইহা কেবল আবেদন নিবেদনের ক্ষেত্র হিসাবেই ব্যবহৃত হইত। ১৯৬৩ সালের (?) ডিসেম্বরের দিকে ঢাকার নওয়াব হাবিবুল্লাহ বাহারের আগমনে রাজশাহী বালিকা বিদ্যালয়ে উপস্থিত মৌঃ আবদুল হামিদ মিঞা, ডাঃ মজিদুর রহমান ও মৌঃ মাদার বখশ, পারভেজ আলী মরহুম, য়্যাডভোকেট আবদুল আজিজ, খান মেহের আলী মোক্তার, ডাঃ মোঃ সফী, মরহুম আবদুল গোফফার প্রমুখ প্রায় ২২ জন কর্মী সমন্বয়ে ডাঃ মজিদুর রহমানকে সম্পাদক ও জনাব মৌঃ আবদুল হামিদকে সভাপতি করিয়া রাজশাহীতে মুসলীম লীগের শাখা স্থাপনের আগ্রহ দেখা যায়। তদানুসারে ইং ১৯৩৭ সালে (?) পাকিস্তানের সাবেক উজিরে আজম মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী রাজশাহীতে আগমন করিলে শহরের দরগাহ, প্রাঙ্গনে এক সভার অধিবেশনে শহরের গন্যমান্য ব্যক্তিদের লইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। এই সংগঠনের মৌঃ আবদুল হামিদ সভাপতি ও মৌঃ মাদার বখশ সম্পাদক নির্বাচিত হন*। এখন মুসলিম লীগ শহর ছাড়িয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে।

* রাজশাহীর বিপ্লবী কর্মীদের আত্মগোপন করিয়া থাকা কালীন রাজশাহীর বন-তোষনী ও শীরূপ বৈষ্টুমী নানা ভাবে সাহায্য করেন।

পরে উকিল জনাব আজিজুল আলম, রহমত আলী উকিল, মির্জ্জা ইয়াকুব আলী, নুরুল হোদা, আলী আজম উকিল, এ, সামাদ প্রমুখ কর্মী যোগদান করেন। এই সময় যুব কর্মী হিসাবে জনাব আতাউল রহমান (মোক্তার) প্রভৃতির যোগদান বিশেষ স্মরণীয়।

সদরে মুসলিম লীগের আনুষ্ঠানিক সংগঠন কালে নাটোরের মুসলিম লীগের নেতৃত্ব করেন কাজী ভ্রাতৃদ্বয় মৌঃ কাজী আবদুল মজিদ ও মৌঃ কাজী মাসুদ ও জনাব ফজলুর রহমান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। নওগাঁ মুসলিম লীগের পুরো ভাগে তখন উকিল নবী উদদীন ও সিরাজ উদদীন, মৌঃ মনিরুদ্দীন আকন্দ, নেয়াজ উদদীন আহমদ, ছমির মোক্তার, ইয়ার মহম্মদ, হাজি মোবারক আলী প্রমুখ নেতৃত্ব করেন। এইভাবে মুসলিম লীগ সদর হইতে সমস্ত জেলায় মহকুমা, থানা, ইউনিয়নে বাজার-বন্দরে শাখা প্রশাখার মাধ্যমে মুসলিম লীগের সংগঠন ও সংহতি জোরদার হইতে থাকে।

তারপর ইং ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাবের উপর কায়েদ-ই-আজম জনাব মুহম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ (All India Muslim league) স্বকীয় হইয়া উঠিলে, রাজশাহীতেও – ইহার দুর্বার শক্তি অর্জন করে এবং বৃটিশ ব্যুরোক্রেশী ও কংগ্রেসের আপত্তি কর পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে। ছাত্র, শিক্ষক, আবাল বৃদ্ধ বনিতা পাকিস্তান অর্জনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। অতঃপর বাঙলা দেশে মুসলিম লীগ গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে তখনই পরিণত হয় যখন জনাব এ, কে, ফজলুল হক মরহুম ১৯৪১ সালে (নভেম্বর) লীগ পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ও মুসলমানের দুস্মন হিন্দু মহসভা নেতা ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জ্জির সহিত যোগদান করিয়া "প্রোগ্রেসিভ মন্ত্রীসভা" গঠন করেন। ইসলাম জিন্দা হোতা হায় হরকারবালাবাদ"। তাই, আমরা দেখিতে পাই, জনাব মরহুম হকের এই ব্যাপারের জন্য আজাদী তরান্বিত হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। এই সময় রাজশাহীর মুসলিম লীগের নীতি-নির্ধারক (Policy maker) মৌঃ মাদার বখশ ও তদীয় অন্যতম ভাব শিষ্য ক্ষণজন্মা কর্মী জনাব আতাউর রহমান প্রমুখের দ্বারা সমগ্র জেলার মুসলমান সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। শোনা যায়, তখন জনাব আতাউর রহমানের মত লীগ পাগলের আবির্ভাব না হইলে রাজশাহীতে লীগের দুর্বার শক্তি অর্জন করা সম্ভবপর হইত না। এই সময় নাটোরের কাজী মাসুদ, নওগাঁতে মনিরুদ্দীন আকন্দ, সিরাজ উদ্দীন প্রমুখ লীগের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ান। এইভাবে মুক্তি সংগ্রামে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সুনিয়ন্ত্রিত নীতি নির্দ্ধারণে আন্দোলন বিপ্লবের মাধ্যমে মুসলিম লীগ বৃটিশ শাসনকে টলটলয়মান করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশন

আতাউব বহমান

---

সন তারিখ সম্বলিত ইঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের ধারাবাহিক ঘটনাটি ও কর্মকীতির কথা সংগৃহীত হইলে স্থানান্তরে লিপিবদ্ধ হইতে পারে।

অবশ্য ডাঃ মজিদুর রহমান সাহেব অপারগ হইলে জনাব মাদার বখশ সাহেব কিছুদিন পূর্ব্বে থেকেই সম্পাদক ছিলেন।

## ॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ ॥

# পাকিস্তান আমল

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাজশাহীতে নওয়াবগঞ্জ মুসলিম লীগের ভূমিকায় আমরা মনাকষার মরহুম মুরতেজা রেজা চৌধুরী, নজমুল হক মরহুম, গরীবুল্লাহ আরেফিন প্রভৃতির নাম জানিতে পারি। ১৯৫৩ সালে জেলা মুসলিম লীগের যে পরিবর্তিত সংগঠন ও নির্ব্বাচন হয় মুরতেজা রেজা চৌধুরী তাহার সভাপতি ও মোক্তার এমরান আলী সরকার সম্পাদক হন। এই লীগে ক্যাপটেন মরহুম শামসুল হক, ও আবুল কালাম আজাদ মোক্তার প্রভৃতি কর্মী ও নেতার যোগদান উল্লেখযোগ্য।

মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড লীগের একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছিল। লীগের বিপ্লব যুগে ১৯৪৪ সালে রাজশাহীতে ন্যাশনাল গার্ড সংগঠন উদ্দেশ্যে সরকার এমরান আলী সাহেবকে সালারে জেলা নিযুক্ত করা হয়। তাহার অধীনে যথাক্রমে সদরে মোসাদ্দারুল হক, নাটোরে মৌঃ কাচু-উদদীন, নওগাঁতে মৌঃ আবদুর রহমান তরফদার এই তিন জনকে নায়েব সালার জেলা নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিট গঠন করিয়া আঁধা-সামরিক ট্রেনিং দেওয়া হয়। ইঁহাদের মধ্যে হইতে বাছাই কৃত জোয়ানদের লইয়া কলিকাতায় উর্দ্ধতন ট্রেনিং সমাপ্ত হইলে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে সালারে সুবা জনাব আই-এ. মোজাহের সাহেবের রাজশাহী আগমনে কলেজ ময়দানে প্রায় দশ হাজার ন্যাশনাল গার্ডের একটি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। তৎপর ১৯৪৫-৪৬ সালে পাকিস্তান ইসুর উপরে ভোট গ্রহণকালে এই প্রতিষ্ঠান তাহাদের শক্তি নিয়োজিত করে এবং জয়যুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে কলিকাতায় দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় বহু সংখ্যক জোয়ান সেখানে মাসাধিক কাল অবস্থান করিয়া সাধাবণ নাগরিকের জীবন রক্ষার দায়িত্ব পালন করিতে যাইয়া অনেকে নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করেন।

মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড

বিভাগোত্তর কালে ইঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল সরকারী কার্য্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা। চোরা চালান বন্ধ করা ও মোহাজেরদের পুর্ণবাসন কার্য্যে সাহায্য করা ইত্যাদি। অতঃপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কোন কার্য্য না থাকায় ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে কায়েদ-ই-আজমের নির্দ্দেশ ক্রমে এই প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। ন্যাশনাল হোম গার্ডও একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছিল। পাকিস্তানের ভিত্তি সুদৃঢ়ের মূল্যে এই দুই প্রতিষ্টানের প্রচুর অবদান রহিয়াছে।

নূরুল আমিন সরকারের আমলে নানাবিধ গঠণ মূলক কার্য্য হওয়া সত্ত্বেও স্বার্থপর ও দুস্কৃতি পরায়ন লোকদের দ্বারা দেশে নানা প্রকারের অবৈধ বরবরোচিত কার্য্য হইতে থাকিলে সাধারণ নাগরিকদের জীবন দুব্বিসহ হইয়া উঠে। ফলে লীগের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। তাহার দরুণ সরকার দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই সুযোগে কয়েকটি বিরুদ্ধ দল সৃষ্ট হইয়া মাথা চাড়া দিয়া উঠে।

পাকিস্তান সৃষ্টি ও আজাদীর মূলে রাজশাহীর মুসলিম লীগের ত্যাগ কোরবাণী ও সুদৃঢ় মনোবল চিরদিন আজাদীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। রাজশাহী মুসলিম লীগের এই গৌরবময় অধ্যায়ে মরহুম পারভেজ আলী, মোক্তার মেহের আলী, মৌঃ

আবদুল হামিদ মিঞা, মৌঃ মাদার বখশ, মৌঃ মনিরুদ্দীন আকন্দ, কাজী আবদুল মাসুদ, মৌঃ ফজলার রহমান, আতাউর রহমান মোক্তার প্রমুখ বিশেষ স্মরণীয়।

ইং ১৯৪৮ সাল হইতে (?) রাজশাহীতে বাঙলা ভাষা আন্দোলনের পুরোভাগে ছাত্র নেতা ও কর্মীদের মধ্যে জনাব একরামুল হক, জনাব গোলাম রহমান, জনাব মোঃ সুলতান, জনাব হাবীবুর রহমান (শেলী) ও অধ্যাপক আবুল কাশেম প্রমুখের নাম স্মরণীয়। জনাব শেলী বর্তমানে ঢাকা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করেন।

আজাদী উত্তর যুগে

পরবর্তীকালে পাকিস্তান তামদ্দুন মজলিস ও ছাত্র শক্তি প্রভৃতি আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন জনাব আনার আলী প্রমুখ।

আজাদী উত্তর যুগে মুসলিম লীগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে যে সব রাজনৈতিক দল মাথা চাড়া দিয়া উঠে, তন্মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নিজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দলের সমন্বয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' নামক একটি পার্টি গঠিত হয়। এই দল ক্ষমতায় আসিবার পর, অভ্যন্তরীণ কোন্দল সৃষ্টি হয় এবং 'যুক্তফ্রন্ট' দল ক্ষমতাচ্যুৎ হইয়া 'কৃষক-শ্রমিক' ও জনশক্তি পার্টি (Peoples prograsive party) ও অন্যান্য দলের সহিত মিলিত হইয়া একটি 'কোয়ালিশন' মন্ত্রী প্রবাস চন্দ্র লাহিড়ী, মরহুম শামসুল হক প্রভৃতি অগ্রগামী ছিলেন।

এই অধ্যায়ে উপস্থিত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যাঁহাদের কথা শ্রদ্ধা ও গর্বের সহিত স্মরণ করিতেছি তাঁহারা হইতেছেন নাটোরের মহারাণী ভবাণী দেব্যা, দীঘাপতিয়া রাজ পরিবার, নওগাঁর দুবোল হাটির জমিদার, হাসাই গাড়ীর আস্তান মোল্লা, শহরের অধিবাসী ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, আলিয়াবাদ নিবাসী মির্জা ইউসুফ আলী, কামার গাঁ নিবাসী কিশোরী মোহন চৌধুরী, পুঁঠিয়া নিবাসী রাণী হেমন্ত কুমারী দেব্যা, রাজারামপুর নিবাসী খাঁন বাহাদুর ইমাদ-উদ-দীন, আড়ানী নিবাসী প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, দাদন চক নিবাসী মওলানা ইদরিস আলী আহম্মদ, স্থাপন দীঘি নিবাসী মওলবী মাদার বখশ ও কেশবপুর নিবাসী মোক্তার আতাউব রহমান প্রভৃতি অন্যতম। ইঁহারা কেহ বিবিধ দান পুণ্যে কেহ আন্দোলন বিপ্লব ও রাজনীতিক্ষেত্রে, কেহ বা ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনায়, কেহ একাধিক শিক্ষা সদানুষ্ঠান রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়া চিরস্মণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

রাজশাহীর ইতিহাস রচনায় যাদের ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য

অত্র ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে ইহাঁদের ভূমিকার কিছু কিছু উল্লেখ আছে। পরাধীন যুগ হইতে স্বাধীনতা উত্তর যুগের প্রথম দশকের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে ইহাঁদের সংগ্রামী জীবনের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। ইহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

প্রখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের পর, অবসাদগ্রস্থ মুসলিম সমাজকে জাগাইবার ব্রত গ্রহণ করেন মরহুম সার সৈয়দ আহম্মদ। তিনি আলিগড় বিদ্যালয়কে (পরে বিশ্ববিদ্যালয়) কেন্দ্র করিয়া, সর্ব প্রথম এই জাতীয় আন্দোলন শুরু করেন। অবশেষে ইং ১৮৮৫ সালে হিন্দু মুসলমানের সম্বন্বয়ে ভারতীয় জাতীয় (Indian Nationa Congress) কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইহা বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু ইহা নীতিভ্রষ্ট হইয়া ইংরেজ বিতরণের জন্য স্বদেশী সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি করিলে এবং খুদিরাম (বসু) ও প্রফুল্ল চাকী* প্রভৃতি অল্পবয়স্ক যুবকগণ বিভ্রান্ত হইয়া ইংরেজ নিধন শুরু করিয়া ফাঁসীকাষ্ঠ বরণ করিলে, মুলসমানরা ইহা

মুক্তিযুগের অতীত ও বর্তমান

হইতে বাহির হইয়া পড়েন। ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন উপলক্ষে উহা জোরদার হইয়া পড়িলে, ইং ১৯০৬ সালে মুসলমানগণ ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লা মরহুমের নেতৃত্বে মুসলীম লীগের গোড়া পত্তন করেন। অবশেষে ভারত ছাড়'র (Quit India) পরিপ্রেক্ষিতে দেশে হিন্দু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগই অন্যতম সরকার বিরোধী প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ও মরহুম আলী ভ্রাতৃদ্বয়, জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ বিপুল শক্তি অর্জন করে। ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে ও ১৯৩৭ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পাক-ভারতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, দেশকে এই মহাযুদ্ধের সম্মুখে ঠেলিয়া দেওয়ায়, উভয় প্রতিষ্ঠান ইহার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আওয়াজ তোলে। সায়ত্ব শাসন দিবার স্বীকৃতিতে তাঁহারা আন্দোলন লঘু করেন এবং ১৯৩৯ সালের শেষ মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পাক-ভারতের উপনিবেশিক দাবী পেশ করেন।

রাউণ্ড টেব্‌ল কনফারেন্স, মাউন্ট ব্যাটেন সাক্ষাৎকার, বিবিধ মিশন ব্যর্থ হইবার পর, হঠাৎ দেশে সম্প্রদায়িকতার ফলে বিপুল লোকক্ষয় হয় এবং দ্বিজাতিত্বের ভিত্তিতে সর্বশেষে পাকিস্তান ও ভারত ডোমিনিয়নের সৃষ্টি (১৯৪৭-১৪ই আগষ্ট) হয়।

দেশের এই আজাদী সংগ্রামের শেষ লক্ষ্যে পৌঁছিতে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সুনিয়ন্ত্রিত নীতি নির্ধারণ– রাউ লাট য়্যাক্ট, নীল য়্যাকট, ফাঁসী, গুলি, কালাকানুন, বিবিধ নিপীড়ন, শিশু বলি ও মাতৃত্বের সম্ভ্রম বিনাশ প্রভৃতি অনেক কিছুই সহ্য করিতে হইয়াছে। পরিশেষে আজ বলিতে পারি, – যাঁহারা রেশম, নীল, প্রজা, কৃষাণ, মজদুর, সিপাহী; অহাবী, ফরয়েজী, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রভৃতি সঙ্ঘ, সংহতির মাধ্যমে সত্যাগ্রহ, নিয়তি প্রতিরোধ, বিদেশী বর্জন, আইন অমান্য, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি ব্যাপারে যথা সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকার পূর্বক গৃহ বর্জন করিয়াছেন; কারা বরণ করিয়া স্বৈরাচারীদের অশেষ নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন; যাঁহাদের অগ্নিবর্ষী, অনলবর্ষী জ্বালাময়ী ভাষণে একদিন সমগ্র দেশ কম্পিত হইয়াছিল– সংগ্রামী পতাকা তলে দেশের আপামর জনসাধারণ একতাবদ্ধ হইয়াছিলঃ সেই অগ্রগামী দলের মধ্যে আজ অধিকাংশই চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। যাঁহারা কালের সাক্ষী স্বরূপ আজও জীবন সর্বস্ব জীবিত; তাঁহাদের অনেকেই আজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, কেহ বা সর্ব্বহারা, কেহ বা জীর্ণ শীর্ণ ভাবে তৈলশূন্য প্রদীপের ন্যায় ক্ষীণ আয়ু ভোগ করিতেছেন।

আজাদীর সৌভাগ্য স্বরূপ ধর্ম ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হইয়া পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ভারতের যে অঞ্চল যে ধর্মাবলম্বী সংখ্যা গরিষ্ঠ সেই অঞ্চল তাহারই ভাগ্যে পড়িয়াছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে স্ব স্ব ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা, আচার ব্যবহার– মোটকথা সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষার ব্যবস্থা এবং উন্নতির বিধান, স্বাধীনভাবে পরিস্ফুট করিবার অধিকারের দাবীতে ভারত বিভক্ত হইয়াছে।

কায়েদ-ই-আজম মুহম্মদ আলী জিন্নার দৃঢ় একনিষ্ঠ নেতৃত্বে (১৯৪৭ ১৪ই আগষ্ট) ভারতের মুসলমানদের একটি বৃহত্তর অংশে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জিত হয়। এই অংশের নাম পাকিস্তান। পাকিস্তান রাষ্ট্র পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই অংশে বিভক্ত। পূর্ব ও

**পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও ইহার প্রভাব সৃষ্টিতে দেশবাসী ভূমিকা**

পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবধান প্রায় সহস্রাধিক মাইল। একমাত্র জল ও বিমান পথে এই রাষ্ট্রের পরস্পর যোগসূত্র রক্ষিত। পাক-ভারতে ইসলাম প্রচারের ঐতিহাসিক সূত্রে জানিতে পারি– ভারতের সর্ব পূর্ব ও পশ্চিমে যে সব অঞ্চল সর্ব প্রথম মুসলিম প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল এবং মুসলিম অধ্যুষিত ছিল সেই সব অঞ্চল জুড়িয়া পাকিস্তান হয় নাই। কেবল পূর্ব ও পশ্চিম

এই দুই অংশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বটে কিন্তু এখনও মুসলিম অঞ্চলের বহুলাংশ এই দুই বিভাগের বাহিরে রহিয়াছে। মুসলিম বাঙলার কৃষ্টি সভ্যতার ভিত্তি ভূমি মালদহ জেলার গৌড়' হিন্দু স্থানে রহিয়াছে। তাহা ছাড়া এই নদী মাতৃক দেশে ভৌগোলিক সীমারেখার দিক দিয়াও পূর্ব পাকিস্তানের আকৃতি খর্ব করা হইয়াছে এবং তাহার দরুণ এই ভূখণ্ডের সৌন্দর্য্য ও মর্যাদার হানী হইয়াছে।

পাকিস্তানকে জগতের বুকে একটি শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য দেশের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং আপামর জনসাধারণ বিশেষভাবে আগ্রাহান্বিত। কিন্তু কাজ অপেক্ষা কথার তুবরীই বর্তমানে বেশী। ইহার পিছনে রহিয়াছে নেতৃত্বের মোহ। তাই পাকিস্তান সৃষ্টির পট-ভূমিকায় যে আদর্শ লইয়া রাজশাহীর নেতৃবৃন্দ সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, উহা লভ্য হইবার পর তাঁহাদের মধ্যে যেন শিথিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আজাদীর প্রথম ধাপে দেখি যে স্থান হইতে যাত্রা শুরু হইয়াছিল– পরক্ষণেই নেতৃবৃন্দের স্বার্থদ্বন্দ্বে সেই স্থানেই থামিয়া যায়। ইহার দ্বিতীয় স্তর হৈ-হুল্লাহ বিশৃঙ্খলা ও গতানুগতিকতা হইতে রেহাই পায় নাই। তৃতীয় স্তর আরম্ভ হইয়াছে। এই স্তরকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। ইহার প্রথম স্তর সামরিক শাসন ও দ্বিতীয় স্তর মৌলিক গণতন্ত্র। এই শেষের স্তরের প্রবর্তক ফিল্ড মার্শাল মোঃ আইয়ুব খান। এই স্তরে পাকিস্তানের আদর্শ বাস্তবায়ন এবং ইহার সুদৃঢ়তার জন্য সকল রকম প্রচেষ্টা চালিতেছে বটে কিন্তু এক শ্রেণীর স্বার্থপর নাম সর্বস্ব নেতৃবৃন্দের শাসন ক্ষমতায় অযোগ্যতার দরুণ জনসাধারণ নানাভাবে বিভ্রান্ত ও শোষিত হইতেছে। মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে যে পরিমাণ অর্থ বিতরণ করা হইতেছে শতকরা উহার ৫০ ভাগ অর্থ উপযুক্ত ও নিষ্কাম সাধক কর্মীর দ্বারা বিলি ব্যবস্থা করা হইলে, পাকিস্তান এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরও অনেকখানি আত্ম নির্ভরশীল হইয়া উঠিতে পারিত। দুঃখের বিষয় তাহা হয় নাই। বলা বাহুল্য, আদর্শ শিক্ষা ও কর্ম কেন্দ্র স্থাপিত করিয়া হাতে কলমেও কথায় কার্য্যে চরিত্রবান ও উপযুক্ত কর্মী প্রস্তুত করিতে পারিলে, জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। আপামর জনসাধারণের মধ্যে দেশ প্রীতি দেশাত্ববোধ জাগিয়া উঠিবে। আজাদী লাভের পর বৈদেশিক শিক্ষা সংস্কৃতি ও আইনের কুপ্রভাব এখনও পরিবর্তিত হয় নাই। তাহার দরুণ দেশের আদর্শ ও শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম এবং সাধু ও সুধীজন ক্ষোভে দুঃখে বিক্ষুব্ধ হইয়া আছেন। "পাকিস্তানী অর্থে" জাতি কিছুটা ধর্মভাবাপন্ন হইয়াছে বটে কিন্তু শিক্ষা ও আইন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হওয়ায় জাতীয় চরিত্রের ভাঙ্গন রোধ করা সম্ভবপর হয় নাই। বরং বৈদেশিক কৃষ্টি সভ্যতার ব্যাপক প্রচলন হইয়াছে।

পাকিস্তানীরা আজ তাহাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য গর্বিত। বলা বাহুল্য, এই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে বগুড়ার কৃতী সন্তান, পাকিস্তানের সাবেক উজিরে আজম, রাষ্ট্রদূত, ও পররাষ্ট্র সচীব মরহুম মহম্মদ আলী পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থে বর্হিবিশ্বে বন্ধুত্বপূর্ণ কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মহম্মদ আইয়ুব খান এই সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করিয়া পাকিস্তানকে জগতের বুকে এক অদ্বিতীয় আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। পাকিস্তানের তরাক্কীর জন্য খোদা তাঁহাকে তৌফিক এনায়েত করুন।

॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥

# লেখক ও লেখিকা

রাজশাহী জেলায় শতাধিক লেখক ও লেখিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকদের শুধুমাত্র নাম পেশ করিব। স্থানাভাবে ইঁহাদের সংগৃহীত পুঁথি পুস্তকের উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভবপর হইল না।

**১- সাধক নরোত্তম দাস দত্ত** (১৫৩১-১৬১১ খ্রীঃ) :- স্বাধীন মুসলিম বাঙলার আমলে ইঁনি বহু বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি রচনা করিয়া বৈষ্ণব সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হন। গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত কুমারপুরে জন্ম। ইঁহার সাধন পীঠ খেতুর গ্রামে অবস্থিত।

**২- শুকুর মামুদ বা আবদুস শুকুর** : ইঁনি অষ্টাদশ শতকের কোন এক সময়ে জীবিত ও পবা থানার সন্নিকটে সিন্ধুর কুশুম্বী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইঁনি সতী ময়না, গোপীচন্দ্রের গান ও মৃগুল শহরের কাহিনী সম্বলিত পুঁথি প্রভৃতি রচনা করেন।

**৩- গিরিশ চন্দ্র লাহিড়ী** :- ইঁনি মহারাণী শরৎ সুন্দরীর জীবনী প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। ইঁনি পুঁটিয়ার অধিবাসী; বিংশ শতকের গোড়ার দিকে জীবিত ছিলেন।

**৪- মির্জ্জা মৌঃ মহম্মদ ইউসুফ আলী** (১৮৫৮-১৯৩০ খ্রীঃ) : ইঁনি একজন বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও ধর্মীয় পুস্তকাদির লেখক ছিলেন। অত্রগ্রন্থে প্রথম খণ্ডে তাঁহার কর্ম কীর্তির কথা কিছু বর্ণিত হইয়াছে। ইঁনি 'ইসলামতত্ত্ব', 'দুগ্ধ সরোবর', বিখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাজ্জালীর 'কিমিয়া সাদতের' বঙ্গানুবাদ (সৌভাগ্য স্পর্শমণি) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইঁনি দুর্গাপুর থানার আলিয়াবাদ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

**৫-কান্তকবি রজনীকান্ত সেন** (১৮৬৫-১৯২৪ খ্রীঃ) :- ইঁনি পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গা বাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির ছাত্র জীবন ও কর্ম্মজীবন রাজশাহী শহরে অতিবাহিত হইয়াছে। ইঁনি একাধারে গায়ক ও কবি ছিলেন। কবির জীবন মধ্যাহ্নে দুরন্ত ক্যানছার রোগে পীড়িত হইয়া দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেহ ত্যাগ করেন। বাণী, কল্যাণী, আনন্দময়ী, অভয়া, বিশ্রাম, 'অমৃত' প্রভৃতি ৭ খানা কবিতা পুস্তক, ও গান রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

**৬-ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়** (১৮৬১-১৯৩০ খ্রীঃ) : বাঙলার প্রাচীন ইতিহাসে গবেষণা ও সাধনার ক্ষেত্রে তাঁহার দান অনস্বীকার্য্য। তাহার প্রকাশিত গবেষণালব্ধ গ্রন্থের মধ্য, সমরসিংহ, সিরাজদ্দৌলা, সীতারাম, মীর কাসিম, ফিরিঙ্গি বণিক, অজেয়াবাদ গৌড় লেখমালা (প্রথম স্তবক) উল্লেখ্য। এতদব্যতীত পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা প্রবন্ধগুলির একটি তালিকা মৈত্রেয় মহাশয়ের আত্মকথাতে প্রকাশিত হইয়েছে। গৌড় লেখমালা, সিরাজদ্দৌলা ও মীর কাসিম তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ১৯৩০ সালে

১০ই ফেব্রুয়ারী তিনি পরলোক গমন করেন। রাজশাহী শহরে এখনও তাঁহার বসতবাটী রহিয়াছে।

**৭- আচার্য্য যদুনাথ সরকার** (১৮৭০-১৯৫৮ খ্রী:):- মারাঠা শিবাজী, মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও আওরঙ্গজেব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার সার্থক গবেষণার কেন্দ্র ছিল পাটনার বিখ্যাত 'খোদা বখশ লাইব্রেরী'। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। তিনি ১৯শে মে কলিকাতায় পরলোক গমন করেন। মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও আওরঙ্গজেব তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি সিংড়া থানার করচ মরিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

**৮-বিনোদ বিহারী রায়** (১২৬৯-১২৫২ আশ্বিন) :- ইঁনি রাজশাহী শহরের অধিবাসী। পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব নামক বই লিখিয়া সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

**৯- মহম্মদ মহসেন উল্লাহ্** :- ইঁনি 'বুড়ীর সূতা' নামক একখানা পুস্তিকা লিলিয়া তদানীন্তন সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে ইঁনি জীবিত ছিলেন।

**১০–কাজী জসিমুদ্দীন** :– 'দীন ও দুনিয়া' নামক একখানা ধর্মীয় পুস্তিকা লিখিয়া তৎকালীন হিন্দু প্রভাবিত মুসলমান সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

**১১– শেখ মহম্মদ জুমুন উদ-দীন** :– ইঁনি ৮ খানা ধর্মীয় পুস্তক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। মহামানব, মুক্তি পথ, কর্মবীর, জহ্লা, এস্কে মওলা, গৃহদর্পণ প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা। ইঁনি নাটোরের তেবাড়িয়া নিবাসী ও মুনসেফ আদালতের একজন নগণ্য পিয়াদা ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। ইঁনি বিংশ শতকের একজন সার্থক লেখক ছিলেন। তাঁহার অপকাশিত ২ খানি গ্রন্থ 'অপূর্ব্ব তাজমহল' ও 'স্বপ্নে ভ্রমর।'

**১২- মৌঃ দোস্ত মহম্মদ মিঞাজি** :– ইঁনি ঊনবিংশ শতকের শেষ অধ্যায়ে মিরাতোল ইমান. খয়রবেরজঙ্গ, খয়রুল বাসার, প্রভৃতি ধর্মীয় (কাহিনী মূলক) পুঁথি লিখিয়া বেশ নাম করিয়াছিলেন। ইঁনি পোরশা নিবাসী সাহু পরিবারের একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন।

**১৩– মওলানা দেওয়ান নাছিরু উদ-দীন** :– ইঁনি বিংশ শতকের প্রথম অধ্যায়ের ইসলাম প্রচারক ও ধর্মীয় পুস্তকাদির একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন। সমাজপতি ও বাগ্মী হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মুন্সী মেহেরুল্লা প্রমুখ ধর্মীয় নেতাদের সমসাময়িক এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে রাজশাহীর ইসলামী আন্দোলনের পুরাভাগে বিশেষ নাম করা আলেম ছিলেন। তিনি প্রায় ১৯ খানা ধর্মীয় পুস্তক লিখিয়া ইসলামী আন্দোলনকে জোরদার করিয়া তুলিয়াছিলেন। পতি ভক্তি, ঐতিহাসিক, গল্প, বিদায়, উর্দ্দু শিক্ষা প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইঁনি নওগাঁ শিকারপুরের অধিবাসী ছিলেন।

**১৪– হাজি কেয়ামতুল্লাহ্ খন্দকার** :–ইঁনি তাহিরপুরের অধিবাসী ও ইসলামী গজল গীতি লেখক। প্রায় ৫০ খানা গজল গীতির পুস্তিকা প্রচার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইঁনি

একখানা ধর্মীয় মাসিকও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৫–কবি মোজাফফর হোসেন :– নওগাঁ কাজী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁনি 'খাকী সাহেব' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁহার অন্যতম কবিতা পুস্তক 'চাঁদনী চক্'। এতদব্যতীত আরও ২।৩ খানি পাণ্ডুলিপি তাঁহার পুত্রের নিকট রক্ষিত রহিয়াছে। কবির অকাল মৃত্যুতে তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

১৬–রাজা জগদ্রিনাথ রায় (১২৭৫৭১৩৩২ পৌষ) :– ইঁনি নাটোর বড় তরফের জমিদার। সাংবাদিক ও লেখক ছিলেন। ইঁনি দীর্ঘদিন ধরিয়া 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' নামক একটী মাসিক সম্পাদনা করিয়া শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা ভাজন হইয়াছিলেন। ইঁনি নূর জাহান, 'শ্রুতি স্মৃতি' প্রভৃতি ঐতিহাসিক চিত্র সম্বলিত পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'সন্ধ্যা তারা' কবিতা পুস্তকও ইঁহার কীর্তি।

**১৭– মৌঃ এনায়েৎ কাজী** :– উনবিংশ শতকের শেষের দিকে ইঁনি জীবিত ছিলেন। কলিকাতারবয়ান, সকের মেলা ও পয়ার ছন্দের পুঁথি লেখক হিসাবে তৎকালে বেশ নাম করা ছিলেন। তাঁহার পয়ার ছন্দের দুই খানা অপ্রকাশিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইঁনি তানোর থানার অন্তর্গত লবলবী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

**১৮– মৌলবী সমস-উদ-দীন** (জন্ম : ১৮৯৬ খ্রী :)–ইঁনি অবিভক্ত ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগের একজন আরবী ফারসী ভাষার বিশেষজ্ঞ ও সরকারী উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। পরে তিনি কলিকাতা যাদু ঘরের অধ্যক্ষ হন। তৎপর পাকিস্তান পুরাতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক (Director) পদে উন্নীত হন। তখন তিনি বাঙ্লা-বিহার উড়িষ্যা ও আসামের সংগৃহীত আরবী ফারসী ভাষার শিলালিপি সমূহের পাঠোদ্ধার করেন। অবসর জীবন যাপনে তাহা সম্প্রতি Inscriptions of Bengal নামে সম্পাদন করেন। এই সংকলন খানি তাঁহার অমর কীর্তি। লেখক বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত আছেন।

১৯– **প্রমথনাথ বিশী** বড়াই গ্রাম থানার জোয়াড়ী গ্রামের বিশি পরিবারের স্বনামধন্য সুসাহিত্যিক অধ্যাপক প্রথমনাথ বিশী জোড়া দীঘির চৌধুরী পরিবার, পদ্মা, কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের শ্রী কান্তের 'শ্রীকান্ত ৫ম পর্ব্ব ও বহু কবিতা উপন্যাস এবং সাহিত্য, সমালোচনা মূলক বই পুস্তক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার আর একখানি গ্রন্থ 'লালকেল্লা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

**২০–কবি তালিম হোসেন** :–'দিশারী' নামক কবিতা পুস্তক ইঁহার সার্থক রচনা। ইঁনি একজন সুলেখক ও সাংবাদিক। বর্তমানে ইঁনি সরকার পরিচালিত 'মাহেনও' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক পদে নিয়োজিত আছেন। ইঁনি বদলগাছি থানাধীন চাকরাইল গ্রামের অধিবাসী। ইঁহার পিতা মৌঃ তৈয়ব উদ-দীন সাহেবও সমালোচনা মূলক 'ভিক্ষাদান' ও 'নকশা' নামক দুইখানি কবিতা পুস্তক লিখিয়াছেন।

**২১–মজিবর রহমান** :– ইঁনি নওয়াবগঞ্জ মহকুমার চক্আলমপুর নিবাসী একজন প্রাক্তন রিসার্চ স্কোলার ছিলেন। সিরাজদ্দৌলার 'কলঙ্ক মোচন' প্রভৃতি ক্ষুদ্র সংকলন করিয়া পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। লেখকের অকাল মৃত্যু মুসলমান সমাজের অপূরুণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

এতদব্যতীত 'রাণী ভবাণী' উপন্যাসের লেখক দুর্গাদাস লাহিড়ী; পুরাতত্ত্ব মূলক

প্রবন্ধ লেখক শ্রীরাম মৈত্রেয়; আলেয়ার কবি ও সাংবাদিক রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী; 'আত্মবোধ ও রামায়ণের সমালোচক আতাইকুলা নিবাসী উমেশচন্দ্র মৈত্রেয়; 'সঙ্গীত কুসুম' প্রভৃতি রচয়িতা গাঙ্গইল নিবাসী রামজয় বাগচী; 'সালোমে ও নেতাজী নাটক (Oscer Wilde এর Salmoe এর বাংলা অনুবাদ) প্রভৃতির লেখক শৈলেশনাথ বিশি; 'গুরু গোবিন্দ' প্রণেতা পণ্ডিত গিরিজাকান্ত গোস্বামী; 'জল খাবার' ও 'বরেন্দ্র রন্ধন' প্রভৃতির লেখিকা কিরণ লেখা রায়; 'স্বর্ণরেখার' লেখক কুমার জয়ন্তনাথ রায়; বাঙ্‌লা মৌলুদ শরীফের প্রণেতা নওগাঁর কাজী মৌঃ ইউসুফ; 'মালঞ্চ' এর কবি পোরশা নিবাসী' আঃ খালেক; 'খতিয়ানের' (১৪ পৃ:) কবি ও সংবাদদাতা নাটোন নিবাসী শ্রী গজেন্দ্র নাথ কর্মকার; আজমীরের পথে প্রণেতা (বর্তমান) নওগাঁ নিবাসী খান সাহেব মোঃ আফজাল; ঝর্ণা, নিশি ভোরের ডাক পভৃতির লেখক শ্রীরামপুর নিবাসী অধ্যাপক আবদুর রহমান; ঊষার আলো, ঝর, মুক্তি প্রভৃতি নাটকের লেখক নাটোর রেলওয়ে বাজার নিবাসী ডাঃ অন্নদামোহন বাকচী; 'সিক্ত আঁখি, প্রভৃতির লেখিকা রাজশাহী শহর নিবাসী মুছাম্মাৎ শামসুর নাহার; মন হারাল যে, জল-তরঙ্গ প্রভৃতি বইয়ের লেখক আড়ানী নিবাসী মনিন্দ্র সাহা; ধূলিকণার লেখক রাজশাহী নিবাসী মহম্মদ হাসমতউল্লাহ্; পল্লী ছড়ার কবি নজিপুর নিবাসী এ কে, এম, নূরুল ইসলাম; ইসলাম সমাজতন্ত্রবাদের কবি পতিসর নিবাসী আবদুল কাদের; অমর কবি রবীন্দ্রনাথ ও রূপান্তর নাটকের লেখক নাটোর নিবাসী কবীন্দ্র কুমার মজুমদার প্রভৃতি নাম করা যায়।

॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ॥

# পত্র-পত্রিকা এবং নাট্যশালার ইতিবৃত্ত

বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রসারের সহিত বাঙ্‌লা সাময়িক পত্র-পত্রিকার ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে। ১২২৫ (ইং ১৮১৮ খ্রী:) সালে প্রথম বাঙ্‌লা সাময়িক পত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যেব দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

বাংলা ১২৭২ সালে রাজশাহী হইতে 'হিন্দুরঞ্জিকা' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহাই রাজশাহীর প্রাচীনতম পত্রিকা[৭]। ইহার সমসাময়িক আর একটি পত্রিকার নাম করা যায়। তাহা 'রাজশাহী সংবাদ' নামে প্রকাশিত হইত। এই দুইটি পত্রিকা পরস্পর বিরোধী মতামত প্রচার করিত। 'হিন্দুরঞ্জিকা ছিল রাজশাহী 'ধর্ম সভার' সাপ্তাহিক মুখপাত্র; আর 'রাজশাহী সংবাদ' ছিল 'ব্রাহ্ম সমাজের' সাপ্তাহিক মুখপত্র। ইহা ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইত।

রাজশাহী হইতে বিভিন্ন সময়ে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে এখানে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

১— **'হিন্দুরঞ্জিকা'** (প্রথমে মাসিক, পরে ৭৫ সালে বৈশাখ হইতে সাপ্তাহিক) প্রকাশকাল বাঙ্‌লা ১২৭২ সাল। ইং ১৯৫২ সালে বন্ধ।

২— **'রাজশাহী সংবাদ'** (সাপ্তাহিক) প্রকাশ কাল ১২৭৭ সাল। ১২৮২ সালে বন্ধ (?)। সম্পাদক -শ্রী যুক্ত জগচ্চন্দ্র সরকার।

৩— **'জ্ঞানাঙ্কুর'** ও **'প্রতিবিম্ব'**। মাসিক আকারে ১২৭৯ সালে প্রথম প্রকাশ। জ্ঞানাঙ্কুর সম্পাদক শ্রী কৃষ্ণদাস। পরে ১২৮২ সাল সাপ্তাহিক। রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত 'প্রতিবিম্ব' একত্র হইয়া "জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব"নাম করণ। ১৫।১৬ বৎসর চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া প্রকাশ।

৪— **রাজশাহী সমাচার** (সাপ্তাহিক)। **প্রথম প্রকাশ** ১২৮২, বৈশাখ। সম্পাদক বেণী মাধব নন্দী। এক বৎসর জীবিত ছিল।

৫— **'রাজশাহীবাসী'** (মাসিক)। করচ মরিয়া হইতে প্রকাশিত। আয়োজক রাজকুমার সরকার। মাত্র কয়েক সংখ্যার পর বন্ধ হইয়া যায়।

৬— **'উদ্বোধন'** (সাপ্তাহিক)। প্রথম প্রকাশ ১২৯০ সাল। কয়েক সংখ্যা মাত্র।

৭— **'শিক্ষা পরিচর'** (মাসিক)। প্রথম প্রকাশ ১২৯৬ সাল। পাঁচ বৎসর স্থায়ী ছিল। আয়োজক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

৮— **'চিকিৎসা'** (মাসিক)। তালন্দ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইত। প্রথম প্রকাশ ১২৯৬ সাল। সম্পাদক বিনোদ বিহারী রায়। কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হইয়া যায়।

৭. Statistical Account of Bengal. Rajshahi District P. 92.

৯– **'বর্ম্ম বন্ধু'** (মাসিক)। প্রথম প্রকাশ ১২৯৮ সাল। ২।৩ সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হইয়া যায়।

১০– **'উৎসাহ'** (মাসিক)। প্রথম প্রকাশ ১৩০৪ সাল। সুরেশ চন্দ্র সাহা কর্তৃক সম্পাদিত হইত। ৫।৬ বৎসর চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়।

১১– **'ঐতিহাসিকচিত্র'** (ত্রৈমাসিক)। প্রথম প্রকাশ ১৩০৫ সাল। সম্পাদক ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। মাত্র কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হইয়া যায়।

১২– **'নূর-উল-ইমান'** (মাসিক)। প্রথম প্রকাশ ইং ১৯০০ সাল। মাত্র ৪ সংখ্যা। সম্পাদক মির্জ্জা ইউসুফ আলী।

১৩– **'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি গেজেট'** (নাটোর হইতে সাপ্তাহিক)।

১৪– **'কেয়া ও পঞ্চম প্রদীপ'** (মাসিক) সম্পাদনা রাধাচরণ চক্রবর্তী ও সচীনন্দন পাল। নাটোর হইতে প্রকাশিত ইহাই প্রথম পত্রিকা।

১৫– **'পল্লী বান্ধব'** (সাপ্তাহিক)। তখনকার দিনে ইহার কলেবর আজিকার আজাদ ও ইত্তেফাকের মতই ছিল। আইনজীবী জনাব আলী আজম ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। পরে মির্জ্জা ইয়াকুব আলী সাহেব সম্পাদক হন। প্রথম প্রকাশ ১৩৩৩ সাল। দীর্ঘদিন চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়।

১৬– **'মালতী'** (নাটোর হইতে মাসিক)। সম্পাদক কাজী আব্দুল মজিদ ও হাসার উদ-দীন। এক সংখ্যা মাত্র।

১৭– **'পল্লব'** (মাসিক-নাটোর হইতে)। সম্পাদক গজেন্দ্রনাথ কর্মকার। এক সংখ্যা মাত্র।

১৮– **'মীজান'** (সাপ্তাহিক)।

১৯– **'প্রভাত'** (নাটোর হইতে হস্তলিখিত প্রথম মাসিক)। পরিচালনা ও সম্পাদনা অতুলচন্দ্র মৈত্রেয় ও প্রবোধচন্দ্র মৈত্রেয়। ইহার আয়ুষ্কাল ২ বৎসর।

২০– **'নয়াজামানা'** (সাপ্তাহিক)। প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬ সাল। জীবিত কাল ৫১ সাল পর্য্যন্ত। সম্পাদক মুসাদ্দারুল হক্।

২১– **'অভিধারা'** (মাসিক?) ঋত্তিক ঘটক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

২২– **'পরিচয়'** (হস্তলিখিত ত্রৈমাসিক)। ১৯৪৩ হইতে ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত অনিয়মিতভাবে চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়। সম্পাদক আব্দুল মজিদ খান।

২৩– **'অভিযান'** (বার্ষিকী)। গুরুদাসপুর শিক্ষা সংগের মুখপাত্র। সম্পাদক আকবর হোসেন।

২৪– **'হেদায়েত', 'জাগরণ', 'সেবক'** (মাসিক) সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ স্যান্নাল ও গজেন্দ্র নাথ কর্মকার। (নাটোর হইতে প্রকাশিত) ২।১ টি সংখ্যা করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

২৫– **'নির্ঝর,' 'সমাজ শক্তি', 'অরবিন্দ', 'হাসি', 'অশ্রু'** (নাটোর হইতে মাসিক রূপে) ২।১ টি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল।

২৬– **'বর্ত্তিকা 'অর্ঘ্য'** (মাসিক) ২।১টি সংখ্যা মাত্র। নাটোর হইতে প্রকাশিত।

২৭– **'বি-পি-জি'** (সাপ্তাহিক?)। সম্পাদক আব্দুল হামিদ (নাটোর হইতে

প্রকাশিত)।

২৮– **'যুগের আলো' 'খাদেম'** (সাপ্তাহিক)।

২৯– **'আলোর পথে',** (সাপ্তাহিক)। নওয়াবগঞ্জ হইতে মুহম্মদ মজিবর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। স্বল্পকাল অনিয়মিতভাবে কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর বন্ধ হইয়া যায়।

৩০– **'দেশেরবাণী'** (নওগাঁ হইতে প্রথমতঃ মরহুম মুবারক আলী কর্তৃক সম্পাদিত হইত। বর্তমানে তদীয় পুত্র ডাঃ মঞ্জুর কর্তৃক সম্পাদিত। সাপ্তাহিক।

৩১– **'দিশারী'** (মাসিক)। ১৯৫০-৫১ সালে প্রকাশিত। সম্পাদনায় হাবিবুর রহমান ও একরামুল হক্। অনিয়মিতভাবে ৬, সংখ্যা পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।

৩২– **'ছাত্রলীগ'** (সাপ্তাহিক) প্রথম প্রকাশ ১৯৪৭ সাল। ৩।৪ সংখ্যা সম্পাদনায় অধ্যাপক কাজী আব্দুল মান্নান ও একরামুল হক।

৩৩- **'দীপালী'** (সাপ্তাহিক)। সম্পাদক ঋত্তিক ঘটক। ২ সংখ্যা মাত্র। প্রকাশকাল ১৯৪৯ সাল।

৩৪– **'প্রবাহ'** (মাসিক)। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪ সাল। ৬।৭ সংখ্যা অনিয়মিত। প্রথম সম্পাদক মৌঃ আব্দুস সামাদ পরে মুঃ কামরুজ্জামান। (হেনা) বর্তমানে উকিল ও এম. এন. এ।

৩৫– **'যাত্রী'** (ত্রৈমাসিক)। প্রথম প্রকাশ ১৯৬০ সাল। কলেজের ছাত্রদের উদ্যোগে অনিয়মিতভাবে মাত্র কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর বন্ধ হইয়া যায়। প্রথম সম্পাদক খন্দকার সিরাজুল হক।

৩৬– **'পূর্ব্ব মেঘ'** (ত্রৈমাসিক)। প্রথম প্রকাশ ১৯৬২-৬৩ সাল। সম্পাদনায় অধ্যাপক মুস্তাফা নুরউল ইসলাম ও অধ্যাপক জিল্লুর রহমান। অনিয়মিতভাবে জীবিত আছে।

৩৭– **'পাপড়ী'** (মাসিক)। সম্পাদক হাবিবুর রহমান। অনিয়মিতভাবে দুই বৎসর চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়। প্রকাশকাল ১৯৬২-৬৩ সাল।

৩৮– **'কিশোর'** (মাসিক) দুই সংখ্যা।

৩৯– **'চঞ্চল'** (মাসিক?) হস্তলিখিত ২।১টি সংখ্যা।

৪০– **'সেতু'** (হস্তলিখিত মাসিক), ১ সংখ্যা। ১৯৫৬ সাল।

৪১– **'শিক্ষা'** (হস্তলিখিত ত্রৈমাসিক)– ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৪২– **দেঁওয়ান'** ২ সংখ্যা।

৪৩– **'অভিযান'** (হস্তলিখিত মাসিক) ২।১টি সংখ্যা।

৪৪– **'অঙ্কুর'** (মাসিক) ২।১টি সংখ্যা।

৪৫– **'মিতালী'** (মাসিক) কিশোর মজলিস কর্তৃক প্রকাশিত। ২ সংখ্যা ১৯৫০ (?) সাল।

৪৬– **রাজশাহী বার্তা**। জেলা কাউন্সিলের মুখপত্র। জেলা কাউন্সিলের মুখপত্র। সম্পাদক আব্দুস সামাদ। প্রথম পাক্ষিক। বর্তমানে সাপ্তাহিক। প্রথম প্রকাশ ১৯৬১ সাল। অনিয়মিতভাবে প্রকাশ হইলেও ইহাই রাজশাহীর সম্ভ্রম রক্ষা করিতেছে।

এতদব্যতীত রাজশাহী হইতে ঊনবিংশ-বিংশ শতকে 'বৈষয়িত তত্ত্ব' 'কৃষি শিল্প', 'সদর মফস্বল', 'ক্রীড়া ও কৌতুক, 'রাজশাহী সম্পদ,' 'হেমায়েতে ইসলাম,' প্রভৃতি পত্র পত্রিক রাজশাহী সদর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয় ও ২টি কলেজ হইতে প্রতি বৎসরে একটি করিয়া ম্যাগাজিন প্রকাশিত হইয়া থাকে। জিন্না ইসলামিক ইনসটিটিউট হইতে দুই সংখ্যা ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি হইতে এক সংখ্যা বার্ষিকী প্রকাশিত হইয়াছেন।

**নাটক ও নাট্যশালার ইতিবৃত্ত**

বাঙ্লা দেশে নাটক মঞ্চস্থ ও নাট্যশালার ইতিবৃত্তের কথা বলিতে গেলেই ইং ১৭৯৫ সালের রুশ দেশবাসী হিরাসিমের কথা মনে পড়ে। এই হিরাসিম লেবেডেক কর্তৃক বাঙ্লা দেশ কলিকাতায় সৰ্ব্ব প্রথম ২৫ নং ডুমলাতে এক নাট্যশালা স্থাপিত হয়। এই নাট্যশালার সহিত বাঙ্লা দেশের লোকের উৎসাহ ও রুচির কোন সংযোগ ছিল না। তাই, তাহা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। লেবেডেকের বিলাত যাত্রার পরেই উহা বন্ধ হইয়া যায়। তারপর প্রায় ৪০ বৎসর পরে বাঙ্গালীদের উপযোগী করিয়া কলিকাতায় বাঙ্গালী কর্তৃক সত্যকার নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান প্রভৃতি ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে মঞ্চস্থ হয়। ইং ১৮২১ সালে রচিত ও প্রকাশিত 'কলি রাজার যাত্রা' নামক একখানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। কেহ কেহ বলেন, উহাই বাঙ্লা দেশের প্রথম নাটক। এই নাটকের কথা ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসের 'সমাচার দর্পন' নামক বাঙলা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। এতদব্যতীত 'কামরূপ যাত্রা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সব নাটক মঞ্চস্থ করা ও নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জনৈক প্রফুল্ল কুমার ঠাকুরের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম যুদ্ধে এদেশে ইংরেজী নাটক বাঙলায় অনুবাদ করিয়া (Shakespear এর গল্প অবলম্বনে) মঞ্চস্থ করা হইত। পরবর্তীকালে ১৮৩৫ সালের দিকে বাঙ্গালী কর্তৃক বাঙলা নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

কলিকাতার নাট্যশালা স্থাপিত ও নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে রাজশাহীর বিত্তশালী জোতদার ও জমিদারদের সহিত কোন সংযোগ ছিল কি না তাহা জানা যায় না। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে 'রামপুর-বুয়ালিয়াতে' নাটকের মহড়া শুরু হয় বলিয়া কোন কোন প্রাচীন লোকের মুখে শোনা যায়। বুয়ালিয়াস্থ রাণী বাজার গোপাল রায়ের বাড়ীতে ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রের মহাশয়ের অনুজ অশ্বিনী কুমার মৈত্রেয়, গোপাল রায় প্রমুখ জমিদার সদানন্দের প্রভৃতির দ্বারা রাজশাহীতে প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করার প্রয়াস চলে। ১৮৯৩ সালে 'ভিক্টোরিয়া থিয়েটার ক্লাব' নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজশাহী শহরে প্রথম নাট্যশালা স্থাপনের সূত্রপাত হয়। এই সময় নাট্যশালার নাটক প্রহসন প্রভৃতির রচনার ভার ছিল ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রের উপর। তিনি নাটক রচনা করিতেন এবং পরিচালনা করিতেন। সেকালে সামাজিক নাটকের চেয়ে ঐতিহাসিক নাটকই বেশী মঞ্চস্থ হইত। 'নূরজাহান' 'রাণী ভবাণী' 'আশা' প্রভৃতি নাটকের নাম করা যায়। তখন রাজশাহীর বিখ্যাত অভিনেতাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কালীপদ ভট্টাচার্য্য, অশ্বিনী কুমার, সুরেন্দ্র মোহন মৈত্রেয়, ডাঃ প্রফুল্ল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। রাণী বাজার, প্রসন্ন ভবনই ছিল 'ভিক্টোরিয়া থিয়েটার ক্লাবের' কর্মীবৃন্দের ক্লাব ও রঙ্গমঞ্চ।

পরবর্তীকালে রাজা প্রমোদা নাথ প্রমুখ কর্তৃক রাজশাহী টাউন হল, বিনির্মিত হইলে

এই ভিক্টোরিয়া থিয়েটার ক্লাবের আয়োজিত নাটক টাউন হলে মঞ্চস্থ হইত। অতঃপর তালোন্দ জমিদার ব্রজেন্দ্র মোহন মৈত্রেয় প্রমূখ কর্তৃক বিভাগ পূর্ব্বকালে ১৯৩২ সালে শহরের 'তালন্দ ভবনে' আষাঢ়িয়া ক্লাব নামক একটি ক্লাব স্থাপিত হয়। শোনা যায় ইহা ১২/১৩ বৎসর বিশেষ জৌলুসের সহিত চলিবার পর স্তিমিত হইয়া যায়। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের প্রথম তিন দিন পর্য্যন্ত ক্লাবের উদ্যোগে খুবই ধূমধাম হইত। যাত্রা থিয়েটার নৃত্যগীত প্রভৃতিতে শহর সরগম হইয়া উঠিত। বিখ্যাত শিল্পী অহিন্দ্র চৌধুরী শিশির ভাদুরী প্রভৃতি অভিনেতাগণ এবং কলিকাতার ষ্টার ও মির্নাভা থিয়েটার পাটি রাজশাহীতে আসিতেন। খ্যাতনামা ওস্তাদ আলা-উদ-দীন খান, দানীবাবু প্রমুখ শিল্পী রাজশাহীতে অভিনয় ও জলসা উপলক্ষে আগমন করিতেন। এই সব অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক টাউন হলে মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতের আসর বসিত ও নাটক মঞ্চস্থ হইত।

দেশ বিভাগের পর সমবেত চেষ্টায় যুগের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া রাজশাহীতে কোন শক্তিশালী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। শিল্পী আব্দুল মালেক প্রভৃতিব চেষ্টায় 'সুরবানী' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের নাম করা যায়। ১৯৪৯ সালে অক্টোবর মাসে 'রাজশাহী শিল্পী পরিষদ' নামক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। মধ্যে এই পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত কয়েকটি নাটক ও একটি সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবার পর ইহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

জেলা আর্ট কাউন্সিল

উচ্চ সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী সমন্বয়ে ইং ২৫/১/৫৯ তারিখে ডেপুটি কমিশনার জনাব কে, এম, এস, রহমানের সভাপতিত্বে একটি সভার অনুষ্ঠানে ১৮ জন সদস্য বিশিষ্ট 'রাজশাহী জেলা আর্ট কাউন্সিল' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। সরকারী কর্মচারীদের তদারকে ইহা এখনও জীবিত আছে। পাকিস্তানের বিশেষ জাতীয় দিবসগুলিতে এই কাউন্সিল নৃত্য-গীত সঙ্গীত প্রভৃতির আয়োজন করিয়া শহরের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া থাকে। 'গ্রামের মায়া' 'ভোলা মাষ্টার' 'মাটির ঘর' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করিয়া কাউন্সিল বেশ নাম করিয়াছেন। এই কাউন্সিলের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য কাউন্সিলের পক্ষ হইতে প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে স্বনামধন্য ডেপুটি কমিশনার জনাব পি, এ নাজিরের বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় ও রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

শহরের লখীপুর গ্রামে স্থানীয় যুবক বৃন্দের দ্বারা' লক্ষ্মীপুর অপেরা পার্টি, নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়া কিছুদিন চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়। এতদব্যতীত আরও কয়েকটি ছোট খাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংগঠনের প্রয়াস চলিতেছে।

## ॥ উনবিংশ পরিচ্ছেদ ॥
# রাজশাহীর জাতি বিভাগ

রাজশাহী জেলার মুসলমান ছাড়াও কিছু কিছু অন্যান্য জাতির বাস আছে। তাহাদের মধ্যে হিন্দু প্রধান। বর্ণভেদে ইহাদিগকে প্রধানতঃ ৮ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন ব্রহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাক, জল আচরণীয় হিন্দু, জল অনাচরণীয় হিন্দু। এই ৮ শ্রেণীর মধ্যে বহু শাখা প্রশাখা রহিয়াছে। তাহারা অত্র জেলার প্রায় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে। হিন্দু সম্প্রদায় ছাড়াও এই জেলায় কিছু সংখক আদিবাসীর বাস আছে। ইহারা সাঁওতাল, শবর, বুনা, ধাঙ্গর, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গোত্র নামে পরিচিত। রাজশাহীর পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে ইহাদের সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হয়। আগের চেয়ে ইহারা বর্তমানে অনেক সভ্য। পাকিস্তানী প্রভাবে শিক্ষা-দীক্ষায় ইহারা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে আগাইয়া আসিতেছে। ইহারা সকলেই কৃষিজীবী। এতদব্যতীত স্বল্প সংখ্যক মাড়োয়ারীর বাস আছে। ইহারা সাধারণতঃ শহর বন্দরে ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টান জাতিরও বাস আছে। ইহারা শহরও পল্লী অঞ্চলে বাস করে। অধিকাংশই কৃষিজীবী।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণভেদ নাই বটে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপাধি অনুসারে তাঁহাদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করা যায়। যেমন শেয়খ, সৈয়েদ, পাঠান, কাজী, খন্দকার, শাহ, সাহু, মন্ডল, পরধান, মীর্জ্জা, মৃধা, মুন্সী, মোল্লা, খাঁ, সরকার, প্রামানিক, প্রভৃতি উপাধির দাবীদার থাকিলেও মূলতঃ ইহারা এক জাতি-মুসলমান। মুসলমান সম্প্রাদায়ের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছে ইহারা মৎস্যজীবী। ইহারা মাহে ফরাস নামে পরিচিত। বাঙ্গালী হিন্দু প্রভাবিত যে সব মুসলমান পরিবার আগে হিন্দুর চালচলন আচার-অনুষ্ঠান অনুস্মরণ করিয়া চলিত গোত্র বা কওম মানিয়া চালিত, শিক্ষার উন্নতি হওয়ায় তাহাদের মধ্যে আশরাফ আৎরাফ উচুঁ নীচু এখন আর নাই বলিলেই চলে।

পোষাক পবিচ্ছদ ও অনুকরণ

পোষাক পরিচ্ছদের দিক দিয়া রাজশাহীর সকল সম্প্রদয়াকে প্রায় একই পর্য্যয়ে ধরা যাইতে পারে। কদাচিৎ কোন কোন হিন্দু ধৃতি পরিধান করে। লুঙ্গী বা তহবন, সার্ট, পাঞ্জাবী, পায়জামা প্রায় সকলেই ব্যবহার করে। সম্প্রতি কালে ইংরেজী শিক্ষিত এক শ্রেণীর লোকেরা বিজাতীয় বা ফিরিঙ্গি পোষাক পরিচ্ছদের আমদানী করিয়াছে। ইহাদের নিজেদের কোন স্বাতন্ত্র বা দেশীয় বৈশিষ্ট্য নাই। আর এক শ্রেণীর যুবক ও যুবতীদের মধ্যে সম্প্রতি ফিরিঙ্গি মার্কা টেডী নামক এক প্রকার পোষাক প্রচলিত। এই শ্রেণীর যুবকেরা সাধারণতঃ উশৃঙ্খল। ইহারা এই কদাকার পোষাক পরিধান করিয়া যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। জনসাধারণ ইহাদিগকে ‘বল্লাহীন’ রূপে সন্দেহ করিয়া থাকে।

মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছেদ প্রায় একই রকমের দৃষ্ট হয়। শহুরে শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে বিশেষতঃ ছাত্রী মহলে পায়জামা সালোয়ারের পরিবর্ত্তে এক প্রকার

বিজাতীয় সবুজ রঙের আটসাট পোষাকের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, কদাচিত শাড়ী পরিধান করে।

**ভাষা ও বসতি**

রাজশাহীর অধিবাসীবৃন্দ পূর্ব্ব পাকিস্তানী জন সংখ্যার একটি অংশ। পূর্ব্ব পাকিস্তানের ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরা যেমন কোন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মানিয়া চলেন না বিজাতীয় বা ভিন্ন দেশীয় চাল-চলন বা আচার মানিয়া চলেন তেমনই এখানকার এক শ্রেণীর এক শিক্ষিত লোকেরাও নিজস্ব কোন স্বাতন্ত্র মানিয়া চলেন না। কেবল বিশেষ এক শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নিজেদের পূর্ব্ব রীতি-নীতিকে অনুস্মরণ করিয়া চলিতে দেখা যায়। ইহারা বিজাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করেন না অথবা অন্য কোন আচার মানিয়া চলেন না। এই খানেই যা রাজশাহীর অধিবাসীবৃন্দের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

এখানকার অধিবাসীবৃন্দের ভাষা বাঙলা। রাজশাহী শহর অঞ্চলে যে সমস্ত বিদেশী লোকের বাস গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ চাকরীজীবী। ইহারা প্রায় অধিকাংশই অবসর প্রাপ্ত এবং বেশীর ভাগই পুলিশের চাকরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

রাজশাহী কৃষি প্রধান জেলা। ধান, পাট, হলুদ, কলাই, শরিষা, আখ, পান প্রধান। ফলমূলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা খেজুরের গুড় প্রধান।

অতীতে রাজশাহীর বাজারে চক্রবতিহারে লগ্নীর মাধ্যমে মুষ্টিমেয় লোক মহাজনী কারবার করিত তাহা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু বর্তমান যুগের ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ও উন্নয়নমূলক কার্য্যে অল্প সুদে ব্যাঙ্কের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। রাজশাহীতে পাকিস্তান ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের পাঁচটি শাখা রহিয়াছে।